পরশুরাম গ্রন্থাবলী



ভূমিকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পূরাকালে পরশুরাম এসেছিলেন মানুষ মারতে, আমাদের কালে পরশুরামের সেরকম কোন মারাত্মক উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মানুষকে হাসিয়ে গিয়েছেন। এই হাসির প্রকৃতি কি তা না-হয় পরে বিচার করা যাবে, তবে আপাততঃ নির্বিচারে বলা যায় যে পরশুরাম হাসির গল্প লিখে গিয়েছেন,—সে সব গল্পে অন্য উপাদান থাকলেও, হাসিটাই মূল উপাদান। হাসির গল্পলেখক মাত্রেই হাসিখুশি থাকবে, আমুদে হবে এরকম ধারণা অনেকের আছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে হাসির রচনা যারা লিখে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার, পরশুরাম সকলেরই প্রকৃতি গম্ভীর। প্রাচীনদের মধ্যে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, কারণ তাঁদের দু'জনেরই দুঃখের জীবন। এত দুঃখের মধ্যে এত হাসিকে কেমন করে তাঁরা রক্ষা করেছেন সে এক বিস্ময়। শমীবৃক্ষ আপন অভ্যন্তরে অগ্নিকে কিভাবে রক্ষা করে? ব্যতিক্রম বোধ করি দীনবন্ধু। দীনবন্ধু আমোদপ্রিয় মজলিসী ব্যক্তি ছিলেন। আবার তিনিও ব্যতিক্রম কিনা সন্দেহ করবার কারণ আছে, যেহেতু খুব সম্ভব একই সঙ্গে দুটি বিপরীত ব্যক্তিত্বকে অন্তরে তিনি পোষণ করতেন। একজন সামাজিক ব্যক্তি, অপরজন সাহিত্যিক। তবু না হয় স্বীকার করা গেল তিনি ব্যতিক্রম।

প্রকৃত হাস্যরসের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আছে, প্রকৃত হাস্যরস আর যাই হোক তরল নয়। কালিদাস যে কৈলাস পর্বতকে ত্র্যম্বকের অট্টহাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন সে এই জন্যে। প্রকৃত হাস্যরস করুণার রূপান্তর বলেই তা গহন গম্ভীর। এ কথা সবাই বোঝে না বোলেই হাসির গল্পের লেখককে দেখতে গিয়ে আমুদে লোককে প্রত্যাশা করে। পরশুরামকে দেখতে গিয়ে অনেকেরই সন্দেহ হয়েছে এ কেমন ধারা হলো, ইনি যে গম্ভীর রাশভারী লোক।

অনুরূপা দেবীর এইরকম আশাভঙ্গ হয়েছিল। "আমার বিশ্বাস ছিল 'পরশুরাম', আমার পরম স্নেহাস্পদ 'বিশু'র স্বামী, তাঁর লেখার মতই খুব হাসিখুশিতে ভরা অত্যন্ত সামাজিক, চালাক, চটপটে একটি আমুদে লোক হবেন। কিন্তু ওঁকে দেখে মনে মনে ভাবলাম—ইনি কি করে ওই সব অপূর্ব হাস্যরসের আধার হলেন? এ যেন 'সরষার মধ্যে ত্যাল'। মজঃফরপুর থাকতে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমার স্বামীর সহপাঠী সাবজজ ব্রজেন ঘোষের স্ত্রী পঙ্কজিনী ঘোষের মারফৎ তাঁর ছোট বোন (কনিষ্ঠা নয়) বিশুর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, তার পত্রে। তার স্বামীর কথা, তাঁর আঁকা বিশুরই চিত্র (অসুখের পূর্বে, তৎপরে ইত্যাদি) ও নানা সরস মন্তব্য দেখেশুনে ঐ রকম ধারণাটাই বোধ হয় পাকা হয়ে গেছলো। যাহোক, পরে সে বিষয়ে সামঞ্জস্য করবার সুযোগও যথেষ্ট রূপেই আমি পেয়েছিলাম। তাঁর বেঙ্গল কেমিকেলের গৃহে, পরে বহু-বহুবার তাঁর নিজগৃহেও যাতায়াত করে তাঁর লেখার মতই তাঁর গভীর সৌজন্যপূর্ণ গাম্ভীর্যময় সুমিষ্ট ব্যবহারে তাঁর অন্তরের কোন্ গভীরে যে তাঁর অন্তঃসলিল সহজাত হাস্যরস প্রবাহিত ছিল তার সম্যক সন্ধান লাভ করেছি। আর দেখেছি তাঁর ধ্যানমগ্ন শোকগম্ভীর সে রূপটুকু। বাস্তবিক একাধারে এমন শান্তসমাহিত এবং স্নিগ্ধসরস চরিত্র সংসারে বড় কম দেখা যায়।" (কথাসাহিত্য: রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা: শ্রাবণ, ১৩৬০)।

কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ও আমাদের মন্তব্যের সমর্থক। "রাজশেখরবাবু রাশিরাশি পুস্তক রচনা করেন নাই, মাসিক পত্রিকায় ক্বচিৎ কখনও তাঁর লেখা দেখা যায়। জীবিকার জন্য তিনি লেখেন নাই, বাণীকে বানরী করিয়া সভায় সভায় তিনি নাচান নাই, সাহিত্যকে পণ্য করিয়া তিনি গ্রন্থবণিক সাজেন নাই, দেশের সভা-সমিতি, সমাজের নানা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ-সভা, সাহিত্যিক বৈঠক, গোষ্ঠী, মজলিস কোথাও তাঁহাকে দেখা যায় নাই। এই ভাবে তিনি সাহিত্যিক আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাকে 'রাজশেখর দাদা' বলিয়া কেহ আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই। প্রগল্‌ভতা, চাপল্য বা ধৃষ্টতা দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া যায়। তিনি কাহারও স্তব প্রশস্তি গান করেন নাই, ভূমিকা, পরিচায়িকা, প্রশংসাপত্র ইত্যাদির পুটে প্রসাদ বিতরণ করেন নাই, অযোগ্যকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে

আশ্বস্ত করেন নাই, আচার্য সাজিয়া সহস্রের প্রথাগত প্রণিপাত ও মুদ্রিত অর্ঘ্য গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার জীবনে যেমন একটা বিবিক্ততা ও বিচ্ছিত্তি দেখা যায়—রচনাতেও তেমনি আত্মনিগূহন ও প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টের পক্ষে যে detachment ও impersonality স্বাভাবিক তাহাই লক্ষিত হয়। রাজশেখরবাবু নিজে না হাসিয়া হাসান, নিজে না কাঁদিয়া কাঁদান, নিজে অন্তরালে থাকিয়া ঐন্দ্রজালিক মায়া বিস্তার করেন—এ বিষয়ে তিনি বিধাতারই মন্ত্রশিষ্য।" (কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)।

এই মন্তব্যের আর একজন সাক্ষী বর্তমান লেখক। সে ১৯৩৪ সালের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা কমিটি গঠন করেছে, অবৈতনিক সম্পাদক অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বেতনভুক্ সহকারী সম্পাদক বর্তমান লেখক, সভাপতি রাজশেখর বসু। প্রথম দিনের অধিবেশনে আগ্রহভরে সভাপতির অপেক্ষায় আছি, আগে কখনও তাঁকে দেখিনি। নির্দিষ্ট সময়ে সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, গায়ে সাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট, পরনে খদ্দরের ধুতি (এ পোষাক ছাড়া অন্য পোষাকে তাঁকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না), হাতে কাগজের ফাইল, গম্ভীর অথচ প্রসন্ন মুখ। সে প্রসন্নতা কতকটা স্বভাবের, কতকটা প্রতিভার। ঐ প্রসন্নতাটুকু না থাকলে তাঁকে যে কোন বড় একটা অফিসের অভিজ্ঞ বড়বাবু বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। ক্রমে টেবিলের চারধারের চেয়ারগুলি পূর্ণ হয়ে উঠল, সকলেই গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি, অধিকাংশই নামজাদা অধ্যাপক। বিজ্ঞানের নানা শাখার পরিভাষা সংকলিত হচ্ছে, নানা শাখায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আছেন, সভাপতির সব শাখাতেই সমান অধিকার। বাঙালীর সভার কাজ চালানো সহজ নহে, কাজের কথাকে ছাপিয়ে ওঠে অকাজের কথা। অকাজের কথায় সভাপতি যোগ দেন না, চুপ করে শোনেন, কিছুক্ষণ পরে কথার মোড় ঘুরিয়ে কাজের কথায় নিয়ে এসে ফেলেন। কোন একটা বিষয়ে কতজনে কতরকম মন্তব্য করছেন সভাপতি নীরব শ্রোতা, সকলের সব মন্তব্য শেষ হলে দুটি একটি ক্ষুদ্র কথায়—শিখা জেলে দিলেন তিনি। সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সভা দীর্ঘকাল চলেছিল। দীর্ঘকাল তাঁকে টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। কখনও কখনও সভার অধিবেশন বসেছে তার সুকিয়া ষ্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে। বস্তুতঃ সভা চালাতে

এমন যোগ্য সভাপতি আমার চোখে পড়েনি। সভাপতির মধ্যে কোনদিন গ'ড্ডলিকা'র লেখককে দেখতে পাইনি, বড় জোর দেখতে পেয়েছি বেঙ্গল কেমিকেলের অভিজ্ঞ ম্যানেজারকে। ব্যক্তিত্বের শক্তিতে তিনি রাজশেখর বসু। পরশুরামকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোঠায় রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। এই স্বাতন্ত্র্যের ভাব অপর একজন ব্যক্তিও লক্ষ্য করেছেন। "যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে সেই সময় একদিন আমায় Bengal Chemical-এর আপিসে—যে আপিসের তিনি সে সময় Manager ছিলেন—কার্যবশতঃ দেখা করতে যেতে হয়েছিল। কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি—যেমন আমাদের বেশীর ভাগ লোকেরই অভ্যাস—তাঁকে দু-একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন—ও সব কথা ত আপিসের নয়—আপিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন—এই বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল, তাঁর কাছ থেকে এই শিক্ষা তখন পেয়েছিলুম যে, আপিস আপিসই, বাড়ি নয়—কর্তব্যের সময় কর্তব্য করে যাওয়াই সঙ্গত ; অন্য কাজে বা কথায় সময় নষ্ট না করাই উচিত।" (মেজদা—শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র। কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)।

কয়েকবৎসর পরে কাজ শেষ হয়ে গেলে, পরিভাষা কমিটি উঠে গেল, পরিভাষা কমিটির সিদ্ধান্তগুলি এখন 'চলন্তিকা' অভিধানের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। তখন তিনি বকুলবাগান রোডে বাড়ি তৈরী করে উঠে গিয়েছেন। সে বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি, কখনও দরকারে অধিকাংশ সময়েই অদরকারে। যেতেই প্রথম প্রশ্ন করেছেন, চা-না কফি? তাঁর সমাদরের মধ্যে আড়ম্বর ছিল না, তবে সহৃদয়তার কখনও অভাব দেখিনি। সেখানেও দেখেছি দুটি একটি কথায় আলোচনার জট ছাড়াতে তার স্বাভাবিক নিপুণতা। আমরা হয়তো অনেক কথা বললাম মুহূর্তে তার মধ্যে থেকে আলগোছে আসল কথাটি তুলে নিলেন। এও তাঁর শিক্ষা ও স্বভাবের ফল। তাঁর বাড়িটিও তাঁর গায়ে খদ্দরের কোটের মত অনাড়ম্বর প্রশস্ত, বিলাসিতা নেই অথচ সম্পূর্ণ বাসোপযোগী। আর একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ তাঁর গায়ের কোটটি, সেটা প্রথমেই চোখে পড়েছিল পরিভাষা কমিটির অধিবেশনে। নিপুণ জাদুকর যেমন পোষাকের নানা অন্ধিসন্ধি থেকে বিচিত্র বস্তু টেনে বের করেন, তেমনি বের করতেন তিনি কোটের পকেট থেকে।

অনেকগুলি পকেট, কোনোটা চশমার খাপ রাখবার, কোনোটা ফাউণ্টেন পেন রাখবার, কোনোটা থেকে বা বের হতো পেন্সিল কাটা ছুরি ও রবার, প্রায় তাঁর 'অটমেটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' আর কি! মোটের উপরে রাজশেখর বসু সজ্জন, অমায়িক, গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি, প্রকৃত হাস্যরসিকের যেমন হওয়া উচিত তার চেয়ে কম বা বেশী নন। এ পর্যন্ত যা জানা গেল, তাতে আর দশজন হাস্যরসিক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। এবারে অমিলটা কোথায় দেখা যাক। মিলে-অমিলে মিলিয়ে চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

॥ ২ ॥

কোনো লেখকই আকাশের শূন্যতায় জন্মগ্রহণ করে না, তারা ছোট বড় মাঝারি যে দরেরই লেখক হোক না কেন। লেখকের সামাজিক পরিবেশ, দেশ ও কালের প্রভাব, পারিবারিক প্রবণতা প্রভৃতি লেখককে অজ্ঞাতে নিয়ন্ত্রিত করে, এখানে লেখক মানে তার শক্তির বিশেষ রূপটি। এখন কোন লেখককে সম্যকভাবে বুঝতে হলে এই সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কিংবা এই সমস্তর মানচিত্রের উপরে যথাস্থানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে বুঝতে হবে। 'কবিকে পাবে না কবির জীবনচরিতে', একথা সর্বাংশে গ্রাহ্য নহে; জীবনচরিত যদি যথার্থ হয় তবে অবশ্যই কবিকে তাতে পাওয়া যাবে। আরও একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বলতে হবে যে লেখকের শৈশব বা বড়জোর বাল্যকালের কয়েক বছর তাকে গঠন করে তোলে। 'Child is the father of the man'এ আদৌ কবির অত্যুক্তি নয়। আরব্য-উপন্যাসে দেখা গিয়েছে যে, সিন্ধবাদ এক বৃদ্ধকে কাঁধে নিয়ে চলতে বাধ্য হয়েছে, মানুষের বেলায় ঠিক তার উল্টো। প্রত্যেক মানুষ তার শৈশবকে কাঁধে নিয়ে আমৃত্যু চলছে। লেখকের পক্ষে একথা আরও সত্য, কেননা লেখক যে জীবনরহস্যের সন্ধানী তার চাবিকাঠি ঐ শিশুটার হাতে।

রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামের গণ্ডি' তেতালায় বসে দুপুরের আকাশে চিলের ডাক শ্রবণ, পেনেটির বাগানে প্রথম গঙ্গাদর্শন প্রভৃতি আদৌ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নয়। পারিবারিক বিগ্রহের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি, কিংবা সাগরদাঁড়ি

গ্রামে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী মধুসূদনের মনে যে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার ক্রিয়া শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। মানুষ দশ বারো বছর বয়স পর্যন্ত যা গ্রহণ করে তাই তার যথার্থ পুঁজি, তারপরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে নূতন সঞ্চয় যতই হোক, পুঁজিতে যতই মুনাফা দেখানো যাক না কেন, মূলধনের পরিমাণ বাড়ে না। এ সত্য রাজশেখর বসু সম্বন্ধে ষোলআনা প্রযোজ্য। কবিকে জানতে হলে তার জীবনের ভিতর দিয়ে জানতে হবে, কাজেই রাজশেখর বসুর সাহিত্য-বিচারের আগে তার জীবন-বিচার আবশ্যক।

রাজশেখরবাবু নিজের খ্যাতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, স্মৃতিকথা, জীবনচরিত বা কোনরকম খসড়া লিখবার কথা ভাবেন নি। অধিকাংশ লেখক খ্যাতির প্রদীপের শিখাটিকে নিজেই উস্কে দেয়, কেউ বা প্রত্যক্ষে কেউ বা গোপনে, রাজশেখরবাবু কিছুই করেন নি। তবে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর স্বজন ও অনুরাগীগণ কিছু করেছেন বটে। এখানে আমরা সেই সব রচনার সুযোগ গ্রহণ করলাম। উদ্ধৃতিগুলি কিছু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও ভীত হইনি, কারণ গ্রন্থাবলীর সঙ্গে জীবনের বিস্তৃত পরিচয় সংযুক্ত থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক।

প্রথম উদ্ধৃতিতে রাজশেখর বসুর বাল্যকালের কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে।

"দারভাঙ্গা ঘুরে এসে একবার চন্দ্রশেখর (পিতা) বললেন, 'ফটিকের নাম ঠিক হয়ে গেছে।' মহারাজ (লক্ষ্মীশ্বর সিং, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা শেখর হবে নাকি? কি শেখর হবে?' আমি বল্লাম, 'ইওর হাইনেস, যখন তাকে আশীর্বাদ করছেন, তখন আপনিই তার শিরোমাল্য,—আমি আপনার সামনে তার নামকরণ করলাম রাজশেখর।' দারভাঙ্গার রাজা যার শিরে আছেন,—রাজা মহেন্দ্রপালের সভাকবি থেকে এ নাম দেওয়া হয়নি।

মা যখন তার হাতে খেল্না দিতেন, টিনের এঞ্জিন, রবারের বাঁশি, স্প্রিং-এর লাট্টু, এক ঘণ্টার মধ্যেই রাজশেখর লোহা, পাথর ও হাতুড়ি দিয়া ভেঙ্গে দেখ্‌তো ভেতরে কি আছে,—কেন বাজে?—কেন ঘোরে?

আবার যখন কলকাতা থেকে স্প্রিং-এর নূতন এঞ্জিন আসতো, মা রাজশেখরের হাতে দেবার সময় বলতেন, দেখিস্ যেন ভাঙ্গিস্ না। অমনি চার বছরের ছেলের মুখ অভিমানে গম্ভীর হয়ে গেল,—খেলনা নেবে না! তারপর মা

বললেন, 'এই নে যা খুশি কর!' তখন নিয়ে খানিকক্ষণ চালিয়ে রাজশেখর এনজিনটার মুণ্ডপাত করতো।

রাজশেখর আরো বড় হলে কলকাতা থেকে একটা আড়াই টাকা দিয়ে এনজিন কিনে এনেছে। তাতে ইসপিরিট দিয়ে চালাবার জন্য আমাদিগকে সব ডাকলো। সোঁ সোঁ হিস্ হিস্ করচে স্টিম কিন্তু এনজিন চলচে না। সায়েনটিফিক মেকানিক্যাল ব্রেন বিপদ ঘটবে বুঝে নিলে,—চিৎকার করে বললে, 'দাদা পালাও! পালাও!' সকলে পালিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দড়াম করে বিকট আওয়াজে আড়াই টাকার বয়লার ফাটলো। সকলেই চিন্তিত,—কর্ড মেলের বয়লার ফাটে যদি?

রাজশেখরের বয়স যখন চার তখন সে ফুলষ্টপ দিতে শিখলো। দুজন লোক একটা বড় কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো আর পায়জামা চায়না কোট পরা রাজশেখর একটি পেনসিল নিয়ে ছুটে এসে কাগজটা ফুটো করে পেনসিল ভেঙে দিতো। এই তার হাতেখড়ি। পকেটে অটোমেটিক পেনশিল, হাতে লোহার ষ্ট্র্যাপ, কখনও বা কাঠের 'সোঁটা'।

যখন দারভাঙ্গায় এলাম তার বয়স তখন সাত আন্দাজ। আমি লুকিয়ে বাবার বাক্স থেকে 'বেগম' সিগারেট চুরি করে খাই। রাজশেখর যখন আর একটু বড় হলো বল্লাম, 'ওরে ফটিক, একটা সিগারেট টান দিকি, এতে ভারি মজা!' রাজশেখর একটু টেনে ফেলে দিলে।

বুড়ো বয়সে যখন দিল্লীতে অপারেশন হল বেচারী যন্ত্রণায় ছটফট করচে। ডাক্তার সন্তোষকুমার সেন পেশেণ্টকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে বল্লেন, 'সিগারেট খান একটা।' পেশেণ্ট বল্লে, 'খাই না।' 'কখনও খাননি?' রাজশেখর উত্তর দিল, 'আমার দাদা একবার লুকিয়ে খাইয়েছিল ছেলেবেলায়।' ডাঃ সেন বল্লেন, 'You ought to have continued it!' এবং পেশেণ্ট ও ডাক্তার হেসে উঠলেন। যাঁরা বলেন, রাজশেখর হাসে না, তাঁরা দেখবেন রোগযন্ত্রণাতেও কি রকম মজা করবার ঝোঁক। আট বছর বয়সে মাছ মাংস ঘৃণায় ত্যাগ করলো। লোকে বলল, রাজশেখর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবে। ইঁদুর কলে পড়লে ছেড়ে দিত, মারতো না।" (রাজশেখরের ছেলেবেলা : শশিশেখর বসু : শারদীয় যুগান্তর)।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বাল্যকালের বিবরণ কিছু থাকলেও বেশি করে আছে

কলকাতায় তাঁর কলেজ জীবনের কথা এবং চাকুরি জীবনের প্রারম্ভের বিবরণ।

"১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ মঙ্গলবার বর্ধমান জেলায় শক্তিগড়ের সন্নিকটস্থ বামুনপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বামুনপাড়া হচ্ছে রাজশেখরের মামারবাড়ি। আর পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী উলা বীরনগর।

চন্দ্রশেখর বসুর চার পুত্র : শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর, গিরীন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের জন্ম হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইহারা মহিনগর সমাজভুক্ত বড়ানিবাসী কনিষ্ঠ ধবু বসুর সন্তান। চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামসন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বে উলার মুস্তৌফী বাটীতে বিবাহ করেন।

রাজশেখরের পিতা চন্দ্রশেখর সামান্য অবস্থায় জীবনসংগ্রাম শুরু করেন। তবে তাঁর যোগ্যতার গুণে দ্রুত উন্নতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। তিনি যখন যশোহর জেলার সামান্য একজন ডাক বিভাগের কর্মচারী, সেই সময়ে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কলকাতায় যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন, তারই ওপর ভিত্তি করে কলকাতায় ইণ্ডিগো কমিশনের তদন্ত কাজ চলে।

চন্দ্রশেখর সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেনও। তাঁর রচিত বেদান্তপ্রবেশ, বেদান্তদর্শন, সৃষ্টি, অধিকারতত্ত্ব প্রলয়তত্ত্ব, প্রভৃতি গ্রন্থ সেকালে খ্যাতিলাভ করেছিল।

পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ম্যানেজার পদে বহাল হয়ে দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে অতিবাহিত করেন। রাজশেখরের বাল্যকাল পিতার সঙ্গে বাংলার বাইরেই কেটেছে। প্রথম সাত বৎসর তিনি মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে কাটান। তারপর ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গার রাজ স্কুলে পড়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দ্বারভাঙ্গার স্কুলে রাজশেখরই তখন একমাত্র বাঙালী ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর পিতার নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণের দ্বারা রাজশেখর এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গ প্রভাবান্বিত হন। চন্দ্রশেখর নিজে ছেলেদের হস্তলিপি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতেন। পরে বড় হয়েও

তাঁরা বাল্যকালের ভিত্তিপত্তনকে অগ্রাহ্য করেন নি। ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রেও তাঁরা সেই ধারা বহন করে চলেছেন। বাংলাদেশের বেমক্কা চরিত্রের সঙ্গে এদিক দিয়ে তাঁরা আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

১৮৯৫-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পাটনা কলেজে ফার্স্ট আর্টস পড়েন। এই সময়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। পাটনা কলেজে তাঁর সঙ্গে আরও জন-দশেক বাঙলী ছাত্র পড়তেন। সে মহলে সাহিত্য-আলোচনা হত, তবে তা তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। বাঙালী মন তখনও হেম-মধু-বঙ্কিমের প্রভাব-প্রতিপত্তির আওতায় চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি হয়েছে, তবে সে রকম প্রকট হয়নি।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পাটনার পর্ব চুকিয়ে কলকাতায় বি. এ. পড়বার জন্যে এলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হলেন। এই বছরই তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পত্নী মৃণালিনী ছিলেন শ্যামাচরণ দে'র পৌত্রী রাজশেখর ও মৃণালিনীর সন্তান বলতে একমাত্র কন্যা প্রতিমা।

প্রেসিডেন্সী কলেজে রাজশেখর কখন পড়েন সে সময় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও পড়তেন, তবে হেমেন্দ্রবাবু আর্টসের ছাত্র ছিলেন। রাজশেখরের সতীর্থদের মধ্যে শরৎচন্দ্র দত্ত পরবর্তীকালে জার্মেনী থেকে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে এ্যাডেয়ার ডাট্ নামে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ ছাড়া আর্ট প্রেসের নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথ শেঠও তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে রাজশেখর সামান্য কিছুদিন বি এ-তে পড়ছেন। অনেকের ধারণা আছে যে, তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র, এ ধারণা ভুল। অবশ্য পরবর্তী জীবনে প্রফুল্লচন্দ্রের সাহচর্যে রাজশেখর উপকৃত হয়েছিলেন, তবে সেটা কর্মজীবনে, ছাত্রজীবনে নয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেমিষ্ট্রি এবং ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর একবছর পরে অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজশেখর এম এ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হলেন।

পাটনা এবং কলকাতার থাকবার সময়েও দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

এম এ পাশ করার দু-বছর পরে তিনি আইন অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বি. এল. পরীক্ষাটিও পাশ করে ফেললেন। এরপর স্বাভাবতই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের উদ্যোগ করবার কথা। কিন্তু মাত্র তিনদিনেই আদালতে পসার জমাবার উদ্যমে জলাঞ্জলি দিয়ে বসলেন। আইন ব্যবসায়ীর খোলস চাপকানগুলি বিলিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

রাজশেখর প্রকৃতিগত ভাবেই সৎ এবং ভদ্র। শুধু একথা বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। তিনি সংযত শান্ত এবং অন্তর্মুখী মানুষ। তাঁকে দিয়ে গবেষণাদির চিন্তাপ্রধান কাজই ভাল হতে পারে, এ কথা তিনি নিজেও বেশ বুঝেছিলেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং রাজশেখর বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস-এ রাসায়নিকের পদে বহাল হলেন। তখন সারকুলার রোডে বেঙ্গল কেমিকেলের কার্যালয় ছিল। সারকুলার রোড থেকে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে নয় বৎসর এ্যালবার্ট বিল্ডিংস-এ ছিল। বর্তমান বেঙ্গল কেমিকেলের আপিস চিত্তরঞ্জন এভেন্যুতে অবস্থিত। প্রথমে রাজশেখর কিছুকাল থাকেন বেচু চাটুজ্যে ষ্ট্রীটের ভাড়া-বাড়িতে, তারপর পার্শীবাগানের পৈতৃক গৃহে অবস্থান করেন। কাজে বহাল হওয়ার এক বছরের মধ্যেই তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হলেন। এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল কেমিকেলের সর্বময় কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করলেন। সেই থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতিসাধন করে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য এখনও পরোক্ষভাবে বেঙ্গল কেমিকেল তাঁর কাছে উপদেশ পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন।" (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য: কথাসাহিত্য: রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা: শ্রাবণ, ১৩৬০)

এই দুটি অংশ পড়লে শৈশব, বাল্য ও প্রথম যৌবনের একটা খসড়া পাওয়া যাবে। আপাততঃ এতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ এর বেশী তথ্য পাইনি, আর আমার বিচারে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ এই বয়সের মধ্যেই তাঁর ভাবী রচনার গাঁথুনি পাকা হয়ে গিয়েছে। তবে আর একটা পরিচয় এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি। চোদ্দ নম্বর পার্শীবাগান বসু ভ্রাতৃগণের পৈতৃক বাসভবন। এই বাড়িটি ও এখানে যে নিয়মিত আড্ডা বসতো নামান্তরে পরশুরামের রচনায় তা অমরত্ব লাভ করেছে।

"১৪ নম্বর পার্শীবাগানে একটি বিরাট আড্ডা বসিত। পরশুরামের গল্পে ইহা ১৪ নম্বর হাবসীবাগান বলিয়া পরিচিত। ১৪ নম্বর ছিল বসু ভ্রাতৃগণের পৈতৃক বাসভবন। চারি ভ্রাতার মধ্যে রাজশেখর বসু মধ্যম, আমরা মেজদা বলিতাম ; ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু কনিষ্ঠ। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা তাঁহাদের সহিত প্রথম আলাপ। প্রতিদিনই মজলিস বসিত, জমজমাট হইত রবিবার, বৈঠকখানা গমগম করিত, সেদিন সকলের ছুটি। সেই বৈঠকে কত ডাক্তার, কত অধ্যাপক, কত বৈজ্ঞানিক, কত সাহিত্যিক, কত শিল্পী, কত ঐতিহাসিক উপস্থিত থাকিতেন তার ইয়ত্তা নাই। তার নামকরণ করা হইয়াছিল 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। প্রথমে একটা ইংরেজী নামই ছিল, বাংলা নামটি দেন রাজশেখরবাবু। সেই মজলিসে চা, দাবা ও তাসের সঙ্গে চলিত মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস এবং সাহিত্যের আলোচনা। প্রতি রবিবার বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি একসঙ্গে দুপুরবেলা সেই মজলিসে উপস্থিত হইতাম। আড্ডাধারী ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চিরকুমার যতীন্দ্রকুমার সেন। তিনি প্রতিদিন দুপুরে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাঁহার হাতে তৈয়ারী চা আড্ডার একান্ত উপভোগ্য বস্তু ছিল। এ ভার আর্টিষ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এ দায়িত্ব কাহারও উপর ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার তৃপ্তি ছিল না।

এই বৈঠকে জলধরদা নিত্য আসিতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সত্য রায়, অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ডক্টর দ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকিতেন। আচার্য যদুনাথ সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শিল্পী পুলিনচন্দ্র কুণ্ডু কখনও কখনও আসিতেন। পাটনার অধ্যাপক রঙীন হালদার ছুটি পাইলেই পার্শীবাগানে সমুপস্থিত হইতেন। ক্যাপ্টেন সত্য রায়ের পিতা আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় কলিকাতায় আসিলেই এখানে আসিতেন। আরও অনেকে থাকিতেন যাঁহাদের সহিত সাহিত্য বা অধ্যাপনার কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তাঁহারা গল্প এবং কথাবার্তায় আসর সরগরম করিয়া রাখিতেন। জলধরদা অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। শ্রদ্ধেয়

ব্যক্তির কানে না যায় এমন সব কথার আলাপ যখনই জমিয়া উঠিত তখনই দাদা বলিয়া উঠিতেন, 'অ্যাঁ, কি বলছ ভাই ?' মজাদার কথা কদাচিৎ তাঁহার কান এড়াইয়া যাইত।

একদল তাস লইয়া বসিত। ক্যাপ্টেন সত্য রায় ও আমি মাঝে মাঝে দাবা লইয়া বসিতাম। গিরীন্দ্রবাবু কখনও কখনও তাহাতে যোগ দিতেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ কখনও খেলায় আমল দিতেন না। এই দাবা খেলার মধ্য দিয়াই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠতা জন্মে, কিন্তু সে এখানে নয়, রবিবাসরের এক বার্ষিক উদ্যান সম্মেলনে, 'তুলসীমঞ্চে'।

বড়-দা শ্রীশশিশেখর বসু বড় মজার গল্প করিতে পারিতেন। তিনি ইংরেজী-লিখিয়ে, ইংরেজী কাগজে তাঁহার রসরচনা বাহির হইত। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাংলা লিখিতে শুরু করিয়াছেন। রবিবাসরীয় 'যুগান্তরে' এখন প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে। সেজ-দা শ্রীকৃষ্ণশেখর বসু উলা বীরনগরের উন্নতিতে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। পল্লী-উন্নয়নের কথা হইলে তিনি মশগুল হইয়া পড়িতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় চমৎকার মজলিসী গল্প করিতে পারিতেন।" (উৎকেন্দ্র সমিতি—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)।

আর একটি ছোট উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গটা শেষ করবো ইচ্ছে আছে। যতদূর জানি রাজশেখরবাবু খুব পত্রালাপী লোক ছিলেন না। তাঁর যে সব পত্র পাওয়া যায় সেগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ তাঁকে বোঝবার পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই রকম একখানি পত্র উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

"হাস্যরসিক শ্রীরাজশেখর বসুকে দেখিয়াছি, আবার শোকপ্রাপ্ত শ্রীরাজশেখর বসুকেও দেখিয়াছি।

পত্নীবিয়োগে সমবেদনা জানাইয়া শ্রীনিকেতন হইতে তাঁহাকে যে পত্র লিখি তদুত্তরে এই পত্রখানি পাই।

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা

২।১২।৪২

সুহৃদ্বরেষু

চারুবাবু, আপনার প্রেরিত লেখা ভাল লাগল। মন বলছে, নিদারুণ দুঃখ, চারিদিকে অসংখ্য চিহ্ন ছাড়ানো, তার মধ্যে বাস করে স্থির থাকা যায় না।

বুদ্ধি বলছে, শুধু কয়েক বছর আগে পিছে। যদি এর উলটোটা ঘটত তবে তাঁর মানসিক শারীরিক সাংসারিক সামাজিক দুঃখ ঢের বেশী হত। পুরুষের বাহ্য পরিবর্তন হয় না, খাওয়া পরা পূর্ববৎ চলে, কিন্তু মেয়েদের বেলায় মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ে।

নিরন্তর শোকাতুর আর একজনকে দেখলে নিজের শোক দ্বিগুণ হয়। গতবারে আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। এবারে শোক উস্কে দেবার লোক নেই, আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়, সেজন্যে মনে হয় এই অন্তিম বয়সেও সামলাতে পাবব।

আশা করি আপনার সঙ্গে আবার শীঘ্র দেখা হবে এবং তার আগে খবর পাব।

ভবদীয়

রাজশেখর বসু

তিনি লিখিতেছেন,—আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়। কিন্তু তা ঠিক নয়।

গীতায় আছে,—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

যাহার চিত্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না ও বিষয়সুখে নিস্পৃহ এবং যাঁহার রাগ ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ।

অনেক দিন অনেক বার নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ রাজশেখরকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।" (স্থিতপ্রজ্ঞ—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৬০)।

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে রাজশেখর বসু সম্বন্ধে কয়েকটি মূল তথ্য জানতে পাওয়া যাবে, যেগুলির পদে পদে প্রয়োজন হবে তার সাহিত্য ও চরিত্র বিচারের সময়ে। (১) তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও বিজ্ঞান শিক্ষা, এই বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে আইন পাশ করাকেও ধরতে হবে, (২) বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কৃতী প্রধান ব্যক্তি রূপে দীর্ঘকাল অবস্থিতি, (৩) সংসার সম্বন্ধে আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব। পার্শীবাগানে আড্ডায় কখনও যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তদ্‌সত্ত্বেও অনায়াসে

অনুমান করতে পারি যে, তিনি সেই আড্ডার মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে বাগ্‌যত ছিলেন, মাঝে মাঝে একটি দুটি হাসির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে যেতেন। তিনি হাসাতেন, তবে হাসতেন কদাচিৎ। 'অন্যে কথা কবে তুমি রবে নিরুত্তর' (৪) চারুবাবুকে লিখিত পত্রখণ্ডে যে স্থিতপ্রজ্ঞ প্রশান্ত ভাব প্রকাশিত, তাতে মিলিত একাধারে গীতার ও বিজ্ঞানের শিক্ষা। গীতোক্ত আদর্শ পুরুষ বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক। তিনি দুই-ই ছিলেন। এখন এই বিশ্লেষণলব্ধ সিদ্ধান্তগুলি সম্বল করে তাঁর সাহিত্য বিচারে অগ্রসর হবো আর আশা করি দেখতে পাবো যে, বিচারের মূল উপাদান আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়ছে

॥ ৩ ॥

রাজশেখর বসুর গ্রন্থাবলী তার দুটি নামে পরিচিত, রাজশেখর বসু ও পরশুরাম। এই দুই নামের স্বাতন্ত্র্য তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন, এমন আর কোন লেখক রাখতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। দুটি এমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। একই ব্যক্তির দুটি ভিন্ন ব্যক্তিত্ব আলাদা কোঠায় রাখা যে খুব কঠিন এ কথা সহজেই বুঝতে পারা যাবে। তাঁর পক্ষে এ কাজ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল একজন লেখক তা প্রকাশ করেছেন, "যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে সেই সময়ে একদিন আমায় Bengal Chemical এর আপিসে—যে আপিসের তিনি সে সময়ে Manager ছিলেন—কার্যবশতঃ দেখা করতে যেতে হয়েছিল। কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি—যেমন আমাদের বেশীরভাগ লোকেরই অভ্যাস—তাঁকে দু-একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করছিলুম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন—ওসব কথা ত আপিসের নয়—আপিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন, এই বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল, তাঁর কাছ থেকে এই শিক্ষা তখন পেয়েছিলুম যে, আপিস আপিসই, বাড়ি নয়,—কর্তব্যের সময় কর্তব্য করে যাওয়াই সঙ্গত ; অন্য কাজে বা কথায় সময় নষ্ট না করাই উচিত।" (মেজদা—শ্রীসুহৃদচন্দ্র মিত্রঃ কথাসাহিত্যেঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যাঃ শ্রাবণ ১৩৬০)।

রাজশেখর বসু নামে পরিচিত গ্রন্থাবলীতে মনীষার পরিচয়, অবশ্য শিল্পীর

পরিকল্পনা গৌণভাবে আছে। আর পরশুরামের ছদ্মনামে পরিচিত জনবল্লভ গল্পের বইগুলি শিল্পীর রচনা যদিচ গৌণভাবে মনীষার দেখা পাওয়া যাবে।

আমরা প্রথমে পরশুরাম রচিত গ্রন্থাবলীর বিশদ আলোচনা করবো, পরে রাজশেখর বসু রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা সারলেই হবে।

রাজশেখরবাবু জনসমাজে হাসির গল্পের লেখক বলে পরিচিত, আরো স্বরূপে বলতে গেলে ব্যঙ্গরসিক বলা যেতে পারে। মোটের উপরে একথা স্বীকার্য যে, তাঁর গল্পের প্রধান উপাদান হাসি। কাজেই হাসির প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া আবশ্যক।

সূর্যালোককে বিশ্লিষ্ট করে ফেললে সাতটি রং পাওয়া যায়, যার এক প্রান্তে লাল, অন্য প্রান্তে বেগনী, মাঝখানে অন্য রং। শুভ্র হাসিকেও যদি বিশ্লেষণ করা যায় অনেক জাতের হাসি পাওয়া যাবে, যার এক প্রান্তে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার, অন্য প্রান্তে প্রচ্ছন্ন অশ্রু ; ওরই মধ্যে এক জায়গায় নিছক কৌতুক-হাস্যও আছে। আমরা যখন কোন লেখককে হাসির গল্পের লেখক বলি, তখন বিচার করা আবশ্যক এই হাসির বর্ণালীর মধ্যেই কোনটি তাঁর রচনার প্রধান উপাদান। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে একাধিক উপাদানই তাঁর রচনায় থাকতে পারে। বিশুদ্ধভাবে একটি মাত্র উপাদানকে অবলম্বন করে রচিত এমন গল্প খুব বিরল। বিশেষতঃ আধুনিক মন মিশ্ররীতির পক্ষপাতী, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একাধিক উপাদান মিলিত হয়ে যায় তার রচনায়। শেক্সপীয়ারের 'ফলস্টাফ' এই রকম একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার গঠনে কৌতুকহাসি থেকে আরম্ভ করে প্রায় সবগুলির উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ফলস্টাফের বিদায়ে (Rejection of Falstaff) প্রচ্ছন্ন অশ্রু প্রায় অপ্রচ্ছন্নভাবে ধরা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দীনবন্ধুর নিমে দত্তর চরিত্র শেষ দিকে গিয়ে প্রচ্ছন্ন অশ্রু উদ্গত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠ চরিত্রেও হাসির অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অশ্রুর রেশ আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত চরিত্র এ বিষয়ে বোধ করি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। হাসির স্ফটিক-শিলায় কমলাকান্ত চরিত্র গঠিত, তা থেকে শতমুখে হাসি বিচ্ছুরিত হতে থাকে, কিন্তু যেমনি একটু ব্যথার তাপ লাগে, অমনি স্ফটিক অশ্রুতে বিগলিত হয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত লেখকগণের কেউ অমিশ্র হাসির কারবার করেন নি। বাংলা সাহিত্যে অমিশ্র হাসির একমাত্র কারবারী বোধ করি

অমৃতলাল বসু। তাঁর হাসি প্রায় সময়েই প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। এখন বিচার্য পরশুরামের স্থান হাসির বর্ণালীর মধ্যে কোন দিকে, প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে না প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিকে। এই কথাটি বোঝাবার উদ্দেশ্যে আর একজন প্রধান হাসির গল্পের লেখকের নাম করা দরকার, তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। দুজনেই হাসির গল্পের লেখক বলে পরিচিত, কিন্তু হাসির বর্ণালীর মধ্যে তাঁদের স্থান একত্র নয়। ত্রৈলোক্যনাথ আছেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিক ঘেঁষে আর পরশুরাম আছেন প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে ঘেঁষে। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি প্রধানতঃ প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা হলেও তাতে অন্য উপাদান আছে, পরশুরামে মিশ্রণ নেই এমন বলি না, তবে অপেক্ষাকৃত কম। মোটের উপর দাঁড়ালো এই যে, এঁদের একজন আছেন বর্ণালীর লালের দিকে, আর একজন বেগনীর দিকে। একজনের আবেদন পাঠকের হৃদয়ে, আর একজনের আবেদন পাঠকের বুদ্ধিতে।

ম্যাথু আর্নল্ড-এর একটি সুভাষিত আছে "Literature is Criticism of life"—এই উক্তিটি নিয়ে গত একশ বছর তর্ক-বিতর্কের আর অন্ত নাই। কাজেই সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা বাহুল্য। নিছক কৌতুকহাস্য বাদ দিলে দেখা যাবে যে, হাসি যে জাতেরই হোক না কেন তা Social Criticism ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এই Criticism বা সমালোচনার প্রকার ভেদ আছে। কোন লেখক সমালোচক হিসাবে তিরস্কার করেন কেউ বা অশ্রুপাত করেন, দুজনের পন্থা ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক।

সমাজ সংস্কার হাসির (নিছক কৌতুকহাস্য ছাড়াও) উদ্দেশ্য বলেই হাস্যরসিককে একটা মাপকাঠি ব্যবহার করতে হয়। সে মাপকাঠি Ethical হতে পারে, Intellectual হতে পারে, Social হতে পারে বা অন্য কোন রকমের হতে পারে। একটা Norm বা আদর্শ লেখকের মনের মধ্যে থাকে, সমাজের যেখানে সেই আদর্শের চ্যুতি ঘটছে সেখানে তিনি মাপকাঠিখানি বের করে এগিয়ে আসেন। এখানে বিশুদ্ধ কমেডির সঙ্গে Satire বা ব্যঙ্গের তফাৎ। বিশুদ্ধ আনন্দ দান ছাড়া কমেডির আর কোন উদ্দেশ্য নেই, অন্য সর্বপ্রকার হাসি উদ্দেশ্যমূলক। কমেডি লেখক আনন্দ দান করেন, ব্যঙ্গরসিক বিচার করেন; কমেডি লেখক উৎসববাজ, ব্যঙ্গরসিক বিচারক। বিচারের ভুলভ্রান্তি হতে পারে, এক আদালতের রায় অন্য আদালতে উল্টে যেতে পারে, এক যুগের নজির অন্য যুগ না মানতে পারে এমন উদাহরণ সাহিত্যের

ইতিহাসে প্রচুর। বিশুদ্ধ আনন্দের মার নেই, বিশুদ্ধ বিচার বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ, একথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে ব্যঙ্গলেখকের স্থান অত্যুচ্চ সাহিত্যে সর্বোচ্চশ্রেণীতে কখনো নির্দিষ্ট হয় না। সকলেই তার গুরুত্ব স্বীকার করে, তবু বিশুদ্ধ আনন্দদাতার সঙ্গে সমান আসন দিতে রাজী হয় না। বিচারকের স্থান আদালতে, আনন্দদাতার স্থান অন্তঃপুরে।

নাটকে এই সমালোচনার কাজটি বিদূষক করে থাকে, নীচু আসনে বসেও রাজার দোষ দেখাতে সে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু নাটকের চূড়ান্ত পর্বে বিদূষককে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ আর কিছুই নয়, বিদূষণার সীমা অন্তঃপুরে ও অন্ত্যঅঙ্কের বাইরে। এই সীমা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যঙ্গরসিক স্বকর্তব্য সাধনে যে নিরস্ত হয় না, তার কারণ বিশেষ আদর্শের প্রেরণা তাকে চালিত করে। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যে প্রলাপ-বাদিনী কবিতা তার কানে কানে আনন্দ মন্ত্র উচ্চারণ করে, যে আনন্দ মন্ত্রে বৈষয়িক সার্থকতা কিছুমাত্র নেই, সেই কবিতাকে মানুষ সর্বোচ্চ আসন দিয়ে নীচে বসিয়ে রাখে ব্যঙ্গরসিককে, যার দৃষ্টি সদাজাগ্রত না থাকলে সমাজস্থিতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওরই মধ্যে যে ব্যঙ্গরসিক প্রচ্ছন্ন অশ্রুকে উপাদান রূপে গ্রহণ করে তার প্রতি মানুষের মন কিছু সদয় বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্ন তিরস্কারককে সে মনে ভয় করলেও হৃদয়ের মধ্যে স্থান দেয় না। পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাপারটি আরেকবার বোঝাতে চেষ্টা করবো। এখন এইটুকুই যথেষ্ট যে পরশুরামের হাসি প্রধানতঃ তিরস্কার ঘেঁষা, যার আবেদন মানুষের বুদ্ধিতে। কিন্তু তিনি শুধুই হাসির গল্প লিখেছেন এ কথা সত্য নয়। তাঁর রচনার মধ্যে এমন অনেক গল্প আছে যা ঠিক হাসির গল্প নয়। অন্য নামের অভাবে তাদের সামাজিক গল্প বলতে হয়। যথা—কৃষ্ণকলি, চিঠি বাজি, দীনেশের ভাগ্য, যশোমতী, ভূষণ পাল, ভবতোষ ঠাকুর ইত্যাদি।

এ সব গল্পে হাসি যে নেই তা নয়, তবে হাসিটা তার প্রধান উপাদান নয়। একবার হাস্যরসিক বলে নাম রটে গেলে, তার নিতান্ত সাধারণ কথাতেও হেসে ওঠা পাঠক কর্তব্য মনে করে। শুনেছি প্রসিদ্ধ কমিক অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী একটি সভায় ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠে প্রথম বাক্যটাও শেষ করতে পারেন নি, ঘনঘন হাসি ও করতালিতে শ্রোতারা নিজেদের রসবোধের পরিচয় দিয়েছিল।

পরশুরামের এমন কতকগুলি গল্প আছে যা গভীর মনীষা-প্রসূত। মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ, সমাজের অবস্থা, মৃত্যুর রহস্য, পৃথিবীব্যাপী লোভ-অশান্তির পরিণাম প্রভৃতি সম্বন্ধে দুঃসাহসিক চিন্তার পরিচয় বহন করে এই সব গল্প। পরোক্ষভাবেও হাসির সঙ্গে সংশ্রব নাই। কিন্তু যেহেতু পরশুরামের রচনা, কাজেই পাঠকের পক্ষে হাসা একপ্রকার জাতীয় কর্তব্য। যথা—গামানুষ জাতির কথা, অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা, ভীম গীতা, মাঙ্গলিক, কাশীনাথের জন্মান্তর, সত্যসন্ধ বিনায়ক, নির্মোক নৃত্য, কর্দম মেখলা প্রভৃতি।

এই সব গল্পগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ আর কিছুই নয়, পরশুরাম প্রধানতঃ ব্যঙ্গ গল্পের লেখক হলেও কেবলই ব্যঙ্গ গল্প তিনি লেখেন নি, এমন অনেক গল্প লিখেছেন যা মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গভীর অন্তদৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি যদি অন্য ব্যঙ্গরচনা নাও লিখতেন তবে হয়তো এত জনপ্রিয় হতেন না সত্য, কিন্তু একথাও তেমনি সত্য যে এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের আসরে তাকে স্থায়ী আসন দান করতো। ব্যঙ্গ রচনার দ্বারা পাঠকের মনে নিজের যে Image তিনি তৈরী করে তুলেছেন সেই Image-এর আড়ালেই তাঁর অনেক কীর্তি ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র (১৯২২) বাঙালী পাঠকের কান ও চোখ সজাগ হয়ে উঠ্‌ল, এ আবার কে এলো? Curtain Raiser হিসাবে গল্পটি অতুলনীয়। এক গল্পেই আসর মাত। তারপরে পাঠকের ঔৎসুক্য অার ঘুমিয়ে পড়বার অবকাশ পায়নি। চিকিৎসা-সঙ্কট, মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ ও ভুশণ্ডির মাঠে একত্র গ্রন্থাকারে গড্ডলিকা। পরে প্রকাশিত হ'ল কজ্জলী গ্রন্থ, অর্থাৎ বিরিঞ্চিবাবা, জাবালি, দক্ষিণরায়, স্বয়ম্বরা, কচি-সংসদ ও উলট-পুরাণের সমষ্টি। বাংলা সাহিত্যের আকাশে প্রথমে যা একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্ররূপে দেখা দিয়েছিল, কালক্রমে তা উজ্জ্বল বৃহৎ নির্নিমেষ গ্রহের রূপ ধারণ ক'রে সৌর পরিবারের পরিধি বাড়িয়ে দিল। পরে আরও সাতখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে,

তবে একথা বল্‌লে বোধ করি অন্যায় হবে না যে অদ্যাবধি প্রথম বই দু-খানাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার কারণ কি ?

বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে সাহিত্যিকরূপে রাজশেখর বসুর আত্মপ্রকাশ, যে বয়সে নাকি অধিকাংশ লেখকের আদিপর্ব শেষ হ'য়ে গিয়ে মধ্যপর্বে প্রবেশ ঘটে। বিয়াল্লিশের আগে পর্যন্ত তাঁর কোন সাহিত্যিক পরিচয় পাঠকের সম্মুখে ছিল না, হঠাৎ তিনি পাকা লেখা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। পাঠক একেবারে চমকে গেল, কিন্তু সে চমক পীড়াদায়ক নয়, সুখদায়ক। তিনি ধীরে-সুস্থে পাঠককে তৈরী করে নিয়ে পরিণত রচনায় উপনীত হননি, পাঠককে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করিয়ে রাখেন নি। পাঠকের সেই কৃতজ্ঞতা তাঁর জনপ্রিয়তাকে বর্ধিত করেছে।

কোন কোন লেখক, তার মধ্যে অতিশয় শক্তিমান লেখক আছেন, ধীরে ধীরে পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হতে থাকেন। এই ধীরতায় পাঠকের চক্ষু অভ্যস্ত হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ অতি অপরিণত রচনা নিয়ে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন, তারপরে শতাব্দীর না হোক দশকের প্রহরে প্রহরে পরিণতির মধ্য গগনে উত্তীর্ণ হন। অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী দিয়ে এবং মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্য দিয়ে পাঠক সমাজকে চমকে দিয়েছেন। এই তিন মহারথীর সঙ্গে তুলনা না করেও বলা যায় যে, রাজশেখর বসু অতর্কিতে চমকে দিয়ে পাঠকের মনকে অধিকার করে নিলেন। মনে রাখতে হবে যে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড প্রকাশের সময় তাঁর বয়স দুর্গেশনন্দিনী ও মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশকালে লেখকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

এখন চমক যতই বিস্ময়কর হোক ক্রমে তার দ্যুতি ম্লান হ'য়ে আসে। পরশুরামের ক্ষেত্রে তা হয়নি, তার কারণ পাঠকের চমককে নিত্য নূতন উদাহরণ যোগাতে সক্ষম হয়েছিলেন, গড্ডলিকা ও কজ্জলীর এগারটি গল্পে। অবশ্য একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পরবর্তী সাতখানি গ্রন্থে চমকের দ্যুতি অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। একটি কারণ, পাঠকের চোখ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। অন্য কারণ আছে তার আলোচনা যথাস্থানে। এবার পূর্বসূত্র টেনে জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ আলোচনা করা যেতে পারে।

অনেকের ধারণা যে গল্পে বর্ণিত নরনারীর নূতনত্বে পাঠক বিস্ময় হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত ব্যাপার ঠিক উল্টো। এসব নরনারী অত্যন্ত পুরাতন

বলেই তারা আকর্ষণ করেছে পাঠকের চিত্ত। পুরাতন তবে অতি পরিচয়ের ধুলো জমে জমে সে-সব আচ্ছন্ন হয়ে নাস্তিবৎ বিরাজ করছিল। পরশুরামের হাসির দমকা হাওয়ায় সে ধুলো সরে যেতেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। বিস্মিত পাঠক বলে উঠল বাঃ বাঃ, এসব তো সামনেই ছিল অথচ দেখতে পাইনি। ভোরবেলা দরজা খুলতেই বৃহৎ একটা গাছ দেখতে পেলে পাঠকে অবশ্যই চমকিত হয়, কিন্তু পরমুহূর্তের বিস্ময়কে চাপা দেয় বিরক্তি, তখন সে কুড়ুলের সন্ধান করে। না, পরশুরামের প্রথম রচনা দরজার সমুখের বনস্পতি নয়, দিগন্তের গিরিমালা। শীতের কুয়াশায়, গ্রীষ্মের ধুলোয় আর বর্ষার মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, আজ হঠাৎ শরৎকালের বৃষ্টি-ধৌত নির্মল আকাশে তার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখে মনটি প্রসন্ন হয়ে উঠল, বাঃ ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিষটি আছে দেখছি। পূর্বসংস্কারহীন নূতন প্রথমটা চমকে দিলেও তার পরিণাম বিরক্তিতে আর যে নূতন পূর্বসংস্কারের সূত্র ধরে অতি পরিচয়ের পর্দা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রকাশ পায়, সে কখন পুরাতন হয় না ; কারণ পুরাতনত্বেই তার যথার্থ পরিচয়। সূর্যোদয়ে প্রত্যাশিত বিস্ময়, জাদুকরের আমগাছে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়, প্রথম বারের পরে দ্বিতীয় বারে বিরক্তিকর।

এরা সবাই পুরাতন অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত প্রত্যাশিত। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, নন্দবাবু, তারিণী কবিরাজ, কেদার চাটুজ্যে, লাটুবাবু, নাদু মল্লিক—এরা কি আজকের! এদের কেউ কেউ মুরারি শীলের সঙ্গে ভাগে ব্যবসা করছে, ভাড়ুদত্তের সঙ্গে বাজার তোলা আদায় নিয়ে করছে, আবার ঠক চাচার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছে, দুনিয়া বুরা মুই সাচা হয়ে কি করবো? ডমুরধারা আসরে কেদার চাটুজ্যে গল্পের শিকল বোনেনি এবং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী যে নরেদচাঁদের ব্যবসার পার্টনার ছিল না এমন কথা কে হলপ করে বলবে। এরা সবাই অতিপরিচয়ের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল বলেই চিনতে পারা যায়নি।

॥ ৫ ॥

আমেরিকার ভূভাগে গোড়া থেকেই ছিল, কলম্বাস তাকে আবিষ্কার করলো। পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণ গোড়া থেকেই ছিল, পরশুরাম সন্ধানীরূপে

তাদের আবিষ্কর্তা। প্রতিভা দুই ভাবে কাজ করে, আবিষ্কার ও সৃষ্টি, নূতন জগতে উদ্ঘাটন ও নূতন জগতের নির্মাণ, কলম্বাস ও বিশ্বামিত্র। এ দুই গুণের কোন একটাকে একচেটিয়া মনে করলে ভুল হবে। অল্প-বিস্তর সব প্রতিভাবান্ লেখকেই পাওয়া যাবে। আয়েষা সৃষ্টি, বিদ্যাদিগ্‌গজ আবিষ্কার; গোরা সৃষ্টি, পানুবাবু আবিষ্কার। তবে এ পর্যন্ত বলতে পারা যায় যে স্যাটায়রিষ্টে, ব্যঙ্গ প্রতিভার সৃষ্টির তুলনায় আবিষ্কারের ভাগ বেশি। সুইফটের লিলিপুটকে যতই অভিনব মনে হোক, আসলে সে মানুষকে উল্টো দূরবীনের দৃষ্টিতে আবিষ্কার। পরশুরামে আবিষ্কারের ভাগটাই সুপ্রচুর, তবে সৃষ্টিকার্যও আছে। জাবালি চরিত্র মহৎ সৃষ্টি, কৃষ্ণকলি (কালিন্দী) ও চিরঞ্জীবও সৃষ্টিকার্য। তাহলে দাঁড়ালো এই যে, পাঠকের বিস্ময়ের দ্বিতীয় কারণ হিসাবে সে মোটেই বিস্মিত হয়নি, অন্ততঃ নূতন দেখে বিস্মিত হয়নি। প্রত্যাশিত পুরাতনকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল। তৃতীয় কারণ পরশুরামের ভাষা।

এমন পরিচ্ছন্ন, বাহুল্য বর্জিত, সুপ্রযুক্ত ভাষা বড় দেখা যায় না। পাঠক-সমাজ যখন সবুজপত্রী ভাষাকে প্রগতির চরম লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছিল, ভেবেছিল সাধু ভাষার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে, নূতন কোন সম্ভাবনা আর তার মধ্যে নেই, তখন গড্ডলিকা কজ্জলীর ভাষা দেখে সকলে চমকে গেল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতিকে এড়িয়ে সাধুভাষায় এই পদক্ষেপ সত্যই বিস্ময়জনক। বস্তুতঃ পড়বার সময়ে খেয়াল থাকে না এ ভাষা সাধু কি কথ্য, পরে হিসাবে দেখা যায় সাধু ভাষা।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা পাঠককে প্রতি নিঃশ্বাসে তার ধর্ম স্মরণ করিয়ে দেয়, নিজের কৌশলকে লুকোবার কৌশলটা তার অনায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ভাষাতেও এই ত্রুটি। গড্ডলিকা ও কজ্জলীর ভাষারীতি সাধু, তবে জটাজুটধারী ভেকধারী সাধু নয়, এমন সাধু যে সাধুত্ব গোপন রাখতে সমর্থ। সবশুদ্ধ মিলে ভাষাটি ভারী তৃপ্তিদায়ক, ভাবের স্বাভাবিক বাহন।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। হাস্যরস রচনার ভাষা সাধু হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে ভাষার গাম্ভীর্যে আর ভাবের লঘুতায় যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তা হাসির পরিবেশ রচনায় সাহায্য করে। কথ্য ভাষার চটুলতা আর হাসির চটুলতায় মিলে যায়, মুহুর্মুহু পাঠকের মনকে দ্বন্দ্বের

চকমকি স্ফুরণে আলোকিত ও চমকিত করতে পারে না। বিষয়টির বিস্তার অনাবশ্যক, কতকগুলি উদাহরণ দিলেই চলবে। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য ও কমলাকান্ত, রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-কৌতুক, ত্রৈলোক্যনাথ, ইন্দ্রনাথ, প্রভাত-কুমার প্রভৃতির উল্লেখ যথেষ্ট। অনেকে আক্ষেপ করেন বাংলা সাহিত্যে আজকাল যথেষ্ট হাস্যরসের রচনা লিখিত হচ্ছে না। তার অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান, হাসির রচনা আজ ভ্রষ্টবাহন। সিদ্ধিদাতা গণেশ চটুল মুষিক বাহনে চলাফেরা করতে পারেন, তবে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এমন কার সাধ্য! যে শুঁড়ের বহর! গভীর গম্ভীর ভাব কথ্যভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হলেও, কথ্যভাষায় হাস্যরস! নৈব নৈব চ। এই একটি কারণ যেজন্য পরশুরামের শেষ ছয়খানি গল্পগ্রন্থ কিছু পরিমাণে ম্লান। সেগুলির বাহন কথ্যভাষা। সাধুভাষা ও পয়ার ছন্দের আয়ু বঙ্গ-ভারতীর আয়ুর সঙ্গে মিলিয়ে গণনীয়। নূতন নূতন গুণীর হাতে অভাবিত রূপ যুগে যুগে তারা দেখা দেবে।

॥ ৬ ॥

হাসির গল্প লিখবার বিপদ এই যে, পাঠকে হেসেই সব কর্তব্য শোধ করে দেয়, আদৌ তালিয়ে দেখতে চায় না। হাসির গল্পে আর এমন কি থাকবে, ভাবটা এই রকম। কেমন করে জানবে যে হাসির গল্প না থাকতে পারে এমন বস্তু নাই। ভাষার জাদুর কথাই ধরা থাক। হাস্যরস একান্ত ভাবে সামাজিক ব্যাপার। হাসিতে সামাজিক মনের প্রকাশ, অশ্রুতে প্রকাশ ব্যক্তিমনের। স্বভাবতই হাস্যাত্মক রচনায় নিসর্গ বর্ণনার স্থান সংকীর্ণ। যখন তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে, নূতন খাত খনন করে নিতে হয়। গঙ্গা প্রবাহিত স্বাভাবিক খাতে, গঙ্গার খাল কৃত্রিম খাতে যা নাকি সামাজিক চেষ্টার ও সামাজিক প্রয়োজনের ফল।

লম্বকর্ণ গল্পে কালবৈশাখীর এবং ভুশণ্ডির মাঠে অপরাহ্ণের বর্ণনা দুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালবৈশাখীর ও অপরাহ্ণের স্বভাব বর্ণনার সঙ্গে সুনিপুণ ভাবে মিশে গিয়েছে ব্যঙ্গ রসিকের স্বভাব। আবার কচি-সংসদ গল্পে দুটি বর্ণনা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। একটি শরৎ আবির্ভাবের, আর একটি রেলগাড়ীতে যাত্রার সুখের।

শরতের প্রথমপদক্ষেপের নিখুঁৎ স্বাভাবিক বর্ণনা, তারপরেই সামাজিক মন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। "টাকায় এক গণ্ডা রোগারোগা ফুলকপির বাচ্চা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে।" আবার রেলগাড়ীতে যাত্রার বর্ণনার মধ্যেও কেমন অনায়াসে নিসর্গের স্বভাব ও সামাজিক স্বভাব গঙ্গাযমুনায় মিশে গিয়েছে। "কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানলা দিয়ে এক ঝলক উগ্রমধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজী এর মধ্যে নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপরে ফিরিঙ্গীটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা তার উপর আরও দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল-ভাল খাদ্যসামগ্রী, তাছাড়া বেতের বাক্সে আরও অনেক আছে। গাড়ীর অঙ্গে অঙ্গে লোহালক্কড়ে চাকার ঠোক্করে জিঞ্জির ডাণ্ডার ঝঞ্ঝনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিৎপাৎ হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন্ অস্ত্, ওআ হমীন অস্ত!" শেষোক্ত বাক্যে দ্রুত ধাবমান গাড়ীর চলার ছন্দ কেমন সুকৌশলে অথচ কেমন অনায়াসে ধরা হয়েছে। উড়ন্ত পাখীকে ফাঁদ পেতে ধরবার চেয়েও এ যে কঠিন। সাহিত্যে সবচেয়ে দুঃসাধ্য ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রকৃতিকে মেলানো, আর ব্যাঙ্গের সঙ্গে প্রেমকে মেশানো। উপরে উদ্ধৃত সবগুলি বর্ণনায় প্রথম দুঃসাধ্যকে সম্ভব করে তোলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দুঃসাধ্য দুঃসাধ্য হয়ে ওঠবার উদাহরণ পরে দেওয়া যাবে। মোট কথা এই যে এহেন নিসর্গ বর্ণনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যাবে না, না গল্পগুচ্ছে না কপালকুণ্ডলায়। এ পরশুরামের নিজস্ব। আর ভাষায় এই ছন্দ, গতি ও ভঙ্গী অন্যত্র বিরল, পরশুরামের শেষের বইগুলোতেও নেই। সেগুলির আপেক্ষিক অপ্রিয়তার এ যে একটা কারণ তা আগেই বলেছি। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে বাধা নেই যে, রামায়ণ মহাভারতেয় অনুবাদে সাধুভাষা ব্যবহার করলে তাদের মর্যাদা রক্ষিত হতো।

॥ ৭ ॥

গড্ডলিকা ও কজ্জলীর আর একটি ঐশ্বর্য ছবিগুলি। কথার সঙ্গে ছবিগুলি গানের সঙ্গে সঙ্গত নয়। সঙ্গত বন্ধ হলেও গানের মাধুর্য কমে না।

ছবিগুলিকে বলা চলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত নীচে লালকালি দিয়ে দাগ টেনে দেওয়া, কিংবা সঙ্গীর উত্তরীয় প্রান্ত টেনে দৃশ্য বিশেষের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। ওগুলো আছে বলে পাঠক একটু অতিরিক্ত সচেতন হয়ে ওঠে, ওগুলো না থাকলে অনবহিত পাঠক সেগুলো হয়তো অতিক্রম করে যেতো। শেষের ছয়খানি গ্রন্থের আপেক্ষিক ম্লানতার কারণে নীচে দাগটানার কিংবা উত্তরীয় প্রান্তে টান দেওয়ার অভাব। তৃতীয় গ্রন্থ হনুমানের স্বপ্নের কোন কোন গল্পে যথা হনুমানের স্বপ্ন ও প্রেমচক্রে ছবির গুনে অপকর্ষ লক্ষ্য করবার মতো। খুব সম্ভব চিত্রকর নিজের ক্ষমতার ক্ষীণতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন বলেই শেষের বইগুলি অলঙ্করিত করতে ক্ষান্ত হয়েছেন। তার ফল গল্পগুলির আবেদন মন্দ হয়ে এসেছে। তবে প্রথম বই দু'খানিতে লেখায় রেখায় এমন মিলে গিয়েছে যে, এক এক সময়ে সন্দেহ হয়, গল্প অনুসারে ছবি আঁকা না ছবি অনুসারে গল্প লেখা।

পরশুরামের গল্পের আর একটি বিশেষ লক্ষণ পড়বার সময়ে পাঠকে ভারী একটি আরাম ও স্বস্তি বোধ করে। বর্তমান জীবনের তাড়াহুড়া, ব্যস্ততা, গেল গেল ভাব এদের মধ্যে নাই। বর্তমান ব্যস্তসমস্ত জীবনে নিত্য বিড়ম্বিত পাঠক এখানে পদার্পণ করে ভারী আরাম বোধ করে। উদাহরণ স্বরূপ বেদার চটুজ্যে গল্পমালার উল্লেখ করা যেতে পারে। বংশলোচনবাবু গৃহকর্তা হলেও গল্পকর্তা কেদার চাটুজ্যে। বংশলোচনবাবুর বাড়ীর আড্ডাটি ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের আড্ডার প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়।

"চাটুজ্যে মশায় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন, রাত্রি ন'টা সাতান্ন মিনিট গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তি। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না। এখন তো সবে সন্ধ্যা। বিনোদ উকিল বলিলেন—তাই তো বাসায় ফেরা যায় কি করে? গৃহস্বামী বংশলোচনবাবু বলিলেন, বৃষ্টি থামলে সে চিন্তা ক'রো। আপাততঃ এখানেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উদো বলে আয় তো বাড়ীর ভেতরে। চাটুজ্যে বলিলেন, মসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।"

এই চিত্র যুদ্ধপূর্ব সত্যযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পাঠকের চিত্তে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রশ্বসিত করে তোলে। রেশন-কার্ড নাই, কন্‌ট্রোল নাই, ইলিশ মাছ চালান বন্ধ হওয়ায় আশঙ্কা নাই; যত রাতেই বাড়ীতে ফেরো না কেন, ট্রাম বাস পাওয়া যাবে; নাই ধর্মঘট, নাই ছিনতাইয়ের

আশঙ্কা। কয় বছর আগেকারই বা কথা। কিন্তু সত্যযুগ তো লৌকিক বছর গণনার হিসাবের উপরে নির্ভর করে না। প্রত্যেক যুগ বিগত যুগের মধ্যে অচরিতার্থ আশার মরীচিকা দেখে—সেই তো সত্যযুগ। জাবালি পত্নী "হিন্দ্রলিনী তাঁর বাবার কাছে শুনিয়াছিলেন, সত্যযুগে এক কপর্দকে সাত কলস খাঁটি হৈয়ঙ্গবীন মিলিত, কিন্তু এই দগ্ধ ত্রেতাযুগে তিন কলস মাত্র পাওয়া যায়, তাও ভঁয়সা।" আজকের সকলের মধ্যেই একজন হিন্দ্রলিনীর বাস। আবার আগামী যুগ বর্তমান কালের দিকে তাকিয়ে, ধর্মঘট, ঘেরাও, কন্‌ট্রোল, রেশন, ছিনতাই-শঙ্কিত যুগকে সত্য বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে। পাঠকে কেদার চাটুজ্যে গল্পমালা পড়বার সময়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের চিরন্তন বাসা সত্যযুগে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়। এই গল্পগুলির রসের নিত্যতার কারণ বংশলোচনবাবুর বাড়ীর আড্ডা ও আড্ডাধারীগণ নিত্যকালের অধিবাসী, যে নিত্যকাল লৌকিক হিসাবের উর্ধ্বে। সতত বিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রের মাঝখানে এই শান্তিময় দ্বীপটিতে পদার্পণ করবামাত্র এখানকার নাগরিক অধিকার লাভ করা যায়। কিছু মাত্র দায়িত্ব নাই, বসে বসে কেদার চাটুজ্যের গল্প শোনো, (বাধা দিলে ব্রাহ্মণ চটে যায় এমন কাজটি করো না, নগেন ও উদয়ের পরস্পরকে আক্রমণ কৌশল লক্ষ্য করো, পারো তো বিনোদ উকীলের কোল থেকে তাকিয়াটা টেনে নাও, আর সম্ভব হলে বংশলোচনবাবুর অনবধানতার সুযোগে পাশে থেকে Happy though Married বইখানা আলগোছে টেনে নিয়ে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা করো। রাত যতই হোক মসুর ডালের খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজার আসরে যথাসময়ে ডাক পড়বে। স্বচ্ছল গৃহস্থ বংশলোচনবাবুর বাড়ীতে সর্বদা দু'চারজন অতিরিক্তের জন্য চাল নেওরা হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনও আছে, কেননা, ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের আড্ডাধারীরা ক্রমে ক্রমে ওখানে গিয়ে সমবেত হচ্ছেন, এতদিনে বোধহয় সকলেই খণ্ডকালের সীমা পেরিয়ে নিত্যকালের আসরে গিয়ে জুটেছেন।

॥ ৮ ॥

পরশুরামের জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ কারণ তার গল্পগুলির বাহনের বিশেষ প্রকৃতি। এই বিশেষ প্রকৃতিকে সাধারণভাবে হাস্যরস বলা চলে, কিন্তু আগে

মনে করিয়ে দিয়েছি যে হাস্যরসের বর্ণালী বা বর্ণচ্ছটায় নানা রঙ, এক প্রান্তে অনতিপ্রচ্ছন্ন অশ্রু, আর এক প্রান্তে অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কার, মাঝখানে আছে বিশুদ্ধ কৌতুকহাস্য ও অন্যজাতের হাসি। আরও বলেছি যে, পরশুরামের হাসি অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কার-ঘেঁষা। সেই সঙ্গেই বলেছি যে আধুনিক মন রসের জাত বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত নয়, বিভিন্ন রস, এক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের হাসি মিশে গিয়ে মিশ্ররসের এবং মিশ্র জাতের হাসি সৃষ্টি করে। পরশুরামে বিশুদ্ধ কৌতুক হাস্য আছে, যেমন গুপী সাহেব ও উপেক্ষিতা, জটাধর বক্শী পর্যায়কেও এই শ্রেণীতে ধরা উচিত। অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কারের হাসিই অধিকাংশ গল্পে। অনতি-প্রচ্ছন্ন অশ্রু বড় চোখে পড়ে না। হাসতে হাসতে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ করে তোলে কমলাকান্তের দপ্তরে ও বৈকুণ্ঠের খাতায়। সে হাসির বোধ করি একেবারেই অভাব পরশুরামে। বের্গসঁ যাকে ইন্টেলেকচুয়াল লাফটার বলেছেন, পরশুরামের হাসি তা-ই। তবে তাঁর হাসির একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠী বিশেষের গায়ে এসে লাগে না। এ হাসি ভূতের ঢিলের মতো সম্মুখে এসে প'ড়ে সচকিত ও সতর্ক করে দেয়, গায়ে লেগে ব্যথা দেয় না। অর্থাৎ হাসির উদ্দেশ্য সাধিত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হয় না। সেই জন্যে সকলেরই কাছে এর নিত্য সমাদর। অপরপক্ষে অমৃতলাল ও ইন্দ্রনাথের হাসি ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠী বিশেষের পক্ষে পীড়া-দায়ক। স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজীশিক্ষা, রাজনৈতিক আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ এই হাসির লক্ষ্য। পরশুরামের হাসির লক্ষ্য Idea, Ideology, কোন কোন বৃত্তি, ব্যবসায়, সাহিত্য ও ধর্মের ব্যভিচার ইত্যাদি। এ হাসির একটা মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেকেই মনে করে সে ছাড়া আর সকলে তার লক্ষ্য, কাজেই অসঙ্কোচে হাসতে তার বাধে না। গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, পেন্সনপ্রাপ্ত রায় সাহেব তিনকড়িবাবু, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, বিরিঞ্চিবাবা, বকু বাবু, শিহরণ সেন অ্যাণ্ড কোং সকলেই প্রাণ ভরে হাসে, হাঃ হাঃ হাঃ—অমুক লোকটাকে খুব ঠুকেছে দেখছি, বেড়ে হয়েছে। শেক্সপীয়র নাটককে প্রকৃতির দর্পণ বলেছেন। পরশুরামের দর্পণখানা কিছু বাঁকা, দর্শক নিজের বিকৃত ছায়া দেখে বুঝতে না পেরে ভাবে অপরের ছায়া, পেট ভরে হেসে নেয়। সামান্য অতিরঞ্জনের আমদানি করে পরশুরাম এই কাজটি সুসিদ্ধ করেছেন।

হাস্যরস সৃষ্টির একটি চিরাচরিত পন্থা অপ্রত্যাশিতের অতর্কিত সমাবেশ। সকলকেই অল্পবিস্তর এ পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে। এ গুণটিতে পরশুরাম প্রতিদ্বন্দ্বী-রহিত।

সত্যব্রতর উক্তি, "সাণ্ডেল মশায় বলছেন ধর্মজীবনের মধুরতা, আমি ভাবছি আরসোলা।"

শূর্পণখা বিরহ দুঃখ বর্ণনা করেছে এমন সময়ে ভাইঝি পুস্কলা জিজ্ঞাসা করে বসে, "পিসি, তুমি ঋষি খেয়েছ?"

"নিরুপমা বলিল—শাক নয়, ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে। ওঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো।

নিবারণ। সেদ্ধ হচ্ছে? কেন ননীর বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না।

"দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ", "ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক", "শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালির তিন জন্মের স্বামী", "তাঁহারা (নাস্তিকরা) মরিলে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন", "লালিমা পাল (পুং)", "তবে এইটুকু আশার কথা, এখানে (দার্জিলিঙ পাহাড়ে মাঝে মাঝে ধস নামে।" সার আশুতোষ এক ভলুম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন," প্রভৃতি। এমন উদাহরণ শত শত উদ্ধার করা যেতে পারে। এই ধরণের অপ্রত্যাশিতের অতর্কিত সমাবেশকে এক ধরনের এপিগ্রাম বলা যেতে পারে, প্রভেদের মধ্যে এই যে সাধারণ এপিগ্রাম ভাবময়, এগুলি চিত্রময়। এই সব এপিগ্রামের স্ফুলিঙ্গ-বর্ষণ যেমন মনোহর, তেমনি অত্যাবশ্যক। এরাই পাঠকের মনকে সর্বদা সজাগ করে রেখে দেয়, তার চোখের সম্মুখে পথ দৃশ্যমান ও সুগম হয়ে ওঠে।

॥ ৯ ॥

পরশুরামের রচনাগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বক্তব্য শেষ করে এবারে গ্রন্থ হিসাবে তাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার আগে বইগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্বের কারণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক।

গড্ডলিকা ও কজ্জলী অধিকাংশ পাঠকের বিবেচনায় পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তি একথা সম্পূর্ণ সত্য হোক বা না হোক এই বিবেচনার কিছু হেতু আছে। প্রথম

দু'খানির সঙ্গে শেষের সাতখানির একটি প্রধান পার্থক্য, (অন্য পার্থক্য আগেই দেখানো হয়েছে) প্রথম দু'খানিতে দেখানো হয়েছে জীবনচিত্র, শেষের কয়খানিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জীবনতত্ত্ব। প্রথম দু'খানি ছবি, শেষের গুলি ভাষ্য। তবে ছবি ও ভাষ্য, আগে যাকে বলেছি চিত্র ও তত্ত্ব সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ নয়। অনেক সময়ে একটার মধ্যে আর একটা এসে পড়েছে। তবে ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বিচার করলে পার্থক্য মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড ও বিরিঞ্চিবাবা আর তৃতীয়দ্যূতসভা, রামরাজ্য বা গামানুষ জাতির কথা, একজাতের গল্প নয়। প্রথম দুটোতে লেখক ছবি এঁকেই সন্তুষ্ট, শেষেরগুলোতে ছবির সঙ্গে মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন কিংবা বলা উচিত মন্তব্যের সঙ্গে কখনো কখনো জুড়ে দিয়েছেন ছবি। ফানুষ ও ঘুড়িতে এই রকম প্রভেদ। ফানুষ হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে বাজিকর সম্পূর্ণ দায়মুক্ত তারপরে ঐ বস্তুটা বাতাসের বেগ ও নিজের ভার অনুসারে চলতে থাকে। ঘুড়ি উড়নদার নিরক্ষেপ নয়, বাতাসের বেগ ও নিজের ভার যাই বলুক, যতই উঁচুতে সে উঠুক, ওর হাতের চরম টানটা পড়ছে উড়নদারের হাত থেকে। লোকটি ভাষ্যকার, ঘুড়ির গতিবিধি তার ভাষ্য। অন্যপক্ষে ফানুষ অনন্যনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত গল্পগুলি জীবনতত্ত্বের বা জীবন ভাষ্যের শ্রেষ্ঠ আধার।

এখন পাঠক-সাধারণের কাছে তত্ত্বের চেয়ে চিত্রের আদর বেশি ; তাকাইলে চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তত্ত্ব বুঝতে হলে বুদ্ধির আবশ্যক, সকলে সব সময়ে বুদ্ধি খাটাতে চায় না, বিশেষ গল্প উপন্যাসে, সে গল্প উপন্যাস আবার যদি হাস্য রসাত্মক হয়। কিন্তু বুঝমান পাঠকের কাছে শেষের বইগুলোর আদর কম হওয়ার কথা নয় ; লেখকের প্রতিভার সঙ্গে মনীষাকে লাভ করাকে তারা উপরি পাওনা বলে গণ্য করে। শেষের বইগুলির গল্পে সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, যুদ্ধ, শান্তি, প্রেম, নরনারীর সম্বন্ধ প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন আর সেই মন্তব্যের সমর্থনে কখনো বিচিত্র নরনারী ও ঘটনাকে উপস্থিত করেছেন।

তবে উভয় পর্যায়েই ব্যতিক্রম আছে বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষের বইগুলির মধ্যে জটাধর বক্‌শী সিরিজ, দুই সিংহ, আনন্দীবাঈ, আতার পায়েস, পরশপাথর, সরলাক্ষ হোম, জয়হরির জেব্রা, লক্ষ্মীর বাহন,

রাতারাতি, গুরুবিদায় প্রভৃতি জীবন চিত্র-প্রধান গল্প। আবার দুয়ের মিশ্রনে অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টি গগন চটি। এটি পরশুরামের অতি শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্তর্গত। একটি ক্ষুদ্র সরস কাহিনীর ফ্রেমের মধ্যে বর্তমান পৃথিবীর ধাপ্পা ও ভণ্ডামিকে সশ্রদ্ধ করে দাঁড় করানো মুনশীয়ানার চরম, গল্পের কলমের পিছনে মনীষার প্রেরণা না থাকলে এমন সম্ভব হতো না।

প্রথম দু'খানির এগারটি গল্পের মধ্যে জাবালি নিঃসন্দেহে জীবনতত্ত্ব প্রধান। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে যে-সব গল্প লিখেছেন জাবালি তাদের প্রথম। খুব সম্ভব রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে আগ্রহ থেকেই তিনি পেয়েছেন পৌরাণিক কাহিনী পুরুষোচিত ছাঁচে ঢালাই করবার প্রেরণা। সে যাই হোক এই জাবালিতে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, পরে সবিস্তারে বলবো। আপাততঃ অন্য গল্পগুলি সম্বন্ধে বিচার সেরে নেওয়া যেতে পারে।

এগারটি গল্পের জাবালি বাদ পড়লে থাকে দশটি। মহাবিদ্যা ও উলট-পুরাণ দৃষ্টির অভিনবত্বে, নরনারীর বৈচিত্র্যে এবং wit-এর খদ্যোতবর্ষণে চিত্তাকর্ষক হলেও, শক্ত গল্পের ফ্রেমের অভাবে অন্যগুলোর সমকক্ষ হতে পারেনি। ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মনোহর, কিন্তু সমগ্র রূপটি নয়। লেখক যেন দেহের outline-টা আঁকতে ভুলে গিয়েছেন। অন্য আটটি গল্প বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আটটি গল্প।

॥ ১০ ॥

গোড়াতে উল্লেখ করেছি যে রাজশেখর বসুর বিজ্ঞান শিক্ষা (আইনও তার মধ্যে পড়ে) এবং বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গল্পগুলির উপাদান সংগ্রহে তাঁকে সাহায্য করেছে। সকল লেখককেই করে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাকিমী অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর অনেক উপন্যাসে আছে। কৃষ্ণকান্তের উইল ও রজনী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংগীতবিদ্যার সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায়। তাঁর অনেক Image অন্য অলঙ্কার সংগীত-বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রাজশেখর বসুও কাজে লাগিয়েছেন তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

গল্পের কাঠামো রচনা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব—ব্যবসায়ের অন্ধিসন্ধি, লিমিটেড কোম্পানীর আইনের রন্ধ্র সন্ধানে যাঁর জ্ঞান পাকা। আবার বিজ্ঞানবিদ্যা তাঁর কাজে লেগেছে। কুমড়োর চামড়া কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে ভেজিটেবল শু হলেও হ'তে পারে এ ধারণা সকলের মাথায় আসবার কথা নয়। আবার বিরিঞ্চিবাবাতে প্রোফেসার ননীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আইডিয়া কেবল তারই মাথায় আসা সম্ভব, বিজ্ঞানের বিশেষ রসায়নের সাধারণ সূত্রগুলি যিনি অবহিত। প্রাণিতত্ত্ব, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতির মূল সূত্রগুলিকে তিনি কাজে প্রয়োগ করেছেন পরবর্তী অনেক গল্পে।

তারপরে ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের আড্ডাটিকে এবং আড্ডাধারীদের অনেককে তিনি নামান্তরে ও রূপান্তরে ব্যবহার করেছেন কেদার চাটুজ্যে গল্পমালায়।

রাজশেখরবাবু স্বীকার করেছেন যে তিনি বেশী লোকের সঙ্গে মেশেন নি, দেশভ্রমণ বেশি করেন নি। প্রতিভাবান লোকের পক্ষে এ প্রয়োজন সব সময়ে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র খুব মিশুক লোক ছিলেন না, দেশভ্রমণও বেশি করেন নি। তবে তাঁর উপন্যাসে এত বিচিত্র নরনারী এলো কোথা থেকে তাদের অধিকাংশ স্বেচ্ছায় দেখা দিয়েছে আদালতে এসে। রাজশেখরবাবুর বেলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিসে। বাকিটুকু প্রতিভার রসায়ন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালীর রসায়ন বিদ্যার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন "মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।" গরমিলে মেলানোই যে হাস্যরস সৃষ্টির প্রধান উপায়। হাস্যরস ফকিরের আলখাল্লা, নানা রঙের কাপড়ের টুকরোয় তৈরী। বেঙ্গল স্কুল অব্ কেমিষ্ট্রির নব্য-রাসায়নিক পরশুরাম সেই নীতিতেই তাঁর হাসির গল্পগুলি সৃষ্টি করেছেন।

এবারে জাবালি। জাবালি চরিত্রটি খুব জনপ্রিয় না হলেও (সেযুগেও জনপ্রিয় ছিলেন না) জাবালি গল্পটি অতি উৎকৃষ্ট। আর শুধু তাই নয় পরবর্তী অনেক উৎকৃষ্ট পৌরাণিক গল্পের অগ্রজ।

ব্রহ্মা জাবালিকে উদ্দেশ করিয়া বললেন, "হে স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্য আত্মগোপন করিও না, লোকসমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন করো। তোমাকে কেহ বিনিষ্ট করিবে না, অপরেও যেন

তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন্, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাকো।"

স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ সংস্কারের ছিন্নবন্ধন জাবালি মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটা মূর্তিমান প্রছন্ন তিরস্কার। এর আগে অনেকবার বলেছি পরশুরামের হাস্যরসের বিশেষ প্রকৃতি প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। পরশুরামের চোখে আদর্শপুরুষ জাবালি। অমরনাথে ও কমলাকান্তে মিলিয়ে নিলে, হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে খানিকটা পাওয়া যায়। তেমনি খুব সম্ভব পরশুরামের, ব্যক্তিত্বের খানিকটা পাওয়া যায় জাবালি চরিত্রে। পরশুরামের Symbolic Hero জাবালি। ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে বারে বারে পরশুরামের তুলনা করেছি, আবার করা যেতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথের চোখে আদর্শপুরুষ মুক্তামালা গল্প পর্যায়ের স্ববলচন্দ্র গড়গড়ি। গড়গড়ি সরল ভাবে স্বীকার করেছে, (যেন অপরাধ স্বীকার) "ভালরূপ লেখা পড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে সত্য ও পরোপকার, ইহাই ধর্ম।" ত্রৈলোক্যনাথের জীবনেও এই ছিল নীতি ও প্রকৃতি। তার হাস্যরসের প্রচ্ছন্ন অশ্রুর জগতের Symbolic Hero স্ববলচন্দ্র গড়গড়ি। একজনে ঘনীভূত অশ্রু, অপরজনে ঘনীভূত তিরস্কার। এইভাবে দুইজনে হাসির বর্ণালীর দুই বিপরীত প্রান্ত।

॥ ১১ ॥

এবারে আর গ্রন্থ হিসাবে নয় বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে গল্পগুলির আলোচনা করবো। অনেকগুলি পর্যায়ক্রম পরশুরামে আছে, তার মধ্যে পৌরাণিক, কেদার চাটুজ্যে, জটাধর পর্যায়গুলি প্রধান। অন্য গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য হলেও পর্যায়-রূপে তাদের তেমন গুরুত্ব নাই, অর্থাৎ এই সব গল্পে পর্যায়ের বিস্তার সঙ্কীর্ণ।

চিত্তাকর্ষকগুণ কেদার চাটুজ্যে ও জটাধর পর্যায়ে অধিক হলেও চিন্তাকর্ষকগুণ পৌরাণিক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি। সমাজ রাজনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পরশুরামের চিন্তায় এগুলি বাহন। কত বিষয়ে যে তাঁর কল্পনা প্রসারিত হয়েছে, কত সমস্যা যে তাঁর চিন্তার পরিধির মধ্যে এসে পড়েছে গল্পগুলি সেই পরিচয় বহন করেছে।

অনেকের মুখে এমন কথা শোনা যায় যে, পরশুরামের হাতে পড়ে পৌরাণিক নরনারীর বা কাহিনীর অপকর্ষ সাধিত হয়েছে। একথা সত্য নয়, তবে পুরাণের সঙ্গে গল্পগুলির যে ভেদ ঘটে গিয়েছে তা অবশ্যই সত্য। এ ভেদ কালের ও লেখকের দৃষ্টির ভেদ। পুরাণগুলিতেও সমস্ত কাহিনী এক রূপ নয়, বিভিন্ন পুরাণে একই কাহিনীর রূপান্তর দেখতে পাওয়া যায়। সেও একই কারণে, কালেরও লেখকের দৃষ্টির ভেদ। কালের ও লেখকের দাবী অনুসারে পরশুরামের হাতে পুরাণের জন্মান্তর ঘটেছে বললে অন্যায় হয় না।

রামরাজ্য ও চিরঞ্জীবে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক কালের মিশ্রণ। রামরাজ্য গল্পে মিডিয়াম-রূপে ভূতগ্রস্ত ভূতনাথ যে গভীর সামাজিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছে তা কখনোই আধামূর্খ ভূতনাথের দ্বারা সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত পাঠকের মনে এই সন্দেহটুকু লেখক জাগিয়ে রেখেছেন, পাঠক ভাবতে থাকে তবে কি সত্যই সে ভূতাবিষ্ট হয়েছিল? ভূতনাথ কথিত তত্ত্বগুলিকে সে গ্রহণ করলেও ভূতনাথের নিজস্ব বলে গ্রহণ করতে তার বাধে। এই বাধাটুকু স্থষ্টি খুব মুনশীয়ানার কাজ।

চিরঞ্জীবেও তা-ই। চিরঞ্জীব কে? বিভীষণ ছাড়া আর কে হবে? অথচ স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

গুলবুলিস্তান আরব্য-উপন্যাসের উপসংহার, ভারতীয় পুরাণের রূপান্তর নয়, অন্য নামের অভাবে তাকে পৌরাণিক বলেই ধরা উচিত।

দশকরণের বানপ্রস্থে সুখের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাজা দশকরণ নানা অবস্থার মধ্যে সুখের সন্ধান করেছেন, শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করলেন যে, পরের ঘর ছেয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুতেই সুখ নাই, পরোপকারই যথার্থ সুখ। ব্যঙ্গরসিক কমলাকান্তেরও এই সিদ্ধান্ত। অপর দুইজন অতিশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসিক বার্ণাড শ ও ভলটেয়ার শেষ পর্যন্ত এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। Candida এবং Blackgirl in Search of God এই দুই অমর গ্রন্থে এই একই সিদ্ধান্ত। দশকরণ ঘরামী বৃত্তি ছেড়ে সিংহাসনে ফিরে যেতে অস্বীকৃত হয়েছেন।

তৃতীয়দ্যূতসভায় দেখানো হয়েছে, অধর্মের বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ রাজনীতির চিরস্বীকৃত নীতি। এই নীতির প্রেরণাকেই শকুনির ভ্রাতা মতকুনি যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতের সাহায্য লইতে পরামর্শ দিয়েছেন।

ভীম গীতা গল্পে ভীম কৃষ্ণকে বলেছেন কাপুরুষতা ও ধর্মভীরুতা কোনটাই তার চরিত্রের লক্ষণ নয়; সে মধ্যপন্থী। কাজেই কৃষ্ণ তাঁর উচ্চ আদর্শ নিয়ে থাকুন, ভীম ক্ষত্রিয় বীরের কর্তব্য করবে। এই গল্পে চোকমল্ল আর তকমল্ল নামে কৃষ্ণের দুইজন সেবকের উল্লেখ আছে, তারা নিতান্ত সাধারণ ও দুর্বল ব্যক্তি। তাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 'দুর্বলের একমাত্র উপায় জোটবাঁধা। বোলতার ঝাঁক বাঘ-সিংহীকেও জব্দ করতে পারে।' বর্তমান যুগ এই নীতি অবলম্বন করে চলেছে।

ভরতের ঝুমঝুমি ভারত বিভাগ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ মন্তব্য।

অগস্ত্যদ্বার রাজাদের জিগীষার মূঢ়তা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ মন্তব্যে পরিপূর্ণ।

বালখিল্যগণের উৎপত্তি চিন্তাশীল মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। লেখকের অভিমত এই যে, বালখিল্যগণের লীলা পৌরাণিক কালেই সীমাবদ্ধ নহে, যুগে যুগে সে লীলা পুনঃঅভিনয় হয়ে থাকে, বর্তমান যুগ সেই লীলার প্রশস্ত আসর।

তিন বিধাতা গল্পে পাপের উৎপত্তি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বিবৃতি আছে। লেখকের বক্তব্য এই যে, বিধাতা পাপপুণ্যের অতীত, তাঁর চোখে সবই সমান, মানুষ ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলেই পাপপুণ্যের ভেদ করে আর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অসীমকালের অধীশ্বর বিধাতা নিরুদ্বিগ্ন। পাপ ও পুণ্য দুই-ই জীবনের অপরিহার্য লক্ষণ। কোন একটিকে বাদ দিয়ে জীবনকে কল্পনা করা চলে না।

গন্ধমাদন বৈঠকে দেখানো হয়েছে যে, ধর্মযুদ্ধ বলে কিছু সম্ভব নহে। যুদ্ধের আগে ধর্মের প্রেরণায় যেমনই নিয়ম বেঁধে দেওয়া হোক না কেন, যুদ্ধকালে তার ব্যভিচার ঘটবেই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সমস্তই এই ব্যভিচারের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। হয় যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করতে হবে, নয় যুদ্ধে অধর্মকে স্বীকার করে নিতে হবে।

নির্মোক নৃত্যে জীবনে একটি গভীর জিজ্ঞাসাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছে। প্রকৃত সৌন্দর্য রূপাশ্রয়ী নয়, তার স্থান আরও গভীরে। উর্বশীর পরাজয়ে এই সত্যটি দেখানো হয়েছে।

যযাতির জরা গল্পে দেখানো হয়েছে যে, তথাকথিত সন্ন্যাস বাসনার মূলচ্ছেদ করতে অক্ষম। বাসনা যখন রূপসী নারীরূপে উপস্থিত হয়, তখন সন্ন্যাসের সযত্ন-রচিত তাসের ঘর মুহূর্তে ভেঙে পড়ে।

ডম্বরু পণ্ডিত একজন মুখ্য আদর্শবাদী, তাই কোথাও সে প্রতিষ্ঠালাভ করতে

পারেনি। আদর্শবাদের সঙ্গে সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধ নেই এই কথাই বোধ করি লেখক বলতে চান।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি গল্প এই পর্যায়ে পড়ে, বাহুল্যবোধে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না। আগেই বলেছি আবার বলতে ক্ষতি নেই, এই পর্যায়ের আদি ও শ্রেষ্ঠ গল্প জাবালি। শুধু তাই নয় মুক্তমতি সংস্কারমুক্ত জাবালি পরশুরামের Symbolic Hero.

আর একটি পর্যায় আছে যার প্রধান ব্যক্তি কেদার চাটুজ্যে। সে বক্তা ও প্রবক্তা দুই-ই। এই পর্যায়ে লম্বকর্ণ, গুরুবিদায়, রাতারাতি স্বয়ংবরা, দক্ষিণরায় ও মহেশের মহাযাত্রা গল্পগুলির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ নিশ্চয় করে বলা কঠিন। শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট অভিযোগে আমরা কোনটিকেই ছাড়তে রাজী নই। ব্যঙ্গ-সমাজচিত্র হিসাবে এই পর্যায়টিকে পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বললে অন্যায় হয় না। প্রত্যেকটি চরিত্র নিখুঁতভাবে, নখদর্পণে বিম্বিত। ঘটনাগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সর্বোপরি কেদার চাটুজ্যের গল্প-ব্যাখ্যান, কি তার তুলনা দেব জানি না। এই বললেই বোধ করি যথেষ্ট হবে যে, একমাত্র কেদার চাটুজ্যেতেই তা সম্ভব। এই গল্পের একটি প্রধান পাত্র লম্বকর্ণকে ভুলি নাই, বংশলোচনবাবুর অনেক অন্ন সে ধ্বংস করেছে এবং গুরুবিদায় গল্পে নিজের কীর্তি দ্বারা সমস্ত অন্নঋণ শোধ করে দিয়েছে।

জটাধর বক্শী সিরিজের তিনটি গল্প। জটাধর বকশী ভণ্ড ও জোচ্চোর। কিন্তু হলে কি হয়, তার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও সপ্রতিভ ভাব তার উপরেই কাউকে রাগ করতে দেয় না। চাঙ্গায়নি সুধা সমূল্যে বিতরণ করে যখন সে সকার্য সিদ্ধি করছে, তখনও তার উপরে রাগ করা অসম্ভব। যখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে সে পকেট মারছে, তখনও মনে হয় যা করছে করুক কেবল আর কিছুক্ষণ কথা বলুক, তার কথাবার্তাতেই চাঙ্গায়নি সুধার উন্মাদক শক্তি বিদ্যমান। ডিকেন্স যে সব প্রতিভাবান জোচ্চোর সৃষ্টি করেছেন, তাদের সঙ্গে বেশ মিলত জটাধর বক্শীর।

মাঙ্গলিক ও গামানুষ জাতির কথা গল্প দুটিতে চরিত্রগুলি ঠিক মানুষ নয়। মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত ব্যক্তি মাঙ্গলিক, তার চোখে পৃথিবীর সমস্তই অদ্ভুত, অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক। গামানুষ জাতির কথা পাত্রগুলি মানুষ নয়, মানুষ বহুকাল আগে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, এরা গোড়ায় ছিল ইঁদুর, এখন

আণবিক রশ্মির প্রভাবে একপ্রকার, অন্য শব্দের অভাবে মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কি বলব, মনুষ্যত্ব লাভ করেছে। এদেরই বিচিত্র ইতিহাস এই গল্পে।

বিশুদ্ধ আদর্শবাদের প্রতি, যে আদর্শবাদ শতকরা একশো ভাগ খাঁটি, পরশুরামের অনুকম্পা মিশ্রিত হাস্যের ভাব আছে। সত্যসন্ধ বিনায়ক, ভবতোষ ঠাকুর, নিধিরামের নির্বন্ধ, অক্রুর সংবাদ, অটলবাবুর অন্তিমচিন্তা ও সিদ্ধিনাথের প্রলাপ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। সত্যসন্ধ বিনায়ক, ভবতোষ ঠাকুর ও নিধিরাম অবিমিশ্র সৎ প্রকৃতির লোক, খাঁটি আদর্শবাদী। কাজেই তাদের পরিণাম দুঃখের। আদর্শবাদ ও পাগলামি যে কোন কোন সময়ে অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, অক্রুর সংবাদ তার একটি উদাহরণ। আবার অনেক সময়ে আদর্শবাদে মানুষকে যে নৈরাজ্যের মধ্যে নিয়ে যায়, অটলবাবুর অন্তিমচিন্তা তার একটি উদাহরণ। মোটকথা এই যে, আদর্শবাদকে পরশুরাম অশ্রদ্ধা করেন না কিন্তু সেই আদর্শবাদ যখন একান্ত হয়ে উঠে কাণ্ডজ্ঞানকে বর্জন করে, তখন তাকে ব্যঙ্গের উপকরণরূপে গ্রহণ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। আদর্শবাদের সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞান মিশ্রিত হলে তবেই তা কার্যক্ষম হয়ে ওঠে। বোধ করি এই তাঁর সুচিন্তিত অভিমত।

॥ ১২ ॥

ব্যঙ্গ-লেখকের কলমের সঙ্গে প্রেমের বড় আড়াআড়ি, দুয়ে মেলে না, কিংবা মিলতে গেলেও তীক্ষ্ণ কলমের ঠোকরে প্রেমে বিকৃতি ঘটে যায়। সুইফট্, বার্নাড শ ও ভলটেয়ার মহা প্রতিভাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মধুর রসের কাহিনী লিখতে পারেন নি। এমন কেন হয় সহজেই অনুমেয়। ব্যঙ্গের চোখ স্বভাবতই জীবনের অপূর্ণতার দিকে নিবদ্ধ আর প্রেমে যেমন জীবনের পূর্ণতার পরিচয় এমন আর কিসে? ও দুয়ে ধর্মের মূলগত প্রভেদ। অন্যপক্ষে লিরিক কবি, প্রেম যাদের প্রধান উপজীব্য তাদের হাতে ব্যঙ্গের কলমের গতি বড় সুষ্ঠু নয়। শেলী, ওয়ার্ডস্বার্থ, রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ। ব্যতিক্রম বায়রণ ও হায়নে। কীটস সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না, কাব্যের কোন ক্ষেত্রে তার যে প্রবেশ অনধিকার ছিল এমন মনে হয় না।

পরশুরামের ব্যঙ্গদৃষ্টি ব্যঙ্গের স্বাভাবিক উপাদানের দিকে নিবদ্ধ হলেও, সৌভাগ্যবশতঃ কখনো কখনো প্রেমের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তার রচিত প্রেমের গল্প সংখ্যায় সামান্য কয়টি, তার উপরে আবার তাতে প্রেমের উন্মাদনা নেই, এমন কি প্রথম নজরে অনেক সময়ে সেগুলি যে প্রেমের গল্প তা খেয়াল হয় না। তবু সেগুলি প্রেমের গল্প ছাড়া আর কিছু নয়, আর এই স্বল্প সংখ্যকের কয়েকটি পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্তর্গত। আনন্দীবাঈ, যশোমতী, রটন্তী-কুমার, চিঠি বাজি, জয়হরির জেব্রা, নীলতারা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গল্পগুলিতে প্রেমের প্রকৃতি আবার এক রকম নয়।

আনন্দীবাঈ গল্পে প্রেম দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে।

যশোমতীতে কিশোর-কিশোরীর প্রণয় দীর্ঘ কাল-সমুদ্র ডুব সাঁতারে পার হয়ে যখন আবার মুখোমুখী হল তখন পাত্র বৃদ্ধা ও পাত্রী বৃদ্ধ ও পিতামহী। তারা একদিন প্রেমকে দেখেছিল পূর্বাচলের তীর থেকে আজ দেখালো অস্তাচলের তীরে এসে, মাঝখানে দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ। তাদের চোখে অস্তাচলের দৃশ্যও কম মনোরম নয়, কেননা তা পলে পলে পুরাতন হয়ে যাওয়ার দুর্ভাগ্য এড়াতে সমর্থ হয়েছে। প্রেমের উত্তাল সমুদ্র এখন তুষারে শুভ্র ও শান্ত, তাই বলে তার সৌন্দর্য অল্প নয়।

রটন্তীকুমারে ধনী পাত্রের সঙ্গে দরিদ্র পাত্রীর কোর্টশিপ বড় নিপুণভাবে, বড় সুকুমারভাবে, বড় আত্মসম্মান রক্ষা করে অঙ্কিত হয়েছে।

চিঠিবাজিতে পাত্রপাত্রী পরস্পরকে পরীক্ষা করে নিয়েছে। এ প্রেম একটু Intellectual, তাই বলে Emotion-এ কমতি পড়েনি। দু'জনের বাসরের সংলাপটুকু পড়লেই আর সন্দেহ থাকে না।

নীলতারাতে পথভ্রান্ত প্রেম শেষ পর্যন্ত স্বস্থানে এসে মিলিত হয়েছে।

জয়হরির জেব্রা প্রায় Taming of the Shrew। অদৃষ্টের আঘাতে বেতসী খঞ্জিনী হয়েছে। ঐটুকুর প্রয়োজন ছিল খঞ্জ জয়হরির অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার জন্যে।

গল্পগুলি প্রেমের নিঃসন্দেহ, তবে সে-সব গল্পে যে মামুলী উপাদান ও মনস্তত্ত্বের প্যাঁচ থাকে তা একেবারেই নেই, মানব স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে। এগুলিও পরশুরামের দক্ষিণ হস্তের রচনা, তবে মননের রেখা গভীর নয়, রঙটাও হাল্কা।

॥ ১৩ ॥

আর কয়েকটি গল্প আছে যাদের কোন বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না, তবু তাদের মধ্যে যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভূষণ পাল ও দাঁড়কাগ গল্প দুটিতে প্রচ্ছন্ন অশ্রুর আভাস বিদ্যমান। পরশুরামে প্রচ্ছন্ন অশ্রু বিরল বলেই গল্প দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামা নামান্তরে তমিস্রা নামান্তরে দাঁড়কাগ বা কৌয়া দিদি নিজের রূপহীনতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এ বিষয়ে কোন মেয়ে সচেতন অর্থাৎ নিঃসন্দেহ হলে তার মন বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হতে বাধ্য, চরাচরের ষড়যন্ত্রেই এমনটি হয়েছে বলে তার নিশ্চিত বিশ্বাস। কৌয়াদিদি কিন্তু ঐ বিশ্বাসের ফাঁদে পা দেয়নি, বিদ্বেষকে নিজের বিরুদ্ধে আরোপ করে নিজেকে নিয়ে সে ঠাট্টা করতে পারে। এ কাজ যে পারে তাকে আহত করা কঠিন। কৌয়াদিদি অশ্রুকে জমিয়ে আইসক্রীমে পরিণত করেছে, তার উপরে হাসির সূর্যকিরণ পড়ে বড় মনোহর দেখাচ্ছে।

ভূষণ পাল এমনি আর একটি প্রচ্ছন্ন অশ্রু (অনতিপ্রচ্ছন্ন) কাহিনী। খুনী আসামী ফাঁসির বলি। এমন লোকের মধ্যেও যে মহত্ত্ব থাকতে পারে এখানে সেটাই অত্যন্ত সহজে দেখানো হয়েছে। অপটু লেখকের হাতে পড়লে চোখের জলের ঢেউ বয়ে যেতো, এখানে গোটা দুই চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মাত্র শ্রুত হয়েছে।

কৃষ্ণকলি গল্পে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য কোন প্রকার অশ্রু থাকবার কথা নয়, তবু প্রচ্ছন্ন অশ্রুর তালিকায় গল্পটির নাম লিখতে ইচ্ছা করে। গল্পটি শিউলি ফুলের মতো সুকুমার ও স্পর্শকাতর, এর মধ্যে কোথায় যেগল্প বুদ্ধি বুঝতে অক্ষম। শিউলি ফুলে যদি শিশিরের আভাস থাকে, তবে এ গল্পটিতেও অশ্রুর আভাস আছে।

॥ ১৪ ॥

সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে অনেক গূঢ়ার্থ ব্যঙ্গ মন্তব্য পরশুরামের বিভিন্ন গল্পে ছড়ানো আছে সত্য, কিন্তু সরাসরি বিষয়টি নিয়ে লিখিত গল্পের সংখ্যা বেশি নয়। দুই সিংহ, রামধনের বৈরাগ্য, বটেশ্বরের অবদান ও দ্বান্দ্বিক কবিতা গল্প কয়টিকে সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয় বলা যেতে পারে।

দুই সিংহ সাহিত্যিকের আত্মম্ভরিতায় হাস্যকর। রামধনের বৈরাগ্য এক

শ্রেণীর সাহিত্যিকের মনোভাব সম্বন্ধে এবং বটেশ্বরের অবদান এক শ্রেণীর পাঠকের উপরে সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে ব্যঙ্গচিত্র। দ্বান্দ্বিক কবিতা এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের পরিণাম সম্বন্ধীয় সরস বিবরণ।

১৯২২-এ প্রথম গল্প প্রকাশের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরশুরামের যে গল্প-ধারা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বাঙালীর সামাজিক পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত। গড্ডলিকা ও কজ্জলীর গল্পগুলিতে চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর আগেকার সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র। তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অশান্তি, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভ ও তৎপরবর্তী অশান্ত অবস্থা রামরাজ্য, শোনা কথা, বালখিল্যগণের উৎপত্তি, গগন চটি, মাৎস্য ন্যায়, ভীম গীতা প্রভৃতি গল্পে চিত্রিত। কালান্তরে অবস্থান্তর ব্যঙ্গ রসিকের দৃষ্টি এড়ায় নি।

পর্যায়ক্রমে আলোচিত গল্পগুলির বাইরে এমন অনেকগুলি গল্প আছে যা পরশুরামের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে। লক্ষ্মীর বাহন, পরশপাথর, বরনারীবরণ, বদন চৌধুরীর শোকসভা, চিকিৎসা-সঙ্কট, ভুশণ্ডির মাঠে, কচি-সংসদ, বিরিঞ্চি-বাবা, কাশীনাথের জন্মান্তর প্রভৃতি ব্যঙ্গরসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

॥ ১৫ ॥

এবারে উপসংহার। আমাদের যা বক্তব্য প্রবন্ধ মধ্যে নানা প্রসঙ্গে তা কথিত হয়েছে। উপসংহারে সেই সব পুরোনো কথা দু-একটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রধান কথাটা এই যে, ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে পরশুরামের একমাত্র দোসর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। রচনার পরিমাণ, শ্রেণীভেদ ও বৈচিত্র্যে ত্রৈলোক্য-নাথ বোধ করি পরশুরামের উপর। আবার রচনার সূক্ষ্মতায়, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায়, বুদ্ধির অনুশীলনে পরশুরামের শ্রেষ্ঠতা। কঙ্কাবতীর মত উপন্যাস পরশুরাম লেখেন নি। কঙ্কাবতী উপন্যাসখানিকে অবলম্বন করলে ত্রৈলোক্যনাথের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। পরশুরামের ক্ষেত্রে সেরকম কোন অবলম্বন নেই, অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশটি গল্পকে গ্রহণ না করলে তাঁর মোটামুটি পরিচয় লাভ সম্ভব নহে। গল্পলেখকের পক্ষ এ এক মস্ত অসুবিধে। দুজনেই উচ্চ-পটীয়ান স্রষ্টা, তবে দুয়ে প্রভেদ আছে। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা, পরশুরামের প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ঘেঁষা, ব্যতিক্রম দুই ক্ষেত্রেই আছে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির উদ্ভব ও পরিবেশ গ্রামাঞ্চল, পরশুরামের কলকাতা শহর। এ ক্ষেত্রেও ব্যাতিক্রম আছে।

উদ্ভব ও পরিবেশের ভেদে দুজনের গল্পের বিষয়, মনোভাবে ও টেকনিকে ভেদ ঘটেছে। পরশুরামের অসুবিধে এই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলকে তিনি জানেন না বললেই হয়। না জানুন তাতে ক্ষতি নেই, কলকাতা শহরের অনেক পথঘাটও বিভিন্ন অঞ্চলকে সাহিত্যে তিনি স্থায়ীভাবে চিত্রিত করে গিয়েছেন, সেই সব চিত্রে পাঠক বাস্তবের অতিরিক্ত কিছু পায়, ফলে কলকাতা শহর ব্যঙ্গের তির্যক-ছটায় কিছু পরিমানে সত্যতর হয়ে ওঠে। আজ একশো বছরের উপরে বাঙালী সাহিত্যিকগণ কলকাতা শহরকে সাহিত্যের মানচিত্রে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রধান সাহিত্যিকত্রয় মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তেমন কোন মন দেননি। তাঁদের রচনায় বাংলা দেশের পল্লীঅঞ্চলে সত্যতর হয়ে উঠেছে। ডিকেন্স লণ্ডন শহরের জন্য যা করেছেন, কলকাতা শহরের জন্যে এখনও কেউ তা করেন নি। কলকাতা শহরের ডিকেন্স এখনও ভবিতব্যের গর্ভে। পরশুরামের রচনায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে এ চেষ্টা আছে। তিনি প্রতিভায়, পরিচয়ে ও স্বভাবে Urban বা নাগরিক। সেই জন্য তাঁর রচনা ত্রৈলোক্যনাথের চেয়ে অনেক বেশী মার্জিত, অনুশীলিত ও ভব্যতাযুক্ত। অন্যপক্ষে সৃষ্টির প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ত্রৈলোক্যনাথে বেশী। তবে দুজনকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে না করে পরিপূরক মনে করাই অধিকতর সংগত। তাঁদের রচনাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও নগরপ্রধান কলকাতা শহরকে যেন একত্রে পাওয়া যায়। এ একটা মস্ত সৌভাগ্য। সুবল গড়গড়ি ও জাবালি যতই ভিন্নস্তরের ব্যক্তি হোক এক জায়গায় দুজনের মিল আছে। একজন হৃদয় দিয়ে, অপরজন বুদ্ধি দিয়ে সংসারকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কেউই স্থিতাবস্থাকে স্বীকার করে নেন নি। এদের দুজনকে ব্যঙ্গ রসিকদ্বয় Symbolic Hero বলেছে, ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের পাঠকের সম্মুখে এনে দিয়ে আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করলাম।

॥ ১৬ ॥

রাজশেখর বসু স্বনামে অনেকগুলি বই লিখেছেন। তার মধ্যে প্রধান চলন্তিকা অভিধান এবং রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ।

সুখের বিষয় বাংলা ভাষায় অতিকায় অভিধানের অভাব নেই, তৎসত্ত্বেও চলন্তিকা অপরিহার্য। প্রথম কারণ, এর আয়তন বিভীষিকা ব্যঞ্জক নহে, যে

সব শব্দ সাহিত্যে ও সংলাপে নিত্য চলে চলন্তিকা তারই সংযোগ। দ্বিতীয় কারণ, বাংলাভাষা, বানান ও বানানচিহ্নে অরাজকতার মধ্যে একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা আছে। তৃতীয় কারণ, পরিশিষ্টে প্রদত্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরিভাষা সংকলন। প্রধানতঃ এই তিনটি কারণে সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের পক্ষে অর্থাৎ সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্র এবং প্রুফ-রিডারদের পক্ষে চলন্তিকা অপরিহার্য সঙ্গী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সুবলচন্দ্র মিত্র, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিধানের স্থান আলমারীতে, চলন্তিকার স্থান লেখার টেবিলের উপরে। অভিধানের পক্ষে এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর কি হতে পারে জানি না। শুধু এই বইখানা লিখলেই রাজশেখর বসু বাংলা ভাষায় স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

কোন বৃহৎগ্রন্থের সংক্ষেপণ একপ্রকার নিষ্ঠুর কার্য। সে গ্রন্থ আবার যদি মহৎ হয়, তবে এই নিষ্ঠুরতা প্রত্যবায়ের পর্যায়ে পৌছতে পারে, কিন্তু রাজশেখর বসু প্রত্যবায়গ্রস্ত হননি তার কারণ রামায়ণ মহাভারত তথা প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার প্রেরণাতেই তিনি রামায়ণ মহাভারতকে নবকলেবর দান করেছেন। মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ, কাজেই এখানে কার্যটি দুষ্কর হয়নি। মূল কাহিনীকে সহজ বাহ্য আকারে তিনি লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন। মহাভারতের ক্ষেত্রে তাঁর চেষ্টা তর্কাতীত নয়।

কাহিনী, উপকাহিনী, উপদেশ ও অনুশাসনে গঠিত মূল মহাভারতে লক্ষাধিক শ্লোক। এ হেন তিমিঙ্গিল মহাগ্রন্থকে আটশ পৃষ্ঠার মধ্যে আনয়ন অসম্ভব বলেই মনে করতাম, যদি না রাজশেখর বসু হাতেকলমে তা সম্পন্ন করতেন। তার এ কাজ তর্কাতীত না হতে পারে, তবে আদৌ যে সম্ভব হয়েছে তাই বিস্ময়কর। যাই হোক এই দুই অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থকে সহজায়ত্ত করে দিয়ে তিনি বাঙালীর মহৎ উপকার সাধন করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ইলিয়ডের মত ক্লাসিক গ্রন্থকে মূলভাষায় পাঠ করার প্রয়োজন সব সময়ে হয় না, সকলের পক্ষে তো কখনই হয় না, এদের মহত্ত্ব এমন আন্তরিক যে ভাষান্তরে পাঠ করলেও তার স্বাদ লাভ করতে পারে পাঠকে। এই ভাবেই এই সব কাব্য চিরকাল পরিজ্ঞাত হয়ে আসছে। রাজশেখর বসু প্রদত্ত নবকলেবর সেই পরিজ্ঞপ্তির বিস্তারসাধন করে বাঙালী পাঠকের সম্মুখে আর একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছে।

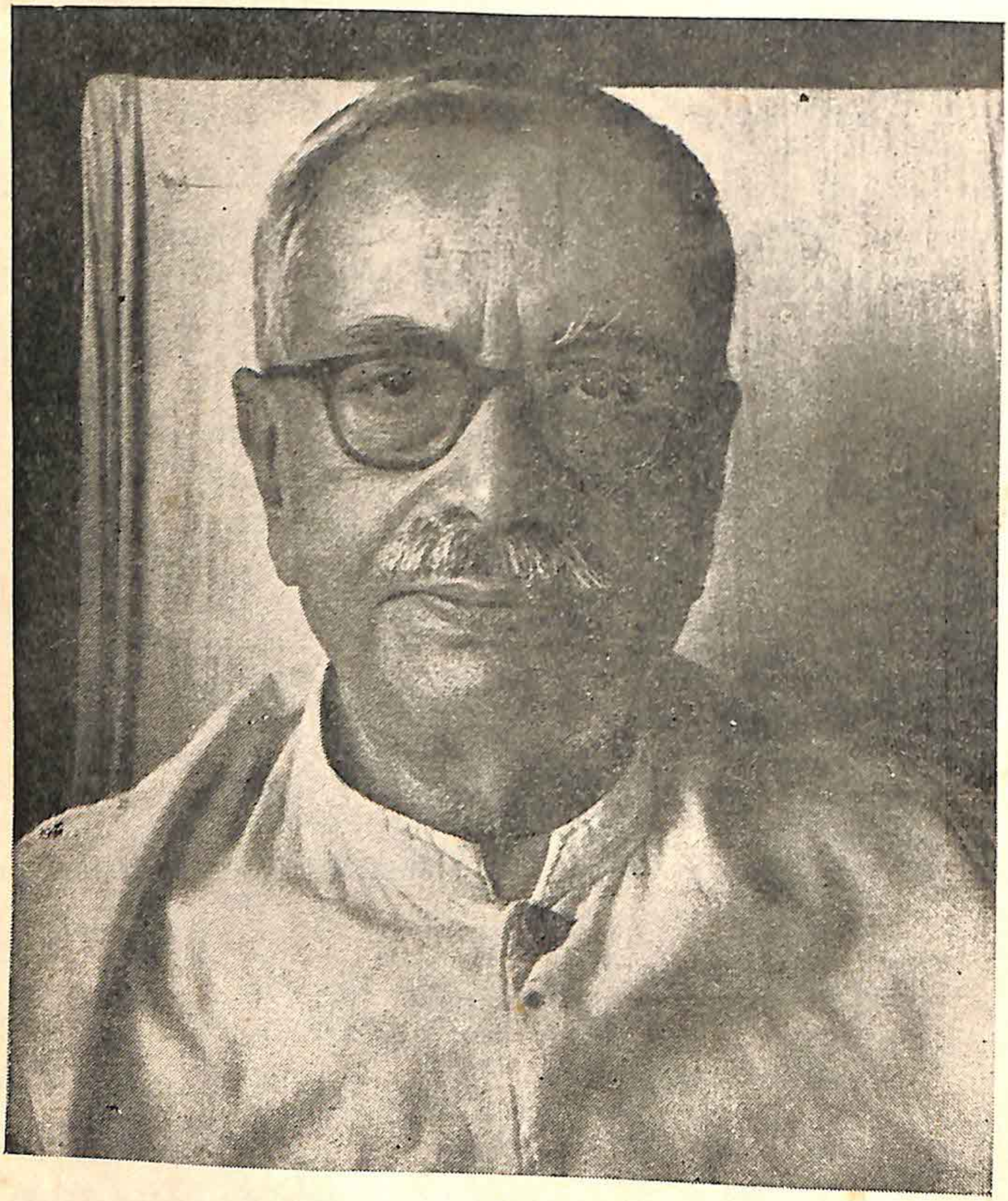
———

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

যতীন্দ্রকুমার সেন চিত্রিত

আলোকচিত্র: অমৃতময় মুখোপাধ্যায়



রাজশেখর বসু

—জন্ম—
১৮ই মার্চ, ১৮৮০

—মৃত্যু—
২৭শে এপ্রিল, ১৯৬০

রাঃ বঃ (২য়)

কজ্জলী

বিরিঞ্চি বাবা



চৌদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেনের মেসটি ছোট কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কারণ ম্যানেজার নিবারণ মাষ্টার খুব আমুদে লোক হইলেও সব দিকে তার কড়া নজর আছে। মেসের অধিবাসী পাঁচ-ছয়জন মাত্র এবং সকলেরই অবস্থা ভাল। বসিবার জন্য একটি আলাদা ঘর, তাতে ঢালা ফরাশ এবং অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র, দাবা, তাস, পাশা ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম, কতকগুলি মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সজ্জিত আছে। কাল হইতে পূজার বন্ধ, সেজন্য মেসের অনেকে দেশে চলিয়া গিয়াছে। বাকী আছে কেবল নিবারণ ও পরমার্থ। ইহারা কোথাও যাইবে না, কারণ দুজনেরই শ্বশুরবাড়ির সকলে কলিকাতায় আসিতেছেন।

নিবারণ কলেজে পড়ায়। পরমার্থ ইনশিওরান্সের দালালি, হঠযোগ এবং থিয়সফির চর্চা করে। আজ সন্ধ্যায় মেসের বৈঠকখানায় ইহারা দুইজন এবং পাশের বাড়ির নিতাইবাবু আড্ডা দিতেছেন। নিতাইবাবু নিত্যই এখানে আসেন। তাঁর একটু বয়স হইয়াছে, সেজন্য মেসের ছোকরার দল তাঁকে একটু সমীহ করে, অর্থাৎ পিছন ফিরিয়া সিগারেট খায়।

নিতাইবাবু বলিতেছিলেন—'চিত্তে সুখ নেই দাদা। ঝি-বেটী

পালিয়েছে, খুকীটার জ্বর, গিন্নী খিটখিট করছেন, আপিসে গিয়েও যে দু-দণ্ড ঘুমুব তার জো নেই, নতুন ছোট-সায়েব ব্যাটা যেন চরকি ঘুরছে।'

পরমার্থ বলিল—'কেন আপনাদের আপিসে তো বেশ ভাল ব্যবস্থা আছে।'

নিতাই। সেদিন আর নেই রে ভাই। ছিল বটে মেকেঞ্জি সায়েবের আমলে। বরদা-খুড়োকে জান তো? শ্যামনগরের বরদা মুখুজ্যে। খুড়ো ছুটোর সময় আফিম খেতেন, আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ঘুমুতেন। আমরা সবাই পালা ক'রে টিফিনঘরে গড়িয়ে নিতুম, কিন্তু খুড়ো চেয়ার ছাড়তেন না। একদিন হয়েছে কি—লেজার ঠিক দিতে দিতে যেমনি পাতার নীচে পৌঁছেছেন অমনি ঘুম এল। নড়ন-চড়ন নেই, নাক-ডাকা নেই, ঘাড় একটু ঝুঁকল না, লেজার টোটালের জায়গায় হাতের কলমটি ঠিক ধরা আছে। অসাধারণ ক্ষমতা—দূর থেকে দেখলে কে বলবে খুড়ো ঘুমোচ্ছে। এমন সময় মেকেঞ্জি সায়েব ঘরে এল, সকলে শশব্যস্ত। সায়েব খুড়োর কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ ক'রে খুড়োর কাঁধে একটি চিমটি কাটলে। খুড়ো একটু মিটমিটিয়ে চেয়েই বিড়বিড় ক'রে আরম্ভ করলে—সাঁইত্রিশের সাত নাবে তিনে-কত্তি তিন। সায়েব হেসে বললে—হ্যাভ এ কাপ অফ টী বাবু। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সংসারে ঘেন্না ধ'রে গেছে। একটি ভাল সাধু-সন্ন্যাসী পাই তো সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

পরমার্থ। জগন্নাথ-ঘাটে আজ একটি সাধুকে দেখে এলুম—আশ্চর্য ব্যাপার। লোকে তাঁকে বলে মিরচাইবাবা। তিনি কেবল লঙ্কা খেয়ে থাকেন,—ভাত নয়, রুটি নয়, ছাতু নয়—শুধু লঙ্কা। লক্ষ লক্ষ লোক ওষুধ নিতে আসছে, একটি ক'রে লঙ্কা মন্ত্রপূত ক'রে দিচ্ছেন, তাই খেয়ে সব ভাল হয়ে যাচ্ছে। শুনেছি তাঁর আবার

যিনি গুরু আছেন, তাঁর সাধনা আরও উঁচু দরের। তিনি খান স্রেফ করাতের গুঁড়ো।

নিতাই। ওহে মাষ্টার, তুমি তো ফিলোজফিতে এম, এ, পাস করেছ—লঙ্কা, করাতের গুঁড়ো, এ সবের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কি বল তো? তোমার পাখোয়াজ বন্ধ কর বাপু, কান ঝালাপালা হ'ল।



তিনে-কত্তি-তিন

নিবারণ প্রথমে একটা মাসিক পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। তাতে যে পাঁচটি গল্প আছে তার প্রত্যেকের নায়িকা এক-একটি সতী-সাধ্বী বারাঙ্গনা। অবশেষে নিবারণ পত্রিকাটি ফেলিয়া দিয়া একটা পাখোয়াজ কোলে লইয়া মাঝে মাঝে বেতালা চাঁটি মারিতেছিল। নিতাইবাবুর কথায় বাজনা থামাইয়া বলিল—'ও সব হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার মার্গ। যেমন জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ,—তেমনি মিরচাইমার্গ, করাতমার্গ, লবণমার্গ, একাদশী-মার্গ, গোবরমার্গ, টিকিমার্গ, দাড়িমার্গ, স্ফটিকমার্গ, কাগমার্গ—'

নিতাই। কাগমার্গ কি রকম?

নিবারণ। জানেন না? গেল বছর হরিহর ছত্রের মেলায় গিয়েছিলুম। এক জায়গায় দেখি একটা প্রকাণ্ড বাঁশের খাঁচায় শ-দুই কাগ ঝামেলা করছে। পাশে একটা লোক হাঁকছে—দো-দো আনে কৌয়ে, দো-দো আনে। ভাবলুম বুঝি পেশোয়ারী কি মুলতানী কাগ হবে, নিশ্চয় পড়তে জানে। একটা ধাড়ি-গোছ কাগের কাছে গিয়ে শিস দিয়ে বললুম—পড়ো ময়না, চিত্রকোট কি ঘাট পর—সীতারাম—রাধাকিষন বোলো—চুচ্চুঃ। ব্যাটা ঠোকরাতে এল। কাগ-ওলা বললে—বাবু কৌয়া নহি পঢ়তা। তবে কি করে বাপু? কাগের মাংস তো শুনতে পাই তেতো, লোকে বুঝি সুক্ত বানাবার জন্যে কেনে? বললে—তাও নয়। এই কাগ খাঁচায় কয়েদ রয়েছে, দু-দু আনা খরচ ক'রে যতগুলি ইচ্ছে কিনে নিয়ে জীবকে বন্ধনদশা হ'তে মুক্তি দাও, তোমারও মুক্তি হবে। ভাবলুম মোক্ষের মার্গ কি বিচিত্র! অন্য লোকে মুক্তি পাবে তাই এই গরিব কাগ-ওলা বেচারা নিজের পরকাল নষ্ট করছে। একেই বলে conservation of virtue. একজন পাপ না করলে আর একজনের পুণ্য হবার জো নাই।

এই সময় একটি হ্যাটকোটধারী বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে ঘরে আসিয়া পাখার রেগুলেটার শেষ পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া হ্যাটটি আছড়াইয়া ফেলিয়া ফরাশের উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। এর নাম সত্যব্রত, সম্প্রতি লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া কাজকর্মের চেষ্টা দেখিতেছে। সত্যব্রত হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—'ওঃ কি মুশকিলেই পড়া গেছে!'

সত্য প্রায়ই মুশকিলে পড়িয়া থাকে, সেজন্য তার কথায় কেহ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল না। অগত্যা সে আপন মনে বলিতে লাগিল—'সমস্ত দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, বিকেলে যে একটু ফুর্তি করব তারও জো নেই। ভাবলুম আজ ম্যাটিনিতে সীতা দেখে

আসি। অমনি পিসিমা ব'লে বসলেন—সতে, তুই ব'কে যাচ্ছিস, আমার সঙ্গে চল্, সাণ্ডেলমশায়ের বক্তৃতা শুনবি। কি করি, যেতে হ'ল। কিন্তু সব মিথ্যে। সাণ্ডেলমশায় বলছেন ধর্মজীবনের মধুরতা, আর আমি ভাবছি আরসোলা।'

নিতাই। আরসোলা?

সত্য। তিন টন আরসোলা। ফরওয়ার্ড কনট্রাক্ট আছে, নভেম্বর-ডিসেম্বর শিপমেণ্ট, চল্লিশ পাউণ্ড পনর শিলিং টন, সি-আই-এফ হংকং। চায়নায় লড়াই বাধবে কিনা, তাই আগে থাকতে রসদ সংগ্রহ করছে। বড়-সায়েবের হুকুম—এক মাসের মধ্যে সমস্ত মাল পিপে-বন্দী হওয়া চাই। কোত্থেকে পাই বলুন তো? ওঃ, কি বিপদ!

নিতাই। হ্যাঁরে সতে, তুই না বেম্মজ্ঞানী, তোদের না মিথ্যে কথা বলতে নেই?

সত্য। কেন বলতে নেই। পিসিমার কাছে না বললেই হ'ল।

নিবারণ। সতে, তোর সন্ধানে ভাল বাবাজী কি স্বামিজী আছে?

সত্য। ক-টা চাই?

নিতাই। যা যাঃ, ইয়ারকি করিস নি। তোরা মন্ত্রতন্ত্রই মানিস না তা আবার বাবাজী।

সত্য। কেন মানব না। পিসিমার দাঁত কনকন করছিল, খেতে পারেন না, ঘুমুতে পারেন না, কথা কইতে পারেন না, কেবল পিসেমশায়কে ধমক দেন। বাড়িশুদ্ধ লোক ভয়ে অস্থির। পিপারমিণ্ট, আস্পিরিন, মাদুলি, জলপড়া, দাঁতের পোকা বার কো-ও-রি, কিছুতে কিছু হয় না। তখন পিসেমশায় এসা জোর প্রার্থনা আরম্ভ করলেন যে তিন দিনের দিন দাঁত পড়ে গেল।

পরমার্থ চটিয়া উঠিয়া বলিল—'দেখ সত্য, তুমি যা বোঝ না তা

নিয়ে ফাজলামি ক'রো না। প্রার্থনাও যা মন্ত্রসাধনাও তা। মন্ত্র-সাধনায় প্রচণ্ড এনার্জি উৎপন্ন হয় তা মান?'

সত্য। আলবৎ মানি। আর সাক্ষী রাজশাহির তড়িতানন্দ ঠাকুর, কলেজের ছেলেরা যাঁকে বলে রেডিও বাবা। বাবার দুই টিকি, একটি পজিটিভ, একটি নেগেটিভ। আকাশ থেকে ইলেকটিসিটি শুষে নেন। স্পার্ক ঝাড়েন এক-একটি আঠারো ইঞ্চি লম্বা। কাছে এগোয় কার সাধ্য,—সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়ে দেখা করতে হয়।

নিবারণ। নাঃ, মিরচাই বেদান্ত, ইলেকট্রিসিটি এর একটাও নিতাইদার ধাতে সইবে না। যদি কোনও নিরীহ বাবাজী সন্ধানে থাকে তো বল। কিন্তু কেরামতি চাই, শুধু ভক্তিতত্ত্বে চলবে না। কি বলেন নিতাইদা?

পরমার্থ। তবে দমদমায় গুরুপদবাবুর বাগানে চলুন, বিরিঞ্চি-বাবার কাছে।

নিবারণ। আলিপুরের উকিল গুরুপদবাবু? আমাদের প্রফেসর ননির শ্বশুর? তিনি আবার বাবাজী জোটালেন কোথা থেকে? সত্য তুই জানিস কিছু?

সত্য। ননিদার কাছে শুনেছিলুম বটে গুরুপদবাবু সম্প্রতি একটি গুরুর পাল্লায় পড়েছেন। স্ত্রী মারা গিয়ে অবধি ভদ্রলোক একেবারে বদলে গেছেন। আগে তো কিছুই মানতেন না।

নিবারণ। গুরুপদবাবুর আর একটি আইবড় মেয়ে আছে না?

সত্য। বুঁচকী, ননিদার শালী।

নিবারণ। তার পর পরমার্থ, বাবাজীটি কেমন?

পরমার্থ। আশ্চর্য! কেউ বলে তাঁর বয়স পাঁচ শ বৎসর, কেউ বলে পাঁচ হাজার, অথচ দেখতে এই নিতাইদার বয়সী বোধ হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে একটু হেসে বলেন—বয়স ব'লে কোনও বস্তুই নেই। সমস্ত কাল—একই কাল; সমস্ত স্থান—একই

স্থান। যিনি সিদ্ধ তিনি ত্রিকাল ত্রিলোক একসঙ্গেই ভোগ করেন। এই ধর—এখন সেপ্টেম্বর ১৯২৫, তুমি হাবশীবাগানে আছ। বিরিঞ্চিবাবা ইচ্ছে করলে এখনই তোমাকে আকবরের টাইমে আগ্রাতে অথবা ফোর্থ সেঞ্চুরি বি. সি.তে পাটলিপুত্র নগরে এনে ফেলতে পারেন। সমস্তই আপেক্ষিক কি না।

নিবারণ। আইনস্টাইনের পসার একেবারে মাটি?

পরমার্থ। আরে আইনস্টাইন শিখলে কোত্থেকে? শুনেছি বিরিঞ্চিবাবা যখন চেকোস্লোভাকিয়ায় তপস্যা করতেন তখন আইনস্টাইন তাঁর কাছে গতায়াত করত। তবে তার বিদ্যে রিলেটিভিটির বেশী এগোয় নি।

নিতাইবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন--'আচ্ছা, আইনস্টাইনের থিওরিটা কি বল তো?'

পরমার্থ। কি জানেন, স্থান কাল আর পাত্র এরা পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। যদি স্থান কিংবা কাল বদলায়, তবে পাত্রও বদলাবে।

সত্য। ও হ'ল না, আমি সহজ ক'রে বলছি শুনুন। ধরুন আপনি একজন ভারিক্কে লোক, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে গেছেন, তখন আপনার ওজন ২ মন ৩০ সের। সেখান থেকে গেলেন গেঁড়াতলা কংগ্রেস কমিটিতে—সেখানে ওজন হ'ল মাত্র ৫ ছটাক, ফুঁয়ে উড়ে গেলেন।

নিবারণ। ঠিক। জনার্দন ঠাকুর পটলডাঙ্গায় কেনে আড়াই সের আলু, আর মেসে এলেই হয়ে যায় ন-পো।

নিতাই। আচ্ছা পরমার্থ, বিরিঞ্চিবাবা নিজে তো ত্রিকালসিদ্ধ পুরুষ। ভক্তদের কোনও সুবিধে করে দেন কি?

পরমার্থ। তেমন তেমন ভক্ত হ'লে করেন বই কি। এই সেদিন মেকিরাম আগরওয়ালার বরাত ফিরিয়ে দিলেন। তিন দিনের জন্যে তাকে নাইন্টিন ফোর্টিনে নিয়ে গেলেন, ঠিক লড়াইয়ের আগে। মেকিরাম পাঁচ হাজার টন লোহার কড়ি কিনে ফেলল—

ছ টাকা হন্দর। তার পরেই তাকে এক মাস নাইন্টিন নাইন্টিনে রাখলেন। মেকিরাম বেচে দিলে একুশ টাকা দরে। তখন আবার তাকে হাল আমলে ফিরিয়ে আনলেন। মেকিরাম এখন পনর লাখ টাকার মালিক। না বিশ্বাস হয়, অঙ্ক ক'ষে দেখ।

নিতাইবাবু পরমার্থের দুই হাত ধরিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—'পরমার্থ ভাই রে, আমায় এক্ষুনি নিয়ে চল্ বিরিঞ্চিবাবার কাছে। বাবার পায়ে ধ'রে হত্যা দেব। খরচ যা লাগে সব দেব, ঘটি-বাটি বিক্রি ক'রব, গিন্নির হাতে পায়ে ধ'রে সেই দশ ভরির গোটছড়াটা বন্ধক দেব। বাবার দয়ায় যদি হপ্তাখানেক নাইন্টিন ফোর্টিনে ঘুরে আসতে পারি, তবে তোমায় ভুলব না পরমার্থ। টেন পারসেণ্ট—বুঝলে? হা ভগবান, হায় রে লোহা!'

নিবারণ। গুরুপদবাবু কিছু গুছিয়ে নিতে পারলেন?

পরমার্থ। তাঁর ইহকালের কোনও চিন্তাই নেই। শুনেছি বিষয় সম্পত্তি সমস্তই গুরুকে দেবেন।

নিবারণ। এতদূর গড়িয়েছে? হ্যাঁরে সত্য, তোর ননিদা, তোর বউদি, এঁরা কিছু বলছেন না?

সত্য। ননিদাকে তো জানই, হ্যালা-খ্যাপা লোক, নিজের এক্সপেরিমেণ্ট নিয়েই আছেন। আর বউদি নিতান্ত ভালমানুষ। ওঁদের দ্বারা কিছু হবে না। কিছু করতে হয় তো তুমি আর আমি। কিছু দেরি নয়।

নিবারণ। তবে এক্ষুনি ননির কাছে চল্। ব্যাপারটা ভাল ক'রে জেনে নিয়ে তার পর দমদমায় যাওয়া যাবে।

নিতাইবাবু কাগজ পেনসিল লইয়া লোহার হিসাব কষিতেছিলেন। দমদমা যাওয়ার কথা শুনিয়া বলিলেন—'তোমরাও বাবার কাছে যাবে নাকি? সেটা কি ভাল হবে? এত লোক গিয়ে আবদার করলে বাবা ভড়কে যেতে পারেন। সত্যটা একে বেম্ম তায় বিশ্ববকাট, ওর গিয়ে লাভ নেই। কেন বাপু, তোদের অমন খাসা

ব্রাহ্মসমাজ রয়েছে, সেখানে গিয়ে হত্যে দে না, আমাদের ঠাকুর-দেবতার ওপর নজর দিস কেন? আমি বলি কি, আগে আমি আর পরমার্থ যাই। তার পর আর একদিন না হয় নিবারণ যেয়ো।'

নিবারণ। না না, আপনার কোনও ভয় নেই, আমরা মোটেই আবদার করব না, শুধু একটু শাস্ত্রালাপ করব। সুবিধে হয় তো কাল বিকেলেই সব একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

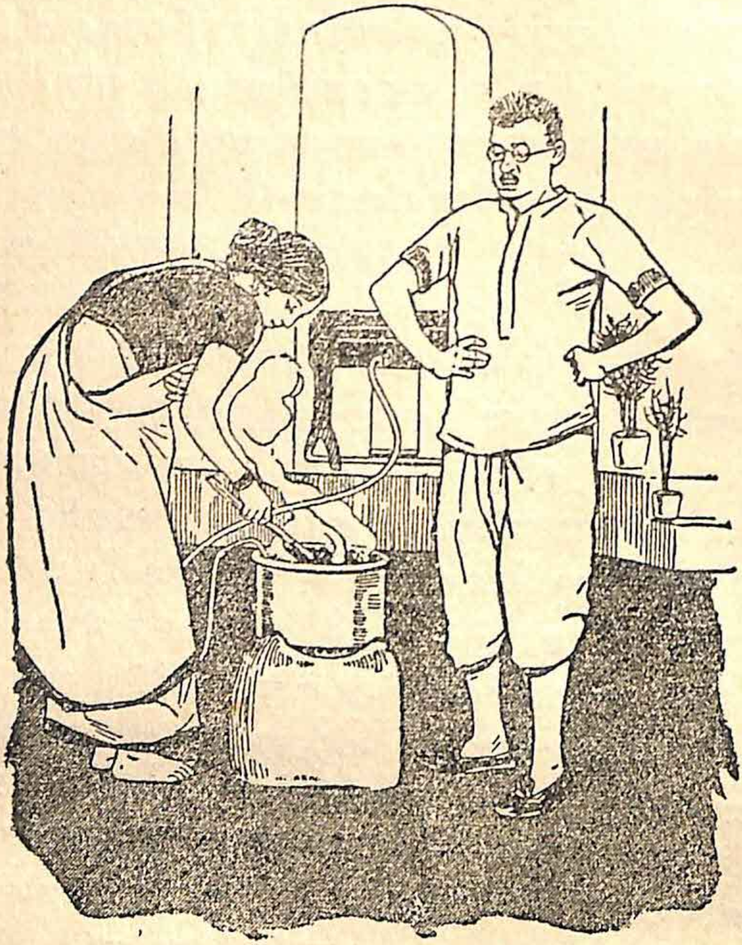
প্রফেসার ননি কোনও কালে প্রফেসারি করে নাই, কিন্তু অনেকগুলি পাস করিয়াছে। সে বাড়িতে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া থাকে, সেজন্য বন্ধুবর্গ তাকে প্রফেসার আখ্যা দিয়াছে। রোজগারের চিন্তা নাই, কারণ পৈতৃক সম্পত্তি কিছু আছে। ননি গুরুপদবাবুর জামাতা, সত্যব্রতের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা এবং নিবারণের ক্লাসফ্রেণ্ড।

নিবারণ ও সত্যব্রত যখন ননির বাড়িতে পৌঁছিল তখন রাত্রি আটটা। বাহিরের ঘরে কেহ নাই, চাকর বলিল বাবু এবং বহুমা ভিতরের উঠানে আছেন। নিবারণ ও সত্য অন্দরে গিয়া দেখিল উঠানের এক পাশে একটি উনানের উপর প্রকাণ্ড ডেকচিতে সবুজ রঙের কোনও পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে, ননির স্ত্রী নিরুপমা তাহা কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে। পাশের বারান্দায় একটা হারমোনিয়াম আছে, তাহা হইতে একটা রবারের নল আসিয়া ডেকচির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রফেসার ননি মালকোঁচা মারিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নিবারণ বলিল—'একি বউদি, এত শাগের ঘণ্ট কার জন্যে রাঁধছেন?'

নিরুপমা বলিল—'শাক নয়, ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে। ওঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো।'

নিবারণ। সেদ্ধ হচ্ছে? কেন, ননির বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না?



কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে

ননি বলিল—'নিবারণ, ইয়ারকি নয়। পৃথিবীতে আর অন্নাভাব থাকবে না।'

নিবারণ। সকলেই তো প্রফেসার ননি বা রোমন্থক জীব নয় যে ঘাস খেয়ে বাঁচবে।

ননি। আরে ও কি আর ঘাস থাকবে? প্রোটিন সিন্থেসিস হচ্ছে ঘাস হাইড্রোলাইজ হয়ে কার্বোহাইড্রেট হবে। তাতে

ছুটো অ্যামিনো-গ্রুপ জুড়ে দিলেই ব্যস্। হেক্সা-হাইড্রক্সি-ডাই-অ্যামিনো—

নিবারণ। থাক, থাক। হারমোনিয়ামটা কি জন্যে?

ননি। বুঝলে না? অক্সিডাইজ করবার জন্যে। নিরু, হারমোনিয়ামটা বাজাও তো।

নিরুপমা হারমোনিয়ামের পেডাল চালাইল। সুর বাহির হইল না, রবারের নল দিয়া হাওয়া আসিয়া ডেকচির ভিতর বগবগ করিতে লাগিল।

নিবারণ। শুধুই ভুড়ভুড়ি! আমি ভাবলুম বুঝি সংগীতরস রবারের নল ব'য়ে ঘাসের সঙ্গে মিশে সবুজ-অমৃতের চ্যাঙড় সৃষ্টি করবে। যাক—বউদি, বাবার খবর কি বলুন তো।

নিরুপমা ম্লানমুখে বলিল—'শোনেন নি কিছু? মা যাওয়ার পর থেকেই কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। গণেশমামা কোথা থেকে এক গুরু জুটিয়ে দিলেন, তাঁকে নিয়েই একেবারে তন্ময়। বাহ্যজ্ঞান নেই বললেই হয়, কেবল গুরু গুরু গুরু। অনেক কান্নাকাটি করেছি কোনও ফল হয় নি। শুনছি টাকাকড়ি সবই গুরুকে দেবেন। বুঁচকীটার জন্যেই ভাবনা। তার কাছেই গিয়ে থাকতুম্, কিন্তু শাশুড়ীর অসুখ, এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারছি না।'

সত্য বলিল—'আচ্ছা ননি-দা, তুমি তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে পার?'

ননি। তা কখনও পারি? শ্বশুরমশায় ভাববেন ব্যাটা সম্পত্তির লোভে আমার ধর্মকর্মের ব্যাঘাত করতে এসেছে।

সত্য। তবে হুকুম দাও, প্রহারেণ ধনঞ্জয় ক'রে দিই।

নিরুপমা। না না, জুলুম যদি কর তবে সেটা বাবার ওপরেই পড়বে। বাবাকে কষ্ট না দিয়ে যদি কিছু করতে পার তো দেখ।

সত্য। বড় শক্ত কথা। আচ্ছা বউদি, বিরিঞ্চিবাবার ব্যাপারটা কি রকম বলুন তো।

নিরুপমা। ব্যাপার প্রায় মাসখানেক থেকে চলছে। দমদমার বাগানে আছেন, সঙ্গে আছে তাঁর চেলা ছোট-মহারাজ কেবলানন্দ। গণেশমামা খিদমত করছেন। বাবা দিনরাত সেখানেই পড়ে আছেন। রোজ দু-তিন-শ ভক্ত গিয়ে ধরা দিচ্ছে, বিরিঞ্চিবাবার অদ্ভুত কথাবার্তা শোনবার জন্যে হাঁ করে আছে। প্রতি রবিবার রাত্রে হোম হচ্ছে, তা থেকে এক-এক দিন এক-একটি দেবতার আবির্ভাব হচ্ছে। কোনও দিন রামচন্দ্র, কোনও দিন ব্রহ্মা, কোনও দিন যিশু, কোনও দিন শ্রীচৈতন্য। যাকে-তাকে হোমঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না, যারা খুব বেশী ভক্ত তারাই যেতে পারে। ব্রহ্মা বেরনোর দিন আমি ছিলুম।

সত্য। কি রকম দেখলেন ?

নিরুপমা। আমি কি ছাই ভাল ক'রে দেখেছি ? অন্ধকার ঘরে হোমকুণ্ডুর পিছনে আবছায়ার মত প্রকাণ্ড মূর্তি, চারটে মুণ্ডু, লম্বা লম্বা দাড়ি। আমার তো দেখেই দাঁতে দাঁত লেগে ফিট হ'ল। গণেশমামা ঘর থেকে টেনে বার ক'রে দিলেন। বুঁচকীর বরং সাহস আছে, প্রায়ই দেখছে কি না। কাল নাকি মহাদেব বারহবেন।

নিবারণ। কাল একবার আমরা বিরিঞ্চিবাবার চরণ দর্শন ক'রে আসি, যদি তাঁর দয়া হয় তবে কপালে হয়তো মহাদেব দর্শনও হবে।

নিরুপমা। গণেশমামাকে বশ করুন, তিনি হুকুম না দিলে হোমঘরে ঢুকতে পাবেন না।

নিবারণ। সে আমি ক'রে নেব। কিন্তু সতে, তোকে নিয়ে যেতে সাহস হয় না, তোর মুখ বড় আলগা, তুই হেসে ফেলবি।

সত্য তার সমস্ত দেহ নাড়িয়ে বলিল—'কখ্‌খনো নয়, তুমি দেখে নিও, হাসে কোন্ শা—ইল্ !'

নিবারণ। ও কি, জিব বার করলি যে ?

সত্য। বেগ ইওর পার্ডন বউদি, খুব সামলে নিয়েছি। পিসীমার কাছে ব'লে ফেললে রক্ষে থাকত না।

নিবারণ। তবে আজ আমরা চলি। হ্যাঁ, ভাল কথা। ননি, এমন কিছু বলতে পার যাতে খুব ধোঁয়া হয় ?

ননি। কি রকম ধোঁয়া ? যদি লাল ধোঁয়া চাও তবে নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যাণ্ড তামা, যদি বেগনী চাও তবে আয়োডিন ভেপার, যদি সবুজ চাও—

নিবারণ। আরে না না। প্লেন ধোঁয়া চাই।

ননি। তা হ'লে ট্রাই-নাইট্রো-ডাই-মিথাইল—

নিবারণ কান চাপিয়া বলিল—'আবার আরম্ভ করলে রে! বউদি, এটাকে নিয়ে আপনার চলে কি ক'রে ?'

নিরুপমা হাসিয়া বলিল—'মামার বাড়িতে দেখেছি গোয়ালঘরে ভিজে খড় জ্বালে, খুব ধোঁয়া হয়।'

নিবারণ। ইউরেকা! বউদি, আপনিই নোবেল প্রাইজ পাবেন, ননেটার কিছু হবেনা।

নিরুপমা। ধোঁয়া দিয়ে করবেন কি ?

নিবারণ। ছুঁচোর উপদ্রব হয়েছে, দেখি তাড়াতে পারি কি না।

গুরুপদবাবুর দমদমার বাগানবাড়ি পূর্বে বেশ সুসজ্জিত ছিল, কিন্তু তাঁর পত্নী গত হওয়া অবধি হতশ্রী হইয়াছে। সম্প্রতি বিরিঞ্চিবাবার অধিষ্ঠানহেতু বাড়িটি মেরামত করানো হইয়াছে এবং জঙ্গলও কিছু কিছু সাফ হইয়াছে, কিন্তু পূর্বের গৌরব ফিরিয়া আসে নাই। গুরুপদবাবু সংসারের কোনও খবর রাখেন না, তাঁর শ্যালক গণেশই এখন সপরিবারে আধিপত্য করিতেছেন।

বৈকাল পাঁচটার সময় নিবারণ, সত্যব্রত, পরমার্থ এবং নিতাই-বাবু আসিয়া পৌছিলেন। বাড়ির নীচে একটি বড় ঘরে শতরঞ্জি বিছাইয়া ভক্তবৃন্দের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তার একপাশে একটি তক্তাপোশে গদি এবং বাঘের ছাপ-মারা রগের উপর

বিরিঞ্চিবাবার আসন। পাশের ঘরে ভক্ত মহিলাগণের স্থান। বাবাজী এখনও তাঁর সাধনকক্ষ হইতে নামেন নাই। ভক্তের দল উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে এবং মৃদুস্বরে বাবার মহিমা গুঞ্জন করিতেছে। একটি সাহেবী পোশাক পরা প্রৌঢ় ব্যক্তি অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া পা মুড়িয়া বসিয়া আছেন এবং অধীর হইয়া মাঝে মাঝে তাঁর কামানো গোঁফে পাক দিতেছেন। ইনি মিস্টার ও, কে, সেন, বার-অ্যাট-ল। সম্প্রতি কয়লার খনিতে অনেক টাকা লোকসান দিয়া ধর্মকর্মে মন দিয়াছেন।

পরমার্থ ও নিতাইবাবুকে ঘরে বসাইয়া নিবারণ ও সত্যব্রত বাহিরে আসিল এবং বাগানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ফটকের কাছে উপস্থিত হইল। ফটকের পাশেই এক সারি টালি-ছাওয়া ঘর, তাতে আস্তাবল এবং কোচমান, দারোয়ান, মালী ইত্যাদি থাকিবার স্থান।

আস্তাবলের সম্মুখে মৌলবী বছিরুদ্দি একটি ভাঙা বেঞ্চে বসিয়া কোচমান ঝোঁটি মিয়া এবং দারোয়ান ফেকু পাঁড়ের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। মৌলবী সাহেবের নিবাস ফরিদপুর, ইনি গুরুপদ-বাবুর অন্যতম মুহুরী। গুরুপদবাবু ওকালতি ত্যাগ করায় বছিরুদ্দির উপার্জন কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি নিয়মিত মাসহারা পাইয়া থাকেন, সেজন্য প্রায়ই মনিবকে সেলাম করিতে আসেন।

মৌলবী সাহেব ফরিদপুরী উর্দুতে দুনিয়ার বর্তমান দুরবস্থা বিবৃত করিতেছিলেন, কোচমান ও দারোয়ান মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছিল। অদূরে সহিস ঘোড়ার অঙ্গ ডলিতেছে এবং মাঝে মাঝে চঞ্চল ঘোড়ার পেটে সশব্দে থাবড়া মারিয়া বলিতেছে—'আরে ঠহ্‌র যা উল্লু।' সামনের মাঠে একটি স্থূলকায় বিড়াল মুখভঙ্গী করিয়া ঘাস খাইতেছে—প্রত্যহ বিরিঞ্চিবাবার ভুক্তাবশিষ্ট মাছের মুড়া খাইয়া তার গরহজম হইয়াছে।

সত্যব্রত বলিল—'আদাব মৌলবী সাহেব। মেজাজ তো দিব্যি

শরিফ ? পর্‌নাম পাঁড়েজী। কোচমানজী আচ্ছা হ্যায় তো ? এঁকে চেন না বুঝি ? ইনি নিবারণবাবু, জামাইবাবুর দোস্ত। পূজোর জন্যে কিছু ভেট এনেছেন—কিছু মনে করবেন না মৌলবী সাহেব—আপনার দশ টাকা, পাঁড়েজী আর কোচমানজীর পাঁচ-পাঁচ, সহিস মালী এদের আরও পাঁচ।

সৌজন্যে অভিভূত হইয়া বছিরুদ্দি, ফেকু এবং ঝোঁটি দন্তবিকাশ করিয়া বার বার সেলাম করিল এবং খোদা ও কালীমায়ীর নিকট বাবুজীদের তরক্কি প্রার্থনা করিল।

মৌলবী বলিলেন—'আর বাবু-মশায়, সে সব দিন-খ্যান কম্‌নে চলে গেছে মা-ঠাকরোন বেহস্ত্‌ পাওয়া ইস্তক মোদের বাবু-সায়েবের জান্‌ডা কলেজায় নেই। অত ক'রে বললাম, হুজুর অমন পয়্যারডা নষ্ট করবেন না। তা কে শোনে ?—খোদার মর্জি।'

নিবারণ বলিল—'ও বাবাজীটাই যত নষ্টের গোড়া।'

ফেকু পাঁড়ে ভরসা পাইয়া মত প্রকাশ করিল—বিরিঞ্চিবাবা বাবাজী থোড়াই আছেন। তাঁর জনৌ ভি নাই, জটা ভি নাই। তিনি মাছ ভি খান, বকড়ির গোস্ত ভি খান। দোনো সাঁঝ চা-বিস্কুট না হইলে তাঁর চলে না। এ সব বংগালী বাবাজী বিলকুল জুয়াচোর। আর ছোট মহারাজ যিনি আছেন তিনি তো একটি বিচ্ছু, ফেকু পাঁড়েকে পর্যন্ত দংশন করিতে তাঁহার সাহস হয়। তিনি জানেন না যে উক্ত ফেকু পাঁড়ে মিউটিনিমে তলোয়ার খেলায়া থা (যদিও ফেকু তখনও জন্মেন নাই)। একবার যদি মনিব হুকুম দেন, তবে লাঠির চোটে বাবাজীদের হড্ডি চুর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

মৌলবী জানাইলেন যে তাঁকেও কম অপমান সহ্য করিতে হয় নাই। মামাবাবু (গণেশ) যে তাঁর উপর লম্বাই চওড়াই করিবে তা তিনি বরদাস্ত করিবেন না। তিনি খানদানী মনিষ্যি, তাঁর ধমনীতে মোগলাই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। যদিও লোকে তাঁকে বছিরুদ্দি বলে, কিন্তু তাঁর আদত নাম ব্রেদম খাঁ, তাঁর পিতার নাম জাঁহাবাজ খাঁ,

তা হ'লে দেবদর্শন হবে না? নিতান্তই নিরাশ করবেন? আচ্ছা, তবে চললুম।

সত্য। প্রণাম মামাবাবু। হ্যাঁ, একটা কথা—আমি বলি কি, আপনার জামাইটি এখন মাস চার-পাঁচ টাইপরাইটিং শিখুক। একবারে আনাড়ী, তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আমিই সায়েবের কাছে অপদস্থ হব। নেক্‌স্‌ট ভেকান্সিতে বরং চেষ্টা করা যাবে।

গণেশ। আরে না না না। চাকরি একবার ফসকে গেলে কি আর সহজে মেলে? না সত্য, লক্ষ্মী বাবা আমার, চাকরিটি ক'রে দিতেই হবে।—হ্যাঁ—কি বলছিলে? তুমি এখন গীতা-টিতা প'ড়ে থাক? খুব ভাল। তা—হোমঘরে গেলে তেমন দোষ হবে না। একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে যেয়ো—দুজনেই। আচ্ছা—তা হ'লে জামাইটির কথা ভুলো না।

গণেশ-মামা তফাতে গেলে নিবারণ বলিল—'এখন পর্যন্ত তো বেশ আশাজনক বোধ হচ্ছে, শেষ রক্ষা হলেই হয়। অমূল্য, হাবলা এরা সব এসেছে?

সত্য। হ্যাঁ, তারা দরবারে রয়েছে। ঠিক সময় হাজির হবে। আচ্ছা নিবারণদা, মামাবাবুর কিছু খবর আছে নাকি?

নিবারণ। ভগবান জানেন। গুরুপদবাবু যত দিন সংসারে নির্লিপ্ত থাকেন, মামাবাবুর তত দিনই সুবিধে।

বিরিঞ্চিবাবা সভা অলংকৃত করিয়া বসিয়াছেন। তাঁর চেহারাটি বেশ লম্বা-চওড়া, গৌরবর্ণ মুণ্ডিত মুখ, সুপুষ্ট গালের আড়াল হইতে দুইটি উজ্জ্বল চোখ উঁকি মারিতেছে। দু-পয়সা দামের শিঙাড়ার মত সুবৃহৎ নাক, মৃদু হাস্যমণ্ডিত প্রশস্ত ঠোঁট, তার নীচে খাঁজে খাঁজে চিবুকের স্তর নামিয়াছে। স্বামীগিরির উপযুক্ত মূর্তি। অঙ্গে গৈরিকরঞ্জিত আলখাল্লা, মস্তকে ঐরূপ কান-ঢাকা টুপি।

বয়স ঠিক পাঁচ হাজার বলিয়া বোধ হয় না, যেন পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন। বাবার বেদীর নীচে ডান-দিকে ছোটমহারাজ কেবলানন্দ বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার বয়স কয় শতাব্দী তাহা ভক্তগণ এখনও নির্ণয় করেন নাই, তবে দেখিতে বেশ জোয়ান বলিয়াই মনে হয়। ইনিও গুরুর অনুরূপ বেশধারী, তবে কাপড়টা সস্তাদরের। বেদীর নীচে বাঁ-দিকে শীর্ণকায় গুরুপদবাবু বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া অর্ধশয়িত অবস্থায় আছেন, জাগ্রত কি নিদ্রিত বুঝিতে পারা যায় না। পাশের ঘরে মহিলাগণের প্রথম শ্রেণীতে একটি সতর-আঠার বছরের মেয়ে লাল শাড়ির উপর এলোচুল মেলিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে গুরুপদবাবুর দিকে করুণ নয়নে চাহিতেছে। সে বুঁচকী, গুরুপদবাবুর কনিষ্ঠ কন্যা। ভক্তবৃন্দের অনেকে সটান লম্বা অবস্থায় উপুড় হইয়া যুক্তকর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া পড়িয়া আছেন। অবশিষ্ট সকলে হাতজোড় করিয়া পা ঢাকিয়া বাবার বচনামৃত পানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন।

সত্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভক্তমণ্ডলীর ভিতরে বসিয়া পড়িল। নিবারণ ছোট-মহারাজের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে বিরিঞ্চিবাবার পা জড়াইয়া ধরিল। বাবা প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন— 'চেনা চেনা বোধ হচ্ছে!'

নিবারণ। অধমের নাম নিবারণচন্দ্র।

বিরিঞ্চি। নিবারণ? ও, এখন বুঝি তোমার ওই নাম? কোথা যেন দেখেছি তোমায়,—নেপালে? উঁহু, মুরশিদাবাদে। তোমার মনে থাকবার কথা নয়। জগৎশেঠের কুঠিতে, তার মায়ের শ্রাদ্ধের দিন! অনেক লোক ছিল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রায়-রায়ান জান্‌কীপ্রসাদ, নবাবের সিপাহ্‌-সলার খান-খানান মহব্বৎ জং, সুতোনুটির আমিরচন্দ্‌—হিস্ট্রিতে যাকে বলে উমিচাঁদ। তুমি শেঠজীর খাজাঞ্চী ছিলে, তোমার নাম ছিল—রোস—মোতিরাম। উঃ, শেঠজী খুব

খাইয়েছিল, কেবল সুতোনুটির বাবুদের পাতে মণ্ডা কম পড়ে, তারা গালাগাল দিয়ে চলে যায়। তা মোতিরাম, উঁহু—নিবারণচন্দ্র, তুমি ধূর্জটিমন্ত্র জপ করতে শেখ, তাতে তোমার সুবিধে হবে। রোজ ভোরে উঠেই একশ-আট-বার বলবে—ধূর্জটি—ধূর্জটি—ধূর্জটি, খুব তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, এখন ব'স গিয়ে।

নিবারণ পুনরায় পায়ের ধুলা লইল এবং তাহা চাটিবার ভান করিয়া ভক্তদের মধ্যে গিয়া বসিল।

নিতাইবাবু চুপি চুপি পরমার্থকে বলিলেন—'ব্যাপার দেখলে? নিবারণটা আসবামাত্র বাবার নজরে প'ড়ে গেল, আর আমি-ব্যাটা দেড় ঘণ্টা হাঁ ক'রে ব'সে আছি। একেই বলে বরাত। এইবার একবার উঠে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরব, যা থাকে কপালে।'

যাঁরা ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়া ছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি স্থূলকায় বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর পরিধানে মিহি জরিপাড় ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া সরু সোনার হার দেখা যাইতেছে। ইনি বিখ্যাত মুৎসদ্দী গোবর্ধন মল্লিক, সম্প্রতি তৃতীয়পক্ষ ঘরে আনিয়াছেন। গোবর্ধনবাবু আস্তে আস্তে উঠিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—'বাবা, প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ এর কোন্‌টা ভাল?'

বাবা ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন—'ঠিক ঐ কথা তুলসীদাস আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমরা আহার গ্রহণ করি। কেন করি? ক্ষুধা পায় ব'লে। কি আহার করি? অন্নব্যঞ্জন ফলমুল মৎস্য মাংসাদি। আহার করলে কি হয়? ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। ক্ষুধা একটা প্রবৃত্তি, আহারে তার নিবৃত্তি। অতএব ভোগের মূল হচ্ছে প্রবৃত্তি, ভোগের ফল হচ্ছে নিবৃত্তি। তুলসী ছিল সন্ন্যাসী। আমি বল্‌লুম—বাপু, ভোগ না হ'লে তোমার নিবৃত্তি হবে না। তার রামায়ণ লেখা শেষ হ'লে তাকে রাজা মানসিংহ ক'রে দিলুম। অনেক বিষয়-সম্পত্তি করেছিল, কিন্তু কিছুই রইল না। তার ব্যাটা

জগৎসিংহ বাঙালীর মেয়ে বে ক'রে সমস্ত উড়িয়ে দিলে। বঙ্কিম তার বইএ সে-কথা আর লেখে নি।'

ব্যারিস্টার ও কে· সেন বলিলেন—'ওআওারফুল!'

নিতাইবাবু আর থাকিতে পারিলন না। ছুটিয়া গিয়া বাবার সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন,—'দয়া কর প্রভু!'

বাবা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'কি চাই তোমার?'

নিতাইবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—'নাইন্টিন ফোর্টিন।'

সত্যব্রতের একটা মহৎ রোগ—সে হাসি সামলাইতে পারে না। সে নিজে বেশ গম্ভীর হইয়া পরিহাস করিতে পারে, কিন্তু অপরের মুখে অদ্ভুত কথা শুনিলে তার গাম্ভীর্যরক্ষা কঠিন হয়। হাস্য দমনের জন্য সত্য একটি মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিয়া থাকে। গুরুজনদের সমক্ষে হাসির কারণ উপস্থিত হইলে সে কোনও ভয়াবহ অবস্থার কল্পনা করে। তবে সব সময় তাতে উপকার হয় না।

বিরিঞ্চিবাবা বলিলেন—'নাইন্টিন ফোর্টিন? সে কি?'

নিবারণ চুপি চুপি বলিল—'ওআন-নাইন-ওআন-ফোর, ক্যালকাটা। নো রিপ্লাই? ট্রাই এগেন মিস।'

সত্যব্রত ধ্যান করিতে লাগিল—ছুতার মিস্ত্রী তার পিঠের উপর রঁদা চালাইতেছে। চোকলা চোকলা চামড়া উঠিয়া যাইতেছে। ওঃ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা!

নিতাইবাবু বলিলেন—'সাতটি দিনের জন্যে আমায় লড়ায়ের আগে নিয়ে যান বাবা, সস্তায় লোহা কিনব—দোহাই বাবা!'

বিরিঞ্চি। তোমার কি করা হয়?

নিতাই। আজ্ঞে ভলচার ব্রাদার্সের আপিসে লেজার-কিপার, কুল্লে দেড়-শ টাকা মাইনে, সংসার চলে না।

বিরিঞ্চি। ষড়ৈশ্বর্য সস্তায় হয় না বাপু, কঠোর সাধনা চাই। মূলাধারচক্রে ঠেলা দিয়ে কুলকুণ্ডলিনীকে আজ্ঞাক্রমে আনতে হবে, তার পর তাকে সহস্রার পদ্মে তুলতে হবে। সহস্রারই হচ্ছেন সূর্য।

এই সূর্যকে পিছু হাঁটাতে হবে। সূর্যবিজ্ঞান আয়ত্ত না হ'লে কাল-স্তম্ভ করা যায় না। তাতে বিস্তর খরচ—তোমার কম্ম নয়। তুমি আপাতত কিছুদিন মার্তণ্ডমন্ত্র জপ কর। ঠিক দুপ্‌পুর বেলা সূর্যের দিকে চেয়ে একশ-আটবার বলবে—মার্তণ্ড-মার্তণ্ড-মার্তণ্ড,—খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু খবরদার, চোখের পাতা না পড়ে, জিব জড়িয়ে না যায়,—তা হ'লেই মরবে।

নিতাইবাবু বিরস বদনে ফিরিয়া আসিলেন।

বিরিঞ্চিবাবা বলিলেন—'ধন-দৌলত সকলেই চায়, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে পড়া চাই। এই নিয়েই তো যিশুর সঙ্গে আমার ঝগড়া। যিশু বলত, ধনীর কখনও স্বর্গরাজ্য লাভ হবে না। আমি বলতুম—তা কেন? অর্থের সদ্‌ব্যবহার করলেই হবে। আহা বেচারা বেঘোরে প্রাণটা খোয়ালে।'



'মাই ঘড!'

মিষ্টার সেন সবিস্ময়ে বলিলেন—'এক্স্‌কিউজ মি প্রভু, আপনি কি জিসস ক্রাইস্টকে জানতেন?'

বিরিঞ্চি। হাঃ হাঃ, যিশু তো সেদিনকার ছেলে।

মিষ্টার সেন। মাই ঘড!

সত্যের কানের ভিতর গঙ্গাফড়িং, নাকের ভিতরে গুবরে পোকা-কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে।

মিস্টার সেন নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইনি তা হ'লে গৌটামা বুড্‌ঢাকেও জানতেন ?'

নিবারণ। নিশ্চয়। গৌতম বুদ্ধ কোন্ ছার, প্রভু মনু-পরাশরের সঙ্গে এক ছিলিমে গাঁজা খেতেন। সব্বার সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল। ভগীরথ, টুটেন খামেন, নেবু-চাড-নাজার, হাম্মুরাব্বি, নিওলিথিক ম্যান, পিথেকান্‌থোপস ইরেক্টস, মায় মিসিং লিংক্।

মিষ্টার সেন চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—'মাঃই !'

সাতটা বাঘ সত্যর পিছনে তাড়া করিয়াছে। সামনে তিনটা ভালুক থাবা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিরিঞ্চিবাবা কহিলেন—'একবার মহাপ্রলয়ের পর বৈবস্বত আমায় বললে—নীললোহিত কল্পে কি ? না, শ্বেতবরাহ কল্প তখন সবে শুরু হয়েছে। বৈবস্বত বললে—মানুষ তো সৃষ্টি করলুম, কিন্তু ব্যাটারা দাঁড়াবে কোথা, খাবে কি ?—চারিদিকে জল থই থই করছে। আমি বললুম—ভয় কি বিবু, আমি আছি, সূর্যবিজ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে। সূর্যের তেজ বাড়িয়ে দিলুম, চোঁ ক'রে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধনধান্যে ভরে উঠল। চন্দ্র-সূর্য চালাবার ভার আমারই ওপর কিনা।'

মিষ্টার সেন কেবল মুখব্যাদান করিলেন।

সত্য মরিয়া গিয়াছে। পঞ্জাব মেলের সঙ্গে দার্জিলিং মেলের কলিশন—রক্তারক্তি—পিসীমা—

কিছুতেই কিছু হইল না। পুঞ্জীভুত হাসি সত্যব্রতের চোখ নাক মুখ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে তখন নিরুপায় হইয়া বিপুল চেষ্টায় হাসিকে কান্নায় পরিবর্তিত করিল এবং দু-হাতে মুখ ঢাকিয়া ভেউ ভেউ করিয়া উঠিল।

বিরিঞ্চিবাবা বলিলেন—'কি হয়েছে, কি হয়েছে—আহা, ওকে আসতে দাও আমার কাছে।'

সত্য নিকটে গিয়া বলিল—'উদ্ধার কর বাবা, মানবজন্মে ঘেন্না ধ'রে গেছে। আমায় হরিণ ক'রে সেই ত্রেতা যুগে কণ্ব মুনির আশ্রমে ছেড়ে দাও বাবা! অর্থ চাই না, মান চাই না, স্বর্গও চাই না। শুধু চাট্টি কচি ঘাস, শকুন্তলার নিজের হাতে ছেঁড়া। আর এক জোড়া শিং দিও প্রভু, দুষ্মন্তটাকে যাতে গুঁতিয়ে দিতে পারি।'

নিবারণ বেগতিক দেখিয়া বলিল—'ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবা। বিস্তর শোক পেয়েছে কিনা।'

ঘড়িতে সাতটা বাজিল। দৈনিক পদ্ধতি অনুসারে এই সময় বিরিঞ্চিবাবা হঠাৎ তুরীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি চক্ষু বুঁজিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন, কেবল তাঁর ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়িতে লাগিল। মামাবাবু, চেলা-মহারাজ এবং দুইজন ভক্ত বাবার শ্রীবপু চ্যাংদোলা করিয়া সাধনকক্ষে লইয়া গেলেন। সভা আজকার মত ভঙ্গ হইল। ভক্তগণ ক্রমশ বিদায় হইতে লাগিলেন।

নিতাইবাবু বলিলেন—'বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর! এ রকম বাবাজী আমার পোষাবে না। ক্যামতা যদি থাকে তবে দু-চারটে নমুনা দেখা না বাপু। তা নয়, সত্যযুগে কি করেছিলেন তারই ব্যাখ্যান। চল পরমার্থ, সাতটা কুড়ির ট্রেন এখনও পাওয়া যাবে। নিবারণ আর সতেটার খোঁজে দরকার নেই। তারা নিজের নিজের পথ দেখবে। দেখ পরমার্থ, কাল নাহয় মিরচাই-বাবার কাছেই নিয়ে চল।'

সত্যব্রত বুঁচ্কীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল—'দেখুন, একটু চা খাওয়াতে পারেন? নিবারণ-দাও আসবে এখনই। ওঃ, গলাটা বড্ড চিরে গেছে।'

বুঁচকী বলিল—'চিরবে না?—যা চেঁচাচ্ছিলেন! জল চড়িয়ে

দিচ্ছি, বসুন একটু। আচ্ছা, আমার বাবার সামনে কি কাণ্ডটা করলেন বলুন তো? কি ভাববেন তিনি?'

সত্য মনে মনে বলিল, তোমার বাবা তো বেহুঁশ ছিলেন। প্রকাশ্যে বলিল—'একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছি নয়? ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, আর কখ্খনো অমন হবে না। আপনার বাবার কাছে মাপ চেয়ে তাঁকে খুশী ক'রে তবে বাড়ি ফিরব।'

বুঁচকী। বাবার আবার খুশি-অখুশি। বেঁচে আছেন এই পর্যন্ত, কে কি করছে বলছে তা জানতেও পারছেন না।

সত্য। থাকবে না, এমন দিন থাকবে না। আপনি দেখে নেবেন।—ওই যে, নিবারণ-দা আসছেন।

রাত ন-টা। হোম আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তের দল পূর্বেই বিদায় হইয়াছে। হোমঘরে আছেন কেবল বিরিঞ্চিবাবা, গুরুপদবাবু, বুঁচ্‌কী, মামাবাবু, নিবারণ, সত্যব্রত এবং গোবর্ধনবাবু। ইনি একজন বিশিষ্ট ভক্ত, বাবার জন্য তেতলা আশ্রম নির্মাণ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। হোমঘরটি ছোট, দরজা-জানালা প্রায় সমস্তই বন্ধ, প্রবেশের পথ মামাবাবু আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ছোট মহারাজ, অর্থাৎ কেবলানন্দ, বাবার নৈশ আহার চরু প্রস্তুত করিবার জন্য অন্যত্র ব্যস্ত আছেন। ঘরে একটি মাত্র ঘৃতপ্রদীপ মিটমিট করিতেছে। বিরিঞ্চিবাবা যোগাসনে ধ্যানমগ্ন, সম্মুখে হোমকুণ্ড। পিছনে গুরুপদবাবু ও তাঁর কন্যা উপবিষ্ট। তাঁহাদের এক পাশে নিবারণ ও সত্যব্রত, অপর পাশে গোবর্ধনবাবু বসিয়া আছেন।

অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বিরিঞ্চিবাবা কোষ হইতে জল লইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিলেন। ঘৃতপ্রদীপ নিবিয়া গেল। হোমাগ্নির শিখা নাই, কেবল কয়েক খণ্ড অঙ্গার আরক্ত হইয়া আছে। বিরিঞ্চিবাবা তখন মুখের উপর হাত কাঁপাইয়া ভীষণ গালবাদ্য আরম্ভ করিলেন। সেই গম্ভীর বু-বু-বু-বু নিনাদে ক্ষুদ্র গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল।

সত্যব্রত বুঁচকীর কানে কানে বলিল—'বুঁচু, ভয় করছে।' বুঁচ্‌কী বলিল—'না।'

সহসা হোমকুণ্ড হইতে নীলাভ অগ্নিশিখা নির্গত হইল। সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকে সকলে দেখিলেন—মহাদেবই তো বটে!—হোমকুণ্ডের পশ্চাতে ব্যাঘ্রচর্মধারী হাড়মালাবিভূষিত পিনাকডমরু-পাণি ধবলকান্তি দস্তুরমত মহাদেব।

গুরুপদবাবু নির্বাক নিশ্চল। গোবর্ধন মল্লিক তাঁর কারবার এবং তৃতীয়পক্ষ সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগ করুণ স্বরে দেবাদিদেবকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। গণেশমামা শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—যেটি তাঁর ছোট মেয়ে মহাকালী-পাঠশালায় শিখিয়াছে।

নিবারণ সত্যব্রতকে চুপিচুপি বলিল—'এইবার।' সত্যব্রত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—'বম্ বাবা মহাদেব!'

একটু পরে হঠাৎ বাহিরে একটা কলরব উঠিল। তারপর চিৎকার করিয়া কে বলিল—'আগ লাগা হ্যায়।'

বিরিঞ্চিবাবার গালবাদ্য থামিল। তিনি চঞ্চল হইয়া ইতস্তত চাহিতে লাগিলেন। মামাবাবু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে গেলেন।

'আগুন—আগুন—বেরিয়ে আসুন শিগ্‌গির।' ঘন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘরে ঢুকিতে লাগিল। বিরিঞ্চিবাবা এক লাফে গৃহত্যাগ করিলেন। গোবর্ধনবাবু চিৎকার করিতে করিতে বাবার পদানুসরণ করিলেন, বুঁচকী পিতার হাত ধরিয়া বলিল—'বাবা বাবা, ওঠ!' নিবারণ কহিল—'এখন যাবেন না, একটু বসুন, কোনও ভয় নেই।'

মহাদেবের টনক নড়িল। তিনি উসখুস করিতে লাগিলেন। নিবারণ একটা বাতি জ্বালিল। মহাদেব পিছনের দরজা দিয়া পলায়নের উপক্রম করিলেন—অমনি সত্যব্রত জাপটাইয়া ধরিল।

মহাদেব বলিলেন—'আঃ ছাড়—ছাড়—লাগে, মাইরি এখন ইয়ারকি ভাল লাগে না—চাদ্দিকে আগুন—ছেড়ে দাও বলছি।''

সত্যব্রত বলিলেন—'আরে অত ব্যস্ত কেন। একটু আলাপ



'আঃ—ছাড়—ছাড়—লাগে'

পরিচয় হ'ক। তারপর ক্যাবলরাম, কদ্দিন থেকে দেবতাগিরি করা হচ্ছে?'

বাহির হইতে দু-চারজন লোক হোমঘরে প্রবেশ করিল। ফেকু

পাঁড়ের জিম্মায় কেবলানন্দকে দিয়া নিবারণ ও সত্যব্রত বিস্ময়-বিমূঢ় গুরুপদবাবু ও তাঁর কন্যাকে বাহিরে আনিল।

বাড়িতে আগুন লাগে নাই। পাশের ঘরে খানিকটা ভিজা খড় কে জ্বালাইয়া দিয়াছিল। দারোয়ান, মৌলবী সাহেব, কোচমান এবং অমূল্য হাবলা প্রভৃতি সত্যব্রতের অনুচরবৃন্দ মিথ্যা হল্লা করিয়াছে।

বিরিঞ্চিবাবা ভাঙেন কিন্তু মচকান না। বলিলেন—'কেমন গুরুপদ, এখন আশা মিটল তো? যে নাস্তিক, তার দিব্যদৃষ্টি হবে কেন? তাই তোমার কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দিলেন না। শেষটায় মানুষের মূর্তি ধ'রে বিদ্রূপ করলেন।'

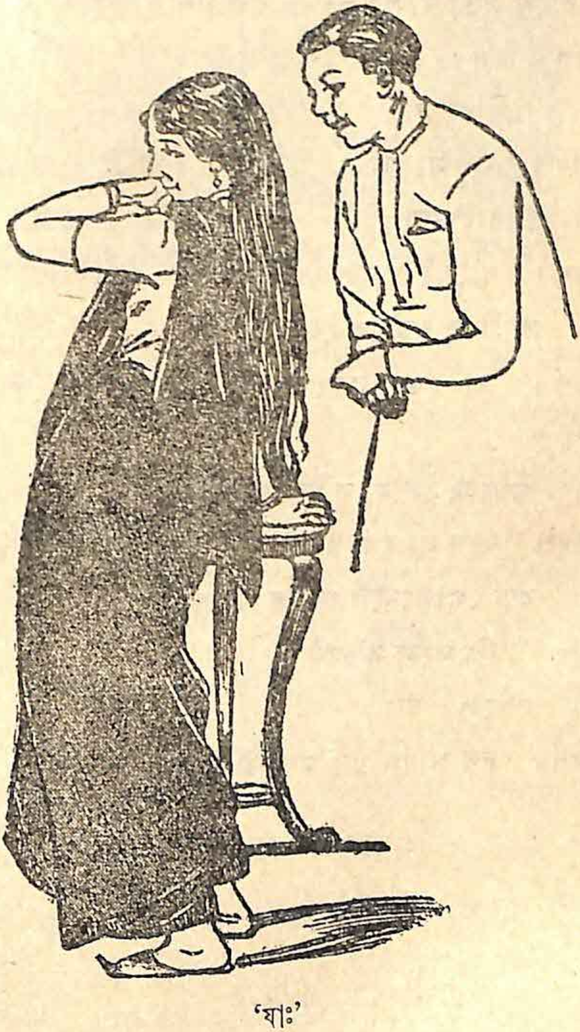
সত্যব্রত বলিল—'বিদ্রূপ ব'লে বিদ্রূপ! মহাদেব প'চে গিয়ে বেরুল ক্যাবলা। বিরিঞ্চিবাবা হয়ে গেলেন জোচ্চোর।'

গোবর্ধনবাবু বলিলেন—'ব্যাটা আমাদের সঙ্গে চালাকি? গোবর্ধন মল্লিক পাঁচটা হৌসের মুচ্ছুদ্দী, বড় বড় ইংরেজ চরিয়ে খায়, —তাকে তুমি ঠকাবে? মারো শালেকো দুই থাবড়া।'

গুরুপদবাবু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বলিলেন—'না না, যেতে দাও, যেতে দাও। সত্য, গাড়িটা জুতিয়ে এঁদের স্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। কেউ যেন কিছু না বলে।'

তল্পিতল্পা গুছানো হইলে সত্য সশিষ্য বিরিঞ্চিবাবাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল। বিদায়কালে বলিল—'প্রভু, তা হ'লে নিতান্তই চললেন? চন্দ্র-সূর্য আপনার জিম্মায় রহিল, দেখবেন যেন ঠিক চলে। দম দিতে ভুলবেন না, আর মধ্যে মধ্যে অয়েল করবেন।

ভিড় কমিলে গুরুপদবাবু বলিলেন—'বাবা নিবারণ, বাবা সত্য, তোমরা আমায় রক্ষা করেছ, এ উপকার আমি ভুলব না। আজ তোমরা এখানেই খাওয়া-দাওয়া ক'রে থাক, অনেক রাত হয়েছে। একি সত্য, তোমার হাতে রক্ত কেন?'



'যাঃ'

সত্য। ও কিছু নয়, ধস্তাধস্তির সময় মহাদেব একটু কামড়ে দিয়েছিলেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বিশ্রাম করুন গিয়ে।

গুরুপদ। তবে তুমি আমার সঙ্গে এস, বুচ্‌কী টিংচার আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দেবে এখন।

*   *   *

আহারান্তে সত্য বলিল—'ওঃ, কি মুশকিলেই পড়া গেছে।'

নিবারণ বলিল—'আবার কি হ'ল রে?'

সত্য। নিবারণ-দা।

নিবারণ। বল্‌ না কি।

সত্য। নিবারণ-দা!

নিবারণ। ব'লেই ফ্যাল্‌ না কি।

সত্য। আমি বুঁচকীকে বে করব।

নিবারণ। তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু তোর সঙ্গে বিয়ে যদি না দেয়?

সত্য। আলবৎ দেবে, বুঁচকীর বাপ দেবে।

নিবারণ। বাপ না হয় রাজী হ'ল, কিন্তু মেয়ে কি বলে?

সত্য। বড় গোলমেলে জবাব দিচ্ছে।

নিবারণ। কি বলে বুঁচকী?

সত্য। বললে—যাঃ।

নিবারণ। দূর গাধা, যাঃ মানেই হ্যাঁ।



ভরতের সঙ্গে বশিষ্ঠাদি যেসকল ঋষিগণ মহিষীগণ ও কুলপতিগণ চিত্রকূট পর্বতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ রাম অটল রহিলেন। অবশেষে মহর্ষি জাবালি বলিলেন—

*'রাম, তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব মাতাপিতা বলিয়া যাহার স্নেহাসক্তি হইয়া থাকে সে উন্মত্ত।....পিতার অনুরোধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম সংকটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সেই সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। সেই এক-বেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন; তিনি অন্য, তুমিও অন্য।....বৎস, তুমি স্ববুদ্ধিদোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে

* বাল্মিকী রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত অনুবাদ।

বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ, কে কোথায় শুনিয়াছে যে মৃতব্যক্তি আহার করিতে পারে?···যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা যজ্ঞ তপস্যা দান প্রভৃতি কার্যের বিধান আছে, ধীমান্ মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেইসকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব রাম, পরলোকসাধন ধর্ম নামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।'

জাবালির কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ধর্মবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক কহিলেন —'তপোধন, আপনি আমার হিতকামনায় যাহা কহিলেন তাহা বস্তুতঃ অকার্য, কিন্তু কর্তব্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আপনার বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক। আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন আমি তাঁহার এই কার্যকে যথোচিত নিন্দা করি। বৌদ্ধ যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডাহ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে। অতএব যাহাকে বেদ-বহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সঙ্গে সম্ভাষণও করিবেন না।···'

জাবালি তখন বিনয়বচনে কহিলেন—'রাম, আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া নাস্তিক হই, আবার অবসরক্রমে আস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল উপস্থিত। এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত এইরূপ কহিলাম, এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহা প্রত্যাহার করিতেছি।'

জাবালির কথা রামায়ণে এই পর্যন্ত আছে। যাহা নাই তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল

মহর্ষি জাবালি ক্লান্তদেহে বিষণ্ণচিত্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমস্ত পথ তাঁহাকে নীরবে অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কারণ অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার সংস্রব প্রায় বর্জন করিয়াই চলিয়াছিলেন। খর্বট খল্লাট খালিত প্রভৃতি কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে দূর হইতে নির্দেশ করিয়া বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

অযোধ্যার বিপ্রগণ কেহই জাবালিকে শ্রদ্ধা করিতেন না। স্বয়ং রাজা দশরথ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া এ পর্যন্ত তাঁহাকে কোনও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু এখন রামচন্দ্র কর্তৃক জাবালির প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে। সহযাত্রী বিপ্রগণের ব্যবহার দেখিয়া জাবালি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তপ্ত তৈলমধ্যে মৎস্যের ন্যায় তাঁহার অযোধ্যায় বাস করা অসম্ভব হইবে।

রামচন্দ্রের উপর জাবালির কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, পরন্তু তিনি রামের ভবিষ্যতের জন্য কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়াছেন। ছোকরার বয়স মাত্র সাতাশ বৎসর, সাংসারিক অভিজ্ঞতা এখনও কিছুমাত্র জন্মে নাই। শাস্ত্রজীবী সভাপণ্ডিতগণ এবং মুনিপুংগব বিশ্বামিত্র—যিনি এককালে অনেক কীর্তি করিয়াছেন—ইঁহারা যেরূপ ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন, সরলস্বভাব রামচন্দ্র তাহাই চরম পুরুষার্থ বোধে গ্রহণ করিয়াছেন। বেচারাকে এর পর কষ্ট পাইতে হইবে। এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে জাবালি অযোধ্যায় নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

নগরের উপকণ্ঠে সরযূতীরে জাবালির পর্ণকুটীর। বেলা অবসান হইয়াছে। গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন অঙ্গনের এক পার্শ্বে পনসবৃক্ষতলে জাবালিপত্নী হিন্দ্রলিনী রাত্রের জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিতেছেন। নদীর পরপারবাসী নিষাদগণ যে মৃগমাংস পাঠাইয়াছিল তাহা শূলপক্ক হইয়াছে, এখন খানকয়েক মোটা মোটা পুরোডাশ সেঁকিলেই রন্ধন শেষ হয়। ইন্দ্রলিনী যবপিণ্ড থাসিতে থাসিতে নানাপ্রকার সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁর এতখানি বয়স হইল, কিন্তু এ পর্যন্ত পুত্রমুখ দেখিলেন না। স্বামীর পুন্নাম নরকের ভয় নাই, পরলোকে পিণ্ডেরও ভাবনা নাই—ইহলোকে দু-বেলা নিয়মিত পিণ্ড পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট। পোষ্যপুত্রের কথা তুলিলে বলেন—পুত্রের অভাব কি, যখন যাকে ইচ্ছা পুত্র মনে করিলেই হয়। কিবা কথার শ্রী! স্বামী যদি মানুষের মতন মানুষ হইতেন তাহা হইলে হিন্দ্রলিনীর অত ক্ষেদ থাকিত না। কিন্তু তিনি একটি সৃষ্টিবহির্ভূত লোক, কাহারও সহিত বনাইয়া চলিতে পারিলেন না। সাধে কি লোকে তাঁকে আড়ালে পাষণ্ড বলে! ত্রিসন্ধ্যা নাই, জপতপ নাই, অগ্নিহোত্র নাই, কেবল তর্ক করিয়া লোক চটাইতে পারেন। অমন যে রামচন্দ্র, ব্রাহ্মণ তাঁকেও চটাইয়াছেন। যতদিন দশরথ ছিলেন, অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নাই। বৃদ্ধ রাজা স্ত্রৈণ ছিলেন বটে, কিন্তু নজরটা তাঁর উচ্চ ছিল। এখন কি হইবে ভবিতব্যতাই জানেন। ভরত তো নন্দিগ্রামে পাদুকাপূজা লইয়া বিব্রত। সচিব সুমন্ত্র এখন রাজকার্য দেখিতেছে; কিন্তু সে অত্যন্ত কৃপণ, ঘোড়ার বল্গা টানিয়া তার সকল বিষয়েই টানাটানি করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। রাজবাটী হইতে যে সামান্য বৃত্তি পাওয়া যায় তাতে এই দুর্মূল্যের দিনে সংসার চলে না। হিন্দ্রলিনী তাঁর বাবার কাছে শুনিয়াছিলেন, সত্যযুগে এক কর্পদকে সাত কলস খাঁটী হৈয়ঙ্গবীন মিলিত, কিন্তু এই দগ্ধ ত্রেতাযুগে তিন কলস মাত্র পাওয়া যায়, তাও ভঁয়ষা। ঘৃতের জন্য জাবালির কিছু ঋণ হইয়াছে, কিন্তু শোধ করার ক্ষমতা

নাই। নীবার ধান্য যা সঞ্চিত ছিল ফুরাইয়া আসিয়াছে, পরিধেয় জীর্ণ হইয়াছে, গৃহে অর্থাগম নাই, এদিকে জাবালি শত্রুসংখ্যা বাড়াইতেছেন। স্বামীর সংসর্গদোষে হিন্দ্রলিনীও অনাচারে অভ্যস্ত হইয়াছেন। অযোধ্যার নিষ্ঠাবতীগণ তাঁহাকে দেখিলে শূকরীর ন্যায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে। হিন্দ্রলিনী আর সহ্য করিতে পারেন না, আজ তিনি আহারান্তে স্বামীকে কিছু কটুবাক্য শুনাইবেন।

অঙ্গনের বাহিরে হুংকার করিয়া কে বলিল—'হংহো জাবালে, হংহো!' হিন্দ্রলিনী ত্রস্ত হইয়া দেখিলেন দশ-বার জন ক্ষুদ্রকায় ঋষি কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের খর্ব বপু বিরল শ্মশ্রু ও স্ফীত উদর দেখিয়া হিন্দ্রলিনী বুঝিলেন তাঁহারা বালখিল্য মুনি।

হিন্দ্রলিনী কহিলেন—'হে মহাতপা মুনিগণ, আমার স্বামী সরযূতটে ধ্যানস্থ আছেন। তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, আপনারা ততক্ষণ ঐ কুটির-অলিন্দে আসন গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করুন।'

বালখিল্যগণের অগ্রণী মহামুনি খর্বট কহিলেন—'ভদ্রে তোমার ঐ অলিন্দ ভূমি হইতে বিতস্তিত্রয় উচ্চ, আমরা নাগাল পাইব না। অতএব এই প্রাঙ্গণেই আসন পরিগ্রহ করিলাম, তুমি ব্যস্ত হইও না।'

জাবালি তখন সরযূতীরে জম্বুবৃক্ষতলে আসীন হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন —এই অন্নজলাবলম্বী মানবশরীরে পঞ্চভূতের কিংবিধ সংস্থান হইলে সুবুদ্ধির উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই বা মূর্খতা জন্মে। অপরন্তু, লাঠ্যৌষধি দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূত প্রকম্পিত করিলে মূর্খতা অপগত হইয়া যে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা স্থায়ী কিনা। এই জটিল তত্ত্বের মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া অবশেষে জাবালি উঠিয়া পড়িলেন এবং আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

জাবালি বালখিল্যগণকে কহিলেন—'অহো, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে খর্বট খালিত প্রভৃতি মহামুনিগণ আমার এই আশ্রমে

সমাগত! হে মুনিবৃন্দ, তোমাদের তো সর্বাঙ্গীণ কুশল? যাগযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে তো? ঋষিভুক্ রাক্ষসগণ তোমাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করে না তো? তোমাদের সেই কপিলা গাভীটির বাচ্চা হইয়াছে? রাজগুরু বশিষ্ঠ তোমাদের জন্য যথেষ্ট গব্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন তো?'

মহামুনি খর্বট দর্দুরধ্বনিবৎ গম্ভীরনাদে কহিলেন—'জাবালে, ক্ষান্ত হও। আপ্যায়নের জন্য আমরা আসি নাই। তুমি পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া আছ, আমরা তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। প্রায়োপবেশন চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা তোমার কিছু হইবে না। আমরা অথর্বোক্ত পদ্ধতিতে তোমাকে অগ্নিশুদ্ধ করিব, তাহাতে তুমি অন্তে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। তুষানল প্রস্তুত, তুমি আমাদের অনুগমন কর।'

জাবালি বলিলেন—হে খর্বট, তোমাদিগকে কে পাঠাইয়াছেন? রাজপ্রতিভূ ভরত, না রাজগুরু বশিষ্ঠ? আমার উদ্ধারসাধনের জন্য তোমরাই বা অত ব্যগ্র কেন? আমি অতি নিরীহ বানপ্রস্থাবলম্বী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, কখনও কাহারও অনিষ্ট করি নাই, তোমাদের প্রাপ্য দক্ষিণারও অংশভাক্ হই নাই। তোমরা আমার পরকালের জন্য ব্যস্ত না হইয়া নিজ নিজ ইহকালের জন্য যত্নবান্ হও।'

তখন অতিকোপনস্বভাব খল্লাট ঋষি অশ্বধ্বনিবৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—'রে তপোধন, তুমি অতি দুরাচার ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক। তোমার বাসহেতু এই অযোধ্যাপুরী অশুচি হইয়াছে, ধর্মাত্মা বিপ্রগণ অতিষ্ঠ হইয়াছেন। আমরা ভরত বা বশিষ্ঠ কাহারও আজ্ঞাবাহী নহি। ব্রাহ্মণ্যের রক্ষাহেতু আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি। তুমি আর বাক্যব্যয় করিও না, প্রস্তুত হও।'

জাবালি বলিলেন—'হে বালখিল্যগণ, আমি স্বেচ্ছায় যাইব না। তোমরা আমাকে ব্রহ্মতেজোবলে উত্তোলন কর।'

জাবালির শালপ্রাংশু বিরাট বপু দেখিয়া বালখিল্যগণ কিয়ৎক্ষণ নিম্নকণ্ঠে জল্পনা করিলেন। অবশেষে গলিতদন্ত খালিত মুনি স্খলিত স্বরে কহিলেন—'হে জাবালে, যদি তুমি অগ্নিপ্রবেশ করিতে নিতান্তই ভীত হইয়া থাক তবে প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ক্রিয়স্বরূপ তিন শূর্প তিল ও শত নিষ্ক কাঞ্চন প্রদান কর। আমরা যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে পাপমুক্ত করিব।'

জাবালি কহিলেন—'আমার এক কপর্দকও নাই, থাকিলেও দিতাম না।'

তখন খর্বট খল্লাট খালিতাদি মুনিগণ সমস্বরে কহিলেন—'রে নরাধম, তবে আমরা অভিসম্পাত করিতেছি শ্রবণ কর। সাক্ষী চন্দ্র সূর্য তারা, সাক্ষী দেবগণ পিতৃগণ দিক্‌পালগণ বষট্‌কারগণ—'

জাবালি বলিলেন—'শৌণ্ডিকের সাক্ষী মদ্যপ, তস্করের সাক্ষী গ্রন্থিচ্ছেদক। হে বালখিল্যগণ, বৃথা দেবতাগণকে আহ্বান করিতেছ, তাঁহারা আসিবেন না। বরং তোমরা জুজুগণ ও কর্ণ-কর্তকগণকে স্মরণ কর।'

হিন্দ্রলিনী বলিলেন—'হে আর্যপুত্র, তুমি কেন এই অল্পায়ু অপোগণ্ড অকালপক্ক কুষ্মাণ্ডগণের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছ, উহাদিগকে খেদাইয়া দাও।'

বালখিল্যগণ কহিলেন—'রে রে রে রে—'

জাবালি তখন তাঁহার বিশাল ভুজদ্বয়ে বালখিল্যগণকে একে একে তুলিয়া ধরিয়া প্রাঙ্গণবেষ্টনীর পরপারে ঝুপ ঝুপ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।

বালখিল্যগণ প্রস্থান করিলে জাবালি বলিলেন—'প্রিয়ে, আমাদের আর অযোধ্যায় বাস করা চলিবে না, কখন কোন্ দিক হইতে উৎপাত আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। অতএব কল্য

প্রত্যুষেই আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে কোনও নিরুপদ্রব স্থানে যাত্রা করিব।'



'রে রে রে রে—'

পরদিন উষাকালে সস্ত্রীক জাবালি অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন। কয়েকজন অনুগত নিষাদ তাঁহাদের সামান্য গৃহোপকরণ বহন করিয়া অগ্রে অগ্রে পথপ্রদর্শনপূর্বক চলিল। মাসাধিক কাল তাঁহারা নানা জনপদ গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিমালয়ের সানুদেশে শতদ্রুতীরে এক রমণীয় উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন।

জাবালি তথায় পর্ণকুটীর রচনা করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পর্বতবাসী কিরাতগণ তাঁহার বিশাল দেহ, নিবিড় শ্মশ্রু ও মধুর সদয় ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং নানাপ্রকার উপঢৌকন দ্বারা সংবর্ধনা করিল। জাবালি তথায় বিবিধ দুরূহ তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধানে নিবিষ্ট রহিলেন এবং অবসরকালে শতদ্রু নদীতে মৎস্য ধরিয়া চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।



দেবতাগণের খ্যাতি আছে—তাঁহারা অন্তর্যামী। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদিগকেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুজবের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয় এবং তাহার ফলে জগতে অনেক অবিচার ঘটিয়া থাকে। অচিরে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট সমাচার আসিল যে মহাতেজা জাবালি মুনি শতদ্রুতীরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন,—তাঁহার অভিসন্ধি কি তাহা এখনও সম্যক্ অবধারিত হয় নাই, তবে সম্ভবতঃ তিনি ইন্দ্রত্ব বিষ্ণুত্ব কিংবা ঐরূপ কোনও একটা

পরমপদ আয়ত্ত না করিয়া ছাড়িবেন না। দেবরাজ চিন্তিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন—'উর্বশীকে ডাক।'

মাতলি আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—'হে দেবেন্দ্র, উর্বশী আর মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে চাহে না—'

ইন্দ্র কহিলেন—'হুঁ, তার ভারি তেজ হইয়াছে।'

দেবর্ষি নারদ কহিলেন—'মর্ত্যের কবিগণই স্তুতি করিয়া তাহার মস্তকটি ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন কিছুকাল তাহাকে বিরাম দাও, দিনকতক অমরাবতীতে আবদ্ধ থাকিলে আপনিই সে মর্ত্যলোকে যাইবার জন্য আবদার ধরিবে। জাবালির জন্য অন্য কোনও অপস্‌রা পাঠাও।'

মাতলি বলিলেন—'মেনকা তার কন্যাকে দেখিতে গিয়াছে। তিলোত্তমাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এখনও তিন মাস বাহির হইতে দিবেন না। অলম্বুষার পা মচকাইয়াছে, নাচিতে পারিবে না। অষ্টাবক্র মুনি দেবগণের উপর বিমুখ হইয়া বাঁকিয়া বসিয়াছেন, রম্ভা তাঁহাকে সিধা করিতে গিয়াছে। নাগদত্তা হেমা সোমা প্রভৃতি তিন শত অপ্সরাকে লঙ্কেশ্বর রাবণ অপহরণ কারিয়াছেন। বাকী আছে কেবল মিশ্রকেশী ও ঘৃতাচী।'

ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'আমাকে না জানাইয়া কেন অপ্সরাদের যত্র তত্র পাঠানো হয়? মিশ্রকেশী ঘৃতাচীর বয়স হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা কিছু হইবে না।'

নারদ বলিলেন—'হে ইন্দ্র, সেজন্য চিন্তা করিও না। জাবালিও যুবা নহেন। একটু গৃহিণী-বাহিনী-জাতীয়া অপ্সরাই তাঁহাকে ভাল-রকম বশ করিতে পারিবে।'

ইন্দ্র বলিলেন—'মিশ্রকেশীর চুল পাকিয়াছে, সে থাক। ঘৃতাচীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর। তাহাকে একপ্রস্থ সূক্ষ্ম চীনাংশুক ও যথোপযুক্ত অলংকারাদি দাও। বায়ু, তুমি মৃদুমন্দ বহিবে। শশধর, তুমি মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া উজ্জ্বল হইয়া লও।

কন্দর্প, তুমি সেই অভ্রের পোশাকটা পরিয়া যাইবে, আবার যাতে ভস্ম না হও। বসন্ত, তুমি সঙ্গে এক শত কোকিল লইবে।'

নারদ বলিলেন—'আর এক শত বন্যকুক্কুট। ঋষি বড়ই মাংসাশা।'

ইন্দ্র বলিলেন—'আচ্ছা, তাহাও লইবে। আর দশ কুম্ভ ঘৃত, দশ স্থালী দধি, দশ দ্রোণী গুড় এবং অন্যান্য ভোজ্যসম্ভার। যেমন করিয়া হউক জাবালির ধ্যান ভঙ্গ করা চাই।'

সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে ঘৃতাচী জাবালিবিজয়ে যাত্রা করিলেন।

জাবালির তপোবনে তখন ঘোর বর্ষা। মেঘে পর্বতে একাকার হইয়া দিগন্তে নিবিড় প্রাচীর রচনা করিয়াছে। শতদ্রুর গৈরিকবর্ণ জলে পালে পালে মৎস্য বিচরণ করিতেছে। বনে ভেকবংশের চতুপ্রহরব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘৃতাচী অনুচরবর্গসহ জাবালির আশ্রমে পৌঁছিলেন। আক্রমণের উদ্‌যোগ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, কারণ বহুবার এইরূপ অভিযান করিয়া তাঁহারা পরিপক্ক হইয়াছেন। নিমেষের মধ্যে মেঘ দূরীভূত হইল, মলয়ানিল বহিতে লাগিল, শতদ্রুর স্রোত মন্দীভূত হইল, নির্মল আকাশে পূর্ণ-চন্দ্র উঠিল, পাদপসকল পুষ্পস্তবকে ভূষিত হইল, অলিকুল গুঞ্জরিতে লাগিল, ভেকগণ নীরব হইয়া পল্বলে লুকাইল।

জাবালি শতদ্রুতীরে ছিপহস্তে নিবিষ্টমনে মাছ ধরিতেছিলেন। আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তিনি বিচলিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। সহসা ঋতুরাজ বসন্তের খোঁচা খাইয়া নিদ্রাতুর কোকিলকুল আকুল চিৎকার করিয়া উঠিল। জাবালি চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা

কটিতটে বামকর, চিবুকে দক্ষিণকর নিবদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতেছে।

ধীমান্ জাবালি সমস্ত ব্যাপারটি চট করিয়া হৃদয়ংগম করিলেন। ঈষৎ হাস্যে বলিলেন—'অয়ি বরাঙ্গনে, তুমি কে, কি নিমিত্তই বা এই দুর্গম জনশূন্য উপত্যকায় আসিয়াছ? তুমি নৃত্য সংবরণ কর। এই সৈকতভূমি অতিশয় পিচ্ছিল ও উপলবিষম। যদি আছাড় খাও তবে তোমার ঐ কোমল অস্থি আস্ত থাকিবে না।'

অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ স্ফুরিত করিয়া ঘৃতাচী কহিলেন—'হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি ঘৃতাচী স্বর্গাঙ্গনা। তোমাকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। এই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার তোমারই। এই ঘৃতকুম্ভ দধিস্থালী গুড়দ্রোণী—সকলই তোমার। আমিও তোমার। আমার যা কিছু আছে—নাঃ থাক।'—এই পর্যন্ত বলিয়া লজ্জাবতী ঘৃতাচী ঘাড় নীচু করিলেন।

জাবালি বলিলেন—'অয়ি কল্যাণি, আমি দীনহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। গৃহিণীও বর্তমানা। তোমার তুষ্টি বিধান করা আমার সাধ্যের অতীত। অতএব তুমি ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া যাও। অথবা যদি তোমার নিতান্তই মুনিঋষির প্রতি ঝোঁক হইয়া থাকে তবে অযোধ্যায় গমন কর। তথায় খর্বট খল্লাট খালিতাদি মুনিগণ আছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা এবং যতগুলিকে ইচ্ছা তুমি হেলায় তর্জনীহেলনে নাচাইতে পারিবে। আর যদি তোমার অধিকতর উচ্চাভিলাষ থাকে তবে ভার্গব দুর্বাসা কৌশিক প্রভৃতি অনলসংকাশ উগ্রতেজা মহর্ষিগণকে জব্দ করিয়া যশস্বিনী হও। আমাকে ক্ষমা দাও।'

ঘৃতাচী কহিলেন—'হে জাবালে, তুমি নিতান্তই নীরস। তোমার ঐ বিপুল দেহ কি বিধাতা শুষ্ক কাষ্ঠে নির্মাণ করিয়াছেন? তুমি দীনহীন তাতে ক্ষতি কি, আমি তোমাকে কুবেরের ঐশ্বর্য আনিয়া দিব। তোমার ব্রাহ্মণীকে বারাণসী প্রেরণ কর। তিনি নিশ্চয়ই লোলাঙ্গী বিগতযৌবনা। আর আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত

কর,—চিরযৌবনা, নিটোলা নিখুঁতা। উর্বশী মেনকা পর্যন্ত আমাকে দেখিয়া ঈর্ষায় ছটফট করে।

জাবালি সহাস্যে কহিলেন—'হে সুন্দরি, কিছু মনে করিও না। তুমিও নিতান্ত খুকীটি নহ। তোমার মুখের লোধ্ররেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্তপঙ্‌ক্তিতে ও কিসের ফাঁক?'

ঘৃতাচী সরোষে কহিলেন—'হে মূর্খ, তুমি নিশ্চয়ই রাত্র্যন্ধ, তাই অমন কথা বলিতেছ। পথশ্রমের ক্লান্তিহেতু আমার লাবণ্য এখন সম্যক্ স্ফূর্তি পাইতেছে না। আগে সকাল হোক, আমি দুধের সর মাখিয়া চান করি, তখন দেখিও, মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবে'—এই বলিয়া ঘৃতাচী আবার নৃত্য শুরু করিলেন।

অদূরবর্তী দেবদারুবৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া জাবালিপত্নী সমস্ত দেখিতেছিলেন। ঘৃতাচীর দ্বিতীয়বার নৃত্যারম্ভে তিনি আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না, সম্মার্জনীহস্তে ছুটিয়া আসিয়া ঘৃতাচীর পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।

তখন কন্দর্প বসন্ত শশধর মলয়ানিল সকলেই মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া বেগে পলায়ন করিলেন। আকাশ আবার জলদজালে আচ্ছন্ন হইল, দিঙ্‌মণ্ডল তিমিরাবৃত হইল, কোকিলকুল ঢুলিতে লাগিল, মধুকরনিকর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিল, শতদ্রু স্ফীত হইল, ভেককুল মহা উল্লাসে বিকট কোলাহল করিয়া উঠিল।

জাবালি পত্নীকে কহিলেন—'প্রিয়ে, স্থিরা ভব। ইনি স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী, ইন্দ্রের আদেশে এখানে আসিয়াছেন—ইহার অপরাধ নাই।'

হিন্দ্রলিনী কহিলেন—'হলা দগ্ধাননে নির্লজ্জে ঘেঁচী, তোর আস্পর্ধা কম নয় যে আমার স্বামীকে বোকা পাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছিস! আর, ভো অজ্জউত্ত, তোমারই বা কি প্রকার আক্কেল যে এই উৎকপালী বিড়ালাক্ষী মায়াবিনীর সহিত বিজনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলে!'

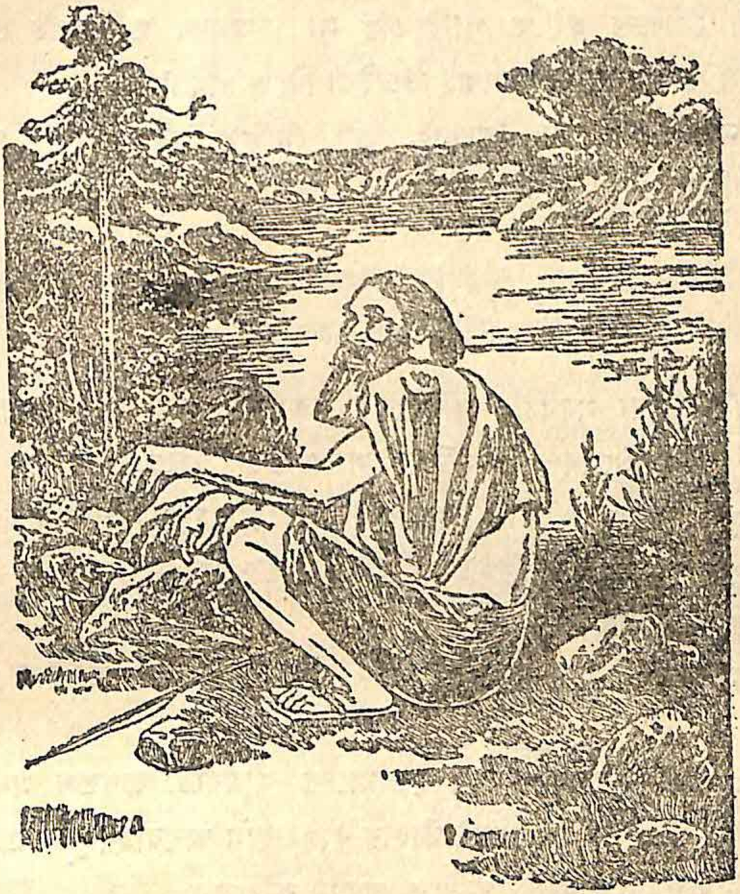
জাবালি তখন সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিয়া অতি কষ্টে পত্নীকে প্রসন্না করিলেন এবং রোরুদ্যমানা ঘৃতাচীকে বলিলেন—'বৎসে, তুমি শান্ত হও। হিন্দ্রলিনী তোমার পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ ইঙ্গুদীতৈল মর্দন করিয়া



আবার নৃত্য শুরু করিলেন

দিলেই ব্যথার উপশম হইবে। তুমি আজ রাত্রে আমার কুটীরেই বিশ্রাম কর। কল্য অমরাবতীতে ফিরিয়া গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ এবং ঘৃত-দধি-গুড়াদির জন্য বহু ধন্যবাদ জানাইও।'

ঘৃতাচী কহিলেন—'তিনি আমার মুখদর্শন করিবেন না। হা, এমন দুর্দশা আমার কখনও হয় নাই।'



জাবালি বলিলেন—'তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি দেবেন্দ্রকে জানাইও যে ইন্দ্রত্বের উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতে থাকুন।'

ধূতাচীর পরাভব শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে কহিলেন—'হে দেবর্ষে, এখন কি করা যায়? জাবালি ইন্দ্রত্ব চাহেন না জানিয়াও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। জনরব শুনিতেছি যে ঐ দুর্দান্ত ঋষি সমস্ত দেবতাকেই উড়াইয়া দিতে চায়।'

নারদ কহিলেন—'পুরন্দর, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি।'

নৈমিষারণ্যে সনকাদি ঋষিগণের সকাশে দেবর্ষি নারদ আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—'হে মুনিগণ, শাস্ত্রে উক্ত আছে, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ, পাপ নাস্তি। কিন্তু এই ত্রেতাযুগে পুণ্য ত্রিপাদ মাত্র এবং একপাদ পাপও দেখা গিয়াছে। ইহার হেতু কি তোমরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?

মুনিগণ বলিলেন—'আশ্চর্য, ইহা আমরা কেহই ভাবিয়া দেখি নাই।'

নারদ বলিলেন—'তবে তোমাদের যাগযজ্ঞ জপতপ সমস্তই বৃথা।' ইহা কহিয়া তিনি তাঁহার কাষ্ঠবাহনে আরোহণপূর্বক ব্রহ্মার নিকট অপর এক ষড়যন্ত্র করিতে প্রস্থান করিলেন।

মুনিগণ নারদীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী প্লবাদি সপ্তদীপ হইতে বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্রগণ নৈমিষারণ্যে সমবেত হইলেন। মহর্ষি জাবালি আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন।

অনন্তর সকলে আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'ভো পণ্ডিতবর্গ, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ ছিল, এখন তাহা ত্রিপাদ হইয়াছে। কেন এমন হইল এবং ইহার প্রতিকার কি, যদি তোমরা কেহ অবগত থাক তবে প্রকাশ করিয়া বল।'

তখন জ্বলন্ত পাবকতুল্য তেজস্বী জামদগ্ন্য মুনি কহিলেন—'হে প্রজাপতে, এই পাপাত্মা জাবালিই সমস্ত অনিষ্টের মূল। উহার সংস্পর্শে বসুন্ধরা ভারগ্রস্তা হইয়াছেন।'

সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলেন—'ঠিক, ঠিক, আমরা তাহা অনেকদিন হইতেই জানি।'

জামদগ্ন্য কহিলেন—'এই জাবালি ভ্রষ্টাচার উন্মার্গগামী নাস্তিক। ইহার শাস্ত্র নাই, মার্গ নাই। রামচন্দ্রকে এই পাষণ্ডই সত্যধর্মচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বালখিল্যগণকে এই দুরাত্মাই নির্যাতিত করিয়াছে। দেবরাজ পুরন্দরকেও এই পাপিষ্ঠ হাস্যাস্পদ করিয়াছে। ইহাকে বধ না করিলে পুণ্যের নষ্টপাদ উদ্ধার হইবে না।'

পণ্ডিতগণ কহিলেন—'আমরাও ঠিক তাহাই ভাবিতেছিলাম।'

দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'হে জাবালে, সত্য করিয়া কহ তুমি নাস্তিক কিনা। তোমার মার্গ কি, শাস্ত্রই বা কি।'

জাবালি বলিলেন—'হে সুধীবৃন্দ, আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি, আমার তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোনও প্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্র তত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়, পরিবর্তনসহ।'

দক্ষ কহিলেন—'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিলাম না।'

জাবালি বলিলেন—'হে ছাগমুণ্ড দক্ষ, তুমি বুঝিবার বৃথা চেষ্টা করিও না। আমি এখন চলিলাম। বিপ্রগণ, তোমাদের জয় হউক।'

তখন সভায় ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল এবং ধর্মপ্রাণ বিপ্রগণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কয়েকজন জাবালিকে ধরিয়া ফেলিলেন। জামদগ্ন্য তাঁহার তীক্ষ্ণ কুঠার উদ্যত করিয়া কহিলেন—'আমি এক-বিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষ করিয়াছি, এইবার এই নাস্তিককে সাবাড় করিব।'

স্থিরপ্রজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'হাঁ হাঁ কর কি, ব্রাহ্মণের দেহে অস্ত্রাঘাত! ছি ছি, মনু কি মনে করিবেন! বরং উহাকে হলাহল প্রয়োগে বধ কর।'

দেবর্ষি নারদ এতক্ষণ অলক্ষ্যে বসিয়াছিলেন। এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া কহিলেন—'আমার কাছে বিশুদ্ধ চৈনিক হলাহল আছে। তাহা সর্ষপপ্রমাণ সেবনে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, দুই সর্ষপে বুদ্ধিভ্রংশ, চতুর্মাত্রায় নরকভোগ, এবং অষ্টমাত্রায় মোক্ষলাভ হয়। জাবালিকে চতুর্মাত্রা সেবন করাও; সাবধান, যেন অধিক না হয়।'

মহাচীন হইতে আনীত কৃষ্ণবর্ণ হলাহল জলে গুলিয়া জাবালিকে জোর করিয়া খাওয়ানো হইল। তাহার পর তাঁহাকে গভীর অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিলোকদর্শী পণ্ডিতগণ কহিলেন—'পাষণ্ড এতক্ষণে কুম্ভীপাকে পৌঁছিয়াছে।'

চৈনিক হলাহল জাবালির মস্তিষ্কে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

জাবালি যজ্ঞের নিমন্ত্রণে বহুবার সোমরস পান করিয়াছেন; প্রথম যৌবনে বয়স্য ক্ষত্রিয়কুমারগণের পাল্লায় পড়িয়া গৌড়ী মাধ্বী পৈষ্টী প্রভৃতি আসবও চাখিয়া দেখিয়াছেন; ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে একবার ভৃগুমামার সঙ্গে চুরি করিয়া ফেনিল তালরসও খাইয়াছিলেন,—কিন্তু এমন প্রচণ্ড নেশা পূর্বে তাঁহার কখনও হয় নাই। জাবালির সকল অঙ্গ নিশ্চল হইয়া আসিল, তালু শুষ্ক হইল, চক্ষু ঊর্ধ্বে উঠিল, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল।

সহসা জাবালি অনুভব করিলেন—তিনি রক্তচন্দনে চর্চিত হইয়া রক্তমাল্যধারণপূর্বক গর্দভযোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে নীয়মান হইতেছেন। রক্তবসনা পিঙ্গলবর্ণা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া

হাসিতেছে এবং বিকৃতবদনা রাক্ষসী তাঁহার রথ আকর্ষণ করিতেছে। ক্রমে বৈতরণী পার হইয়া তিনি যমপুরীর দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় যমকিংকরগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ধর্মরাজের সকাশে লইয়া গেল।

যম কহিলেন—'জাবালে, স্বাগতোসি, আমি বহুদিন যাবৎ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তোমার পারলৌকিক ব্যবস্থা আমি যথোচিত করিয়া রাখিয়াছি, এখন আমার অনুগমন কর। দূরে ঐ যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গবাক্ষহীন অগ্ন্যুদ্গারী সৌধমালা দেখিতেছ, উহাই রৌরব; ইতরপ্রকৃতি পাপিগণ তথায় বাস করে। আর সম্মুখে এই যে গগনচুম্বী তাম্রচূড় রক্তবর্ণ অলিন্দপরিবেষ্টিত আয়তন, ইহাই কুম্ভীপাক; সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এখানে অবস্থান করেন। তোমার স্থান এখানেই নির্দিষ্ট হইয়াছে, ভিতরে চল।

অনন্তর ধর্মরাজ যম জাবালিকে কুম্ভীপাকের গর্ভমণ্ডপে লইয়া গেলেন। এই মণ্ডপ বহুযোজনবিস্তৃত, উচ্চচ্ছাদ, বাষ্পসমাকুল, গম্ভীর আরাবে বিধূনিত। উভয় পার্শ্বে জ্বলন্ত চুল্লীর উপর শ্রেণীবদ্ধ অতিকায় কুম্ভসকল সজ্জিত আছে, তাহা হইতে নিরন্তর শ্বেতবর্ণ বাষ্প ও আর্তনাদ উত্থিত হইতেছে। নীলবর্ণ যমকিংকরগণ ইন্ধন-নিক্ষেপের জন্য মধ্যে মধ্যে চুল্লীদ্বার খুলিতেছে, জ্বলন্ত অনলচ্ছটায় তাহাদের মুখ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছে।

কৃতান্ত কহিলেন—'হে মহর্ষে, এই যে রজতনির্মিত কিংকিণীজাল-মণ্ডিত সুবৃহৎ কুম্ভ দেখিতেছ, ইহাতে নহুষ যযাতি দুষ্মন্ত প্রভৃতি মহাযশা মহীপালগণ পরিপক্ব হইতেছেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই সংশোধিত হইয়া গিয়াছেন, কেবল যযাতির কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আর এক প্রহরের মধ্যে সকলেই বিগতপাপ হইয়া অমরাবতীতে গমন করিবেন। ঐ যে বৈদূর্যখচিত হিরন্ময় কুম্ভ দেখিতেছ, উহার তপ্ত তৈলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকেন। গৌতমের অভিশাপের পরে সহস্রাক্ষ পুরন্দরকে বহুকাল এই

কুম্ভমধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিপ্রয়োগে ইহার তলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে রুদ্রাক্ষমালাবেষ্টিত গৈরিকবর্ণ প্রকাণ্ড কুম্ভ দেখিতেছ, ইহার অভ্যন্তরে ভার্গব দুর্বাসা কৌশিক প্রভৃতি উগ্রতপা মহর্ষিগণ সিদ্ধ হইতেছেন।'

জাবালি কৌতূহলপরবশ হইয়া বলিলেন—'হে ধর্মরাজ, কুম্ভের ভিতরে কি হইতেছে দয়া করিয়া আমাকে দেখাও।'

ধর্মরাজের আজ্ঞা পাইয়া জনৈক যমকিংকর কুম্ভের আবরণী উন্মুক্ত করিল। যম তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ দারুময় দর্বী নিমজ্জিত করিয়া সন্তর্পণে উত্তোলিত করিলেন। সিক্তজটাজূট ধূমায়িতকলেবর কয়েকজন ঋষি দর্বীতে সংলগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত আরম্ভ করিলেন—'রে নারকী যমরাজ, যদি আমাদের কিঞ্চিদপি তপঃপ্রভাব থাকে—'

দর্বী উল্‌টাইয়া কুম্ভের ঢাকনি ঝটিতি বন্ধ করিয়া যম কহিলেন—'হে জাবালে, এই কোপনস্বভাব ঋষিগণের কাঠিন্য দূর হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। ইঁহারা আরও অষ্টাহকাল পরিসিদ্ধ হইতে থাকুন।'

এমন সময় কয়েকজন যমদূতের সহিত খর্বট খল্লাট খালিত বিষণ্ন-বদনে কুম্ভীপাকের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন।

জাবালি কহিলেন—'হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানে কেন, ব্রহ্মলোকে কি স্থানাভাব ঘটিয়াছে?'

খর্বট উত্তর দিলেন—'জাবালে, তুমি বিরক্ত করিও না, আমরা এখানে তদারক করিতে আসিয়াছি।'

যমরাজের ইঙ্গিতে কিংকরগণ বালখিল্যত্রয়কে একত্র বাঁধিয়া উত্তপ্ত পঞ্চগব্যপূর্ণ এক ক্ষুদ্রাকায় কুম্ভে নিক্ষেপ করিল। কুম্ভ হইতে তীব্র চিৎকার উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতান্তের বাপান্তকর বাক্যসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। ধর্মরাজ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন—'হে মহর্ষে, এই নরকের অনুষ্ঠানসকল অতিশয়

অপ্রীতিকর, কেবল বিপন্না ধরিত্রীর রক্ষাহেতুই আমাকে সম্পন্ন করিতে হয়। যাহা হউক, আমি আর তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করিব না, এখন তোমার প্রতি আমার যাহা কর্তব্য তাহাই পালন করিব। দেখ, যে পাপ মনের গোচর তাহা আমি সহজেই দূর করিতে পারি। কিন্তু যাহা মনের অগোচর তাহা জন্মজন্মান্তরেও সংক্রমিত হয়, এবং তাহা শোধন করিতে হইলে কুম্ভীপাকে বার বার



'রে নারকী যমরাজ'

নিষ্কাশন আবশ্যক। তোমার যাহা কিছু দুষ্কৃত আছে তাহা তুমি জানিয়া শুনিয়াই দৌর্বল্যবশাৎ করিয়া ফেলিয়াছ, কদাপি আত্ম-প্রবঞ্চনা কর নাই। সুতরাং আমি তোমাকে সহজেই পাপমুক্ত করিতে পারিব, অধিক যন্ত্রণা দিব না।'

এই বলিয়া কৃতান্ত জাবালিকে সুবৃহৎ লৌহসংদংশে বেষ্টিত করিয়া একটি তপ্ত তৈলপূর্ণ কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ছ্যাঁক করিয়া শব্দ হইল।

সহস্র বিহগকাকলিতে বনভূমি সহসা ঝংকৃত হইয়া উঠিল। প্রাচীদিক্ নবারুণকিরণে আরক্ত হইয়াছে। জাবালি চৈতন্য লাভ করিয়া সাধ্বী হিন্দ্রলিনীর অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে মস্তক



'বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি।'

উত্তোলন করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন-বদনে মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন।

ব্রহ্মা বলিলেন—'বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।'

জাবালি বলিলেন—'হে চতুরানন, ঢের হইয়াছে। আর বরে কাজ নাই। আপনি সরিয়া পড়ুন, আর ভেংচাইবেন না।'

ব্রহ্মা তাহার ভূর্জপত্ররচিত ছদ্মমুখ মোচন করিয়া কহিলেন—'জাবালে, অভিমান সংবরণ কর। তুমি বর না চাহিলেও আমি ছাড়ব কেন? আমিও প্রার্থী। হে স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও না, লোকসমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন কর। তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিবে না, অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন্, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংসারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাক।'

জাবালি বলিলেন—'তথাস্তু।'



চাটুজ্যেমশায় বলিলেন—'বাঘের কথা যদি বল, তো রুদ্রপ্রয়াগের বাঘ। ইয়া কেঁদো কেঁদো। সোঁদরবন থেকে সেখানে গ্রীষ্মকালে হাওয়া বদলাতে যায়। কিন্তু এমনি স্থানমাহাত্ম্য যে কাউকে কিছু বলে না, সব তীর্থযাত্রী কিনা। কেবল সায়েব ধ'রে ধ'রে খায়।

বিনোদ উকিল বলিলেন—'খাসা বাঘ তো। এখানে গোটাকতক আনা যায় না? চটপট স্বরাজ হয়ে যেত,—স্বদেশী, বোমা, চরকা, কাউন্সিল-ভাঙা, কিছুই দরকার হ'ত না।'

সন্ধ্যাবেলা বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তিনি নিবিষ্ট হইয়া একটি ইংরেজী বই পড়িতেছেন—How to be happy though married। তাঁর শালা নগেন এবং ভাগনে উদয়, এরাও আছে।

চাটুজ্যে হুঁকায় একমিনিটব্যাপী একটি টান মারিয়া বলিলেন—'তুমি কি মনে কর সে চেষ্টা হয় নি?'

—'হয়েছিল নাকি? কই, রাউলাট-রিপোর্টে তো সে কথা কিছু লেখে নি।'

—'ভারী এক রিপোর্ট পড়েছ। আরে গবরমেণ্ট কি সবজান্তা? There are more things. কি বলে গিয়ে।'

—'ব্যাপারটা কি হয়েছিল খুলেই বলুন না।'

চাটুজ্যে ক্ষণকাল গম্ভীর থাকিয়া বলিলেন—'হুঁ।'

নগেন বলিল—'বলুন না চাটুজ্যেমশায়।'

চাটুজ্যে উঠিয়া দরজা ও জানালায় উঁকি মারিয়া দেখিলেন। তারপর যথাস্থানে আসিয়া পুনরায় বলিলেন—'হুঁ।'

বিনোদ। দেখছিলেন কি?

চাটুজ্যে। দেখছিলুম হরেন ঘোষালটা আবার হঠাৎ এসে না পড়ে। পুলিশের গোয়েন্দা, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল।

বংশলোচন বই রাখিয়া কহিলেন—'ওসব ব্যাপার নাই বা আলোচনা করলেন। হাকিমের বাড়ি ওরকম গল্প না হওয়াই ভাল।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'ঠিক কথা। আর, ব্যাপারটা বড় অলৌকিক, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। নাঃ, যাক ও কথা। তারপর, উদো, তোর বউ বাপের বাড়ি থেকে ফিরছে কবে?'

বিনোদ উদয়কে বাধা দিয়ে বলিলেন—'ব্যাপারটা শুনতেই বা দোষ কি। চলুন আমার বাসায়, সেখানে হাকিম নেই।'

বংশলোচন বলিলেন—'আরে না না। এখানেই হ'ক। তবে চাটুজ্যেমশায়, বেশী সিডিশস কথাগুলো বাদ দিয়ে বলবেন।'

চাটুজ্যেমশায় বলিলেন—'মা ভৈঃ। আমি খুব বাদসাদ দিয়েই বলছি—বেশীদিনের কথা নয়, বকু দত্তর নাম শুনেছ বোধ হয়, আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মেসো—

বিনোদ। বকুলাল দত্ত? কপালীটোলায় যার মস্ত বাড়ী ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ভাঙছে? তিনি তো মারা গেছেন, শুনেছি কাউন্সিলে ঢুকতে পারেন নি ব'লে মনের দুঃখে।

চাটুজ্যে। ছাই শুনেছ। বকুবাবু আছেন, তবে এখন চেনা

দুষ্কর। এক আনা খরচ করলেই দেখে আসতে পার, কেবল রবিবার বিকেলে এক টাকা।

বিনোদ। কি রকম?

চাটুজ্যে। বুদ্ধির দোষে বেচারা সব নষ্ট করলে—অমন মান, অমন ঐশ্বর্য। বাবার কৃপা হয়েছিল, কিন্তু শেষটায় বকুর মতিচ্ছন্ন হ'ল।

বিনোদ। কোন্ বাবা?

চাটুজ্যে। বাবা দক্ষিণরায়।

উদয় বলিল—'আমার এক পিসশ্বশুরের নাম দক্ষিণামোহন রায়।'

চাটুজ্যে। উদো, তুই হাসালি, হাসালি। পিসশ্বশুর নয় রে উদো,—দেবতা, কাঁচা-খেকো দেবতা, বাঘের দেবতা।

চাটুজ্যে হাতজোড় করিয়া তিনবার কপালে ঠেকাইলেন। তার পর সুর করিয়া কহিতে লাগিলেন—

'নমামি দক্ষিণরায় সোঁদরবনে বাস,
হোগলা উলুর ঝোপে থাকেন বারোমাস।
দক্ষিণেতে কাকদ্বীপ শাহাবাজপুর,
উত্তরেতে ভাগীরথী বহে যত দূর,
পশ্চিমে ঘাটাল পুবে বাকলা পরগণা—
এই সীমানার মাঝে প্রভু দেন হানা।
গোবাঘা শার্দূল চিতে লক্কর হুড়ার
গেছো-বাঘ কেলে-বাঘ বেলে-বাঘ আর
ডোরা-কাটা ফোঁটা-কাটা বাঘ নানা জাতি—
তিন শ তেষট্টি ঘর প্রভুর যে জ্ঞাতি।
প্রতি অমাবস্যা হয় প্রভুর পুণ্যাহ,
যত প্রজা ভেট দেয় মহিষ বরাহ।
ধুমধাম নৃত্য গীত হয় সারা নিশি,
গাঁক গাঁক হাঁক ডাকে কাঁপে দশদিশি।

কস্রাবৎ ছয় বাঘ ছত্রিশ বাঘিনী
ভাঁজেন তেঅটতালে হালুম্ব রাগিণী।
ডেলা ডেলা পেলা দেন শ্রীদক্ষিণ রায়,
হরষিত হঞা সবে কামড়িয়া খায়।
প্রভুর সেবায় হয় জীবহিংসা নিত্য,
পহরে পহরে তাঁর জ্ব'লে উঠে পিত্ত।
বড় বড় জন্তু প্রভু খান অতি জল্‌দি,
হিংসার কারণে তাঁর বর্ণ হৈল হল্‌দি।
ছাগল শুয়ার গরু হিন্দু মুছলমান,
প্রভুর উদরে যাঞা সকলে সমান।
পরম পণ্ডিত তেঁহ ভেদজ্ঞান নাঞি,
সকল জীবের প্রতি প্রভুর যে খাঁঞি।
দোহাই দক্ষিণরায় এই কর বাপা—
অন্তিমে না পাঞি যেন চরণের থাপা।'

বিনোদ বলিলেন—'ও পাঁচালি কোত্থেকে পেলেন ?'

চাটুজ্যে। রায়মঙ্গল। আমার একটা পুঁথি আছে, তিন শ বছরের পুরনো। সেটা নেবার জন্যে চিমেশ মিত্তির ঝুলোঝুলি। ছোকরা তার ওপর প্রবন্ধ লিখে ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তার উপাধি পেতে চায়। দেড়শ অবধি দিতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। প্রবন্ধ লিখতে হয় আমিই লিখব। নাড়ীজ্ঞান আছে, ডাক্তার হতে পারলে বুড়ো বয়সের একটা সম্বল হবে।

বিনোদ। যাক, তার পর ?

চাটুজ্যে। বকুবাবুর কথা বলছিলুম। পনর বৎসর পূর্বে তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না। পরিবার দেশে থাকত, তিনি কলকাতায় একটা মেসে থেকে রামজাদু অ্যাটর্নির আপিসে আশি টাকা মাইনের চাকরি করতেন। রামজাদুবাবু তাঁর ক্লাসফ্রেণ্ড, সেই সূত্রে

চাকরি। এখন বকুবাবুর একটু হাতটান ছিল। বিপক্ষের ঘুষ খেয়ে একটা সমন ধরাতে দেরি করিয়ে দেন। রামজাদুবাবু কড়া লোক, ছেলেবেলার বন্ধু বলে রেয়াত করলেন না। ব্যাপার জানতে পেরে বকুলালকে যাচ্ছেতাই অপমান করলেন। বকুবাবুও তেরিয়া হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাসায় চলে এলেন। মন খারাপ, মেসের বামুনকে বললেন রাত্রে কিচ্ছু খাবেন না। তার পর হেদোর ধারে গেলেন মাথা ঠাণ্ডা করতে। রাগের মাথায় চাকরি ছাড়লেন, কিন্তু সংসার চলে কিসে? পুঁজি তো সামান্য। রামজাদুর ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ হ'ল। আরে উকিলবাড়ি অমন একটু-আধটু উপরি অনেকে নিয়ে থাকে, তা বলে কি পুরনো বন্ধুকে অপমান করতে হয়? আচ্ছা, এর শোধ একদিন বকুলাল নেবেনই।

রাত নটায় মেসে ফিরে এলেন। মেস খাঁ খাঁ, সেদিন শনিবার, সব মেম্বার থিয়েটার দেখতে গেছে। বকুলাল নিঃশব্দে বাসায় ঢুকে দেখতে পেলেন রান্নাঘরের ভেতর—'

নগেন বলিল—'দক্ষিণরায়?'

চাটুজ্যে বলিলেন—'রান্নাঘরের ভেতর মেসের ঝি বকুবাবুর পশমী আসনে—যেটা তাঁর গিন্নী বুনে দিয়েছিলেন—তাইতে বসে তাঁরই থালায় লুচি খাচ্ছে, মেসের ঠাকুর তাকে বাতাস করছে। ঝি আধ হাত জিব কেটে দেড় হাত ঘোমটা টানলে। অন্য দিন হ'লে বকুবাবু কুরুক্ষেত্র বাধাতেন, কিন্তু আজ দেখেও দেখলেন না। চুপটি ক'রে ওপরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

তার পর অগাধ চিন্তা। কি করা যায়? কোত্থেকে টাকা আসবে? তাঁর এক বিধবা পিসী হুগলীতে থাকেন, বিপুল সম্পত্তি, ওয়ারিস একটিমাত্র ছেলে ভুতো। ভুতো ছোঁড়া অতি হতভাগা, অল্প বয়সেই অধঃপাতে গেছে। কিন্তু পিসী তাকে নিয়েই ব্যস্ত, অমন উপযুক্ত ভাইপো বকুলালের দিকে ফিরেও তাকান না। বুড়ীর কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই।

বকুলাল ভাবলেন, ভগবানের কি বিচার! লক্ষ্মীছাড়া ভুতো হ'ল দশলাখের মালিক, আর তারই মামাতো ভাই বকুর অন্তভক্ষ-ধনুর্গুণ। তাঁর ক্লাসফ্রেণ্ড—ঐ বজ্জাত রামজাতুটা—মক্কেল ঠকিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করছে, আর তিনি একটি সামান্য চাকরির জন্যে লালায়িত। দুত্তোর ভগবান।

কিন্তু বকুলাল তাঁর এক ভক্ত বন্ধুর কাছে শুনেছিলেন, ভগবানকে যদি একমনে ভক্তিভরে ডাকা যায় তা হ'লে তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আচ্ছা, তাই একবার ক'রে দেখলে হয় না? যে কথা সেই কাজ। বকুলাল তড়াক করে উঠে পড়লেন, স্টোভ জ্বাললেন, চা ক'রে তিন পেয়ালা খেলেন। আজ তিনি ভররাত ভগবানকে ডাকবেন।

বকুলাল আলো নিবিয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে তপস্যা শুরু করলেন।—হে ভক্তবৎসল হরি, হে ব্রহ্মা, হে মহাদেব, দয়া কর। সেকালে তোমরা ভক্তের আবদার শুনতে, আজ কেন এই গরিবের প্রতি বিমুখ হবে? হে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, তোমাদের যে-কেউ ইচ্ছে করলে আমার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পার। বর দাও—বর দাও—বেশী নয়, মাত্র এক লাখ। উঁহু, এক লাখে কিছুই হবে না,—গিন্নীই গয়না গড়িয়ে অর্ধেক সাবাড় করবেন। রামজেদোটার কিছু কম হবে তো দশ লাখ আছে। আমার অন্তত পাঁচ লাখ চাই,—না না, দশ লাখ। দোহাই দেবতারা, তোমাদের কাছে এক লাখও যা দশ লাখও তা, তাতে এই বিশ্বসংসারের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। অনেককে তো কোটি কোটি দিয়ে থাক, আমায় না হয় মাত্র দশ লাখ দিলে। লাখ টাকায় একটা বাড়ি, হাজার-পঞ্চাশ যাবে ফার্নিচার করতে, তারপর আরও পঞ্চাশ হাজার যাবে এটা-সেটায়। এই ধর একটা ভাল মোটরকার। উঁহু, একটায় হবে না, গিন্নীই সেটা আঁকড়ে ধরে থাকবেন, হরদম থিয়েটার আর গঙ্গাস্নান। আচ্ছা তাঁর জন্যে না হয় একটা ফোর্ড গাড়ি মোতায়েন করে দেওয়া যাবে,—

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফোর্ড,—মেয়েছেলের বেশী বাড় ভাল নয়। আর ঐ রামজাদুটা—রাসকেলকে কেউ যদি বেঁধে নিয়ে আসে তো ফুটপাথের ওপর তার হামদো মুখখানা ঘষি। ঘষি আর দেখি, যতক্ষণ না চোখ মুখ খয়ে গিয়ে তেলপানা হয়ে যায়। হে বুদ্ধদেব, যিশুখ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, আজকের মতন তোমরা আমায় মাপ কর, তোমরা এসব পছন্দ কর না তা জানি। দোহাই বাবাসকল, আজ আমার এই তপস্যায় তোমরা বাগড়া দিও না, এর পর তোমাদের একদিন খুশী করে দেব। হে নারায়ণ, হে দর্পহারী কৃষ্ণ, হে পয়গম্বর, হে ব্রাহ্মের ব্রহ্ম, ইহুদীদের যেহোভা, পার্সীর অহুর, দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ, শয়তান—অ্যাঁ! রামো রামো। তা শয়তানেই বা আপত্তি কি, না হয় শেষটায় নরকে যাব। যাক, অত বাছলে চলে না। হে তেত্রিশ কোটির যে-কেউ দয়া কর—দয়া কর। আমি একান্তঃকরণে ভক্তি-ভরে ডাকছি—ধনং দেহি, ধনং দেহি।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'আচ্ছা, চাটুজ্যেমশায়, আপনি বকুবাবুর মনের কথা জানলেন কি ক'রে?'

চাটুজ্যে বলিলেন—'সে তোমরা বুঝবে না। কলিকাল, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ দু-চারটি এখনও আছেন। গরিব বটি, কিন্তু কাশ্যপ গোত্র, পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তান। কেদার চাটুজ্যের এই বুড়ো হাড়ে ঋষিদের গুঁড়ো বর্তমান। একটু চেষ্টা করলে লোকের হাঁড়ির খবর জানতে পারি, মনের কথা তো কোন্ ছার। তার পর বকুলালবাবু ঐ রকম একমনে তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর দু চোখ বেয়ে ধারা বইতে লাগল, বাহ্যজ্ঞান নেই, কেবল ধনং দেহি। এমন সময় নীচে থেকে একটি আওয়াজ এল—টিংটিং। বকুলাল লাফিয়ে উঠে দেশলাই জ্বাললেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঠনে আলো ফেলে দেখলেন—

নগেন রোমাঞ্চিত হইয়া আবার বলিয়া ফেলিল—'দক্ষিণরায়!'

চাটুজ্যেমশাই মুখ খিঁচাইয়া ভেংচাইয়া বলিলেন—'দ্যাক্ষিণরায়!

তোমার ম্যাথা। গ্যাপ্লোটা তুমিই ব্যালো না, আমি আর ব'কে মরি কেন।'

উদয় খুশী হইয়া বলিল—'নগেন-মামার ঐ মস্ত দোষ, মানুষকে কথা কইতে দেয় না। আমার শালীর পাকাদেখার দিন—'

চাটুজ্যে অস্থির হইয়া বলিলেন—'আরে গ্যালো যা! একজন থামলেন তো আর একজন পোঁ ধরলেন! যা—আমি আর বলব না।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'আহা কেন তোমরা রসভঙ্গ কর! ব্রাহ্মণকে বলতেই দাও না।'

চাটুজ্যে বলিতে লাগিলেন—'বকুলালবাবু উঠনে দেখলেন—ব্রহ্মার হাঁস শিবের ষাঁড় বিষ্ণুর গড়ুর কেউ-ই নেই, শুধু এক কোণে একটি লাল বাইসিকেল ঠেসানো রয়েছে। হেঁকে বললেন—কোন্ হ্যায়? টেলিগ্রাফপিয়ন সিঁড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়েছিল, এখন সামনে এসে বললে—তার হ্যায়।

কিসের তার? বকুবাবুর বুক দুরুদুরু ক'রে উঠল। কই, তিনি তো লটারির টিকিট কেনেন নি। তবে কি গিন্নীর কি ছেলেপিলের অসুখ? আজ বিকেলেই তো চিঠি পেয়েছেন সব ভাল। বকুলাল হুড়মুড় করে নেমে এলেন।

তারের খবর—ভুতো হঠাৎ মারা গেছে, পিসীও এখনতখন, শীগ্গির চলে এস। বকুবাবু ইয়া আল্লা বলে লাফিয়ে উঠলেন, তার পর মনিব্যাগটি পকেট থেকে বার ক'রে পিয়নের হাতে উবুড় করে দিলেন। পিয়ন বেচারা আসবার আগেই জেনে নিয়েছিল যে খারাপ খবর, বকশিশ চাওয়া চলবে না। এখন অযাচিত তিন টাকা ছ আনা পেয়ে ভাবলে শোকে বাবুর মাথা বিগড়ে গেছে। সে সই নিয়েই পালাল।

ভুতো তাহলে মরেছে? সত্যিই মরেছে? বা রে ভুতো, বেড়ে ছোকরা! নিশ্চয় মদ খেয়ে লিভার পচিয়েছিল। জাঁকিয়ে শ্রাদ্ধ করতে হবে। বকুবাবু সেই রাত্রেই হুগলী রওনা হলেন।

বকুবাবুর বরাত ফিরে গেল। তবে দশ লাখ নয়, মাত্র পাঁচ লাখ। টাকাটা কম হওয়ায় প্রথমটা একটু মন খুঁতখুঁত করেছিল, কিন্তু ক্রমে সয়ে গেল। বাড়ি হ'ল, গাড়ি হল, সব হল। বকুলাল নানারকম কারবার ফাঁদলেন। তারপর যুদ্ধ বাঁধল, বকুলাল একই মাল পাঁচবার চালান দিতে লাগলেন, ধুলো-মুঠো সোনা-মুঠো হতে লাগল। টাকার আর অবধি নেই, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বকুর বুদ্ধিটা মোটা হয়ে পড়ল। এই রকমে বছর চোদ্দ কেটে গেল।........'

এই পর্যন্ত বলিয়া চাটুজ্যেমশায় তামাক টানিয়া দম লইতে লাগিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন—'কই চাটুজ্যেমশায়, বাঘ কই?'

চাটুজ্যে বলিলেন—'আসবে, আসবে, ব্যস্ত হয়ো না, সময় হলেই আসবে। বকুবাবু যেদিন পঞ্চান্ন বৎসরে পড়লেন, সেই রাত্রে বঙ্গমাতা তাঁকে বললেন—বৎস বকু, বয়স তো ঢের হ'ল, টাকাও বিস্তর জমিয়েছ। কিন্তু দেশের কাজ কি করলে? বকুলাল জবাব দিলেন—মা, আমি অধম সন্তান, বক্তৃতা দেওয়া আসে না, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যেতে পারি না, খদ্দর আমার সয় না—সুখের শরীর—দেশী মিলের ধুতিতেই পেট কেটে যায়। আর—বোমা দূরে থাক, একটা ভুঁই-পটকা ছোড়বার সাহসও আমার নেই। কি কর্তব্য তুমিই বাতলে দাও। খাটুনির কাজ আর এ বয়সে পেরে উঠব না, সোজা যদি কিছু থাকে তাই ব'লে দাও মা। বঙ্গমাতা বললেন—কাউনসিলে ঢুকে পড়।

মা তো ব'লে খালাস, কিন্তু ঢোকা যায় কি ক'রে? বকুলাল মহা ফাঁপরে পড়লেন। অনেক ভেবে-চিন্তে একজন মাতব্বর সায়েবকে ধ'রে বললেন—তিনি হাজার টাকা ড্রংকেন সেলার্স হোমে দিতে রাজী আছেন যদি গবরমেণ্ট তাঁকে কাউনসিলে নমিনেট করে। সায়েব বললেন—টাকা তিনি গ্ল্যাডলি নেবেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না, কারণ গবরমেণ্ট যার-তার কাছে ঘুষ নেয় না। বকুবাবু মুখ চুন ক'রে ফিরে এলেন। তার পর একজন রাজনীতিক

চাঁইকে বললেন—আমি ইলেকশনে দাঁড়াতে চাই, আমায় দলে ভরতি ক'রে নিন, ক্রীড কি আছে দিন সই করে দিচ্ছি। চাঁইমশাই বললেন—দুত্তোর ক্রীড, আগে লাখ টাকা বার করুন দেখি, আমাদের নিখিল-বঙ্গীয়-সর্পনাশক ফাণ্ডের জন্যে,—সাপ না মারলে পাড়াগাঁয়ের লোক সাপোর্ট করবে কেন? বকুবাবু বললেন—ছি ছি, দেশের কাজ করব তার জন্যে টাকা? ঘুষ আমি দিই না। ফিরে এসে স্থির করলেন, সব ব্যাটা চোর। খরচ যদি করতেই হয়, তিনি নিজে বুঝে-সুজে করবেন।

কলকাতায় সুবিধে করতে না পেরে বকুবাবু ঠিক করলেন, সাউথ-সুন্দরবন-কন্‌ষ্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়াবেন। সেখানে সম্প্রতি কিছু জমিদারি কিনেছিলেন, সেজন্য ভোট আদায় করা সোজা হবে। ইলেকশনের দু-তিন মাস আগে থেকেই তিনি উঠে-প'ড়ে লেগে গেলেন।

তারপর হঠাৎ একদিন খবর এল যে বকুলালের পুরনো শত্রু রামজাদুবাবু রাতারাতি খদ্দরের সুট বানিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। তিনিও ঐ সোঁদরবন থেকে দাঁড়াবেন। বকুবাবুর দ্বিগুণ রোখ চেপে গেল—তিনি টেরিটিবাজার থেকে একটি তিন নম্বরের টিকি কিনে ফেললেন, দেউড়িতে গোটা-দুই ষাঁড় বাঁধলেন, আর বাড়ির রেলিংএর ওপর ঘুঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

খবরের কাগজে নানারকম কেচ্ছা বার হ'তে লাগল। বকুলাল দত্ত—সেটাকে কে চেনে? চোদ্দ বছর আগে কার কাছে চাকরি করত? সে চাকরি গেল কেন? কেরানীর অত পয়সা কি করে হ'ল? হে দেশবাসিগণ, বকুলাল অত সোডাওআটার কেনে কেন? কিসের সঙ্গে মিশিয়ে খায়? বকুর বাগানবাড়িতে রাত্রে আলো জ্বলে কেন? বকুলাল কালো, কিন্তু তার ছোট ছেলে ফরসা হ'ল কেন? সাবধান বকুলাল, তুমি শ্রীযুক্ত রামজাদুর সঙ্গে পাল্লা দিতে যেয়ো না, তা হ'লে আরও অনেক কথা ফাঁস ক'রে দেব। বকুবাবুও

পাল্‌টা জবাব ছাপতে লাগলেন, কিন্তু তত জুতসই হ'ল না, কারণ তাঁর তরফে তেমন জোরালো সাহিত্যিক-গুণ্ডা ছিল না।

বকুবাবু ক্রমে বুঝলেন যে তিনি হটে যাচ্ছেন, ভোটাররা সব বেঁকে দাঁড়াচ্ছে। একদিন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে ব'সে আছেন এমন সময় তাঁর মনে পড়ল যে চোদ্দ বৎসর আগে দেবতার দয়ায় তাঁর অদৃষ্ট ফিরে যায়। এবারেও কি তা হবে না? বকুলাল ঠিক করলেন আর একবার তেমনি ক'রে কায়মনোবাক্যে তিনি তেত্রিশ কোটিকে ডাকবেন। শুধু বঙ্গমাতার ওপর নির্ভর করা চলবে না, কারণ তিনি তো আর সত্যিকার দেবতা নন—বঙ্কিম চাটুজ্যের হাতে গড়া। তাঁর কোনও যোগ্যতা নেই, কেবল লোককে খেপিয়ে দিতে পারেন।

রাত্রি দশটার সময় বকুবাবু তাঁর আপিস-ঘরে ঢুকে দারোয়ানকে ব'লে দিলেন যে তাঁর অনেক কাজ, কেউ যেন বিরক্ত না করে। এবার আর শোবার ঘরে নয়, কারণ গিন্নী থাকলে তপস্যার বিঘ্ন হ'তে পারে। বকুলাল ইজিচেয়ারে শুয়ে এই মর্মে একটি প্রার্থনা রুজু করলেন।—'হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী ইত্যাদি, পূর্বে তোমরা একবার আমার মান রেখেছিলে, আমিও তোমাদের যথাযোগ্য পূজো দিয়েছি। তার পর নানান ধান্দায় আমি ব্যস্ত, তোমাদের তেমন খোঁজখবর নিতে পারি নি—কিছু মনে ক'রো না বাবারা। কিন্তু গিন্নী বরাবরই তোমাদের কলাটা মূলোটা যুগিয়ে আসছেন, সোনা রুপোও কিছু কিছু দিয়েছেন। ঐ যে তাঁর রুপোর তাম্রকুণ্ড, কোষাকুষি, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ, শালগ্রামের সোনার সিংহাসন, সে তো আমারই টাকায় আর তোমাদেরই জন্যে। আর আমিও দেখ, এখন একটু ফুরসত পেয়েই ধম্ম-কম্মে মন দিয়েছি, টিকি রেখেছি, গো-সেবা করছি। এখন আমার এই নিবেদন, রামজাদু ব্যাটাকে ঘাল কর। ওকে ভোটে হারাবার কোনও আশা দেখছি না। দোহাই তেত্রিশ কোটি দেবতা, ওটাকে বধ কর। কিন্তু এক্ষুনি

নয়, নমিনেশন-পেপার দেবার ছু-দিন পরে,—নয়তো আর একটা ভুঁইফোড় দাঁড়াবে। কলেরা, বসন্ত, বেরিবেরি, হার্টফেল, গাড়িচাপা যা হয়। আমি আর বেশী কি বলব, তোমরা তো হরেক রকম জান। দাও বাবারা, বজ্জাত ব্যাটার ঘাড় মটকে দাও—রেমোর রক্ত দাও—রক্তং দেহি, রক্তং দেখি।'...বকুলালবাবু নিবিষ্ট হয়ে এই রকম সাধনা করছেন, এমন সময়ে সেই ঘরে টুপ ক'রে একটি শব্দ হ'ল।

নগেনের ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। আস্তে আস্তে বলিল—'দ—'

চাটুজ্যে গর্জন করিয়া বলিলেন—'চোপ রও।'—বকুবাবুর আপিসের কড়িকাঠে একটি টিকটিকি আট্‌কে ছিল। সে যেমনি হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙবে অমনি খ'সে গিয়ে টুপ করে বকুলালের টেবিলে পড়ল। বকুলাল চমকে উঠে দেখলেন—টেবিলের ওপর একটি টিকটিকি, আর তার নীচেই একখানা পোস্টকার্ড।

পোস্টকার্ডটি পূর্বে নজরে পড়ে নি। এখন বকুবাবু প'ড়ে দেখলেন তাতে লিখেছে—মহাশয়, শুনছি আপনি ইলেকশনে সুবিধে করে উঠতে পারছেন না। যদি আমার সাহায্য নেন আর উপদেশ-মত চলেন তবে জয় অবশ্যম্ভাবী। কাল সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে দেখা করব। ইতি। শ্রীরামগিধড় শর্মা।

বকুলালবাবু উৎফুল্ল হয়ে বললেন—জয় মা কালী, জয় বাবা তারকনাথ ব্রহ্মা বিষ্ণু পীর পয়গম্বর। এই পোস্টকার্ডখানি তোমাদেরই লীলা, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কাল তোমাদের ঘটা ক'রে পূজো দেব, নিশ্চিন্ত থাক। তার পর খুব মনে মনে বললেন—যাতে দেবতারাও টের না পান—উঁহু বিশ্বাস নেই, আগে কাজ উদ্ধার হ'ক তখন দেখা যাবে।

সমস্ত রাত, তারপর সমস্ত দিন বকুবাবু ছটফট ক'রে কাটালেন। যথাকালে রামগিধড় শর্মা দেখা দিলেন। ছোট্ট মানুষটি, মেটেমেটে রং, ছুঁচলো মুখ, খাড়াখাড়া কান। পরনে পাটকিলে রঙের ধুতি-মেরজাই গায়ের রঙের সঙ্গে বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কথা কন

কখনও হিন্দী, কখনও বাংলা। বকুলাল খুব খাতির করে বললেন—বইঠিয়ে। আপনি আর্যসমাজী? রামগিধড় বললেন—নহি নহি। বকু জিজ্ঞাসা করলেন—মহাবীর দল? প্যাক্টওয়ালা? কৌসিল-তোড়? চরখা-বাজ? রামগিধড় ওসব কিছুই নন, তিনি একজন পলিটিকাল পরিব্রাজক। বকুবাবু ভক্তিভরে পায়ের ধূলো নিলেন। রামগিধড় বললেন—বস্ হুয়া হুয়া।

তার পর কাজের কথা শুরু হ'ল। রামগিধড় জানতে চাইলেন বকুবাবুর রাজনীতিক মতামত কি, তিনি স্বরাজী, না অরাজী, না নিমরাজী, না গররাজী? বকু বললেন, তিনি কোনওটাই নন, তবে দরকার হ'লে সবতাতেই রাজী আছেন। তিনি চান দেশের একটু সেবা করতে, কিন্তু রামজাদু থাকতে তা হবার জো নেই। রামগিধড় বললেন—কোনও চিন্তা নেই, তুমি ব্যাঘ্রপার্টিতে জয়েন কর।

বকুবাবু আঁতকে উঠলেন। রামগিধড় বললেন—আমি অতি গুহ্য কথা প্রকাশ ক'রে বলছি শোন। এই পার্টির সভ্যসংখ্যা একেবারে গোনাগুনতি তিন শ তেষট্টি। আমি এর সেক্রেটারি। একটিমাত্র ভেকান্সি আছে, তাতে ইচ্ছা করলে তুমি আসতে পার। কাউনসিলের সমস্ত সীট আমরাই দখল করব।

বকুর ভরসা হ'ল না। বললেন—তা পেরে উঠবেন কি ক'রে? শত্রু অতি প্রবল, হটাতে পারবেন না। নিখিল-বঙ্গীয়-সর্পনাশক ফাণ্ডের সমস্ত টাকা ওরা হাত করেছে।

রামগিধড় খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বললেন—আমরা সর্প নই। ফাণ্ড না থাক, দাঁত আছে, নখ আছে। বাবা দক্ষিণরায় আমাদের সহায়। তাঁর কৃপায় সমস্ত শত্রু নিপাত হবে।

তিনি কে?

চেন না? তেত্রিশ কোটির মধ্যে তিনিই এখন জাগ্রত, আর সবাই ঘুমচ্ছেন। বাবা তোমার ডাক শুনতে পেয়েছেন। নাও, এখন ক্রীডে সই কর। অতি সোজা ক্রীড—কেবল বাবার নিত্যিকার

খোরাক যোগাতে হবে—তার বদলে পাবে শত্রু মারবার ক্ষমতা আর কাউনসিলে অপ্রতিহত প্রতাপ।

কিন্তু গবরমেণ্ট ?

গবরমেণ্টের মাংসও বাবা খেয়ে থাকেন—'

বংশলোচন বাধা দিয়া বলিলেন—'ওকি চাটুজ্যেমশায় !'

চাটুজ্যে কহিলেন—'হাঁ হাঁ মনে আছে। আচ্ছা, খুব ইশারায় বলছি। রামগিধড় বুঝিয়ে দিলেন, একবারে রামরাজ্য হবে। শত্রুর বংশ লোপাট, সবাই ভাই-ব্রাদার। দিব্যি ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে খাবে। সকলেই মন্ত্রী, সকলেই লাট।

কিন্তু ঐ রামজাহুটা ঢিট হবে তো ?

ঢিট ব'লে ঢিট ! একেবারে ঢ-য় দীর্ঘ-ঈ ঢীট। তাকে তুমি নিজেই বধ ক'রো।

বকুবাবুর মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। এইবার তাঁর কৃত্রিম দন্তে অকৃত্রিম হাসি ফুটে উঠল। ক্রীড সই করে দিয়ে বললেন—বাবা দক্ষিণরায় কি জয় !

রামগিধড় বললেন—হুয়া, হুয়া, আব সব ঠিক হুয়া।

এই স্থির হ'ল যে কাল ফাইভ-আপ-প্যাসেঞ্জারে বকুবাবু তাঁর সুন্দরবনের জমিদারিতে রওনা হবেন। সেখানে পৌঁছলে রামগিধড় তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে বাবার আশীর্বাদ পাইয়ে দেবেন।

বকুবাবুর মাথা বিগড়ে গেল। সমস্ত রাত তিনি খেয়াল দেখলেন রামগিধড় হুয়া হুয়া করছে। রামরাজ্য, কাউনসিলে অপ্রতিহত প্রতাপ, লাট, মন্ত্রী—এসব বড় বড় কথা তাঁর মনে ঠাঁই পায় নি। রামজাহু মরবে আর তিনি কাউনসিলে ঢুকবেন—এইটেই আসল কথা। তার পর রামরাজ্যই হ'ক্ আর রাক্ষসরাজ্যই হ'ক্, দেশের লোক বাঁচুক বা বাবার পেটে যাক, তাতে তাঁর ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

তার পর সোঁদরবনে গভীর অমাবস্যা রাত্রে বাবা তাঁকে দর্শন দিলেন।

বিনোদ বলিলেন—'চাটুজ্যেমশায়, আপনি বড় ফাঁকি দিচ্ছেন। বাবার মূর্তিটা কি রকম তা বলুন?'

চাটুজ্যে। বলব না, ভয় পাবে। বিশেষ ক'রে এই উদোটা।

উদয় বলিল—'মোটেই না। হাজারিবাগে থাকতে কতবার আমি রাত্তিরে একলা উঠেছি। বউ বলত—'

চাটুজ্যে বলিলেন—'বউ বলুক গে।' বাবা প্রথমটা সৌম্য ব্রাহ্মণের মূর্তি ধ'রে দেখা দিয়েছিলেন। বকুলালকে বললেন—বৎস, আমি তোমার প্রার্থনায় খুশী হয়েছি। এখন বর কি নেবে বল।

বকুবাবু বললেন—বাবা, আগে রামজাদুটাকে মার, ও আমার চিরকালের শত্রু।

বাবা বললেন--দেশের হিত?

বকু উত্তর দিলেন—হিত-টিত এখন থাক বাবা। আগে রামজাদু।

বাবা বললেন—তাই হ'ক। ক্রীড সই করেছ, এখন তোমায় জাতে তুলে দি—

এতেক কহিয়া প্রভু রায় মহাশয়
ধরিলেন নিজ রূপ দেখে লাগে ভয়।
পর্বতপ্রমাণ দেহ মধ্যে ক্ষীণ কটি,
দুই চক্ষু ঘোরে যেন জ্বলন্ত দেউটি।
হলুদ বরন তনু তাহে কৃষ্ণ রেখা,
সোনার নিকষে যেন নীলাঞ্জন লেখা।
কড়া কড়া খাড়া খাড়া গোঁফ দুই গোছা,
বাঁশঝাড় যেন দেয় আকাশেতে খোঁচা।
মুখ যেন গিরিগুহা রক্তবর্ণ তালু,
তাহে দন্ত সারি সারি যেন শাঁখ আলু।
দু-চোয়াল বহি পড়ে সাদা সাদা গেঞ্জ,

আছাড়ি পাছাড়ি নাড়ে বিশ হাত লেঞ্জ।
ছাড়েন হুংকার প্রভু দন্ত কড়মড়ি,
জীব জন্তু যে যেখানে ভাগে দড়বড়ি।
ভয় পাঞা দেবগণ ইন্দ্রে দেয় ঠেলা,
কহে—দেবরাজ হান বজ্র এইবেলা।
ইন্দ্র বলে ওরে বাপা কিবা বুদ্ধি দিলে,
রহিবে পিতার নাম আপুনি বাঁচিলে।
চক্ষে বান্ধ ফেটা বাপা কানে দাও রুই,
কপাট ভেজাঞা সুখা খাও ঢোঁক দুই।

বাবা দক্ষিণরায় তাঁর ল্যাজটি চট্ ক'রে বকুবাবুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন।

বাবা বললেন—যাও বৎস, এখন চ'রে খাও গে।

চাটুজ্যে হুঁকায় মনোনিবেশ করিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন—
—'তার পর?'

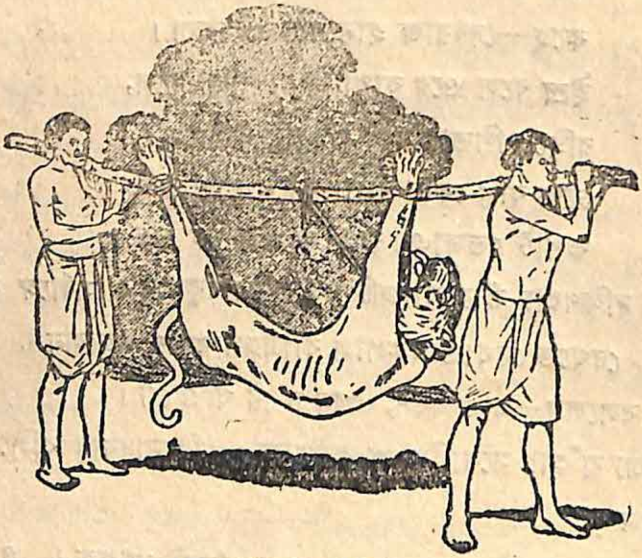
'তার পর আবার কি। বকুলাল কেঁদেই আকুল। ও বাবা, একি করলে? আমি ভাত খাব কি ক'রে? শোব কোথায়? সিল্কের চোগা-চাপকান পরব কি ক'রে? গিন্নী যে আর চিনতে পারবে না গো!'

বাবা অন্তর্ধান। রামগিধড় বললে—আবার ক্যা হুয়া? গোল মত কর। এখন ভাগো, শত্রু পকড়-পকড়কে খাও গে। বকুলাল নড়েন না, কেবল ভেউ ভেউ কান্না। রামগিধড় ঘ্যাঁক ক'রে তাঁর পায়ে কামড়ে দিলে। বকুলাল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালালেন।

পরদিন সকালে ক-জন চাষা দেখতে পেলে একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুঁকছে। চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে গেল ডেপুটিবাবুর বাড়ি। তিনি বললেন—এমন বাঘ তো দেখি নি, গাধার মত রং। আহা, শেয়ালে কামড়েছে, একটু হেমিওপ্যাথিক ওষুধ দিই। একটু চাঙ্গা হোক, তারপর আলিপুরে নিয়ে যেয়ো; বকশিশ মিলবে।

বকুবাবু এখন আলিপুরেই আছেন। আর দেখাসাক্ষাৎ করিনে —ভদ্দরলোককে মিথ্যে লজ্জা দেওয়া।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'আচ্ছা চ্যাটুজ্যেমশায়, বাবা দক্ষিণরায় কখনও গুলি খেয়েছেন?'



চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল

'গুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।'

'তিনি না খান, তাঁর ভক্তরা কেউ খান নি কি?'

'দেখ বিনোদ, ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে তামাশা ক'রো না, তাতে অপরাধ হয়। আচ্ছা ব'স তোমরা—আমি উঠি।'



চাটুজ্যেমশায় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন—'রাত্রি ন-টা সাতান্ন মিনিট গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তি। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না। এখন তো সবে সন্ধ্যে।'

বিনোদ উকিল বলিলেন—'তাই তো, বাসায় ফেরা যায় কি ক'রে।'

গৃহস্বামী বংশলোচনবাবু বলিলেন—'বৃষ্টি থামিলে সে চিন্তা ক'রো। আপাতত এখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উদো, ব'লে আয় তো বাড়ির ভেতর।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'মসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।'

বিনোদবাবু তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া বলিলেন—'তা তো হ'ল, কিন্তু ততক্ষন সময় কাটে কিসে। চাটুজ্যেমশায়, একটা গল্প বলুন।'

চাটুজ্যে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—'আর-বছর মুঙ্গেরে থাকতে আমি এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম।'

বিনোদবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'দোহাই চাটুজ্যেমশায় বাঘের গল্প আর নয়।'

চাটুজ্যে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—'তবে কিসের কথা বলব, ভূতের না সাপের ?'

—'এই বর্ষায় বাঘ ভূত সাপ সমস্ত অচল, একটি মোলায়েম দেখে প্রেমের গল্প বলুন।'

—'গল্প আমি বলি না। যা বলি, সমস্ত নিছক সত্য কথা।'

—'বেশ তো একটি নিছক সত্য প্রেমের কথাই বলুন।'

নগেন বলিল—'তবেই হয়েছে, চাটুজ্যেমশায় প্রেমের কথা বলবেন! বয়স কত হ'ল চাটুজ্যেমশায় ? আর কটা দাঁত বাকী আছে ?

—'প্রেম কি চিবিয়ে খাবার জিনিস ?' ওরে গর্দভ, দাঁতে প্রেম হয় না, প্রেম হয় মনে।'

নগেন বলিল—'মন তো শুখিয়ে আমসি হয়ে গেছে। প্রেমের আপনি জানেন কি ? সব ভুলে মেরে দিয়েছেন। প্রেমের কথা বলবে তরুণরা। কি বলিস উদো ?'

—'তরুণ কি রে বাপু ? সোজা বাংলায় বল্ চ্যাংড়া। তিনি কুড়ি বয়েস হ'ল, কেদার চাটুজ্যে প্রেমের কথা জানে না, জানে যত হ্যাংলা চ্যাংড়ার দল!'

বিনোদবাবু বলিলেন—'আঃ হা, কেন ব্রাহ্মণকে চটাও, শোনই না ব্যাপারটা।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'বর্ণের শ্রেষ্ঠ হলেন ব্রাহ্মণ। দর্শন বল, কাব্য বল, প্রেমতত্ত্ব বল, সমস্ত বেরিয়েছে ব্রাহ্মণের মাথা থেকে। আবার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ হলেন চাটুজ্যে। যথা বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে।'

—'আর ?'

—'আর এই ক্যাদার চাটুজ্যে। কেন বলব না ? তোমাদের ভয় করব নাকি ?

'যাক যাক, আপনি আরম্ভ করুন।'

চাটুজ্যেমশায় আরম্ভ করিলেন—'আর বছরের ঘটনা। আমি এক অপরূপ সুন্দরী নারীর পাল্লায় পড়েছিলুম।'

নগেন বলিল—'এই যে বলছিলেন বাঘিনীর পাল্লায়?'

বিনোদ বলিলেন—'একই কথা।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'ওরে মুখ্খু, বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম মুঙ্গেরে, আর এই নারীর ব্যাপার ঘটেছিল পঞ্জাব মেলে, টুণ্ডলার এদিকে। যাক, ঘটনাটা শোন।—'

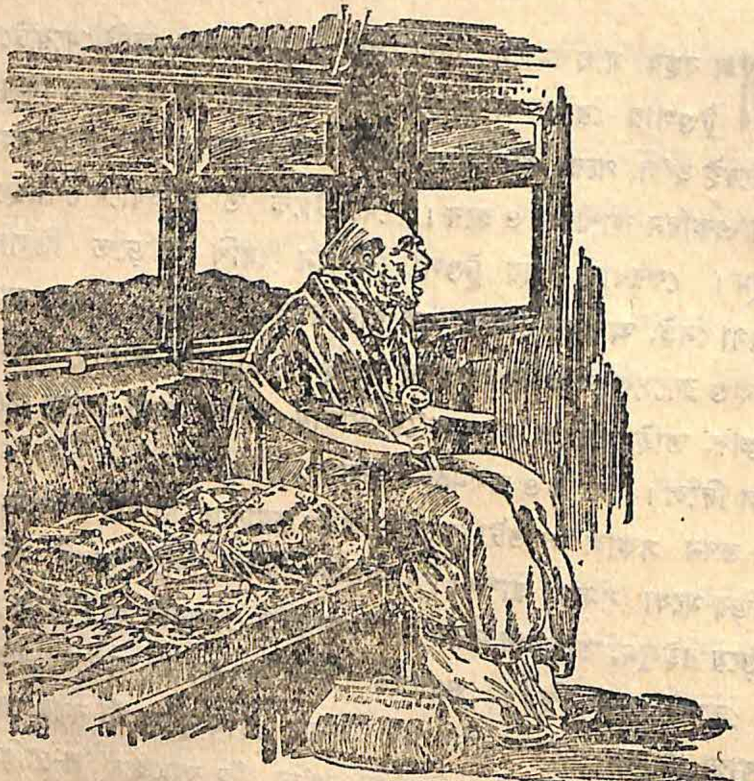
গেল বছর মাঘ মাসে চরণ ঘোষ বললে তার ছোট মেয়েটিকে টুণ্ডলায় রেখে আসতে,—জামাই সেখানেই কর্ম করে কিনা। সুবিধেই হ'ল, পরের পয়সায় সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ, আবার ফেরবার পথে একদিন কাশীবাসও হবে। মেয়েটাকে তো নির্বিবাদে পৌঁছিয়ে দিলুম। ফেরবার সময় টুণ্ডলা স্টেশনে দেখি গাড়িতে তিলাধ জায়গা নেই, আগ্রার ফেরত এক পাল মার্কিন ভবঘুরে সমস্ত ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের বেঞ্চি দখল ক'রে আছে। ভাগ্যিস জামাই রেলের ডাক্তার, তাই গার্ডকে ব'লে ক'য়ে আমায় একটা ফার্স্ট ক্লাসে ঠেলে তুলে দিলে। গাড়িও তখনই ছাড়ল।

তখন সকাল সাতটা হবে, কিন্তু কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন, গাড়ির মধ্যে সমস্ত ঝাপসা। কিছুক্ষণ ধাঁধা লেগে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, তার পর ক্রমে ক্রমে কামরার ভেতরটা ফুটে উঠল।

দেখেই চক্ষু স্থির। ওধারের বেঞ্চিতে একটা অসুরের মতন আখাম্বা ঢ্যাঙা সায়েব চিতপাত হ'য়ে চোখ বুঁজে হাঁ করে শুয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় ক'রে কি বলছে। দু-বেঞ্চির মাঝে মেঝের ওপর আর একটা বেঁটে মোটা সায়েব মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে, তার মাথার কাছে একটা খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। এধারের বেঞ্চিতে কেউ নেই, কিন্তু তাতে দামী বিছানা পাতা, তার

ওপর একটা অদ্ভুত পোশাক—বোধ হয় ভাল্লুকের চামড়ার,—আর নানা রকম জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে। গাড়ি চলছে, পালাবার উপায় নেই। বেঞ্চির শেষদিকে একটা চেয়ারের মতন জায়গা ছিল, তাইতে ব'সে দুর্গানাম জপতে লাগলুম। কোনও গতিকে সময় কাটতে লাগল, সায়েব দুটো শুয়েই রইল, আমারও একটু একটু ক'রে মনে সাহস এল।

হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক অপরূপ মূর্তি। দূর থেকে বিস্তর মেমসায়েব দেখেছি, কিন্তু এমন সামনাসামনি



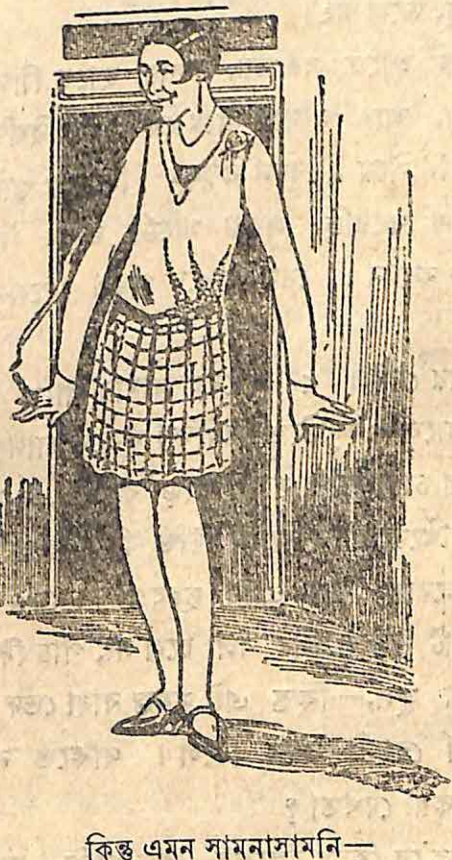
দূরে থেকে বিস্তর মেমসায়েব দেখেছি

দেখবার সুযোগ কখনও ঘটে নি। মুখখানি চীনে করমচা, ঠোঁট দুটি পাকা লঙ্কা, মারবেলে কোঁদা আজানুলম্বিত দুই বাহু। চোস্ত

ঘাড়-ছাঁটা, কেবল কানের কাছে শণের মতন দুগাছি চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পরনে একটি দেড়হাতী গামছা—'

বিনোদবাবু বলিলেন—'গামছা নয় চাটুজ্যেমশায়, ওকে বলে স্কার্ট।'

—'কাঠ-ফাট জানি নে বাবা। পষ্ট দেখলুম বাঁদিপোতার গামছা খাটো ক'রে পরা, তার নীচে নেমে এসেছে গোলাপী



কিন্তু এমন সামনাসামনি—

কলাগাছের মতন দুই পা, মোজা আছে কি নেই বুঝতে পারলুম না। দেহযষ্টি কথাটা এতদিন ছাপার হরফেই পড়েছি, এখন স্বচক্ষে দেলুখম,—হাঁ, যষ্টি বটে, মাথা থেকে বুক-কোমর অবধি একদম চাঁচাছোলা, কোথাও একটু উঁচুনীচু টক্কর নেই। সঞ্চারিণী পল্লবিনী

লতেব নয়, একবারে জ্বলন্ত হাউইএর কাঠি। দেখে বড়ই ভক্তি হ'ল। কপালে হাত ঠেকিয়ে বললুম—সেলাম মেমসাহেব।

ফিক ক'রে হাসলেন। পাকা লঙ্কার ফাঁক দিয়ে গুটিকতক কাঁচা ভুট্টার দানা দেখা গেল। ঘাড় নেড়ে বললেন—ঘুৎ মর্নিং।

মেম নৃত্যপরা অপ্সরার মতন চঞ্চল ভঙ্গীতে এসে বেঞ্চে বসলেন। আমি কাঁচুমাচু হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লুম। মেম বললেন—সিট ডাউন বাবু, ডরো মৎ।

দেবীর এক হাতে বরাভয়, অপর হাতে সিগারেট। বুঝলুম প্রসন্ন হয়েছেন, আর আমায় মারে কে। ইংরিজী ভাল জানি না, হিন্দী ইংরিজী মিশিয়ে নিবেদন করলুম—নিতান্ত স্থান না পেয়েই এই অনধিকারপ্রবেশ করেছি, অবশ্য গার্ডের হুকুম নিয়ে; মেমসায়েব যেন কসুর মাফ করেন। মেম আবার অভয় দিলেন, আমিও ফের ব'সে পড়লুম।

কিন্তু নিস্তার নেই। মেমসায়েব আমার পাশে ব'সে একটু দাঁত বার ক'রে আমাকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

এই কেদার চাটুজ্যেকে সাপে তাড়া করেছে, বাঘে পেছু নিয়েছে, ভূতে ভয় দেখিয়েছে, হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিসকোর্টের উকিল জেরা করেছে, কিন্তু এমন দুরবস্থা কখনও ঘটে নি। ষাট বছর বয়েস, রংটি উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে না, পাঁচ দিন ক্ষৌরি হয় নি, মুখ যেন কদম ফুল,—কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভেদ ক'রে লজ্জা এসে আমার আকর্ণ বেগনী ক'রে দিলে। থাকতে না পেরে বললুম—মেম সাব, কেয়া দেখতা?

মেম হু-হু ক'রে হেসে বললেন—কুছ নেহি, নো অফেন্স। তুম কোন্ হ্যায় বাবু?

আমার আত্মমর্যাদায় ঘা পড়ল। আমি কি সঙ না চিড়িয়াখানার জন্তু? বুক চিতিয়ে মাথা খাড়া ক'রে বললুম—আই কেদার চাটুজ্যে, নো জু-গার্ডেন।

মেম আবার হু-হু ক'রে হেসে বললেন—বেঙ্গলী ?

আমি সগর্বে উত্তর দিলুম—ইয়েস সার, হাই কাস্ট বেঙ্গলী ব্রাহ্মিণ। পইতেটা টেনে বার ক'রে বললুম—সী ? আপ কোন্ হ্যায় ম্যাডাম ?

বিনোদবাবু বলিলেন—'ছি চাটুজ্যেমশায়, মেমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন ! ওটা যে এটিকেটে বারণ।'

'কেন করব না ? মেম যখন আমার পরিচয় নিলে তখন আমিই বা ছাড়ব কেন। মেম মোটেই রাগ করলেন না, জানালেন তাঁর নাম জোন জিল্‌টার, নিবাস আমেরিকা, এদেশে এর পূর্বেও ক-বার এসেছিলেন, ইণ্ডিয়া বড় আশ্চর্য জায়গা।

আমি সাহস পেয়ে সায়েব দুটোকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—এঁরা কারা ?

মেমটি বড়ই সরলা। বেঞ্চির উপরের ঢ্যাঙা সায়েবের দিকে কড়ে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—হ্যাট চ্যাপি হচ্ছেন টিমথি টোপার, নিবাস কালিফোর্নিয়া, আমাকে বিবাহ করতে চান। ইনি দশ কোটির মালিক। আর যিনি গড়াগড়ি যাচ্ছেন, উনি হচ্চেন ক্রিস্টফার কলম্বস ব্লটো, ইনিও আমাকে বিবাহ করতে চান, এঁরও দশ কোটি ডলার আছে।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম—কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

মেম বললেন—সে অন্য লোক। এঁরা আমেরিকায় থেকেও কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি। দেশটা একদম শুখিয়ে গেছে, মেথিলেটেড স্পিরিট ছাড়া কিছুই মেলে না। তাই এঁরা দেশত্যাগী হ'য়ে খাঁটী জিনিসের সন্ধানে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—এঁরা বুঝি মস্ত স্পিরিচুয়ালিষ্ট ?

মেম বললেন—ভেরি।

এমন সময় ঢ্যাঙা সায়েবটা চোখ মেলে কটমট ক'রে চেয়ে

আমার দিকে ঘুষি তুলে বললে—ইউ-ইউ গেট আউট কুইক। বেঁটে টাও হঠাৎ হাত-পা ছুড়তে সুরু করলে।

আমি আমার লাঠিটা বাগিয়ে ধ'রে ঠক ঠক ক'রে ঠুকতে লাগলুম। মেমসায়েব বিছানা থেকে তাঁর পালকমোড়া চটিজুতো তুলে নিয়ে ঢ্যাঙার তুই গালে পিটিয়ে আদর ক'রে বললেন—ইউ পগ্, ইউ পগ্। বেঁটেটাকে লাথি মেরে বললেন—ইউ পিগ, ইউ পিগ্। তুটোই তখনই আবার হাঁ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ল। মেম তাদের বুকের ওপর এক-এক পাটি চটি রেখে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে এসে বললেন—ভয় নেই বাবু।

ভরসাই বা কই? আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম একটা দৈত্য এক রাজকন্যাকে সিন্দুকে পুরে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত। দৈত্যটা ঘুমুলে রাজকন্যা তার বুকের ওপর একটা ঢিল রেখে দিয়ে যত রাজ্যের রাজপুত্তুর জুটিয়ে আংটি আদায় করতেন। ভাবলুম এইবার সেরেছে রে! এই মেমসায়েব তু-তুটো দৈত্যের ঘাড়ে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে, এখনই নিরানব্বই আংটির মালা বার করবে।

যা ভয় করছিলুম ঠিক তাই। আমার হাতে একটা রুপো আর তামার তারে জড়ানো পলা-বসানো আংটি ছিল। মেম হঠাৎ সেটাকে দেখে বললেন—হাউ লভ্লি! দেখি বাবু কি রকম আংটি।

আমি ভয়ে ভয়ে হাতটি এগিয়ে দিলুম, যেন আঙ্‌লহাড়া অস্তর করাচ্ছি। মেম ফস করে আংটিটি খুলে নিয়ে নিজের আঙুলে পরিয়ে বললেন—বিউটিফুঃ!

হরে রাম! এ যে আমার ত্রিসন্ধ্যা জপ করার আংটি,—হায় হায়, এই ম্লেচ্ছ মাগী সেটাকে অপবিত্র ক'রে দিলে! আমার চোখ ছলছল ক'রে উঠল, কিন্তু কৌতূহলও খুব হ'ল। বললুম—মেমসায়েব, আপ্‌কা আর কয়ঠো আংটি হ্যায়? নাইন্টিনাইন?

মেম বেঞ্চির তলা থেকে একটি তোরঙ্গ টেনে এনে তা থেকে

একটি অদ্ভুত বাক্স খুলে আমাকে দেখালেন। চোখ ঝলসে গেল। দেরাজের পর দেরাজ, কোনওটায় গলার হার, কোনওটায় কানের দুল, কোনওটায় আর কিছু। একটা আংটির ট্রে—তাতে কুড়ি পঁচিশটা হবে—আমার সামনে ধরে বললেন—যেটা খুশি নাও বাবু!

আমি বললুম—সে কি কথা। আমার আংটির দাম মোটে ন-সিকে। আমি ওটা আপনাকে প্রেজেণ্ট করলুম, সাবধানে রাখবেন, ভেরি হোলি আংটি।

মেম বললেন—ইউ ওল্ড ডিয়ার! কিন্তু তোমার উপহার যদি আমি নিই, একটা চুনির আংটি আমার ফেরত দেওয়া উচিত নয়। এই ব'লে একটা চুনির আংটি আমার আঙুলে পরিয়ে দিলেন। বললুম—থ্যাংক ইউ মেমসায়েব, আমি আপনার গোলাম, ফরগেট মি নট। মনে মনে বললুম—ভয় নেই ব্রাহ্মণী, এ আংটি তোমার জন্যেই রইল।

ট্রেন এটাওআয় এসে পৌঁছল। কেলনারের খানসামা চা রুটি মাখন নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—টি হুজুর? মেম ট্রে রাখলেন। তারপর আমার লাঠিটা নিয়ে ঢ্যাঙা আর বেঁটেকে একটু গুঁতো দিয়ে বললেন—গেট আপ টিমি, গেট আপ ব্লটো। তারা বুনো শুয়োরের মতন ঘোঁত ঘোঁত ক'রে কি বললে শুনতে পেলুম না। আন্দাজে বুঝলুম তাদের ওঠবার অবস্থা হয় নি। মেম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—চ্যাটার্জি, তুমি খাবে? আপত্তি নেই তো?

মহা ফাঁপরে পড়া গেল। ম্লেচ্ছ নারীর স্বহস্তে মিশ্রিত, কিন্তু ভুরভুরে খোশবায়, শীতটাও খুব পড়েছে। শাস্ত্রে চা খেতে বারণ কোথাও নেই। তা ছাড়া রেলগাড়ির মতন বৃহৎ কাষ্ঠে ব'সে শীত নিবারণের জন্যে ঔষধার্থে যদি চা পান করা যায় তবে নিশ্চয়ই দোষ

নাস্তি। বললুম—ম্যাডাম লক্ষ্মী, তুমি যখন নিজ হাতে চা দিচ্ছ, তখন কেন খাব না। তবে রুটিটা থাক।

চায়ে মনের কপাট খুলে যায়, খেতে খেতে অনেক বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অশ্বত্থামা যেমন দুধের অভাবে পিটুলি-গোলা খেয়ে আহ্লাদে নৃত্য করতেন, নিরীহ বাঙালী তেমনি চায়েতেই মদের নেশা জমায়। বঙ্কিম চাটুজ্যে তারিফ ক'রে চা খেতে শেখেন নি, সর্দি-টর্দি হ'লে আদা-নুন দিয়ে খেতেন,—তাতেই লিখতে পেরেছেন—বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। আজকাল চায়ের কল্যাণে বাংলা দেশে ভাবের বন্যা এসেছে,—ঘরে ঘরে চা', ঘরে ঘরে প্রেম। সেকালের কবিদের বিস্তর বায়নাক্কা ছিল,—উপবন রে, চাঁদ রে, মলয় রে, কোকিল রে, তবে পঞ্চশর ছুটবে। এখন কোনও ঝঞ্ঝাট নেই,—চাই শুধু দুটো হাতল-ভাঙা বাটি, একটু ছেঁড়া অয়েল ক্লথ, একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল, দু'ধারে দুই তরুণ-তরুণী, আর মধ্যিখানে ধূমায়মান কেতলি। ভাগ্যিস বয়েসটা ষাট, তাই বেঁচে গিয়েছিলুম।

মেমকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা মেমসায়েব, এই যে দুই হুজুর গড়াগড়ি যাচ্ছেন, এঁরা দুজনেই তো আপনার পাণিপ্রার্থী। আপনি কোন্ ভাগ্যবান্‌টিকে বরণ করবেন?

মেম বললেন—সে একটি সমস্যা। আমি এখনও মনস্থির করতে পারি নি। কখনও মনে হয় টিমিই উপযুক্ত পাত্র, বেশ লম্বা সুপুরুষ, আমাকে ভালও বাসে খুব। কিন্তু মদ খেলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর ঐ ব্লটো, যদিও বেঁটে মোটা, আর একটু বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার অত্যন্ত বাধ্য আর নরম মন! একটু মদ খেলেই কেঁদে ফেলে। বড় মুশকিলে পড়েছি, দুজনেই নাছোড়বান্দা। যা হক এখনও ক-ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে, হাওড়া পৌঁছবার আগেই স্থির ক'রে ফেলব। আচ্ছা চাটার্জি, তুমিই বল না—এদের মধ্যে কাকে বিয়ে করা উচিত।

বললুম—মেমসায়েব, আপনি এঁদের স্বভাবচরিত্র যে প্রকার বর্ণনা করলেন তাতে বোধ হয় দুটিই অতি সুপাত্র। তবে কি না এঁরা যেরকম বেহুঁশ হয়ে আছেন—

মেম বললেন—ও কিছু নয়। একটু পরেই দুজনে চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে।

আমি বললুম—আপনার নিজের যদি কোনওটির ওপর বেশী ঝোঁক না থাকে, তবে আপনার বাপ-মার ওপর স্থির করার ভার দিন না ?

মেম বললেন—আমার বাপ-মা নেই, নিজেই নিজের অভিভাবক। দেখ চ্যাটার্জি, তোমার ওপরেই ভার দিলুম। তুমি বেশ ক'রে দুটোকে ঠাউরে দেখ। মোগলসরাইএ নেমে যাবার আগেই তোমার মত আমাকে জানাবে। ভেবেছিলুম একটা টাকা ছুড়ে চিত-উবুড় দেখে মনস্থির করব, কিন্তু তুমি যখন রয়েছ তখন আর দরকার নেই।

ব্যবস্থা মন্দ নয়। আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যে এ পর্যন্ত বিস্তর বর-কনে ঠিক ক'রে দিয়েছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত পাত্র দেখার ভার কখনও পাই নি। দুজনেই ক্রোরপতি, দুটোই পাঁড়মাতাল। একটা লম্বায় বড়, আর একটা ওজনে পুষিয়ে নিয়েছে। বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় এ যাবৎ যা পেয়েছি তা শুধু ঘোঁত ঘোঁত। চুলোয় যাক, মেমের যখন আপত্তি নেই তখন যেটার হয় নাম বলব। আর যদি বুঝি যে মেম আমার কথা রাখবে, তবে বলব—মা লক্ষ্মী, মাথা যখন আগেই মুড়িয়েছ তখন বাকী কাজটুকুও সেরে ফেল।—এই দু-ব্যাটা ভাবী স্বামীকে ঝেঁটিয়ে নরকস্থ কর।

গল্প করতে করতে বেলা প্রায় সাড়ে নটা হ'য়ে এল। এর পরেই একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থামবে, সেই অবসরে সায়েব-মেমরা

হাজরি খেতে খানা-কামরায় যাবে। এতক্ষণ ঠাওর হয় নি, এখন দেখতে পেলুম চা খেয়ে মেমের ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বুঝলুম রংটি কাঁচা। মেম একটি সোনার কৌটো খুললেন, তা থেকে বেরুল একটি ছোট আরশি, একটি লাল বাতি, একটি পাউডারের পুঁটুলি। লালবাতি ঠোঁটে ঘ'সে নাকে একটু পাউডার লাগিয়ে মুখখানি মেরামত ক'রে নিলেন।

গাড়ি থামল। মেম বললেন—চ্যাটার্জি, আমি ব্রেকফাস্ট খেতে চললুম। টিমি আর ব্লটো রইল, এদের দিকে একটু নজর রেখো, যেন জেগে উঠে মারামারি না করে। যদি সামলাতে না পার তবে শেকল টেনো।

আহা, কি সোজা কাজই দিয়ে গেলেন! প্রায় আধ ঘণ্টা পরে কানপুরে গাড়ি থামবে, তখন মেম আবার এই কামরায় ফিরে আসবেন। ততক্ষণ মরি আর কি! লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে ফের দুর্গানাম জপ করতে লাগলুম।

ঢ্যাঙা সায়েবটা উঠে বসেছে। হাই তুললে, চোখ রগড়ালে, আঙুল মটকালে। আমার দিকে একবার কটমট ক'রে চাইলে, কিন্তু কিছু বললে না। টলতে টলতে বাথরুমে গেল।

তখন বেঁটেটা তড়াং করে উঠে কোলা ব্যাঙের মতন থপ ক'রে আমার পাশে এসে বসল। আমি ভয়ে চেঁচাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই সে আমার হাতটা নেড়ে দিয়ে বললে—গুড মর্নিং সার, আমি হচ্ছি ক্রিস্টফার কলম্বস ব্লটো।

আমি সাহস পেয়ে বললুম—সেলাম হুজুর।

—আমার দশ কোটি ডলার আছে। প্রতি মিনিটে আমার আয়—

—হুজুর দুনিয়ার মালিক তা আমি জানি।

ব্লটো আমার বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বললে—লুক হিয়ার বাবু, আমি তোমাকে পাঁচ টাকা বকশিশ দেবো।

—কেন হুজুর ?

—মিস জিল্‌টারকে তোমার রাজী করাতেই হবে। আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেছি। তোমারই ওপর সমস্ত ভার, তুমিই কন্যাকর্তা। ঐ টিমথি টোপার—ও অতি পাজী লোক, ওর সমস্ত সম্পত্তি আমার কাছে বাঁধা আছে। ও একটা পাঁড়মাতাল,



ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল

পপার, ওর সঙ্গে বিয়ে হ'লে মিস জিল্‌টার মনের দুঃখে মারা যাবেন।

এই ব'লে ব্লটো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটা বোতলে একটু তলানি পড়ে ছিল, সেটুকু খেয়ে ফেলে বললে—বাবু, তুমি জন্মান্তর মান ?

—মানি বইকি।

—আমি আর জন্মে ছিলাম একটি তৃষিত চাতক পক্ষী, আর এই মেম ছিল একটি রূপসী পানকৌড়ি। আমরা ছুটিতে—

এমন সময় বাথরুমের দরজা ন'ড়ে উঠল। ব্লটো তাড়াতাড়ি আমাকে পাঁচ আঙুল দেখিয়ে ইশারা ক'রেই ফের নিজের জায়গায় শুয়ে নাক ডাকতে লাগল।

ঢ্যাঙা সায়েব—মেম যাকে টিমি বলে—ফিরে এসে নিজের বেঞ্চে গ্যাঁট হ'য়ে বসল। তখন ব্লটো জেগে ওঠার ভান ক'রে হাই তুললে, চোখ রগড়ালে, আমার দিকে একবার করুণ নয়নে চেয়ে বাথরুমে ঢুকল।

এবার টিমির পালা। ব্লটো স'রে যেতেই সে কাছে এসে আমার হাতটা চেপে ধরলে। আমি আগে থাকতেই বললুম—গুড মর্নিং সার।

টিমি আমার হাতটায় ভীষণ মোচড় দিলে।

বললুম—উঃ!

টিমি বললে—তোমার হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব।

ভয়ে ভয়ে বললুম—ইয়েস সার।

—তোমায় থেঁতলে জেলি বানাব।

—ইয়েস সার।

—মিস জোন জিল্‌টারকে আমি বিয়ে করবই। আমি সমস্ত শুনেছি। যদি আমার হ'য়ে তাকে না বল তবে তোমাকে বাঁচতে হবে না।

—ইয়েস সার।

—আমার অগাধ সম্পত্তি। পাঁচটা হোটেল, দশটা জাহাজ কোম্পানি, পঁচিশটা শুঁটকী শুওরের কারখানা। ব্লটোর কি আছে? একটা মদের চোরা ভাঁটি, তাও আমার টাকায়। ব্লটো একটা হতভাগা মাতাল বেঁটে বজ্জাত—

ব্লটো বোধ হয় আড়ি পেতে সমস্ত শুনছিল। হঠাৎ কামরায় ছুটে ফিরে এসে ঘুষি তুলে বললে—কে হতভাগা, কে মাতাল, কে বেঁটে বজ্জাত ?

সকলেরই বিশ্বাস যে গান আর গালাগাল হিন্দীতেই ভাল রকম জমে। হিন্দী গালাগালের প্রসাদগুণ খুব বেশী তা স্বীকার করি। কিন্তু যদি নিছক আওয়াজ আর দাপট চাও তবে বিলিতী গাল শুনো—বিশেষ ক'রে মার্কিনী গাল। এক-একটি লব্জ যেন তোপ, কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে। ইংরিজী আমি ভাল জানি না, সব গালাগালির অর্থ বুঝতে পারি নি, কিন্তু তাতে রসগ্রহণের কিছু মাত্র বাধা হয় নি।

দেখলুম এক বিষয়ে সায়েবরা আমাদের চেয়ে দুর্বল—তারা বাগ্‌যুদ্ধ বেশীক্ষণ চালাতে পারে না। দু-মিনিট যেতে না যেতেই হাতাহাতি আরম্ভ হ'ল। আমি হতভম্ব হ'য়ে দেখতে লাগলুম, গাড়ি কখন কানপুরে এসে থামল, তা টের পাই নি।

হনহন ক'রে মেমসায়েব এসে পড়ল। এই গজ-কচ্ছপের লড়াই থামানো কি তার কাজ ? বললে—টিমি ডিয়ার, ডোণ্ট্—ব্লটো ডারলিং,—ডোণ্ট্—প্লিজ প্লিজ ডোণ্ট্। কিছুই ফল হ'ল না। আমি বেগতিক দেখে গাড়ি থেকে নেমে ছুটলুম।

ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাস সমস্ত খালি। ডাইনিং কারে সকলে তখনও খানা খাচ্ছে। কাকে বলি ? ওই যে—একটা সাদা ফ্লানেলের পেণ্টুলুন-পরা সায়েব প্লাটফর্মে পাইচারি ক'রে শিস দিচ্ছে। হন্তদন্ত হ'য়ে তাকে বললুম—কাম্ সার, লেডির মহা বিপদ। সায়েব হুশ ক'রে একটি জোরে শিস দিয়ে আমার সঙ্গে ছুটল।

মেম তখন আমার লাঠিটা নিয়ে অপক্ষপাতে দু-ব্যাটাকেই পিটছিলেন। কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, সামনে ঝুটোপটি করছে। আগন্তুক সায়েবটি মেমকে জিজ্ঞাসা করলে—হেলো জোন, ব্যাপার কি ? মেম তাড়াতাড়ি ব্যাপার বুঝিয়ে দিলেন। সাহেব

টিমি আর ব্লটোকে থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তারা তাকেই মারতে এল। নতুন সায়েবের তখন হাত ছুটল।

বাপ, কি ঘুষির বহর! টিমি ঠিকরে গিয়ে দরজায় মাথা ঠুকে



হাতাহাতি আরম্ভ হ'ল

প'ড়ে চতুর্দশ ভুবন অন্ধকার দেখতে লাগল। ব্লটো কোঁক ক'রে বেঞ্চের তলায় চিতপাত হ'য়ে পড়ল। বিলকুল ঠাণ্ডা।

একটু জিরিয়ে নিয়ে মেম আমার সঙ্গে নতুন সায়েবটির পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি বিখ্যাত মিস্টার বিল বাউণ্ডার, খুব ভাল ঘুষি লড়তে পারেন। আর ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি, ভেরি ডিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড।

সায়েব আমার মুখখানা দেখে বললে—সাম্ বিয়ার্ড!

মেম বললেন—থাকুক দাড়ি। ইনি অতি জ্ঞানী লোক।

সায়েব আমার হাতটা খুব ক'রে নেড়ে দিয়ে বললে—হা-ডু-ডু? বেশ শীত পড়ছে নয়?

ধা ক'রে আমার মাথায় একটা মতলব এল। মেমসায়েবকে চুপি চুপি বললুম—দেখুন মিস জোন, অত গোলমালে কাজ কি? টিমি আর ব্লটো দুজনেই তো কাবু হ'য়ে পড়েছে। আমি বলি কি—আপনি এই বিল সায়েবকে বিয়ে করুন। খাসা লোক।

মেম বললেন—রাইটো। আমার একথা এতক্ষণ মনেই পড়ে নি। আই সে বিল, আমায় বিয়ে করবে?

বিল বললে—রাদার। কে বলে আমি করব না?

রাধামাধব! সায়েব জাতটা ভারী বেহায়া। বিলকে বাধা দিয়ে বললুম—রোসো সায়েব, এক্ষুনি ও সব কেন। আমি হচ্ছি ব্রাইডমাস্টার—কন্যাকর্তা। তোমার কুলশীল আগে জেনে নি, তার পর আমি মত দেব।

বিল বললে—আমার ঠাকুরদা ছিলেন মুচি। আমার বাপও ছেলেবেলায় জুতো সেলাই করতেন।

আমি বললুম—তাতে কুলমর্যাদা কমে না। তোমার আয় কত?

বিল একটু হিসেব করে বললে—মিনিটে দশ হাজার, ঘণ্টায় ছ লাখ। কিন্তু চিন্তা করবেন না, আমার মাসী মারা গেলে আয় আর একটু বাড়বে। তাঁর পঁচিশটা বড় বড় পুকুর আছে, নোনা জলে ভরতি, তাতে তিমি মাছ কিলবিল করছে।

বললুম—থাক্, আর বলতে হবে না, আমি মত দিলুম। এগিয়ে এস, আমি আশীর্বাদ করব, রিয়াল হিন্দু স্টাইল।

কিন্তু ধান-দুব্বো কই? জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললুম—এই কুলী, জলদি থোড়া ঘাস ছিঁড়কে লাও, পয়সা মিলেগা।

ইংরিজী আশীর্বাদ তো জানি না। বললুম—যদি আপত্তি না থাকে তবে বাংলাতেই বলি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সাহেবের মাথায় এক মুঠো ঘাস দিয়ে বললুম—বেঁচে থাক। ধন তো যথেষ্ট আছে, পুত্রও হবে, লক্ষ্মী এই সঁপে দিলুম। কিন্তু খবরদার ব্যাটা, বেশী মদ-টদ খেয়ো না, তা হ'লে ব্রহ্মশাপ লাগবে। সাহেব আর একবার আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে নড়া ছিঁড়ে দিলে।

মেমকে বললুম—মা লক্ষ্মী, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হ'ক। বীরপ্রসবিনী হ'য়ে কাজ নেই মা—ও আশীর্বাদটা আমাদের অবলাদের জন্যই তোলা থাক। তুমি আর গরিব কালা-আদমীদের দুঃখের নিমিত্ত হয়ো না,—গুটিকতক শান্তশিষ্ট কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘরকন্না কর।

মেম হঠাৎ তার মুখখানা উঁচু ক'রে আমার সেই পাঁচ দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ির ওপর—'

বিনোবাবু বলিলেন—'আ ছি ছি ছি।'

চাটুজ্যেমশায় বলিলেন—'হুঁ, দেবীচৌধুরানীতে ঐ রকম লিখেছে বটে।'

'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, পাকা লঙ্কার আস্বাদটা কি রকম লাগল?'

'তাতে ঝাল নেই। আরে, ঐ হ'ল ওদের রেওয়াজ, ঐ রকম ক'রেই ভক্তিশ্রদ্ধা জানায়, তাতে লজ্জা পাবার কি আছে।'

চাটুজ্যেমশায় বলিতে লাগিলেন—'তারপর দেখি ঢ্যাঙা আর

বেঁটে মুখ চুন ক'রে নেমে যাচ্ছে, জন-দুই কুলী তাদের মালপত্র নামাচ্ছে।

গাড়ি ছাড়ল। বিল আর জোন হাত ধরাধরি ক'রে নাচ শুরু ক'রে দিলে। আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখতে লাগলুম।



'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক'

জোন বললে—চ্যাটার্জি, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন গ্লাম হ'য়ে বসে থেকো না। আমাদের নাচে যোগ দাও।

বললুম—মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।

—তবে তুমি গান গাও, আমরাই নাচি।

কি আর করা যায়, পড়েছি যবনের হাতে। একটা রামপ্রসাদী ধরলুম।

সমস্ত পথটা এই রকম চলল, অবশেষে মোগলসরাই এল। মেম বললে কলকাতায় গিয়েই তাদের বিয়ে হবে, আমি যেন তিন দিন



নাচ শুরু ক'রে দিল

পরে গ্রাণ্ড হোটেলে অতি অবশ্য তাদের সঙ্গে দেখা করি। বিস্তর শেকহ্যাণ্ড, বিস্তর অনুরোধ, তারপর নেমে কাশীর গাড়ী ধরলুম।.... পরদিন আবার কলকাতা যাত্রা।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, গিন্নী সব কথা শুনেছেন ?'

'কেন শুনবেন না। সতীলক্ষ্মী, তায় পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে। তোমাদের নবীনাদের মতন অবুঝ নন যে অভিমানে চৌচির হবেন। আমি বাড়ী ফিরে এসেই তাঁকে সমস্ত বলেছি।'

'চাটুজ্যেগিন্নী শুনে তখন কি বললেন ?'

'তক্ষুনি একটা উড়ে নাপিত ডেকে বললেন—দে তো রে, বুড়োর মুখখানা আচ্ছা ক'রে চেঁচে, ম্লেচ্ছ মাগী উচ্ছিষ্টি ক'রে দিয়েছে। তারপর সেই চুনির আংটিটা কেড়ে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের আঙ্‌লে পরলেন।'

'বউভাতের ভোজটা কি রকম খেলেন ?'

'সে দুঃখের কথা আর না-ই শুনলে। গ্রাণ্ড হোটেলে গিয়ে জানলুম ওরা কেউ নেই। একটা খানাসামা বললে—বিয়ের পরদিনই বেটী পালিয়েছে। সায়েব তাকে খুঁজতে গেছে।'



আলিপুরের সংবাদ—সাগর আইল্যাণ্ডে বায়ুমণ্ডলে যে গর্ত হইয়াছিল সেটা সম্প্রতি পাকারকম ভরাট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর বৃষ্টি হইবে না। চৌরঙ্গিতে তিনটা সবুজ পোকার অগ্রদূত ধরা পড়িয়াছে। ঘোলা আকাশ ছিঁড়িয়া ক্রমশঃ নীল রং বাহির হইতেছে। রৌদ্রে কাঁসার রং ধরিয়াছে, গৃহিণী নির্ভয়ে লেপ-কাঁথা শুকাইতেছেন। শেষরাত্রে একটু ঘনীভূত হইয়া শুইতে হয়। টাকায় এক গণ্ডা রোগা-রোগা ফুলকপির বাচ্চা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে। স্থলে জলে মরুৎ-ব্যোমে দেহে মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেকালে রাজারা এই সময়ে দিগ্‌বিজয়ে যাইতেন।

আদালত বন্ধ, আমার গৃহ মক্কেলহীন। সার্কুলার রোড়ে ধাপা-মেলের বাঁশি পোঁ করিরা বাজিল—চমকিত হইয়া দেখিলাম বড় ছেলেটা জিওমেট্‌রি ত্যাগ করিয়া রেলের টাইম-টেব্‌ল অধ্যয়ন করিতেছে। ছোট ছেলেটার ঘাড়ে এঞ্জিনের ভূত চাপিয়াছে, সে ক্রমাগত দু-হাতের কনুই ঘুরাইয়া ছুঁচার মতন মুখ করিয়া বলিতেছে—ঝুক ঝুক ঝুক ঝুক। মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

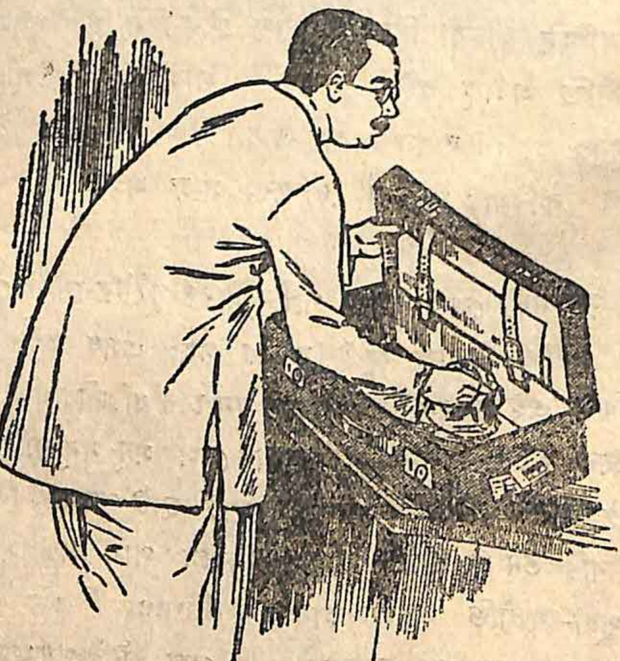
এবার কোথা যাওয়া যায়? দু-একজন মহাপ্রাণ বন্ধু বলিলেন—পূজার ছুটিতে দেশে যাও, পল্লীসংস্কার কর। কিন্তু অতীব লজ্জার

সহিত স্বীকার করিতেছি যে বহু বহু সৎকার্যের ন্যায় এটিও আমার দ্বারা হইবার নয়। জানামি ধর্মং—অন্ততঃ মোটামুটি জানি, কিন্তু ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। ভ্রমণের নেশা আমার মাথা খাইয়াছে।

পদব্রজ, গোযান, মোটর, নৌকা, জাহাজ—এসব মাঝে মাঝে মুখ বদলাইবার জন্য মন্দ নয়। কিন্তু যানের রাজা রেলগাড়ি, রেলগাড়ির রাজা ই. আই. আর। বন্ধু বলেন—ইংরেজের জিনিসে তোমার অত উৎসাহ ভাল দেখায় না। আচ্ছা, রেল না-হয় ইংরেজ করিয়াছে কিন্তু খরচটা কে যোগাইতেছে? আজ না-হয় আমরা ইংরেজকে সহিংস বাহবা দিতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন সেও আমাদের কীর্তি অবাক্ হইয়া দেখিত। আবার পাশা উল্টাইবে, দু-শ বৎসর সবুর কর। তখন তারায় তারায় মেল চালাইব, ইংরেজ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিবে, সঙ্গে লইব না,—পয়সা দিলেও না।

বাংলার নদ-নদী ঝোপ-ঝাড়, পল্লীকুটীরের ঘুঁটের সুমিষ্ট ধোঁয়া, পানা-পুকুর হইতে উত্থিত জুই ফুলের গন্ধ—এসব অতি স্নিগ্ধ জিনিস। কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। পাঞ্জাব-মেল সন্ সন্ ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড়, নিমেষে নিমেষে পট-পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিরাম পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম, পুরী-কচৌড়ি রোটি-কাবাব, dinner sir at Shikohabad? তার পর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, দু-পাশে আকের খেত স্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দূরে প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিদূরের শ্যামায়মান অরণ্যানীকে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়া এক ঝলক উগ্রমধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তার পর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে।

ওদিকের বেঞ্চে স্থুলোদর লালাজী এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গীটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরও দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী—তা ছাড়া বেতের বাক্সে আরও অনেক আছে। গাড়ির অঙ্গে অঙ্গে লোহা-লক্কড়ে চাকার ঠোক্করে জিঞ্জিরডাণ্ডার ঝঞ্চনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিতপাত হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন অস্ত্, ওআ হমীন অস্ত্!



আমার বড় সুটকেসটা ঝাড়িতেছি—

এই পাশবিক পরিকল্পনা—এই অহেতুকী রেলওয়েপ্রীতি—ইহার পশ্চাতে মনস্তত্ত্বের কোন্ দুষ্ট সর্প লুক্কায়িত আছে? গিরীন বোসকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম—ডালহাউসি যাইব, আমার এক পাঞ্জাবী বন্ধুর নিমন্ত্রণে। একাই যাইব, গৃহিনীকে একটা মোটা রকম ঘুষ এবং অজস্র থিয়েটার

দেখার অনুমতি দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখিব। কিন্তু man proposes woman disposes।

আমার বড় সুটকেসটা ঝাড়িতেছি, হঠাৎ বিদ্যুল্লতার মত ছুটিয়া আসিয়া গৃহিণী বলিলেন—'হোআট-হোআট-হোআট ?'

এইখানে একটা কথা চুপি চুপি বলিয়া রাখি। গৃহিণীর ইংরেজী বিদ্যা ফার্স্ট বুক পর্যন্ত। কিন্তু তিনি আমার ফাজিল শ্যালকবৃন্দের



'হোআট—হোআট—হোআট'

কল্যাণে গুটিকতক মুখরোচক ইংরেজী শব্দ শিখিয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই সেগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম—'এই মনে করেছি ছুটির ক-দিন একটু পাহাড়ে কাটিয়ে আসি, শরীরটা একটু ইয়ে কিনা।'

গৃহিণী বলিলেন—'হোআট ইয়ে? হুঁ, একাই যাবার মতলব দেখছি—আমি বুঝি একটা মস্ত ভারী বোঝা হয়ে পড়েছি? পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা হবে নাকি?'

সভয়ে দেখিলাম শ্রীমুখ ধূমায়মান, বুঝিলাম পর্বতো বহ্নিমান্। খাঁ করিয়া মতলব বদলাইয়া ফেলিয়া বলিলাম—'রাম বল, একা কখনও তপস্যা হয়? আমি হব না হব না হব না তাপস যদি না মিলে তপস্বিনী।'

মন্ত্রবলে স্মোক নুইসান্স কাটিয়া গেল, গৃহিণী সহাস্যে বলিলেন—'হোআট পাহাড়?'

আমি। ডালহাউসি। অনেক দূর।

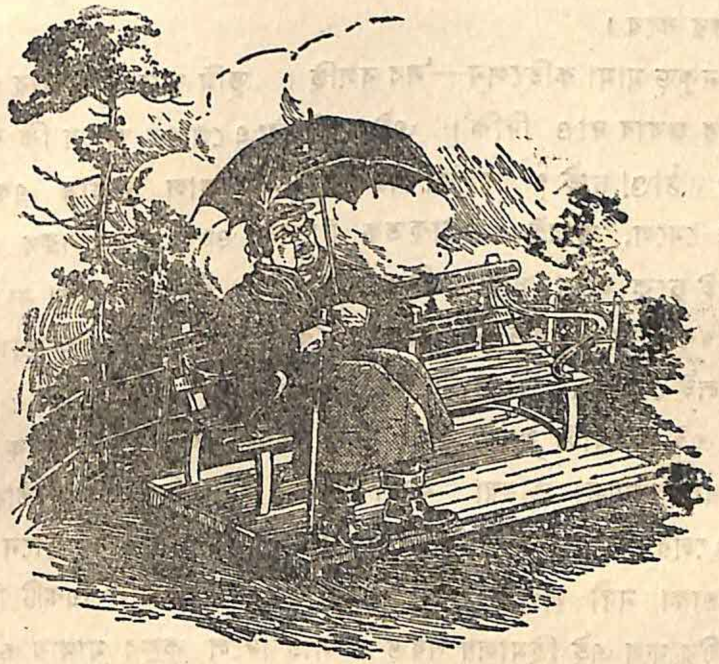
গৃহিণী। হ্যাং ডালহাউসি। দার্জিলিং চল। আমার ত্রিশ ছড়া পাথরের মালা না কিনলেই নয়, আর চার ডজন ঝাঁটা। আর অত দাম দিয়ে গলায় দেবার শুঁয়োপোকা কেনা হ'ল—সেই যে বোআ না কি বলে—আর-হীরে-বসানো চরকা-ব্রোচ—তা তো এ পর্যন্ত পরতেই পেলুম না। তোমার সেই ডালকুত্তো পাহাড়ে সে-সব দেখবে কে? দার্জিলিংএ বরঞ্চ কত চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে। টুনি-দিদি, তার ননদ, এরা সব সেখানে আছে। সরোজিনীরা, সুকু-মাসী, এরাও গেছে। মংকি মিত্তিরের বউ তার তেরোটা এঁড়িগেঁড়ি ছানাপোনা নিয়ে গেছে।

যুক্তি অকাট্য, সুতরাং দার্জিলিং যাওয়াই স্থির হইল।

দার্জিলিংএ গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশদিক্ আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে। প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা

বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিন্‌টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি।....জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতে ছিলাম—অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভাল লাগে না....এমন সময় অনতিদূরে—

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত আশ্চর্য রকম মিল আছে। কিন্তু আমার অদৃষ্ট অন্যপ্রকার,—বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর



নকুড় মামা

পুত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দেখা হইল ডুম্‌রাওনের মোক্তার নকুড় চৌধুরীর সঙ্গে, যিনি সম্পর্কনির্বিশেষে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই সরকারী মামা।

নকুড়-মামা পথের পার্শ্বস্থিত খদের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া আছেন। তাঁর মাথায় ছাতা, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে ওভারকোট, চক্ষুতে ভ্রূকুটি, মুখে বিরক্তি। আমাকে দেখিয়া কহিলেন—'ব্রজেন নাকি ?'

বলিলাম—'আজ্ঞে হ্যাঁ। তার পর, আপনি যে হঠাৎ দার্জিলিংএ? বাড়ির সব ভাল তো? কেষ্টর খবর কি—বেনারসেই আছে নাকি? কি করছে সে আজকাল?'—কেষ্ট নকুড়-মামার আপন ভাগিনেয়, বেনারসের বিখ্যাত যাদব ডাক্তারের একমাত্র পুত্র, পিতৃমাতৃহীন, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। সে একটু পাগলাটে লোক, নকুড়-মামাকে বড়-একটা গ্রাহ্য করে না, তবে আমাকে কিছু খাতির করে।

নকুড়-মামা কহিলেন—'সব বলছি। তুমি আগে আমার একটা কথার জবাব দাও দিকি। এই দার্জিলিংএ লোকে আসে কি করতে হ্যা? ঠাণ্ডা চাই? কলকাতায় তো আজকাল টাকায় এক মন বরফ মেলে, তারই গোটাকতক টালির ওপর অয়েলক্লথ পেতে শুলেই চুকে যায়, সস্তায় শীতভোগ হয়। উঁচু চাই—তা না হ'লে শৌখিন বাবুদের বেড়ানো হয় না? কেন রে বাপু, দু-বেলা তালগাছে চড়লেই তো হয়। যত সব হতভাগা—।'

এই পৃথিবীটা যখন কাঁচা ছিল তখন বিশ্বকর্মা তাহাকে লইয়া একবার আচ্ছা করিয়া ময়দা-থাসা করিয়াছিলেন। তাঁর দশ আঙুলের গাঁট্টার ছাপ এখনও রহিয়া গিয়া স্থানে স্থানে পর্বত উপত্যকা নদী জলধি সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বকর্মার একটি বিরাট্ চিমটির ফল এই হিমালয় পর্বত। নাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে,—ভগবানের আশকারা পাইয়া মানুষ হিমালয়ের বুকে চড়িয়া দার্জিলিংএ বাসা বাঁধিয়াছে। নকুড়-মামা ধর্মভীরু লোক, অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না।

আমি বলিলাম—'কি জানেন নকুড়-মামা, কষ্ট পাবার যে আনন্দ, তাই লোকে আজকাল পয়সা খরচ ক'রে কেনে। অমৃত বোস লিখেছে—

ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে যেতে পারে পয়সা দিয়ে ওপারে।

দার্জিলিং আছে তাই লোকের পয়সা খরচ ক'রে পাহাড় ডিঙোবার বদখেয়াল হয়েছে। তবে এইটুকু আশার কথা—এখানে মাঝে মাঝে ধস নাবে।'

মামা ত্রস্ত হইয়া খদের কিনারা হইতে সরিয়া রাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ প্রান্তে আসিয়া বলিলেন—'উচ্ছন্ন যাবে। এটা কি ভদ্দর লোকের থাকবার দেশ? যখন-তখন বৃষ্টি, বাসা থেকে বেরুলে তো দশ তালার ধাক্কা, দু-পা হাঁটো আর দম নাও। তাও সিঁড়ি নেই, হোঁচট খেলে তো হাড়গোড় চূর্ণ। চললে হাঁপানি, থামলে কাঁপুনি—কেন রে বাপু?'

নকুড়-মামা চারিদিকে একবার ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সময়টা যদি সত্য ত্রেতা অথবা দ্বাপর যুগ হইত এবং মামা যদি মুনি-ঋষি বা ভস্মলোচন হইতেন, তবে এতক্ষণে সমস্ত দার্জিলিং শহর সাহারা মরুভূমি অথবা ছাইগাদা হইয়া যাইত। আমি বলিলাম—'তবে এলেন কেন?'

নকুড়। আরে এসেছি কি সাধে। কেষ্টার স্বভাব জানো তো? লেখাপড়া শিখলি, বে-থা কর্, বিষয়-আশয় দেখ্—রোজগার তো আর করতে হবে না। সে সব নয়। দিনকতক খেয়াল হ'ল ছবি আঁকলে। তার পর আমসত্ত্বর কল ক'রে কিছু টাকা ওড়ালো। তারপর কলকাতায় গিয়ে কতকগুলো ছোঁড়ার সর্দার হ'য়ে একটা সমিতি করলে। তার পর বম্বে গেল, সেখান থেকে আমাকে এক আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম। কি হুকুম? না এক্ষুনি দার্জিলিং যাও, মুন-শাইন ভিলায় ওঠ, আমিও যাচ্ছি, বিবাহ করতে চাই। কি করি, বড়লোক ভাগনে, সকল আবদার শুনতে হয়। এসে দেখি—মুন-শাইন ভিলায় নরক গুলজার। বরযাত্রীর দল আগে থেকে এসে ব'সে আছে। সেই রুচি-সংসদ্,—কেষ্টা যার প্রেসিডেণ্ট।

আমি। পাত্রী ঠিক হয়েছে?

নকুড়। আরে কোথায় পাত্রী! এখানে এসে হয়তো একটা লেপচানী কি ভুটানী বিয়ে করবে।

আমি। কচি-সংসদের সদস্যেরা কিছু জানে না?

নকুড়। কিচ্ছু না। আর জানলেই বা কি, তাদের কথাবার্তা আমি মোটেই বুঝতে পারি না, সব যেন হেঁয়ালি। তবে তারা খায়-দায় ভাল, আমার সঙ্গে তাদের ঐটুকুই সম্বন্ধ। কেষ্টবাবাজী আজ বিকেলে পৌঁছবেন। সন্ধ্যেবেলা যদি এস, তবে সবই টের পাবে, সংসদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হবে।

কচি-সংসদের কথা পূর্বে শুনিয়াছি। এদের সেক্রেটারি পেলব রায় আমাদের পাড়ার ছেলে, তার পিতৃদত্ত নাম পেলারাম। বি, এ, পাস করিয়া ছোকরার কচি এবং মোলায়েম হইবার বাসনা হইল। সে গোঁফ কামাইল, চুল বাড়াইল এবং লেডি-টাইপিস্টের খোপার মতন মাথার দু-পাশ ফাঁপাইয়া দিল। তার পর মুগার পঞ্জাবি, গরদের চাদর, সবুজ নাগরা ও লাল ফাউণ্টেন পেন পরিয়া মধুপুরে গিয়া আশু মুখুজ্যেকে ধরিল—ইউনিভার্সিটির খাতাপত্রে পেলারাম রায় কাটিয়া যেন পেলব রায় করা হয়। সার আশুতোষ এক ভলুম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন। পেলারাম পলাইয়া আসিল এবং বি. এ. ডিপ্লোমা বাক্সে বন্ধ করিয়া নিরুপাধিক পেলব রায় হইল। তারই উদ্যমে কচি-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তবে যতদূর জানি কেষ্টই সমস্ত খরচাপত্র যোগায়। এই কচি সংসদের উদ্দেশ্য কি আমার ঠিক জানা নাই। শুনিয়াছি এরা যাকে তাকে মেম্বার করে না এবং নূতন মেম্বারের দীক্ষাপ্রণালীও এক ভয়াবহ ব্যাপার। গভীর পূর্ণিমা নিশীথে সমবেত সদস্য-মণ্ডলীর করস্পর্শ করিয়া দীক্ষার্থী ষোলটি ভীষণ শপথ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ষোল টিন সিগারেট পোড়ে এবং এনতার চা খরচ হয়।

অনেক বেলা হইয়াছে, মেঘও কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময়

নিশ্চয়ই মুন-শাইন ভিলায় যাইব বলিয়া নকুড়-মামার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।



পেলব রায়

গৃহিণী তিন ছড়া পাঁচ সিকা দামের চুনি-পান্নার মালা উপর্যুপরি গলায় পরিয়া বলিলেন—'দেখ তো, কেমন মানাচ্ছে।'

আমি বলিলাম—'চমৎকার। যেন পরস্ত্রী।'

গৃহিণী। তুমি একটি ক্যাড। পরস্ত্রী না হ'লে বুঝি মনে ধরে না?

আমি। আরে চট কেন। পরকীয়াতত্ত্ব অতি উঁচুদরের জিনিস। তার মহিমা বোঝা যার তার কম্ম নয়, তবে যে নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রীর মতন নিত্যনূতন—ধরি ধরি ধরিতে না পারি—দেখে, সে অনেকটা এগিয়েছে। রাধাকৃষ্ণই হচ্ছেন মডেল প্রেমিক। ফ্রয়েড বলেছেন—

গৃহিণী। ড্যাম ফ্রয়েড—অ্যাণ্ড রাধাকৃষ্ণ মাথায় থাকুন। আমাদের মতন মুখ্খু লোকের সীতারামই ভাল।

আমি। কিন্তু রাম যে সীতাকে দু-দুবার পোড়াতে চাইলেন তার কি?

গৃহিণী। সে ত লোকনিন্দেয় বাধ্য হ'য়ে। ত্রেতাযুগের লোকগুলো ছিল কুচুণ্ডে রাসকেল।

আমি। তা—তিনি ভরতকে রাজ্য দিয়ে সীতাকে নিয়ে আবার বনে গেলেই পারতেন।

গৃহিণী। সেই আহ্লাদে প্রজারা যে রামকে ছাড়তে চাইলে না।

আমি। বাঃ তুমি আমার চাইতে ঢের বড় উকিল। আমি তোমাকে রামচন্দ্রের তরফ থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু ভাগ্যিস তিনি সীতার মতন বউ পেয়েছিলেন তাই নিস্তার পেয়ে গেলেন। তোমার পাল্লায় পড়লে অযোধ্যা শহরটাকেই ফাঁসি দিতে হ'ত।

গৃহিণী। কেন, আমি কি শূর্পনখা না তাড়কা রাক্ষুসী?

আমি। সীতা ছিলেন গোবেচারী লক্ষ্মীমেয়ে। তোমার মতন আবদেরে নয়।

গৃহিণী। সোনার হরিণ কে চেয়েছিল মশায়? কত ওজন তার খোঁজ রাখ? যদি ফাঁপা হয় তবু পাঁচ হাজার ভরি।

আমি। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমারই জিত। আর শুনেছ, কেষ্ট যে এখানে বিয়ে করতে আসছে। সেই কাশীর কেষ্ট।

গৃহিণী। হুরে! ভাগ্যিস খানকতক গহনা এনেছি। কিন্তু আশ্বিন মাসে লগ্ন কই?

আমি। প্রেমের তেজ থাকলে লগ্নে কি আসে যায়। তবে পাত্রীটি কে তা কেউ জানে না। হয়তো এখনও পাত্রীই স্থির হয় নি, যদিও বরযাত্রীর দল হাজির।

গৃহিণী। গ্যাড! শুনেছিলুম কেষ্টর বাপের ইচ্ছে ছিল টুনি দিদির ননদের সঙ্গে কেষ্টর বিয়ে দিতে। সে মেয়ে তো এখানেই আছে, আর বড়-সড়ও হয়েছে। তারও বাপ-মা নেই, তার দাদা—টুনি-দির বর ভুবনবাবু—তিনিই এখন অভিভাবক।

আমি। তা বলতে পারি না। কেষ্টর মতিগতি বোঝা শিবের অসাধ্য। যাই হ'ক, সন্ধ্যার সময় একবার কেষ্টর বাসায় যাব।

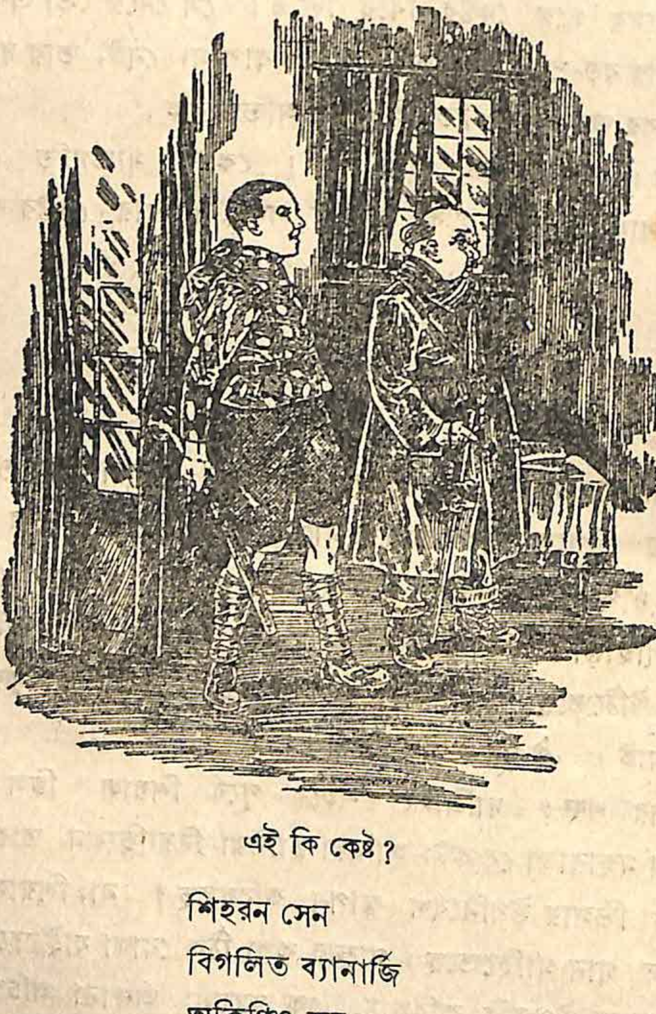
মনোহারিণী সন্ধ্যা। জনবিরল পথ দিয়া চলিয়াছি। শহরের সর্বত্র—উপরে, আরও উপরে, নীচে, আরও নীচে—স্তরে স্তরে অগণিত দীপমালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার দু-ধারে ঝোপে জঙ্গলে পাহাড়ী ঝিঁঝির অলৌকিক মূর্ছনা ষড়্‌জ হইতে নিষাদে লাফাইয়া উঠিতেছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কুয়াশার চিহ্নমাত্র নাই। ঐ মুন-শাইন ভিলা।

কিসের শব্দ? দার্জিলিং শহরে পূর্বে শিয়াল ছিল না। বর্ধমানের মহারাজা যে-কটা আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তারা কি মুন-শাইন ভিলায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে? না, শিয়াল নয়, কচি-সংসদ গান গাহিতেছে। গানের কথা ঠিক বোঝা যাইতেছে না, তবে আন্দাজে উপলব্ধি করিলাম, এক অচেনা অজানা অচিন্তনীয়া অরক্ষণীয়া বিশ্ব তরুণীর উদ্দেশ্যে কচি-গণ হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিতেছে। হা নকুড় মামা, তোমার কপালে এই ছিল?

আমাকে দেখিয়া সংসদ গান বন্ধ করিল। মামা ও কেষ্টকে দেখিলাম না। কেষ্ট আজ বিকালে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু কোথায়

উঠিয়াছে কেহ জানে না। শীঘ্রই সে মুন শাইন ভিলায় আসিবে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

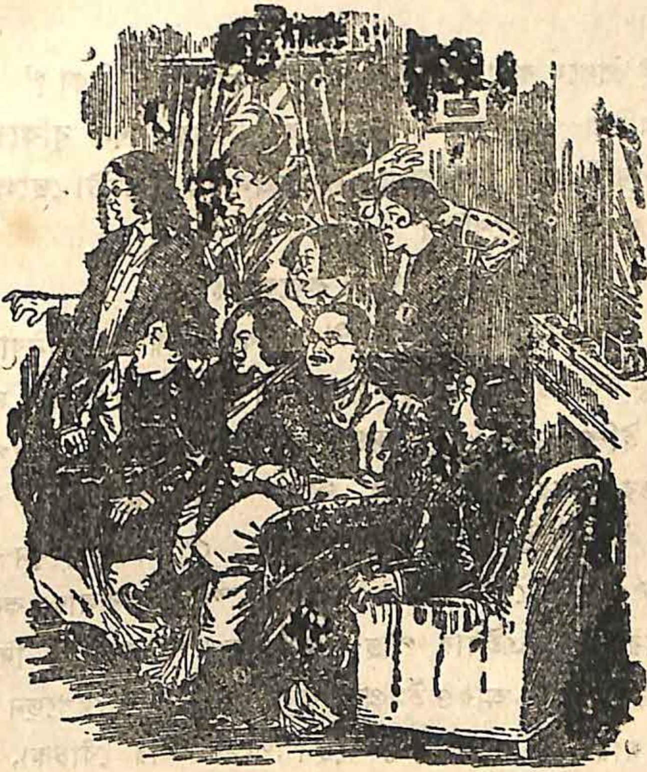
পেলব রায় আমাকে খাতির করিয়া বসাইল এবং সংসদের অন্যান্য সভ্যগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল, যথা—



এই কি কেষ্ট?

শিহরন সেন
বিগলিত ব্যানার্জি
অকিঞ্চিৎ কর
হুতাশ হালদার
দোদুল দে
লালিমা পাল (পুং)

এদের নাম কি অন্নপ্রাশনলব্ধ না সজ্ঞানে স্বনির্বাচিত ? ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু চক্ষুলজ্জা বাধা দিল। লালিমা পাল মেয়ে নয়। নাম শুনিয়া অনেকে ভুল করে, সেজন্য সে আজকাল নামের পর 'পুং' লিখিয়া থাকে।



সমগ্র কচি-সংসদ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল

হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া নকুড় মামা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর পিছনে ও কে ? এই কি কেষ্ট ? আমি একাই চমকিত হই নাই, সমগ্র কচি-সংসদ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। হুতাশ বেচারা নিতান্ত ছেলেমানুষ, সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে,—সে আঁতকাইয়া উঠিল।

কেষ্টর আপাদমস্তক বাঙালীর আধুনিক বেশবিন্যাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। তার মাথার চুল কদম্বকেশরের মতন

ছাটা, গোঁফ নাই কিন্তু ঠোঁটের নীচে ছোট এক গোছা দাড়ি আছে, গায়ে সবুজ রঙের খাটো জামা—তাতে বড় বড় সাদা ছিট, কোমরে বেল্ট, মালকোঁচা-মারা বেগনী রঙের ধুতি, পায়ে পটি ও বুট, হাতে একটি মোটা লাঠি বা কোঁতকা, পিঠে ক্যাম্বিসের হ্যাপস্যাক ষ্ট্রাপ দিয়া বাঁধা।

আমিই প্রথমে কথা কহিলাম....'কেষ্ট, একি বিভীষিকা ?'

কেষ্ট বলিল—'প্রথমটা তাই মনে হবে, কিন্তু যখন বুঝিয়ে দেব তখন বলবেন হাঁ কেষ্ট ঠিক করেছে। ব্রজেন-দা, জীবনটা ছেলেখেলা নয়, আর্ট অ্যাণ্ড এফিশেন্সি।'

আমি। কিন্তু চেহারাটা অমন করলে কেন ?

কেষ্ট। শুনুন। মানুষের চুলটা অনাবশ্যক, শীততাপ নিবারণের জন্যে যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকু রেখেছি। এই যে দেখছেন দাড়ি, একে বলে ইম্পিরিয়াল, এর উদ্দেশ্য নাকটা ব্যালান্স করা। আপনারা সাদা ধুতির ওপর ঘোর রঙের জামা পরেন—অ-ফুল। তাতে চেহারাটা টপ-হেভি দেখায়। আমার পোশাক দেখুন—প্লাম ভায়োলেট অ্যাণ্ড সেজ-গ্রীন, হোয়াইট স্পট্‌স—কলার কনট্রাস্ট অ্যাণ্ড হারমনি। এইবার পাছাপাড় হাফপ্যাণ্ট ফরমাশ দিয়েছি, তাতে ওয়েস্ট-লাইন আরও ইমপ্রুভ করবে। এই যে দেখছেন লাঠি, এতে বাঘ মারা যায়। এই যে দেখছেন পিঠের ওপর বোঁচকা, এতে পাবেন না এমন জিনিস নেই। আমি স্বাবলম্বী, স্বয়ংসিদ্ধ, বেপরোয়া।

এই পর্যন্ত বলিয়া কেষ্ট দুই পকেট হইতে দুই প্রকার সিগারেট বাহির করিল যুগপৎ টানিতে টানিতে বলিল—'পারেন এ রকম ? একটা ভার্জিনিয়া একটা টার্কিশ। মুখে গিয়ে ব্লেণ্ড হচ্ছে।'

নকুড়-মামা চক্ষু মুদিয়া অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষবৎ বসিয়া রহিলেন তাঁহার অভ্যন্তরে বিস্ময় ও ক্রোধ ধিকিধিকি জ্বলিতেছে।

পেলব রায় বলিল—কেষ্টবাবু আপনি না রুচি-সংসদের সভাপতি ? আপনি শেষটায় এমন হলেন ?'

কেষ্ট। কচি ছিলুম বটে, কিন্তু এখন পাকবার সময় হয়েছে।

আমি। নিশ্চয়ই, নইলে দরকচা মেরে যাবে। যাক ওসব কথা,—কেষ্ট তুমি নাকি বে করবে?'

কেষ্ট। সেই পরামর্শ করতেই তো আসা। অপনিও এসেছেন খুব ভালই হয়েছে। প্রথমে আমি প্রেম সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই।

আমি। নকুড়-মামা, আপনি ওপরে গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন—আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না। যা স্থির হয় পরে জানাব এখন। তার পর কেষ্ট, প্রেম কি প্রকার?—একটু চা হ'লে যে হ'ত।

পেলব হাঁকিল—'বোদা—বোদা—।' বোদা বলিল—'জু!'

বোদা কেষ্টর চাকর, নেপালী ক্ষত্রিয়। তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায় যে সে চন্দ্রবংশাবতংস। পেলব তাহাকে দশ পেয়ালা চা আনিতে বলিল।

কেষ্ট বলিতে লাগিল—'প্রেম সম্বন্ধে লোকের অনেক বড় বড় ধারণা আছে। চণ্ডীদাস বলছেন—নিমে দুধ দিয়া একত্র করিয়া ঐছন কানুর প্রেম। রাশিয়ান কবি ভড্‌কাউইস্কি বলেন—প্রেম একটা নিকৃষ্ট নেশা। মেট্‌স্নিকফ বলেন—প্রেমে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঘোল আরও উপকারী। মাদাম দে সেইয়াঁ বলেন—প্রেমই নারীর একমাত্র অস্ত্র যার দ্বারা পুরুষের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়া যায়। ওমর খায়য়াম লিখেছেন—প্রেম চাঁদের শরবত, কিন্তু তাতে একটি শিরাজী মিশুতে হয়। হেনরি-দি-এইট্‌থ বলেছিলেন,—প্রেম অবিনশ্বর, একটি প্রেমপাত্রী বধ করলে পর পর আর দশটি এসে জোটে। ফ্রয়েড বলেন—প্রেম হচ্ছে পশু-ধর্মের ওপর সভ্যতার পলেস্তারা। হ্যাভেলিক এলিস বলেন—'

আমি। ঢের হয়েছে। তুমি নিজে কি বল তাই শুনতে চাই।

কেষ্ট। আমি বলি—প্রেম একটা ধাপ্পাবাজি, যার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে ঠকায়।

রুচি-সংসদ্ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিল! হুতাশ বুকে হাত দিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল—'ব্যথা, ব্যথা।'

কেষ্ট বলিল—'হুতো, অমন করছিস 'কেন রে,? বেশী সিগারেট খেয়েছিস বুঝি? আর খাস নি?'

লালিমা পালের গলা হইতে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ নির্গত হইল—জাপানী ঘড়ি বাজিবার পূর্বে যে-রকম করে সেই প্রকার। তার গলাটা স্বভাবতঃ একটু শ্লেষ্মাজড়িত। কলিকাতায় থাকিতে সে কোকিলের ডিমের সঙ্গে মকরধ্বজ মাড়িয়া খাইত, কিন্তু এখানে অনুপান অভাবে ঔষধ বন্ধ আছে। কেষ্ট তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিল—'নেলো, তোর যদি প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলবার থাকে তো বল্ না।'

লালিমা বলিল—'আমার মতে প্রেম হচ্ছে একটা—একটা—একটা—'

আমি সজেস্ট করিলাম—'ভূমিকম্প।'

কেষ্ট। এগ্‌স্যাক্টলি। প্রেম একটা ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, নায়াগ্রা-প্রপাত, আকস্মিক বিপদ—যাতে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।

লালিমা আর একবার বাজিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তার প্রতিবাদ নিষ্ফল জানিয়া অবশেষে নিরস্ত হইল।

আমি বলিলাম—'তবে তুমি বিয়ে করতে চাও কেন? কত টাকা পাবে হে?'

কেষ্ট। এক পয়সাও নেব না। আমি বিবাহ করতে চাই জগতকে একটা আদর্শ দেখাবার জন্যে। জগতে দু-রকম বিবাহ চলিত আছে। এক হচ্ছে—আগে বিবাহ, তার পরে প্রেম, যেমন সেকেলে হিঁদুর। আর এক রকম হচ্ছে—আগে প্রেম, তার পর বিবাহ, অর্থাৎ কোর্টশিপের পর বিবাহ। আমি বলি—দু-ই ভুল। আগে বিবাহ হ'লে পরে যদি বনিবনাও না হয়, তখন কোথা থেকে প্রেম আসবে? আর—আগে প্রেম, পরে বিবাহ, এও সমান খারাপ,

কারণ কোর্টশিপের সময় দু-পক্ষই প্রেমের লোভে নিজের দোষ ঢেকে রাখে। তার পর বিবাহ হ'য়ে গেলে যখন গলদ বেরিয়ে পড়ে তখন টু লেট।

আমি। ওসব তো পুরনো কথা বলছ। তুমি কি ব্যবস্থা করতে চাও তাই বল!

কেষ্ট। আমার সিস্টেম হচ্ছে—প্রেমকে একদম বাদ দিয়ে কোর্টশিপ চালাতে হবে, কারণ প্রেমের গন্ধ থাকলেই লুকোচুরি আসবে। চাই—দু-জন নির্লিপ্ত সুশিক্ষিত নরনারী, আর একজন বিচক্ষণ ভুক্তভোগী মধ্যস্থ ব্যক্তি—যিনি নানা বিষয়ে উভয় পক্ষের মতামত বেশ করে মিলিয়ে দেখবেন। আমি একটা লিস্ট করেছি। এতে আছে—বেশভূষা, আহার্য, শয্যা, পাঠ্য, কলাচর্চা, বন্ধু-নির্বাচন, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদি তিরেনব্বইটি অত্যন্ত দরকারী বিষয়, যা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর হরদম মতভেদ হ'য়ে থাকে। প্রথমেই যদি এইসব মোকাবেলা হ'য়ে যায় এবং অধিকাংশ বিষয়ে দু-পক্ষের এক মত হয়, আর বাকী অল্পস্বল্প বিষয়ে একটা রফা করা চলে, তা হ'লে পরে গোলযোগের ভয় থাকবে না। কিন্তু খবরদার, গোড়াতেই প্রেম এসে না জোটে, তা হ'লেই সব ভণ্ডুল হবে। শেষে যত খুশি প্রেম হ'ক তাতে আপত্তি নেই। এতদিন চলছিল—কোর্টশিপ, আর আমার সিস্টেম হচ্ছে—হাইকোর্টশিপ।

আমি। কোর্ট-মার্শাল বললে আরও ঠিক হয়। সিস্টেম তো বুঝলুম, কিন্তু এমন পাত্রী কে আছে যে তোমার এই এক্সপেরিমেণ্টে রাজী হবে? তবে তুমি যে প্রেমের ভয় করছ সেটা মিথ্যে। তোমার ঐ মূর্তি দেখলে প্রেম বাপ বাপ ক'রে পালাবে।

কেষ্ট। পাত্রী আমি আজ ঠিক ক'রে এসেছি।

আমি। কে সেই হতভাগিনী?

কেষ্ট। ভুবন বোসের ভগ্নী, পদ্মমধু বোস।

আমি। আরে! আমাদের টুনি-দিদির ননদ? তাই বল।

গিন্নী তা হ'লে ঠিক আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু শুনলুম তোমাদের বিয়ের কথা নাকি আগেই একবার হয়েছিল। এতে কেস প্রেজুডিস্‌ড হবে না?

কেষ্ট। মোটেই না। আমরা দু-পক্ষই নির্বিকার। ব্রজেন-দা, আপনাকেই মধ্যস্থ হ'তে হবে কিন্তু। আপনার লিগাল ম্যাট্রিমনিয়াল দু-রকম অভিজ্ঞতাই আছে, ভাল ক'রে জেরা করতে পারবেন।

আমি। রাজী আছি, কিন্তু মেয়েটা আমার ওপর না চটে।

কেষ্ট। কোন ভয় নেই, পদ্ম অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ লোক।

আমি। লোকটি তো বুদ্ধিমান্, কিন্তু মেয়েটি কেমন?

কেষ্ট। মজবুত ব'লেই তো বোধ হয়। সাত মাইল হাঁটতে পারে, দু-ঘণ্টা টেনিস্ খেলতে পারে, মাস্কুলার ইনডেক্স খুব হাই, ফেটিগ-কোয়েফিশেণ্ট বেশ লো। সেলাই জানে, রান্না জনে, লজিক জানে, বাজে তর্ক করে না, ইকনমিক্স জানে, গান গাইবার সময় বেশী চেঁচায় না। তা হ'লে কাল সন্ধ্যেবেলা ভুবনবাবুর বাড়ি ঠিক যাবেন—লাভলক রোড, মডলিন কটেজ।

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহাভিমুখ হইলাম। মুন-শাইন ভিলার গেট পার হইতেই একটা কোলাহল কানে আসিল। আন্দাজে বুঝিলাম কচি-সংসদের রুদ্ধ বেদনা মুখরিত হইয়া কেষ্টকে গঞ্জনা দিতেছে। আমি আর দাঁড়াইলাম না।

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণী মত প্রকাশ করিলেন—'রিপিং! পারসী থিয়েটারের চাইতেও ভাল। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। যদি পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হয় তাতেও রাজী আছি।'

আমি বললাম—'কিন্তু তোমাকে তো শুনতে দেবে না।

হাইকোর্টশিপ গোপনে হয়, ওইটুকুই সাধারণ কোর্টশিপের সঙ্গে মেলে। ঘরে থাকব শুধু আমি, কেষ্ট আর পদ্ম।'

গৃহিণী। আড়ি পাতব।

আমি। তার দরকার হবে না। সব কথাই পরে শুনতে পাবে। আমার যে কান তাহা তোমার হউক।

গৃহিণী। যাই হ'ক আমিও যাব।

আমি। কিন্তু পরের ব্যাপারে তোমার ওরকম কৌতূহল তো ভাল নয়। ফ্রয়েড এর কি ব্যাখ্যা করেন জান?

গৃহিণী। খবদ্দার, ও মুখপোড়ার নাম ক'রো না বলছি।

অগত্যা দুজনেই টুনি-দিদির বাসায় চলিলাম।

ভুবনবাবু ও টুনি-দিদি—এঁরা যেন সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি। কর্তাটি কুঁড়ের সম্রাট, সমস্ত ক্ষণ ড্রেসিং গাউন পরিয়া ইজি-চেয়ারে বসিয়া বই পড়েন ও চুরুট ফোঁকেন। গিন্নীটি ঠিক উল্টা, অসীমশক্তিময়ী, অঘটনঘটনপটিয়সী, মাছ-কোটা হইতে গাড়ি রিজার্ভ করা পর্যন্ত সব কাজ নিজেই করিয়া থাকেন, কথা কহিবার ফুরসত নাই। তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা শেষ করিয়াই অতিথিসৎকারের বিপুল আয়োজন করিতে রান্নাঘরে ছুটিলেন। পদ্ম আসিয়া প্রণাম করিল।

খাসা মেয়ে। কেষ্টা হতভাগা বলে কিনা মজবুত! একি হাতুড়ি না হামানদিস্তা? কচি-সংসদের মধ্যে বাস্তবিক যদি কেউ নিরেট কচি থাকে, তবে সে কেষ্ট—যতই প্রেমের বক্তৃতা দিক। ঋষ্য-শৃঙ্গের একটা শিং ছিল, কেষ্টর দুটো শিং। কিন্তু এই সুশ্রী বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ মেয়েটি কেন এই গর্দভের খেয়ালে রাজী হইল? স্ত্রীজাতি বাঁদর-নাচ দেখিতে ভালবাসে। পদ্মর উদ্দেশ্য কি শুধু তাই? স্ত্রীচরিত্র বোঝা শক্ত। না, মনস্তত্ত্বের বইগুলা ভাল করিয়া পড়িতে হইবে।

হাইকোর্টশিপ আরম্ভ হইল। ঘরের পর্দা ভেদ করিয়া সুদূর রান্নাঘর হইতে টুনি-দিদি ও আমার গৃহিণীর উচ্চ হাসি এবং কাটলেট-ভাজার গন্ধ আসিতেছে। আমি যথাসাধ্য গাম্ভীর্য সঞ্চয় করিয়া শুভকার্য আরম্ভ করিলাম—

'এই মকদ্দমায় বাদী, প্রতিবাদী, অনুবাদী, সংবাদী, বিসংবাদী কে কে তা এখনও স্থির হয় নি। কিন্তু সেজন্য বিচার আটকাবে না, কারণ দুই সাক্ষী হাজির,—শ্রীমান্ কেষ্ট ও শ্রীমতী পদ্ম—'

কেষ্ট বলিল—'ব্রজেন-দা, আপনি এই গুরু বিষয় নিয়ে আর তামাশা করবেন না—কাজ শুরু করুন।'

আমি। ব্যস্ত হও কেন, আগে যথারীতি সত্যপাঠ করাই।—শ্রীমান্ কেষ্ট, তুমি শপথ ক'রে বল যে তোমার মধ্যে পূর্বরাগের কোন কমপ্লেক্স নেই। যদি থাকে তবে মকদ্দমা এখনই ডিসমিস হবে।

কেষ্ট। একদম নেই। পদ্ম যখন পাঁচ বছরের আর আমি যখন দশ বছরের, তখন ওকে যে-রকম দেখতুম এখনও ঠিক তাই দেখি! তবে আগে ওকে ঠেঙাতুম, এখন আর ঠেঙাইনা।

আমি। শ্রীমতী পদ্ম, কেষ্টর প্রতি তোমার মনোভাব কি রকম তা জিজ্ঞেস ক'রে তোমার অপমান করতে চাই না! কেষ্টর মূর্তিই হচ্ছে পূর্বরাগের অ্যান্টিডোট। কেষ্ট, এইবার তোমার সেই ফিরিস্তিটা দাও। বাপ! তিরেনব্বইটা আইটেম। বেশভূষা—আহার্য—শয্যা—পাঠ্য—এ তো দেখছি পাক্কা পনর দিন লাগবে। দেখ, আজ বরঞ্চ আমি গোটাকতক বাছা বাছা প্রশ্ন করি, যদি অবস্থা আশাজনক বোধ হয় তবে কাল থেকে সিস্টেম্যাটিক টেস্ট শুরু হবে। আচ্ছা, প্রথমে আহার্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি—কারণ ওইটেই সবচেয়ে দরকারী, ফ্রয়েড যা-ই বলুন। কেষ্ট তুমি লঙ্কা খাও?

কেষ্ট। ঝাল আমার মোটেই সহ্য হয় না।

আমি। পদ্ম কি বল?

পদ্ম। লঙ্কা না হ'লে আমি খেতেই পারি না।

আমি। ব্যাড। প্রথমেই ঢেরা পড়ল। স্বামী-স্ত্রীর তো ভিন্ন হেঁশেল হ'তে পারে না। রফা করা চলে কিনা পরে স্থির করা যাবে। জলে লঙ্কা সেদ্ধ ক'রে দু-জনকে খাইয়ে দেখে এমন একটা পার্সেণ্টেজ ঠিক করতে হবে যা দু-পক্ষেরই বরদাস্ত হয়। আচ্ছা— তোমরা চায়ে কে ক চামচ চিনি খাও?

কেষ্ট। এক।

পদ্ম। সাত।

আমি। ভেরি ব্যাড। আবার ঢেরা পড়ল।

কেষ্ট। আমি মেরে কেটে তিন চামচ অবধি উঠতে পারি। পদ্ম, তুমি একটু নাবো না।

আমি। খবরদার, সাক্ষী ভাঙাবার চেষ্টা ক'রো না। যা জিজ্ঞাসা করবার আমিই করব। আচ্ছা—কেষ্ট, তুমি কি-রকম বিছানা পছন্দ কর? নরম না শক্ত?

কেষ্ট। একটু শক্ত রকম, ধরুন দু-ইঞ্চি গদি। বেশী নরম হ'লে আমার ঘুমই হয় না।

পদ্ম। আমি চাই তুলতুলে।

আমি। ভেরি ভেরি ব্যাড। এই ফের ঢেরা দিলুম। আচ্ছা— কেষ্ট, পদ্মর চেহারাটা তোমার কি-রকম পছন্দ হয়?

কেষ্ট। তা মন্দ কি।

আমি সাক্ষীবিহ্বলকারী ধমক দিয়া বলিলাম—'ওসব ভাসা ভাসা জবাব চলবে না, ভাল ক'রে দেখ তার পর বল।'

পদ্ম লাল হইল। কেষ্ট অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া একটু বোকা-হাসি হাসিয়া বলিল—'খাখ্-খাসা চেহারা। এঃ, পদ্ম আর সে পদ্ম নেই, এক্‌কেবারে—'

আমি। বস্ বস্—বাজে কথা ব'লো না। পদ্ম, এবারে তুমি কেষ্টকে দেখে বল।

পদ্ম ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কেষ্টর প্রতি চকিত দৃষ্টি হানিয়া বলিল—'যেন একটি সঙ!'

কেষ্ট। তা—আ আমি না-হয় মাথার চুলটা এক ইঞ্চি বাড়িয়ে ফেলব, আর দাড়িটাও না-হয় ফেলে দেব। আচ্ছা, এই হাত দিয়ে দাড়িটা চেপে রাখলুম—এইবার দেখ তো পদ্ম।

পদ্ম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

আমি বলিলাম—'হোপলেস। আপত্তির প্রতিকার হ'তে পারে, কিন্তু বিদ্রূপের ওষুধ নেই।'

কেষ্ট একটু গরম হইয়া বলিল—'আপনিই তো যা-তা রিমার্ক ক'রে সব গুলিয়ে দিচ্ছেন।'

আমি। আচ্ছা বাপু, তুমি নিজেই না-হয় জেরা কর।

কেষ্ট প্রত্যালীঢ়পদে বসিয়া আস্তিন গুটাইয়া বলিল—'পদ্ম এই দেখ আমার হাত। একে বলে বাইসেপ্স—এই দেখ ট্রাইসেপ্স। এইরকম জবরদস্ত গড়ন তোমার পছন্দ হয়, না ব্রজেন-দার মতন গোলগাল নাদুস-নুদুস চাও? তোমার মতামত জানতে পারলে আমি না-হয় আমার আদর্শ সম্বন্ধে ফের বিবেচনা করব।'

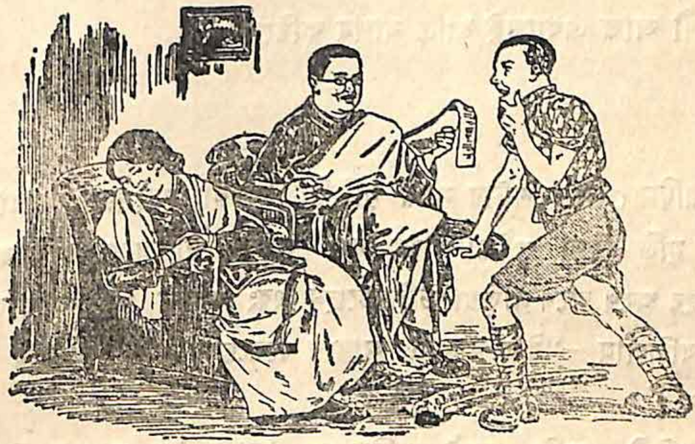
পদ্ম। তোমার চেহারা তুমি বুঝবে—আমার তাতে কি। আমি তো আর তোমায় দারোয়ান রাখছি না।

কেষ্ট। আছা, তোমার হাতটা দেখি একবার—কি রকম পাঞ্জার জোর—

কেষ্ট খপ করিয়া পদ্মর পদ্মহস্ত ধরিল। আমি বলিলাম—'হাঁ হাঁ—ও কি! সাক্ষীর ওপর হামলা! ওসব চলবে না—আমার ওপর যখন বিচারের ভার তখন যা করবার আমিই করব। তুমি ওই ওখানে গিয়ে বস।'

কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল—'বেশ তো' আপনিই ফের কোশচেন করুন।'

আমি। আর দরকার নেই। তোমাদের মোটেই মতে মিলবে না, রফা করাও চলবে না। আমি এই হুকুম লিখলুম-napoo, nothing doing। কেস এখন মুলতবী রইল। এক বৎসর নিজের নিজের মতামত বেশ ক'রে রিভাইজ কর, তার পর আবার অত্র আদালতে হাজির হইবা।



'এইবার দেখতো'

কেষ্ট এবার চটিয়া উঠিল। বলিল—'আপনি আমার সিস্টেম কিচ্ছু বুঝতে পারেন নি। আপনি যা করলেন সে কি একটা টেস্ট্ হ'ল ?—শুধু ইয়ারকি। আপনাকে মধ্যস্থ মানাই ঝকমারি হয়েছে।'

আমিও খাপ্পা হইয়া বলিলাম—'দেখ কেষ্ট, বেশী চালাকি ক'রো না। আমি একজন উকিল, বার বৎসর প্র্যাকটিস করেছি, পনর বৎসর হ'ল বিবাহ করেছি, ঝাড়া একটি মাস সাইকলজি পড়েছি। কার সঙ্গে কার মতে মেলে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর—তুমি তো নির্বিকার, তোমার অত রাগ কেন ? দেখ দিকি, পদ্ম কেমন লক্ষ্মীমেয়ে, চুপটি ক'রে বসে আছে।'

কেষ্ট গজগজ করিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ ঘরের পর্দা ঠেলিয়া টুনি-দিদির ছোট খুকী প্রবেশ করিল।

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম—'নারী, তুমি কি চাও ?'

খুকীর নারীত্বের দাবি অতি মহৎ এবং সমস্ত নারীসমাজের অনুধাবনযোগ্য। বলিল—'খাবেন চলুন, লুচি জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

কেষ্ট কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিল না, ভাল করিয়া খাইলও না। আহারান্তে আমি একাই নিজের বাসায় ফিরিলাম। গৃহিণী আজ এখানেই রাত্রি যাপন করিবেন।

পরদিন বেলা দশটার সময় গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সভয়ে দেখিলাম তিনি কম্বলের ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে নড়িয়া উঠিতেছেন এবং অস্ফুট শব্দ করিতেছেন।

বলিলাম—'ফিক ব্যথাটা আবার ধরেছে বুঝি ? ডাক্তার দাসকে ডাকব ?'

গৃহিণী অতি কষ্টে বলিলেন—'না, কিছু দরকার নেই, ও আপনিই সেরে যাবে। হুঃ হুঃ হিঃ।

হিস্টিরিয়া নাকি ? ও উৎপাত তো ছিল না, নিশ্চয় বেচারা কন্যকার ব্যাপারে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমার মতলব তো জানে না। মেয়েরা চায় রাতারাতি বিবাহটা স্থির হইয়া যাক। আরে অত ব্যস্ত হইলে কি চলে! কেষ্ট সবে বঁড়শি গিলিয়াছে, এখন তাকে আরও দিনকতক খেলাইতে হইবে।

বৈকালে মুন-শাইন ভিলায় যাইলাম—উদ্দেশ্য কেষ্টকে একটু ঠাণ্ডা করা। কিন্তু কেষ্টর দেখা পাইলাম না, মামাও নাই। কচি-সংসদের সভ্যগণ নিজ নিজ খাটে শুইয়া আছে, ডাকিলে সাড়া দিল না। তাহাদের দৃষ্টি উদাস,—নিশ্চয় একটা বড়রকম ব্যথা পাইয়াছে।

বোদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাবু কাঁহা ?'

বোদার বদনচক্রে দর্শন নিঃশ্বাস ও বাক্যনিঃসরণের জন্য যে কয়টি ছোট ছোট ছিদ্র আছে তাহা বিস্ফারিত হইল। বলিল—'বাবু বাগা।'

'আঁ? কেষ্টবাবু ভাগা! কাঁহা ভাগা? নিশ্চয় ভুবনবাবুর বাড়িতে গিয়া হোগা।'



'বাবু বাগ গিয়া'

'বুবনবাবু বাগ গিয়া! উনকি বিবি বাগ গিয়া। উনকি কোকী বাগ গিয়া। কোকীকা গোড়া বাগ গিয়া। গোরে-সি মিসিবাবা যো থি সো বি বাগ গিয়া।' কেষ্ট পালাইয়াছে। ভুবনবাবু, তাঁহার বিবি, তাঁহার খুকী, খুকীর ঘোড়া এবং ফরসা-মতন মিসিবাবা—অর্থাৎ পদ্ম—সকলেই পালাইয়াছে। নকুড়-মামা বোধ হয় খোজে বাহির হইয়াছেন। কচি-সংসদ্ কিছুই জানে না, জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

গৃহিণীর কাণ্ড মনে পড়িল। ফিক ব্যথাও নয় হিস্টিরিয়াও নয়—শুধু হাসি চাপিবার চেষ্টা। তৎক্ষণাৎ বাসায় ফিরিলাম।

বলিলাম—'তুমিই যত নষ্টের গোড়া।'

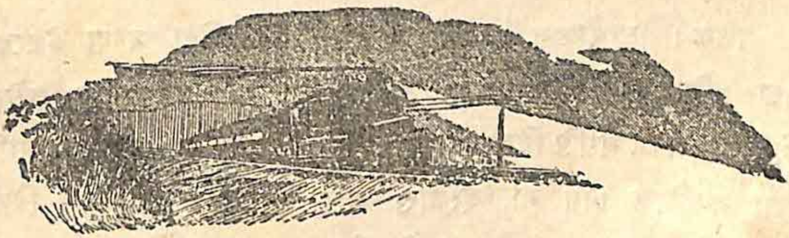
গৃহিণী। আহা, কি আমার কাজের লোক! নিজে কিছুই করতে পারলেন না, এখন আমার দোষ।

আমি। তার পর ব্যাপারটা কি বল দিকি?

গৃহিণী প্রথমে একচোট হাসিয়া গড়াইয়া লইলেন। শেষে বলিলেন—'তুমি তো রাত সাড়ে দশটায় ফিরে গেলে। টুনি-দিদি আর আমি গল্প করতে লাগলুম—সে কত সুখ-দুঃখের কথা। রাত বারটার সময় দেখি—কেষ্ট টিপিটিপি আসছে। তার মুখ কাঁদো-কাঁদো, চাউনি পাগলের মতন। টুনি-দি বললে—কেষ্ট, কি হয়েছে? কেষ্ট বললে, পদ্মর সঙ্গে বে না হ'লে সে আর এ প্রাণ রাখবে না, তার আর তর সইছে না, হয় পদ্ম—নয় কি একটা অ্যাসিড। আমি বললুম—তার আর চিন্তা কি, অ্যাসিড ডাক্তারখানায় প্যাওয়া যায়, আর পদ্ম তো মজুতই আছে! আগে সকাল হ'ক তারপর যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কেষ্ট বললে—সে এক্ষুনি তার সঙের সাজ ফেলে দিয়ে ভদ্দর লোক সাজবে, কিন্তু অত লাফালাফির পর পাঁচ জনের কাছে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? টুনি-দি বললে—কুছ পরোয়া নেই, কালকের মেলেই কলকাতায় পালিয়ে চল, গিয়েই বে দেব। পদ্ম বিগড়ে বসল। টুনি-দি বললে, নে নেঃ—নেকী। টুনি-দিকে জান তো, তার অসাধ্য কাজ নেই। সেই রাত্রেই মশাই মোট বাঁধা হ'য়ে গেল—এক-শ তেষট্টিটা লাগেজ। তারপর আজ সকালে তাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এখানে চ'লে এলুম।'

বিবাহের পর দেড় মাস কেষ্ট আমার সঙ্গে লজ্জায় দেখা করে নাই,—সবে কাল আসিয়া ক্ষমা চাহিয়া গিয়াছে! আমি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করিয়াছি এবং মনস্তত্ত্ব হইতে নজির দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে তাহার লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই। কেষ্টর মনের আড়ালে যে আর-একটা উপমন এতদিন ছাই-চাপা ছিল তাহারই ভূমিকম্পের ফলে সে বাঁদর নাচিয়াছে।

কচি-সংসদ্ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কেষ্ট আবার একটা নূতন ক্লাব স্থাপন করিয়াছে—হৈহয় সংঘ। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হৈহয় ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহার মেম্বার—সস্ত্রীক আমি ও কেষ্ট। এই বড়দিনের বন্ধে আমরা হাওড়া হইতে পেশাওআর পর্যন্ত হইহই করিতে যাইব।



উলটপুরাণ

রিচমণ্ড বঙ্গ-ইঙ্গীয় পাঠশালা। মিস্টার ক্র্যাম (পণ্ডিত মহাশয়) এবং ডিক টম হ্যারি প্রভৃতি বালকগণ

ক্র্যাম। চটপট নাও, চারটে বাজে। ডিক, ইতিহাসের শেষটুকু প'ড়ে ফেল।

ডিক। 'ইওরোপের দুঃখের দিন অবসান হইয়াছে। জাতিতে জাতিতে দ্বেষ হিংসা বিবাদ দূর হইয়াছে। প্রবলপরাক্রান্ত ভারত-সরকারের দোর্দণ্ডশাসনের সুশীতল ছায়ায়'—দোর্দণ্ড মানে কি পণ্ডিত মশায়?

ক্র্যাম। দোর্দণ্ড জান না? The big rod. Under the soothing influence of the big rod.

ডিক। 'সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিয়া সমস্ত ইওরোপ ধন্য হইয়াছে। আয়ারলাণ্ড হইতে রাশিয়া, ল্যাপলাণ্ড হইতে সিসিলি, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ফ্রান্স এখন আর জার্মানির গলা কাটিতে চায় না, ইংলাণ্ড আর জাতিতে জাতিতে বিবাদ বাধাইতে পারে না, অস্ট্রিয়া ও ইটালিতে আর মেতিপুকুরের দখল লইয়া মারামারি করে না।' মেতিপুকুর কোন্‌টা পণ্ডিতমশায়?

ক্র্যাম। ঐ সামনে মানচিত্র রয়েছে দেখ না। ইটালির কাছে যে সমুদ্র সেইটে। সেকালে নাম ছিল মেডিটেরিনিয়ান।

ইণ্ডিয়ানরা উচ্চারণ ক'রতে পারে না ব'লে নাম দিয়েছে মেতিপুকুর। সেইরকম আল্‌স্টারকে বলে বেলেস্তারা, সুইট্‌সারলাণ্ডকে বলে ছছুরাবাদ, বোর্দোকে বলে ভাঁটিখানা, ম্যাঞ্চেস্টারকে বলে নিম্‌তে। তার পর প'ড়ে যাও।

ডিক। 'ইওরোপীয়গণের, শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হইতেছে। তাহাদের লোভ কমিয়াছে, অসভ্য বিলাসিতা দূর হইতেছে, ইহকালের উপর আস্থা কমিয়া গিয়াছে, পরকালের উপর নির্ভর বাড়িতেছে। ভারত-সন্তানগণ সাত-সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই পাণ্ডববর্জিতদেশে আসিয়া নিঃস্বার্থভাবে শান্তি শৃঙ্খলা ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, এসব কি সত্যি ?

ক্র্যাম। ছাপার অক্ষরে যখন লিখেছে আর সরকারের হুকুমে যখন পড়াতে হচ্ছে তখন সত্যি বইকি।

ডিক। কিন্তু বাবা বলেন সব bosh।

ক্র্যাম। তোমার বাবার আর বলতে বাধা কি। তিনি হলেন উকিল, আমার মতন তো আর সরকারের মাইনেয় নির্ভর করতে হয় না।

ডিক। 'হে সুবোধ ইংরেজশিশুগণ, তোমরা সর্বদা মনে রাখিও যে ভারত-সরকার তোমাদের দেশের অশেষ উপকার করিয়াছেন। তোমরা বড় হইয়া যাহাতে শান্ত বাধ্য রাজভক্ত প্রজা হইতে পার তাহার জন্য এখন হইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও।'

টম। বু—হু হু হু—

ক্র্যাম। ও কি রে, শীত করছে বুঝি ? আবার তুই ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে এসেছিস! বাঙালীর নকল করতে গিয়ে শেষে দেখছি নিউমোনিয়ায় মরবি।

টম। বাবার হুকুম পণ্ডিত মশায়। আজ পাঠশালের ফেরত খাঁসাহেব গবসন টোডির পার্টিতে যেতে হবে। তিনি নতুন খেতাব

পেয়েছেন কিনা। সেখানে বিস্তর ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক আসবেন, তাই বাবা বললেন, দেশী পোশাক পরা চলবে না।

ক্র্যাম। তা বাঙালী সাজতে গেলি কেন? ইজের-চাপকান পরলেই পারতিস।

টম। আজ্ঞে, বাবা বললেন, বাঙালীই সবচেয়ে সভ্য তাই—ব্রর্‌ র্‌ র্‌—

ক্র্যাম। যা যা শীগ্‌গির বাড়ি যা, অন্তত একটা শাল মুড়ি দিগে যা। ও কি, হোঁচট খেলি নাকি?

হ্যারি। দেখুন দেখুন, টম কি রকম কাছা দিয়েছে, যেন স্কিপিং রোপ!

ধর্মযাজকগণের মুখপত্র 'দি কিংডম কাম'
হইতে উদ্ধৃত।

সর্বনাশের আয়োজন হইতেছে। ভারত-সরকার আমাদের ধন-প্রাণ হস্তগত করিয়াছেন—আমরা নিরীহ ধর্মযাজক-সম্প্রদায় তাহাতে কোনও উচ্চবাচ্য করি নাই, কারণ ইহলোকের পাঁউরুটি ও মাছের উপর আমাদের লোভ নাই এবং সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দেওয়াই শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু আজ এ কি শুনিতেছি? আমাদের ধর্মের উপর হস্তারোপ! ঘোড়দৌড় বন্ধ করার জন্য আইন হইতেছে। অ্যাসকট, এপসম প্রভৃতি মহাতীর্থ কি শেষে শ্মশানে পরিণত হইবে? বিশপ ষ্টোনিব্রোক নাকি গভর্নমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে ধর্মশাস্ত্রে ঘোড়দৌড়ের উল্লেখ নাই, অতএব রেস বন্ধ করিলে খ্রীষ্টীয় ধর্মের হানি হইবে না। হা, একজন ধর্মযাজকের মুখে এই কথা শুনিতে হইল! বিশপ কি জানেন না যে-রেস খেলা ব্রিটিশ জাতির সনাতন ধর্ম এবং লোকাচার বাইবেলেরও উপর? আরও ভয়ানক সংবাদ—শীঘ্রই নাকি মদ্যপান রোধ করার উদ্দেশ্যে আইন হইবে। আমাদের শাস্ত্রসম্মত সনাতন পানীয় বন্ধ করিয়া ভারতসরকার কি ভারতীয় চায়ের কাটতি বাড়াইতে চান?

'রাষ্ট্রবিৎ'—যাহার সঙ্গে সংযুক্ত আছে 'ইঙ্গবন্ধু'
হইতে উদ্ধৃত

আমরা খাঁসাহেব গবসন টোডিকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। তিনি অতি উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁহাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত দেখিয়া আমরা প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছি। দেশী লোকের ভাগ্যে এত বড় উপাধি এই প্রথম মিলিল। আমরা কিন্তু সরকারকে সাবধান করিতেছি—এই সকল উচ্চ উপাধি যেন বেশী সস্তা করা না হয়, তাহা হইলে ভারতীয় রায়সাহেব খাঁবাহাদুর প্রভৃতি ক্ষুণ্ণ হইবেন এবং তাহাতে ইওরোপের উন্নতি পিছাইয়া যাইবে। নাইট, ব্যারন, মার্কুইস, ডিউক প্রভৃতি দেশী উপাধিই সাহেবের পক্ষে যথেষ্ট। যাহা হউক, মিস্টার টোডি যখন নিতান্তই খাঁসাহেব টোডি হইয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার অতি সন্তর্পণে সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলা উচিত। আশা করি, তিনি রাজদ্রোহী লিবার্টি-লীগের ছায়া মাড়াইবেন না।

গবসন টোডির অন্দরমহল। মিসেস টোডি, তাঁহার দুই কন্যা ফ্লফি ও ফ্ল্যাপি
এবং তাহাদের শিক্ষয়িত্রী জোছনা-দি

জোছনা। ফ্ল্যাপি, তোমায় নিয়ে আর পেরে উঠি নে বাছা। ওই রকম ক'রে বুঝি চুল বাঁধে? আহা কি ছিরিই হয়েছে! কান দুটো যে সবটাই বেরিয়ে রয়েছে। এতখানি বয়স হ'ল কিছুই শিখলে না। দেখ দিকি, তোমার দিদি কি সুন্দর খোঁপা বেঁধেছে!

ফ্ল্যাপি। Let her। কানের ওপর চুল পড়লে আমি কিচ্ছু শুনতে পাই না। আমি ঘাড় ছাঁটবো, ও-বাড়ীর মিস ল্যংকি গসলিংএর মতন।

জোছনা। হ্যাঁ, ঘাড় ছাঁটবে, ন্যাড়া হবে, ভুরু কামাবে, রূপ একেবারে উথলে উঠবে। দেখাবে যেন হাড়গিলেটি। পড়তে শাশুড়ীর পাল্লায়—

ফ্ল্যাপি।

Little Pussy Friskers
Shaved off her whiskers ;
And sharpening her paw
Scratched her mum-in-law.

জোছনা। কি বেহায়া মেয়ে। মিসেস টোডি, আপনার ছোট মেয়েকে দুরস্ত করা আমার সাধ্য নয়।

মিসেস টোডি। ছি ফ্ল্যাপি, তুমি দিন দিন ভারী বেয়াড়া হচ্ছ। জোছনা-দি তোমাদের শিক্ষার জন্য কত মেহনত করেন তা বোঝ?

ফ্ল্যাপি। আমি শিখতে চাই না। উনি ফ্লফিকে শেখান না।

জোছনা। আবার 'ফ্লফি'! দিদি বলতে কি হয়? অ্যাঁ ও কি—ফের তুমি পেনসিল চুষছ! ছি ছি কি নোংরা! আচ্ছা, এখন তুমি ও-ঘরে গিয়ে সেই উর্দু গজলটা অভ্যাস কর।

মিসেস টোডি। জোছনা-দি, আপনার ডিবে থেকে একটা পান নেব? থ্যাংক ইউ।

জোছনা। দেখুন মিসেস টোডি, কথায় কথায় থ্যাংক ইউ—প্লীজ—সরি এগুলো বলবেন না। ভারী বদ অভ্যাস। এর জন্যেই আপনাদের জাতের উন্নতি হচ্ছে না। ওরকম তুচ্ছ কারণে কৃতজ্ঞতা বা দুঃখ জানানো আমরা ভণ্ডামি ব'লে মনে করি। নিন একটু দোক্তা খান।

মিসেস টোডি। নো, থ্যাংক্স,—থুড়ি। দোক্তা খেলেই আমার মাথা ঘোরে। বরং একটা সিগারেট খাই।

জোছনা। মেয়েদের সিগারেট খাওয়া অত্যন্ত খারাপ। আপনি একটু চেষ্টা ক'রে দোক্তা ধরুন।

মিসেস টোডি। কিন্তু দু-ই তো হ'ল তামাক?

জোছনা। তা বললে কি হয়। একটা হ'ল ধোঁয়া, আর একটা হ'ল ছিবড়ে। ধোঁয়া পুরুষের জন্যে, আর ছিবড়ে

মেয়েদের জন্যে। ফ্লফি, তোমার সেই বাংলা উপন্যাসখানা শেষ হয়েছে

ফ্লফি। বড় শক্ত, মোটেই বুঝতে পারছি না।

জোছনা। বোঝবার বিশেষ দরকার নেই, কেবল বাছা বাছা জায়গা মুখস্থ ক'রে ফেলবে। লোককে জানানো চাই যে বাংলা ভাল ভাল বইএর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। কিন্তু তোমার উচ্চারণটা বড় খারাপ। সভ্যসমাজে মিশতে গেলে চোস্ত বাংলা উচ্চারণ আগে দরকার, আর গোটাকতক উর্দু গান। আচ্ছা, তুমি বাংলায় এক দুই তিন চার ব'লে যাও দিকি।

ফ্লফি। এক দুই তিন শাড়—

জোছনা। শাড় নয়, চার।

ফ্লফি। চার পাইচ—

জোছনা। পাইচ নয়, পাঁচ।

ফ্লফি। পাঁইশ—

জোছনা। পাঁ—চ।

ফ্লফি। ফ্যাঁচ—

জোছনা। মাটি করলে। মিসেস টোডি, ফ্লফিকে বেশী চকোলেট খেতে দেবেন না, ছোলাভাজার ব্যবস্থা করুন, নইলে জিবের জড়তা ভাঙবে না। দেখ ফ্লফি, আর এক কাজ কর। বার বার আওড়াও দিকি—রিশড়ের আড়পার খড়দার ডান ধার—ছাঁদনাতলায় হোঁতকা হেঁদল।

নেপথ্যে গবসন টোডি। ডিয়ারি—

মিসেস টোডি। কূ! কোথায় তুমি?

গবসন টোডি। বাথরুমে। আরও গোটাকতক আম দিয়ে যাও।

জোছনা। বাথরুমে আম?

মিসেস টোডি। তা ভিন্ন আর উপায় কি। গবি বলে, আম

যদি খেতে হয় তবে ভারতীয় পদ্ধতিতেই খাওয়া উচিত। অথচ আপনাদের মতন হাত দুরস্ত নয়,—পোশাক কার্পেট টেবিল-ক্লথে রস ফেলে একাকার করে। তাই গবিকে বলেছি বাথরুমে গিয়ে আম খাওয়া অভ্যাস করতে। সেখানে দু-হাতে আঁটি ধ'রে চুষছে আর চোয়াল ব'য়ে রস গড়াচ্ছে। Horrid!

জোছনা। ঠিক ব্যবস্থাই করেছেন। দেখুন মিসেস টোডি, আপনি যে স্বামীকে 'গবি' বলছেন, ওটা সভ্যতার বিরুদ্ধ। আড়ালে গবি হাবি যা খুশি বলুন, কিন্তু অপরের কাছে নাম উচ্চারণ করবেন না। দরকার হ'লে বলবেন—'উনি'। আর যদি অতটা খাতির না করতে চান, তবে বলবেন—'ও'।

মিসেস টোডি। তাই নাকি? আচ্ছা, আপনি বসুন একটু। আমি ওকে আম দিয়ে আসছি।

'রাষ্ট্রবিং'-এর বিজ্ঞাপনস্তম্ভ হইতে।

বিশুদ্ধ আনন্দনাড়ু। চর্বিমিশ্রিত ইংরেজী বিস্কুট খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের আনন্দনাড়ু খান। দাঁত শক্ত হইবে। কেবল চালের গুঁড়া ও গুড়। যন্ত্রদ্বারা স্পর্শিত নহে। বাঙালী মেয়ের নিজ হাতে গড়া। এক ঠোঙা পাঁচ শিলিং। সর্বত্র পাওয়া যায়। নির্মাতা—রসময় দাস, টিকটিকি বাজার, কলিকাতা।

অম্বুরী বরুণ। মেমগণের দুঃখ এইবার দূর হইল। এই আশ্চর্য গুঁড়া মুখে মাখিলে ফ্যাকাশে রং দূর হইয়া ঠিক বাঙালী মেয়ের মতন রং হইবে? যদি আর একটু বেশী ঘোর করিতে চান, তবে ইহার সঙ্গে একটু বের্দিগ্রীন মিশাইয়া লইবেন। রামচন্দ্রজী উহা মাখিতেন। দাম প্রতি পুরিয়া পাঁচ শিলিং। বিক্রেতা—শেখ অজহর, লেডেনহল স্ট্রীট, ইণ্ডিয়া হাউস, লণ্ডন।

'দি লণ্ডন ফগ' হইতে উদ্ধৃত

আগামী আশ্বিন মাসে এই লণ্ডন নগরে বিরাট রাজসূয় যজ্ঞ

বসিবে। স্বয়ং মহাক্ষত্রপ ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরূপে এই যজ্ঞের যজমান হইবেন। হোতা, ঋত্বিক, মোল্লা, মওলানা প্রভৃতি ভারত হইতে আসিবেন। দুই মাস ব্যাপিয়া দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিবে, খরচ জোগাইবে অবশ্য এই গরীব ইওরোপবাসী।

সমস্ত ইওরোপের শোষণকার্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি নাই। ভারতমাতা তাঁহার খরজিহ্বা লকলক করিয়া বলিতেছেন—হে সপত্নীপুত্রগণ, আনন্দ কর, আর একবার ভাল করিয়া তোমাদের হাড় চাটিব।

ঠিক ঐ সময়েই হাগ-নগরে প্যান-ইওরোপিয়ান লিবার্টি-লীগের অধিবেশন হইবে। হে ব্রিটন, জন-অ গ্রোট্‌স হইতে ল্যাণ্ডস্‌-এণ্ড পর্যন্ত যে যেখানে আছে, দলে দলে সর্বরাষ্ট্রীয় মহাসম্মেলনে যোগ দাও। যদি তোমার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকে তবে রাজসূয় যজ্ঞের ত্রিসীমায় যাইও না। একবার ভাবিয়া দেখ তোমার এই মেরি ইংলাণ্ড—যেখানে একদা দুগ্ধ ও মধুর স্রোত বহিত—তাহার কি দশা হইয়াছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বীফ নাই, মাখন নাই, পনির নাই—এইবার বিয়ারও বন্ধ হইবে। বিদেশ হইতে গম আসে তবে তোমার রুটি প্রস্তুত হয়। তোমার ভেড়ার লোম ছাঁটামাত্রই পাঞ্জাবে যাইতেছে এবং তথা হইতে বনাত কম্বলরূপে ফিরিয়া আসিয়া তোমার অঙ্গে উঠিতেছে। ভারতের কার্পাসবস্ত্র তোমার বিখ্যাত লিনেন শিল্প নষ্ট করিয়াছে। হায়, তুমি কাহার বসন পরিয়াছ? তোমার নগ্নতা ঘুচিয়াছে কিন্তু লজ্জা ঢাকে নাই, শীত নিবারিত হইয়াছে কিন্তু তুমি অন্তরে অন্তরে কাঁপিতেছ। তোমার ভাল ভাল গো-বংশ ভারতে নির্বাসিত হইয়াছে, সেখানকার হিন্দু-মুসলমান ক্ষীর-ছানা-ঘি খাইয়া নির্দ্বন্দ্বে মোটা হইতেছে। বিয়ার হুইস্কির আস্বাদ তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, ভারতের গাঁজা আফিম তোমার মস্তিষ্কে শনৈঃ শনৈঃ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তোমার সর্বনাশের উপরে ভারত তাহার ভোগবিলাসের বিরাট মন্দির খাড়া করিয়াছে। তুমি

ডিসেম্বরের শীতে পর্যাপ্ত কয়লার অভাবে হিহি করিয়া শিহরিতেছ, ওদিকে তোমারই অর্থে শেভিয়ট হিলে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পুড়াইয়া কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করা হইয়াছে; কারণ, ভারতীয় আমলাগণ শীতকালে সেখানে আপিস করিবেন—লণ্ডনের শীত তাঁহাদের বরদাস্ত হয় না।

হে বহুধাবিভক্ত আত্মকলহপরায়ণ ইওরোপীয়গণ, এখনও কি তোমরা তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ত্যাগ করিবে না? এখনও কি অ্যাংলো-সেল্টিক দ্বন্দ্ব, ফ্রাঙ্কো-জার্মান দ্বন্দ্ব, ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব বন্ধ হইবে না?

হাইড পার্ক। বক্তা—সার ট্রিক্‌সি টার্ন্‌কোট।
শ্রোতা—তিন হাজার লোক।

টার্ন্‌কোট। মাই কান্ট্রিমেন, তোমরা আজ আমাকে যে দু-চার কথা বলবার সুযোগ দিয়েছ তার জন্য বহু ধন্যবাদ। তোমাদের আমি কি বলে সম্বোধন করব খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ আমার হৃদয় পূর্ণ হয়েছে। হে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠদেশবাসী ভগবানের নির্বাচিত মানবগণ, হে ব্রিটন-স্যাকসন-ডেন-নর্মান বংশোদ্ভব ইংরেজ জাতি—

ম্যাক্‌ডুড্‌ল। ইংরেজ নয়, বলুন ব্রিটিশ জাতি। স্কচরা কি ভেসে এসেছে নাকি?

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা। হে ব্রিটিশ জাতি, একবার তোমাদের সেই প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ কর। হে হেস্টিংস-ক্রেসি-এজিনকোর্টের বীরগণ, যাদের বিজয়পতাকা একদিন ইংলাণ্ড, স্কটলাণ্ড, আয়ারলাণ্ড, ফ্রান্সে—

ম্যাক্‌ডুড্‌ল। মিথ্যে কথা। স্কটলাণ্ডে তোমাদের বিজয়-পতাকা কোনও কালে ওড়ে নি।

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা, স্কটলাণ্ড বাদ দিলুম। যাদের বিজয়-পতাকা একদিন আয়ারলাণ্ড ফ্রান্সে—

ও' হুলিগান। Oireland! Say it again!

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা আচ্ছা। বিজয়পতাকা কোথাও ওড়েনি। হে ইংলিশ-স্কচ-আইরিশ-মিশ্রিত-ব্রিটিশ জাতি—

ও' হুলিগান। Begorrah! আমরা ব্রিটিশ নই,—সেলটিক।

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা। হে ব্রিটিশ ও সেলটিক ভাই-সকল, আজ তোমরা কেন এখানে সমবেত হয়েছ?

ও' হুলিগান। Sure, Oi don't know।

টার্ন্‌কোট। কেন এখানে সমবেত হয়েছ তাও কি ব'লে দিতে হবে? হে হতভাগ্যগণ, তোমাদের এই পৈতৃক দেশের বুকের ওপর কোন্ অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে তার খবর রাখ? রাজসূয় যজ্ঞ। ভারত সরকার মহাআড়ম্বর ক'রে তাঁর ঐশ্বর্য এবং পরাক্রমের পসরা খুলে বসবেন, আর সমস্ত ইওরোপের গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে মহাক্ষত্রপকে কুর্নিশ ক'রে বলবেন—ভারত-সরকার কি জয়! এই আউট্‌লাণ্ডিশ কাণ্ড, এই স্যাক্রিলেজ—

(লর্ড ব্লার্নির বেগে প্রবেশ)

লর্ড ব্লার্নি জনান্তিকে। আরে তুমি কি বলছ সার ট্রিক্‌সি! নিজের সর্বনাশ করছ? আমি কত ক'রে ক্ষত্রপকে ব'লে-ক'য়ে এসেছি যেন Chiltern Hundreds এর দেওয়ানিটা তোমাকেই দেওয়া হয়। কি আরামের চাকরি, একেবারে sine cure। ক্ষত্রপের ইচ্ছে চাকরিটা টোডিকে দেন, কিন্তু আমার একান্ত মিনতি শুনে বলেছেন বিবেচনা ক'রে দেখবেন। এখনই খবর আসবে, আর এদিকে তুমি রাজদ্রোহ প্রচার করছ!

টার্ন্‌কোট। বটে, বটে? আচ্ছা, আমি সামলে নিচ্ছি।

জনতা হইতে। Go on Tricksy, go on।

টার্ন্‌কোট। হ্যাঁ, তার পর কি বলছিলুম—হে আমার

দেশবাসিগণ, এই ঘোর দুর্দিনে তোমাদের কর্তব্য কি? তোমরা কি এই যজ্ঞে এই বিরাট তামাশায় যোগ দেবে?

জনতা হইতে। Never, never।

বিল স্মুক্‌স। Say guv'nor, will they stand treat? মদ ক পিপে আসবে?

টার্ন্‌কোট। এক ফোঁটাও নয়। কেবল বাতাসা বিলি হবে। হে বন্ধুগণ, এই মহাযজ্ঞে তোমাদের স্থান কোথায়?

লর্ড ব্লার্নি। আঃ, কি বলছ টার্ন্‌কোট!

টার্ন্‌কোট। ঘাবড়ান কেন, শুনুন না। হে বন্ধুগণ, এই বিরাট যজ্ঞে কি তোমরা যাবে?

জনতা হইতে। বরং শয়তানের কাছে যাব।

টার্ন্‌কোট। না, না, সেটা ভালো দেখাবে না। তোমাদের যেতেই হবে—না-গিয়ে উপায় নেই, কারণ ভারত-সরকার স্বয়ং তোমাদের আহ্বান করছেন।

লর্ড ব্লার্নি। হিয়ার, হিয়ার।

জনতা হইতে। মিয়াও, মিয়াও।

টার্ন্‌কোট। দোহাই তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। মনে রেখো ভারতের সহানুভূতি না পেলে আমাদের গতি নেই—আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সরকারের দয়ার উপর—(পচা ডিম)—এঃ, চোখটা খুব বেঁচে গেছে। হে বন্ধুগণ, আমি কর্তব্যপালনে ভয় খাই না, যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করি তাই অকপটে বলব।

লর্ড ব্লার্নি। বাঃ, ঠিক হচ্ছে। ঐ যে, টেলিগ্রাম নিয়ে আসছে। ব্রেভো সার ট্রিক্‌সি নিশ্চয় ক্ষত্রপ তোমাকেই মনোনীত করেছেন। আমি প'ড়ে দেখছি, তুমি থেমো না, বক্তৃতা চলুক।

টার্ন্‌কোট। হে ভাই-সকল, আমি যা বলছি তা তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। এতে আমার নিজের কোনও স্বার্থ নেই।—ব্লার্নি, খবর কি হে?—হে প্রিয় বন্ধুগণ, দেশের মঙ্গলের জন্য আমি সকল

রকম লাঞ্ছনা ভোগ করতে প্রস্তুত। তোমাদের ঐ বেরালডাক আমারই জয়ধ্বনি। তোমাদের এই পচা ডিম আমি মাথা পেতে নিলুম। যদি তোমাদের তূণীরে আরও কিছু নিগ্রহের অস্ত্র থাকে —(বাঁধাকপি)—নাঃ, আর পারা যায় না! ব্লার্নি, বল না হে, কি লিখেছে?

ব্লার্নি। পুওর ট্রিক্‌সি! শেষটায় টোডি ব্যাটাই চাকরি পেলে। নেভার মাইণ্ড, তুমি হতাশ হয়ো না। আবার একটা সুবিধা পেলেই তোমার জন্য চেষ্টা করব। ক্ষত্রপটা অতি গাধা। এটা বুঝলে না যে টোডি তো পোষ মেনেই আছে। আর তুমি হ'লে এত বড় একটা ডিমাগগ—তোমাকে হাত করবার এমন সুযোগটা ছেড়ে দিলে! ছি ছি!

টার্ন্‌কোট। ড্যাম টোডি আণ্ড ড্যাম ক্ষত্রপ। হে আমার স্বদেশবাসিগণ—

জনতা হইতে। Shut up! kick him—lynch the traitor।

টার্ন্‌কোট। না, না, আগে আমাকে বলতেই দাও। এই রাজসূয় যজ্ঞে তোমাদের যেতে হবে। কেন যেতে হবে? বাতাসা খেতে? সেলাম করতে? ভারত সরকারের জয়জয়কার করতে? নেভার। সেখানে যাবে যজ্ঞ পণ্ড করতে, লণ্ডভণ্ড করতে—ভারত-সরকার যেন বুঝতে পারে যে তামাসা দেখিয়ে আর বাতাসা খাইয়ে তোমাদের আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না।

জনতা হইতে। Long live Tricksy! Turncoat for ever!

নারীজাতির মুখপত্র 'দি শি-ম্যান' হইতে উদ্ধৃত।

কাল বৈকালে ঠিক তিনটার সময় নিখিল-ব্রিটিশ-নারী-বাহিনীর শোভাযাত্রা বাহির হইবে। রিজেণ্ট পার্ক হইতে আরম্ভ করিয়া

পোর্টলাণ্ড প্লেস, রিজেণ্ট স্ট্রীট, পিকাডিলি সার্কস, ট্রাফালগার স্কোয়ার হইয়া এই বিরাট প্রসেশন পার্লিমেণ্ট হাউসে পৌঁছিবে।

হাজার হাজার বৎসর হইতে পুরুষজাতি নারীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আর তাহাদের চালাকি চলিবে না। আমরা সবলে নিজের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইব। আমরা ভোটের অধিকার যাহা পাইয়াছি তাহা একেবারে ভুয়া। জুয়াচোর পুরুষগণ ছলে বলে কৌশলে ভোট যোগাড় করিয়া রাষ্ট্রীয় পরিষৎ প্রায় একচেটে করিয়াছে। এ ব্যবস্থা চলিবে না। ব্রিটেনের লোক-সংখ্যার শতকরা ষাটজন নারী। আমরা এই অনুপাতেই নারীসদস্য চাই। সরকারী চাকরিতেও আমরা শতকরা ষাটজন নারী চাই। পুরুষের চেয়ে কিসে আমরা কম? আমরা ডিভাইডেড স্কার্ট পরি, ঘাড় ছাঁটি, সিগারেট খাই, ককটেল টানি। এর পর দরকার হয় তো মুখে কবিরাজি কেশতৈল মাখিয়া গোঁফ-দাড়ি গজাইব। পুরুষের সহিত কোনও কারবার রাখিব না, কারণ ওরূপ কুটিল স্বার্থপর জাতি পৃথিবীতে আর নাই। তারা মনে করে এই জগতটা পুরুষের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। তাদের ভগবান পর্যন্ত পুংলিঙ্গ। আমরা হি-গড মানিব না। আইসিস, ডায়না, কালী অথবা শূর্পণখা —এঁদের দ্বারাই আমাদের কাজ চলিবে।

হে নারী, তুমি আর অবলা সরলা niminy piminy গৃহিণী নহ। তুমি দাঁত নখ শানাইয়া এস, ভয়ংকরী মূর্তিতে এই মহাবাহিনীতে যোগ দিয়া পার্লিমেণ্ট আক্রমণ কর। অকর্মণ্য পুরুষদের তাড়াইয়া দিয়া সরকারের নিকট হইতে আপন অধিকার আদায় করিয়া লও।

পুরুষজাতির মুখপাত্র 'দি মিয়ার ম্যান' হইতে উদ্ধৃত।

সরকার কি নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইতেছেন? কাল এই লণ্ডন শহরের উপরে যে পৈশাচিক কাণ্ড হইয়া গেল তাহাতে বোধ হয় যেন দেশে অরাজকতা উপস্থিত। দুর্বৃত্তা নারীগণ প্রকাশ্য

দিবালোকে বিষম অত্যাচার করিয়াছে, দোকান-পাট ভাঙিয়া তছনছ করিয়াছে, নিরীহ পুরুষগণকে খামচাইয়া কামড়াইয়া জর্জরিত করিয়াছে, কিন্তু সরকারের পেয়ারের উড়িয়া-পুলিশ তখন কি করিতেছিল ? তারা একগাল পান মুখে পুরিয়া দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিতেছিল এবং নারীগুণ্ডাগণকে অধিকতর ক্ষিপ্ত করিবার জন্য হাততালি দিয়া বলিতেছিল—'হী—হ-হ-হ-হ-। খাঁসাহেব গবসন টোডি, সার ট্রিক্সি টার্নকোট প্রভৃতি মাননীয় দেশনেতৃগণ দাঙ্গা-নিবারণের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িয়া সার্জেণ্টরা তাঁদের অপমান করিয়া বলিয়াছে—'এ সাহেবঅ, ওপাকে যিব তো ডণ্ডা খিব।'

সরকার নিশ্চয় এই ব্যাপারে মনে মনে খুশী হইয়াছে, কারণ দেশে আত্মকলহ যত হয় ততই সরকারের বলিবার ছুতা হয় যে আমরা স্বায়ত্তশাসনের অযোগ্য।

'রাষ্ট্রবিৎ' হইতে উদ্ধৃত।

ইংরেজগণের মধ্যে যদি কেহ বুদ্ধিমান থাকেন তবে এইবার বুঝিবেন যে তাঁহাদের স্বাধীনতার আশা সুদূরপরাহত। লিবার্টি লীগ, অ্যাংলো-সেল্টিক ইউনিয়ন, হেটেরো-সেক্সুয়াল প্যাক্ট—এ সব শুনিতে বেশ। কিন্তু এই ঠাণ্ডা দেশের রক্ত যখন দ্বেষহিংসায় গরম হইয়া উঠে তখন আর তত্ত্বকথায় চলে না যখন দাঙ্গা বাধে তখন একমাত্র ভরসা ভারত সরকারের দণ্ডনীতি এবং দুর্দান্ত উড়িয়া পুলিস।

কেবলই শুনতে পাই—স্বায়ত্তশাসনে ব্রিটিশ জাতির জন্মগত অধিকার। কিন্তু হে ব্রিটন, তোমাদের ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয় ? স্বাধীনতা কাকে বলে তোমরা কখনই জানিতে না। প্রথমে রোমান-গণের, তার পর অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, ডেন, নরম্যান প্রভৃতি বিবিধ দস্যুজাতির অধীনতায় তোমাদের দিন কাটিয়াছে। যাহারা বিজেতা-রূপে তোমাদের দেশে আসিয়াছে, পরে তাহারাই আবার অন্য জাতি

কর্তৃক বিজিত হইয়াছে। আজ কে বিজেতা কে বিজিত বুঝিবার উপায় নাই—তোমরা কেহই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পার নাই। তোমাদের জাতির স্থিরতা নাই, দেশ নিজের নয়, ধর্ম পর্যন্ত নিজের নয়। একতা তোমাদের মধ্যে কোনও কালেই নাই। সামাজিক আর্থিক কতরকম দলাদলি তোমাদের আছে তার ইয়ত্তা নাই। ক্ষুদ্র ব্রিটেনের যখন এই অবস্থা, তখন সমস্ত ইওরোপের কথা না তোলাই ভাল! নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম ইওরোপকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র ভারত সরকারের শাসনেই এই মহাদেশ ঠাণ্ডা হইয়া আছে। তোমরা আগে একটু সভ্য হও, তার পর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিও। তোমরা মদে ও জুয়ায় ডুবিয়া আছ, বর্বরের মত তোমরা এখনও নাচিয়া থাক, স্নান করিতে ভয় খাও, আহারের পর কুলকুচা কর না। এখন কিছুকাল শান্ত শিষ্ট হইয়া সর্ববিষয়ে ভারতের অনুগত হইয়া চল, তার পর যথাসময়ে তোমাদের অধিকার দেওয়া-না-দেওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

ভোমস্টাট প্রাসাদ। প্রিন্স ভোম, চৈনিক পর্যটক ল্যাং প্যাং
এবং প্রিন্স খানসামা কোবন্ট।

প্রিন্স ভোম। আচ্ছা হের প্যাং, আপনি তো নানা দেশ বেড়িয়েছেন—আমাদের এই রাজ্যটা আপনার কেমন লাগছে?

ল্যাং প্যাং। মন্দ নয়। মাঠ আছে, জল আছে, রুটি আছে, ঘাস আছে, শুওর ভেড়া আছে। কিন্তু দেশের লোক যেন সব ঝিমিয়ে রয়েছে। কেন বলুন তো?

প্রিন্স। ঐ তো মজা। সমস্ত ইওরোপে যে অসন্তোষ আর চাঞ্চল্য দেখেছেন, এখানে তার কিছুই পাবেন না। ভারত-সরকার বলেন—আমাদের খাস রাজ্যে আমরা ইচ্ছামত প্রজাদের একটু আশকারা দেব, আবার রাশ টেনে ধরব। কিন্তু তুমি নাবালক, ওরকম করতে যেয়ো না, মারা যাবে। তোমার রাজ্যে গোলযোগ

দেখলেই তোমায় কান ধ'রে বার ক'রে দেব। তাই রাজ্যসুদ্ধ মৌতাতের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি—সব ভোম হয়ে আছে। কোবল্ট, এক গুলি দে বাবা, তিনটে বাজে, হাই উঠছে। আহা, কি জিনিসই আপনাদের পূর্বপুরুষেরা আবিষ্কার করেছিলেন হের প্যাং!

ল্যাং প্যাং। কিন্তু এখন আর আমাদের দেশে জন্মায় না। যা খাচ্ছেন তা ভারতের, আপনাদের জন্যই উৎপন্ন হয়।

(প্রিন্সের মন্ত্রী ব্যারন ফন বিবলারের প্রবেশ)

বিবলার। মহারাজ, ইংলাণ্ড থেকে সার ট্রিক্‌সি টার্ন্‌কোট দেখা করতে এসেছেন।

প্রিন্স। আঃ জ্বালালে। একটু যে শুয়ে শুয়ে আরাম করব তার জো নেই। নিয়ে এস ডেকে। বাবা কোবল্ট, আমায় বাঁ পাশে ফিরিয়ে দে তো।

ল্যাং প্যাং। আমি তা হ'লে এখন উঠি—

প্রিন্স। না, না, বসুন। আমি ভারতীয় কায়দায় লোকজনের সঙ্গে মোলাকাত করি, একে একে অডিয়েন্স দেওয়া আমার পোষায় না, একসঙ্গেই পাঁচ-সাত জনের দরবার শুনি। তাতে মেহনত কম হয়, গল্প-গুজবও জমে।

(টার্ন্‌কোটের প্রবেশ)

প্রিন্স। হা-ডু-ডু সার ট্রিক্‌সি? বসুন ঐ চেয়ারটায়। তার পর খবর কি বলুন।

টার্ন্‌কোট। প্রিন্স, আপনাকে হাগ যেতে হবে, প্যান ইওরোপিয়ান লিবার্টি-লীগের সভাপতিরূপে।

প্রিন্স। মাইন গট! এ বলে কি? কোবল্ট, আর এক গুলি দে বাবা।

টার্নকোট। আচ্ছা সভাপতি হ'তে আপত্তি থাকে, না হয় অমনিই যাবেন। না গেলে আমরা ছাড়ব না।

প্রিন্স। হাগ যাব? খেপেছেন নাকি?

টার্নকোট। কেন, তাতে বাধা কি? এই তো ভাইকাউন্ট পাফ, কাউণ্টেস গ্রিমালকিন, গ্রাণ্ডডিউক প্যাঞ্জানড্রাম—এঁরা সব যাবেন।

প্রিন্স। আরে তাদের সঙ্গে আমার তুলনা! তারা হ'ল নগণ্য ভারতীয় প্রজা, ইচ্ছা করলে জাহান্নমে যেতে পারে। আর আমি হলুম একজন স্বাধীন সামন্ত নরপতি, যাব বললেই কি যাওয়া যায়? যদি মহাক্ষত্রপের হুকুম নিতে যাই তো বলবেন—ব্যাটা এক্ষুনি রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যাও।

টার্নকোট। তবে কথা দিন, রাজসূয় যজ্ঞেও যাবেন না।

প্রিন্স। গট ইন হিম্মেল! আপনার দেখছি মাথা বিগড়ে গেছে। রাজসূয় যজ্ঞে যাবার জন্যে ছ-মাস ধ'রে আয়োজন করছি, কোটি-খানেক টাকা খরচ হবে—আর আপনাদের আবদার শুনে সব এখন ভেস্তে দিই! হাঁ—ভাল কথা—ব্যারন, জগঝম্প সব কটা ঠিক আছে তো? সতরটা গুনে দেখেছ?

বিবলার। আজ্ঞে হাঁ। আমি সব-কটা রদ্দুরে দিয়ে টনটনে ক'রে রেখেছি।

প্রিন্স। ঠিক সতরটা?

বিবলার। ঠিক সতর।

ল্যাং প্যাং। জগঝম্প কি হবে প্রিন্স?

প্রিন্স। বাজবে। যখন আমি যাত্রা করব, সঙ্গে সঙ্গে সতরটা জগঝম্প বাজবে। প্রিন্স ড্রুংকেনডর্ফের মোটে তেরটা। আমার সতর।

ল্যাং প্যাং। আপনার অভাব কি, আপনি মনে করলে তো

সতরর জায়গায় সাত-শ জগঝম্প, জয়ঢাক, চড়বড়ে, কাঁসি, ভেঁপু, রামশিঙে যা খুশি বাজাতে পারেন।

প্রিন্স। হেঁ হেঁ, জগঝম্প হ'লেই হয় না। সরকার যে-কটি বরাদ্দ ক'রে দিয়েছেন ঠিক সেই কটি বাজানো চাই। বেশী যদি বাজাই তবে বিলকুল বাতিল হবে। বাবা কোবল্ট আমার নাকের ডগায় একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দে তো।

টার্ন্‌কোট। তা হ'লে আপনি আমার কোনও অনুরোধই রাখলেন না?

প্রিন্স। অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আপনাদের উদ্যমে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে জানবেন। ব্যারন বিবলার, আপনি একটু ও-ঘরে যান তো। হ্যাঁ—দেখুন সার ট্রিক্‌সি, আপনাদের সঙ্গে দেশ উদ্ধার করতে গিয়ে আমার এই পৈতৃক রাজ্য আর পৈতৃক প্রাণটি খোয়াতে পারব না। তবে যদি বেঁচে থাকি, আর আপনাদের কার্যসিদ্ধি হয়, আর ইওরোপের জন্য একজন জবরদস্ত এম্পারার কি কাইজার কি ডিকটেটার দরকার হয়, তখন আমার কাছে আসবেন। ঐ কাজটা আমাদের বংশগত কিনা, বেশ ষড়গত আছে। তার পর সার ট্রিক্‌সি, এক গুলি খেয়ে দেখবেন নাকি? মাথা ঠাণ্ডা হবে। অভ্যাস নেই? আচ্ছা, তবে এক গ্লাস শ্যাম্প্‌স্‌ খান।

'দি লণ্ডন ফগ' হইতে উদ্ধৃত

দুইমাসব্যাপী হরতালের মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। ইওরোপের জনসাধারণ এই অনুষ্ঠান বর্জন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছে—অবশ্য জনকতক ধামা-ধরা ছাড়া। আমরা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম না, সুতরাং আর কোনও খবর জানি না।

রাজসূয় যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তথাকথিত দেশনায়কগণকে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া ইওরোপের জনসাধারণ এই বিরাট উৎসবে যোগ দিয়া অশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছে।

যজ্ঞ উপলক্ষে যাঁহারা সরকারকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সার ট্রিক্সি টার্ন্‌কোটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুনিতেছি ব্রিটিশ মেষবংশের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকার যে কমিশন বসাইয়াছেন, সার ট্রিক্সি তার প্রেসিডেন্টরূপে শীঘ্রই কামরূপ যাত্রা করিবেন।



আনন্দীবাঈ

ইত্যাদি গল্প

আনন্দীবাঈ

বহু কারবারের মালিক ত্রিক্রমদাস করোড়ী তাঁর দিল্লির অফিসের খাস কামরায় বসে চেক সহি করছেন। আরদালী এসে একটা কার্ড দিল—এম. জুলফিকার খাঁ। ত্রিক্রমদাস বললেন, একটু সবুর করতে বল।

কিছুক্ষণ পরে সহি করা চেকের গোছা নিয়ে কেরানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ত্রিক্রমদাস ঘণ্টা বাজিয়ে আরদালীকে ডেকে কার্ডখানা দিয়ে বললেন, আসতে বল।

জুলফিকার খাঁ এসে বললেন, আদাব আরজ। শেঠজী, আমি ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ থেকে আসছি।

উদ্বিগ্ন হয়ে শেঠজী প্রশ্ন করলেন, ইনকামট্যাক্স নিয়ে আবার কিছু গড়বড় হয়েছে নাকি ?

—তা আমার মালুম নেই। আমার ডিপার্টমেণ্টে আপনার নামে একটা সিরিয়স চার্জ এসেছে।

—কেন, আমার কসুর কি ?

—আপনি তিনটি শাদি করেছেন।

একটু হেসে ত্রিক্রম বললেন, য়হ বাত ? যদি করেই থাকি তাতে আমার কসুর কি ? অমি তো হিন্দু, সৈকড়োঁ শাদি করতে পারি, আপনাদের মতন চারটি বিবিতে আটকে থাকবার দরকার নেই।

খাঁ সাহেব হাত নেড়ে বললেন, হায় হায় শেঠজী, আপনি রুপয়াই কামাতে জানেন, মুলুকের খবর রাখেন না। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন আর শিখ একটির বেশী শাদি করতে পারবে না—এই আইন সম্প্রতি চালু হ'য়ে গেছে তা জনেন না ?

—বলেন কি! আমি নানা ধান্দায় ব্যস্ত, সব খবর রাখবার ফুরসত নেই। নতুন ট্যাক্স কি বসল, নতুন লাইসেন্স কি নিতে হবে, এই সবেরই খোঁজ রাখি। কিন্তু আপনার খবরে বিশ্বাস হচ্ছে না, আমার ফুফা (পিসে) হরচন্দ্‌জী দুই জরু নিয়ে বহুত মজে মে আছেন, তাঁর নামে তো চার্জ আসে নি।

—আইন চালু হবার আগে থেকেই তো তাঁর দুই জরু আছে, তাতে দোষ হয় না। কিন্তু আপনি হালে তিন শাদি করেছেন, তার জন্যে কড়া সাজা হবে, দশ বৎসর জেল আর বিস্তর টাকা জরিমানা হতে পারে।

শেঠজী ভয় পেয়ে বললেন, বড়ী মুশকিল কি বাত, এখন এর উপায় কি?

—দেখুন শেঠজী আপনি মান্যগণ্য আমীর আদমী, আপনাকে মুশকিলে ফেলতে আমরা চাই না। এক মাস সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলুন।

—কত টাকা লাগবে?

—আপনি একটি জরুকে বহাল রেখে আর দুটিকে ঝটপট খারিজ করুন। তার জন্যে কত খেসারত দিতে হবে তা তো আমি বলতে পারি না, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। আর এদিকে কত টাকা লাগবে সে তো আপনার আর আমার মধ্যে, তার কথা পরে হবে।

মাথা চাপড়ে ত্রিক্রমদাস বললেন, হোরামজী, হো পরমাত্মা, বাঁচাও আমাকে। একটিকে সনাতনী মতে বিবাহ করেছি, আর একটিকে আর্যসমাজী মতে, আর একটির সঙ্গে সিভিল ম্যারিজ হয়েছে। খারিজ করব কি করে?

—ঘাবড়াবেন না, শেঠজী, আপনার টাকার কমি কি? দু-চার লাখ খরচ করলে সব মিটে যাবে। দুটি স্ত্রীকে মোটা খেসারত দিয়ে কবুল করিয়ে নিন যে তারা আপনার অসলী জরু নয়, শুধু মুহব্বতী পিয়ারী। তার পর আমরা ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেব। দেরি

করবেন না, এখনই কোনও ভাল উকিল লাগান। আচ্ছা, আজ আমি উঠি, হপ্তা বাদ আবার দেখা করব। আদাব।

ত্রিক্রমদাসের বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশী। তাঁর বৈবাহিক ইতিহাস অতি বিচিত্র। দু বৎসর আগে তাঁর একমাত্র পত্নী কয়েকটি ছেলেমেয়ে রেখে মারা যান। তার কয়েক মাস পরে তিনি আনন্দীবাঈকে বিবাহ করেন। তার পর সম্প্রতি তিনি আরও দুটি বিবাহ করেছেন কিন্তু তার খবর আত্মীয়-বন্ধুদের জানান নি। এখনকার পত্নীদের প্রথমা আনন্দীবাঈ হচ্ছেন খজৌলি স্টেটের ভূতপূর্ব দেওয়ান হরজীবনলালের একমাত্র সন্তান, বহু ধনের অধিকারিণী। হরজীবন মারা গেলে তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই অভিভাবক হয়ে ভাইঝিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু মেয়ের মামাদের সাহায্যে ত্রিক্রমদাস আনন্দীকে বিবাহ করে তাঁর সম্পত্তি নিজের দখলে আনলেন। আনন্দীবাঈএর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, দেখতে ভাল নয়; একটু ঝগড়াটে, উচ্চবংশের অহংকারও আছে।

ত্রিক্রমদাসের ব্যবসার কেন্দ্র আর হেড অফিস দিল্লিতে, তা ছাড়া বোম্বাই আর কলকাতায় তাঁর যে ব্রাঞ্চ অফিস আছে তাও ছোট নয়। তিনি বৎসরে তিন-চার বার ওই দুই শাখা পরিদর্শন করেন। আনন্দীর সঙ্গে বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি বোম্বাই যান। সেখানকার ম্যানেজার কিষনরাম খোবানী একদিন তাঁর মনিবকে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি সিন্ধের লোক, দেশ ত্যাগের পর দিল্লি চলে আসেন, তার পর শেঠজীর ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে বোম্বাইএ বাস করছেন। কিষনরাম শৌখিন লোক, তাঁর ফ্ল্যাট বেশ সাজানো। তিনি তাঁর স্ত্রী আর শালীর সঙ্গে নিজের মনিবের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শেঠজী সেকেলে লোক, আধুনিক মহিলাদের সঙ্গে তাঁর মেশবার

সুযোগ এ পর্যন্ত হয় নি। কিষনরামের শালী রাজহংসী ঝলকানীকে দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। কি ফরসা রং, কি সুন্দর সাজ! পরেন ফিকে নীল সালোয়ার আর ঘোর নীল কামিজ, তার উপর চুমকি বসানো ফিকে সবুজ দোপাট্টা ঝলমল করছে। কথাবার্তা অতি মধুর, কোনও জড়তা নেই, হেসে হেসে এটা খান ওটা খান বলে অনুরোধ করছে।

খাওয়া শেষ হল। কিষনরামকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে শেঠজী রাজহংসী ঝলকানীর সব খবর জেনে নিলেন। মেয়েটির বাপ মা নেই। একমাত্র ভাই সিংগাপুরে ভাল ব্যবসা করে, কিন্তু বোনের কোনও খবর নেয় না, অগত্যা কিষনরাম তাঁর শালীকে নিজের কাছে রেখেছেন। সে ভাল অভিনয় করতে পারে, গাইতে পারে, সিনেমায় নামবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু কিষনরাম ও তাঁর স্ত্রীর মত নেই।

শেঠজী তখনই মতি স্থির করে বললেন, আমার সঙ্গে রাজহংসীর বিবাহ দাও, ওকে আমি খুব সুখে রাখব। এই বোম্বাই শহরেই আমার জন্যে জলদি একটা বাড়ি কিনে ফেল, রাজহংসী সেখানে থাকবে, আমিও বৎসরের বেশীর ভাগ বোম্বাইএ বাস করব। এখানকার কারবার ফালাও করতে চাই।

আনন্দীবাঈ এর কথা শেঠজী চেপে গেলেন। কিষনরাম জানতেন যে তাঁর মালিক বিপত্নীক, সুতরাং তিনি খুশী হয়ে সম্মতি দিলেন। রাজহংসীও রাজী হলেন, শেঠজীর বেশী বয়সের জন্যে কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করলেন না। আর্যসমাজী পদ্ধতিতে বিবাহ হয়ে গেল। তার পর নূতন বাড়িও কেনা হল, রাজহংসী সেখানে বাস করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে ত্রিক্রমদাস তাঁর কলকাতার কারবার পরিদর্শন করতে গেলেন। ওখানকার ম্যানেজার পরিতোষ হোড়-চৌধুরী খুব কাজের লোক, আলিপুরে সাহেবী স্টাইলে থাকেন। তিনি তাঁর মনিবকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে

পরিতোষের স্ত্রী আর ভগ্নীর সঙ্গে ত্রিক্রমদাসের পরিচয় হল। মিস বলাকা হোড়-চৌধুরীকে দেখে শেঠজী অবাক হয়ে গেলেন। রাজ-হংসীর মতন রূপসী নয় বটে, কিন্তু শাড়ি পরবার ভঙ্গীটি কি চমৎকার, আর বাত-চিত আদব কায়দাও কি সুন্দর! মেমসাহেবদের মতন ইংরেজী উচ্চারণ করে, আর হিন্দী বলতে ভুল করে বটে কিন্তু সেই ভুল কি মিষ্টি! শেঠজী একেবারে কাবু হয়ে পড়লেন। পরিতোষ হোড়-চৌধুরী তাঁকে জানালেন, বলাকা এম· এ· পাস, নাচ-গানে কলকাতায় ওর জুড়ী নেই, সিনেমাওয়ালারা ওকে পাবার জন্যে সাধাসাধি করছে, কিন্তু পরিতোষের তাতে মত নেই। ত্রিক্রমদাস নিজেকে সামলাতে পারলেন না, বলে ফেললেন, মিস বলাকা, মৈ তুমকো শাদি করুংগা।

বলাকা সহাস্যে উত্তর দিলেন, তা বেশ তো, কিন্তু দিল্লির গরম তো আমার সইবে না, আর আপনাদের দাল-রোটি ভাজী দহিবড়া আমার হজম হবে না।

শেঠজী বললেন, আরে দিল্লি যেতে তোমাকে কে বলছে? আমি এই আলিপুরে একটা মোকাম কিনব, তুমি সেখানে তোমার দাদার কাছাকাছি বাস করবে। আমি বছরে আট-ন মাস এখানেই কাটাব, কলকাতার কারবার ফালাও করতে চাই। তোমাকে দাল-রোটি খেতে হবে না, মচ্ছি-ভাতই খেয়ো। মচ্ছি খেতে আমিও নারাজ নই, কিন্তু বড় বদব্ লাগে।

বলাকা বললেন, আমি গোলাপী আতর দিয়ে ইলিশ মাছ রেঁধে আপনাকে খাওয়াব, মনে হবে যেন কালাকন্দ খাচ্ছেন।

ত্রিক্রমদাস পালা করে দিল্লি থেকে বোম্বাই আর কলকাতা যেতে লাগলেন, তাঁর দাম্পত্যের ত্রিধারায় কোনও ব্যাঘাত ঘটল না, পরমানন্দে দিন কাটতে লাগল। তার পর অকস্মাৎ একদিন জুলফিকার খাঁ দুঃসংবাদ দিয়ে শেঠজীর শান্তিভঙ্গ করলেন।

উকিল খজনচাঁদ বি. এ. এল-এল. বি. ত্রিক্রমদাসের অনুগত বিশ্বস্ত বন্ধু, ইনকমট্যাক্সের হিসাব দাখিলের সময় তাঁর সাহায্য না নিলে চলে না। শেঠজী সেই দিনই সন্ধ্যার সময় খজনচাঁদের কাছে গিয়ে নিজের বিপদের কথা জানালেন।

খজনচাঁদ বললেন, শেঠজী, আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষের মতন কাজ করেছেন। আমাকে আপনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু ওই বুম্বই-বালী আর কলকাত্তাবালীকে কথা দেবার আগে একবার আমাকে জানালেন না, এ বড় আফসোস কি বাত।

শেঠজী হাত জোড় করে বললেন, মাফ কর ভাই, বুড়ো বয়সে একটা স্ত্রী থাকতে আরও দুটো বিয়ে করবার লোভ হয়েছে এ কথা লজ্জায় তোমাকে বলি নি। এখন উদ্ধারের উপায় বাতলাও।

কিছুক্ষণ ভেবে খজনচাঁদ বললেন, আনন্দীবাঈকে কিছু বলবার দরকার নেই, শুনলে উনি দুঃখ পাবেন, কান্নাকাটি করবেন। আর দুজনকে একে একে আপনি সব কথা খুলে বলুন। ওঁরা হচ্ছেন মডার্ন গার্ল, আত্মমর্যাদাবোধ খুব বেশী। আপনার কুকর্ম জানলে রেগে আগুন হবেন, আপনার মুখ দেখতে চাইবেন না। তাতে আমাদের সুবিধাই হবে, মোটা খেসারত দিলে আর আপনার দুই ম্যানেজারকে কিছু খাওয়ালে সব মিটে যাবে। দুচার লাখ খরচ হতে পারে, কিন্তু আপনার তা গায়ে লাগবে না।

এই পরামর্শ ত্রিক্রমদাসের পছন্দ হল না। তিনি বললেন, খজন ভাই, তুমি আমার প্রাণের কথা বুঝতে পারছ না। আমি বিজনেস বাড়াতে চাই, তার জন্যে নামজাদা লোকের সঙ্গে মেশা দরকার। আমি যদি মন্ত্রী আর বড় বড় অফিসারদের পার্টি দিই তবে আমার বাড়ির কোন্ লেডী অতিথিদের আপ্যায়িত করবে? আনন্দী? রাম কহো। রাজহংসী আর বলাকা হচ্ছে এই কাজের কাবিল। বাতিল করতে হলে আনন্দীকেই করতে হবে। তাতে আমার কলিজা ফেটে যাবে, অনেক টাকার সম্পত্তিও ছাড়তে হবে, কিন্তু

তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি। মুশকিল হচ্ছে—রাজহংসী আর বলাকার মধ্যে কাকে রাখব কাকে ছাড়ব তা স্থির করা বড় শক্ত, তবে আমার বেশী পছন্দ কলকাত্তাবালী বলাকা দেবী। ওকে যদি নিতান্ত না রাখতে পারি তবে ওই বুম্বইবালী রাজহংসী। টাকার জন্যে ভেবো না, দশ-পনেরো লাখ তক খরচ করতে আমি তৈয়ার আছি।

খজনচাঁদ অনেক বোঝালেন যে আনন্দীবাঈ তাঁর আইনসম্মত স্ত্রী, তাঁর দাবী সকলের উপরে। তাঁকে ত্যাগ করতে হলে অনেক জুয়াচুরির দরকার হবে, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে দিতে হবে, তার ফলে মোট লোকসান খুব বেশী হবে, আনন্দীবাঈএর সেই বদমাশ কাকার শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু ত্রিক্রমদাস কিছুতেই তাঁর সংকল্প ছাড়লেন না। অগত্যা খজনচাঁদ বললেন, বেশ, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি দেরি না করে তিনজনকেই সব কথা খুলে বলুন। ওঁদের মনের ভাব দেখে আমি যা করবার করব।

কালবিলম্ব না করে ত্রিক্রমদাস এয়োরোপ্লেনে বোম্বাই গেলেন এবং সোজা রাজহংসীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। রাজহংসী তাঁর ড্রইংরুমে বসে একটি সুবেশ যুবকের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন, আরে শেঠজী হঠাৎ এলে যে! কোনও খবর দাও নি কেন? এঁকে তুমি চেন না, ইনি হচ্ছেন মিস্টার ঝুমকমল মটকানি, দূর সম্পর্কে আমার ফুফেরা (পিসতুতো) ভাই হন, হিসাবের কাজে ওস্তাদ। এখানকার অফিসের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট তো বুড়ো হয়েছে, তাকে বিদায় করে এই ঝুমকমলকে সেই পোস্টে বসাও।

ত্রিক্রমদাস বললেন, আমি ভেবে দেখব। রাজহংসী, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

ঝুমকমল চলে গেলে ত্রিক্রমদাস ভয়ে ভয়ে তাঁর তিন বিবাহের কথা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তার রিঅ্যাকশন যা হল তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। রাজহংসী হেসে গড়িয়ে পড়ে বললেন, বাহবা শেঠজী তুমি দেখছি বহুত রঙ্গীলা আদমী! তোমার আরও দুই জরু আছে তাতে হয়েছে কি, আমি ওসব গ্রাহ্য করি না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সব ঠিক হৈ। তবে কথাটা যেন জানাজানি না হয়।······হ্যাঁ, ভাল কথা, এই বাড়িটা জলদি আমার নামে রেজিস্টারি করা দরকার, মিউনিসিপ্যালিটি বড় হয়রান করছে।

শেঠজী বললেন, আচ্ছা, তার ব্যবস্থা হবে। আজ আমি থাকতে পারব না, জরুরী কাজে এখনই কলকাতা রওনা হব।

কলকাতায় পৌঁছে ত্রিক্রমদাস সোজা আলিপুরে বলাকার কাছে গেলেন। ড্রইংরুমে একজন সুদর্শন ভদ্রলোক পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন আর বলাকা তালে তালে নাচছিলেন। ত্রিক্রমকে দেখে বলাকা বললেন, একি শেঠজী, হঠাৎ এলে যে! এঁকে বোধ হয় চেন না, ইনি হচ্ছেন লোটনকুমার ভড়, দূর সম্পর্কে আমার মাসতুতো ভাই, নাচের ওস্তাদ। এঁর কাছে আমি কবুতর-নৃত্য শিখছি। দেখবে একটু?

ত্রিক্রম বললেন, এখন আমার ফুরসত নেই। বলাকা, তোমার সঙ্গে আমার বহুত জরুরী কথা আছে।

লোটনকুমার উঠে গেলে ত্রিক্রমদাস কম্পিত বক্ষে তাঁর তিন বিবাহের কথা প্রকাশ করলেন। বলাকা গালে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, ওমা তাই নাকি! ওঃ শেঠজী, তুমি একটি আসল পানকৌড়ি নটবর নাগর। তা তুমি অমন মুষড়ে গেছ কেন, তিনটে বউ আছে তো হয়েছে কি? ঠিক আছে, তুমি ভেবো না, আমি হিংসুটে মেয়ে নই। কিন্তু তুমি যেন সবাইকে বলে বেড়িয়ো না।....হ্যাঁ, ভাল কথা, দেখ শেঠজী একটা নতুন মোটরকার না হলে চলছে না, পুরনো অস্টিনটা হরদম বিগড়ে যাচ্ছে। তুমি হাজার কুড়ি টাকার একটা চেক আমাকে দিও, তার কমে ভাল গাড়ি মিলবে না।

ত্রিক্রমদাস বললেন, আচ্ছা, তার ব্যবস্থা হবে। আমি এখন উঠি, আজই দিল্লি যেতে হবে।

ত্রিক্রমদাস দিল্লিতে এসেই খজনচাঁদের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। তার পর তাঁকে সঙ্গে করে নিজের বাড়িতে এনে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করতে বললেন।

অন্দরমহলে গিয়ে ত্রিক্রম আনন্দীবাঈকে শোবার ঘরে ডেকে আনালেন। আনন্দী বললেন, তিন দিন তোমার কোনও পাত্তা নেই, চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, ব্যাপার কি, গভরমেণ্টের সঙ্গে আবার কিছু গড়বড় হয়েছে নাকি ?

ত্রিক্রমদাস মাথা হেঁট করে তাঁর গুপ্তকথা প্রকাশ করলেন। আনন্দী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তার পর কোমরে হাত দিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, ক্যা বোলা তুম নে ?

শেঠজী একটু ভয় পেয়ে বললেন, আনন্দী, ঠাণ্ডা হো যাও, সব ঠিক হো জাগা।

বাংলা সাহিত্য যতই সমৃদ্ধ আর উঁচুদরের হক, হিন্দী ভাষায় গালাগালির যে শব্দসম্ভার আছে তার তুলনা নেই। আনন্দীবাঈ হাত-পা ছুড়ে নাচতে লাগলেন, হোজ-পাইপ থেকে জলধারার মতন তাঁর মুখ থেকে যে ভর্ৎসনা নির্গত হতে লাগল তা যেমন তীব্র তেমনি মর্মস্পর্শী। তার সকল বাক্য ভদ্রজনের শ্রোতব্য নয়, ভদ্রনারীর উচ্চার্যও নয়, কিন্তু আনন্দীবাঈএর তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তিনি উত্তরোত্তর উত্তেজিত হচ্ছেন দেখে শেঠজী হাত জোড় করে আবার বললেন, আনন্দী, মাফ করো, সব ঠিক হো জাগা।

আনন্দী গর্জন করে বললেন, চোপ রহো শড়ক কা কুত্তা, ডিরেন কা ছুছুন্দর! এই বলেই বাঘিনীর মতন লাফিয়ে গিয়ে শেঠজীর

দুই গালে খামচে দিলেন। তার পর পিছু হটে তাঁর বাঁ হাত থেকে দশগাছা মোটা মোটা চুড়ি খুলে নিয়ে স্বামীর মস্তক লক্ষ্য করে ঝনঝন শব্দে নিক্ষেপ করলেন। শেঠজীর কপাল ফেটে রক্ত পড়তে লাগল, তিনি চিৎকার করে ধরাশায়ী হলেন। ততোধিক চিৎকার করে আনন্দীবাঈ তাঁর পূজোর ঘরে চলে গেলেন এবং মেঝেয় শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বাড়িতে মহা শোরগোল পড়ে গেল। আত্মীয়া যাঁরা ছিলেন তাঁরা আনন্দীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। শেঠজীর জন্যে খজনচাঁদ তখনই ডাক্তার ডেকে আনালেন।

সাত দিন পরে শেঠজী অনেকটা সুস্থ হয়েছেন এবং দোতলার বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে গুড়গুড়ি টানছেন। তাঁর মাথায় এখনও ব্যাণ্ডেজ আছে, মুখে স্থানে স্থানে স্টিকিং প্লাসটারও আছে।

খজনচাঁদ এসে বললেন, কহিএ শেঠজী, তবিয়ত কৈসী হৈ।

শেঠজী বললেন, অনেক ভাল। শোন খজন-ভাই, রাজহংসী আর বলাকার সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখতে চাই না। তুমি তুরন্ত বোম্বাই আর কলকাতায় গিয়ে একটা মিটমাট করে ফেল, যত টাকা লাগে আমি দেব। ওই বুম্বইবালী আর কলকাত্তাবালী শুধু আমার টাকা চায়, আমাকে চায় না, কিন্তু আনন্দী আমাকেই চায়। খুশবু পাচ্ছ? আনন্দী নিজে আমার জন্যে ড়হর ডালের খিচ্‌ড়ি বানাচ্ছে। আর এই দেখ, গলাবন্ধ বুনে দিয়েছে।

খজনচাঁদ বললেন, বহুত খুশি কি বাত। শেঠজী, ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দেব। আপনি আনন্দীবাঈকে মথুরা বৃন্দাবন দ্বারকায় ঘুরিয়ে আনুন, তাঁর মেজাজ ভাল হয়ে যাবে।

পত্নীর সেবায় ত্রিক্রমদাস শীঘ্র সেরে উঠলেন। খজনচাঁদের

চেষ্টায় রাজহংসী আর বলাকার সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে, জুলফিকার খাঁও পান খাবার জন্যে মোটা টাকা পেয়েছেন। কলকাতার সব চেয়ে বড় জ্যোতিষসম্রাট জ্যোতিষচন্দ্র জ্যোতিষার্ণবের কাছ থেকে আনন্দীবাঈ হাজার টাকা দামের একটি বশীকরণ কবচ আনিয়ে স্বামীর গলায় বেঁধে দিয়েছেন। এই পুরশ্চরণসিদ্ধ কবচের ফলও আশ্চর্য। শেঠজী আজকাল তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছে বলে থাকেন, সিবায় আনন্দী সব আওরত চুড়েল হৈ—অর্থাৎ আনন্দী ছাড়া সব স্ত্রীলোকই পেতনী।

(একটি ইংরেজী গল্পের প্লটের অনুসরণে। লেখকের নাম মনে নেই।)

১৮৭৮

চাঙ্গায়নী সুধা

ক্যালকাটা টি ক্যাবিনের নাম নিশ্চয় আপনাদের জানা আছে, নূতন দিল্লির গোল মার্কেটের পিছনের গলিতে কালীবাবুর সেই বিখ্যাত চায়ের দোকান।

বিজয়াদশমী, সন্ধ্যা সাতটা। পেনশনভোগী বৃদ্ধ রামতারণ মুখুজ্যে, স্কুল মাষ্টার কপিল গুপ্ত, ব্যাংকের কেরানী বীরেশ্বর সিংগি, কাগজের রিপোর্টার অতুল হালদার প্রভৃতি নিয়মিত আড্ডাধারীরা সকলেই সমবেত হয়েছেন। বিজয়ার নমস্কার আর আলিঙ্গন যথারীতি সম্পন্ন হয়েছে, এখন জলযোগ চলছে। কালীবাবু আজ বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন—চায়ের সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা ফুলুরি নিমকি আর গজা।

অতুল হালদার বললেন, আজকের ব্যবস্থা তো কালীবাবু ভালই করেছেন, কিন্তু একটি যে ত্রুটি রয়ে গেছে, কিঞ্চিৎ সিদ্ধির শরবত থাকলেই বিজয়ার অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

রামতারণ মুখুজ্যে বললেন, তোমাদের যত সব বেয়াড়া আবদার। চায়ের দোকানে সিদ্ধির শরবত কি রকম? সিদ্ধি হল একটি পবিত্র বস্তু, যার শাস্ত্রীয় নাম ভঙ্গা বা বিজয়া। কালীবাবুর এই দোকান তো পাঁচ ভূতের হাট, এখানে সিদ্ধি চলবে না। দেবীর বিসর্জনের পর মঙ্গলঘট আর গুরুজনদের প্রণাম করে শুদ্ধচিত্তে সিদ্ধি খেতে হয়। আমি তো বাড়িতেই-একটু খেয়ে নিয়ম রক্ষা করে তবে এখানে এসেছি।

একজন সাধুবাবা টি-ক্যাবিনে প্রবেশ করলেন। ছ ফুট লম্বা মজবুত গড়ন, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা চুল, মোটা-গোঁফ, কোদালের মতন কাঁচা-পাকা দাড়ি, কপালে ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় কান ঢাকা গেরুয়া টুপি, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে

গেরুয়া ক্যামবিসের জুতো, হাতে একটি অ্যালুমিনিয়মের প্রকাণ্ড কমণ্ডলু বা হাতলযুক্ত বদনা। আগন্তুক ঘরে এসেই বাজখাঁই গলায় বললেন, নমস্তে মশাইরা, খবর সব ভাল তো ?

কপিল গুপ্ত বললেন, আরে বকশী মশাই যে, আসতে আজ্ঞা হ'ক।* দু বছর দেখা নেই, এতদিন ছিলেন কোথায় ? ভোল ফিরিয়েছেন দেখছি, সাধু মহারাজ হলেন কবে থেকে ? বাঃ দাড়িটিতে দিব্বি পার্মানেণ্ট ওয়েভ করিয়েছেন ! কত খরচ পড়ল ?

রামতারণ মুখুজ্যে বললেন, হুঁ হুঁ বাবা, দু-দু বার ঘুঘু তুমি খেয়ে গেছ ধান, এই বার ফাঁদে ফেলে বধিব পরান।

কপিল গুপ্ত বললেন, আহা ভদ্রলোককে একটু হাঁফ ছেড়ে জিরুতে দিন, এঁর সমাচার সব শুনুন, তার পর পুলিস ডাকবেন। ও কালীবাবু, বকশী মশাইকে চা আর খাবার দাও, আমার অ্যাকাউণ্টে।

রবি বর্মার ছবিতে যেমন আছে—মেনকার কোলে শিশু শকুন্তলাকে দেখে বিশ্বামিত্র মুখ ফিরিয়ে হাত নাড়ছেন—সেই রকম ভঙ্গী করে জটাধর বললেন, না না, আর লজ্জা দেবেন না, আপনাদের ঢের খেয়েছি, এখন আমাকেই সেই ঋণ শোধ করতে হবে।

রামতারণ বললেন, তোমার অচলার কি খবর, যাকে সেই বিধবা বিবাহ করেছিলে ?

ফোঁস করে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জটাধর বললেন, তার কথা আর বলবেন না মুখুজ্যে মশাই, মনে বড় ব্যথা পাই। অচলা তার আগেকার স্বামী বলহরির সঙ্গেই চলে গেছে। বলহরি তাকে জোর করে নিয়ে গেছে, আমার পঞ্চাশটা টাকাও ছিনিয়ে নিয়েছে, অচলার জন্যে এখান থেকে যে খানকতক চপ নিয়ে গিয়েছিলুম তাও সেই রাক্ষসটা কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে।

* জটাধর বকশীর পূর্বকথা 'কৃষ্ণকলি' ও 'নীল তারা' গ্রন্থে আছে।

কপিল গুপ্ত বললেন, যাক, গতস্য অনুশোচনা নাস্তি, এখন আপনার সন্ন্যাসের ইতিহাস বলুন। আহা, লজ্জা করছেন কেন, চা আর খাবার খেতে খেতেই বলুন, আমরা শোনবার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। ওহে কালীবাবু, বকশী মশাইকে আর এক পেয়ালা চা আর এক প্লেট খাবার দাও, গোটা দুই বর্মা চুরুটও দাও, সব আমার খরচায়।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে জটাধর বললেন, নেহাতই যদি শুনতে চান তো বলছি শুনুন। অচলা চলে যাবার পর মনে একটা দারুণ বৈরাগ্য এল, সংসারে ঘেন্না ধরে গেল। দুত্তোর বলে একটি তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। ঘুরতে ঘুরতে মানস সরোবর কৈলাস পর্বতে এসে পৌঁছুলুম। সেখানে হঠাৎ কানহাইয়া বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর পূর্বনাম কানাই বটব্যাল, খুব বড় সায়েন্টিস্ট ছিলেন, অনেক রকম কারবারও এককালে করেছেন। শেষ বয়সে বিবাগী হয়ে হিমালয়ের একটি গুহায় পাঁচটি বৎসর তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছেন। আমার সঙ্গে পূর্বে একটু পরিচয় ছিল, দেখা মাত্র চিনে ফেললেন। তাঁর পা ধরে আমার দুঃখের সব কথা তাঁকে নিবেদন করলুম। কানু ঠাকুর বললেন, ভেবো না জটাধর, নিষ্কাম হয়ে কর্মযোগ অবলম্বন কর, আমার শিষ্য হও। আমি সংকল্প করেছি এই মানস সরোবরের তীরে একটি বড় মঠ প্রতিষ্ঠা করব, তাতে যাত্রীরা আশ্রয় পাবে। তিব্বত সরকারের পারমিশন পেয়েছি, দালাই লামা তাসী লামা পঞ্চেন লামা সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমি চাঁদা সংগ্রহের জন্য পর্যটন করব, তুমি সঙ্গে থেকে আমাকে সাহায্য করবে। কানু মহারাজের কথায় আমি তখনই রাজী হলুম। তার পর প্রায় বছর খানিক তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করেছি, হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত। মাঠের জন্যে গরিব বড়লোক সবাই চাঁদা দিয়েছে, যার যেমন সামর্থ্য, এক আনা থেকে এক লাখ পর্যন্ত। তা টাকা মন্দ ওঠে নি, প্রায় পৌনে চার লাখ,

সবই ইণ্ডো-টিবেটান যক্ষ ব্যাংকে জমা আছে। কানু মহারাজ সম্প্রতি দিল্লিতেই অবস্থান করছেন, দরিয়াগঞ্জে শেঠ গজাননজীর কুঠীতে তাঁর অনুমতি নিয়ে একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলুম।

রামতরণ বললেন, আমরা কেউ এক পয়সা চাঁদা দেব না তা আগেই বলে রাখছি। তোমাকে থোড়াই বিশ্বাস করি।

জটাধর বকশী প্রসন্ন বদনে বললেন, মুখুজ্যে মশাইএর কথাটি হুঁশিয়ার জ্ঞানযোগীরই উপযুক্ত। বিশ্বাস করবেন কেন, আমার ভালোর দিকটা তো দেখেন নি। অদৃষ্টের দোষে বিপাকে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি, আপনাদের কাছে অপরাধী হয়ে পড়েছি, সে কথা আমিই কি ভুলতে পারি? সৎকার্যের জন্যে চাঁদা, বিশেষ করে মঠ নির্মাণের জন্যে চাঁদা শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে হয়। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্—এই হল শাস্ত্রবচন। শ্রদ্ধা না হলে দেবেন কেন, আমিই বা চাইব কেন!

অতুল হালদার বললেন, থ্যাংক ইউ জটাই মহারাজ, আপনার বাক্যে আশ্বস্ত-হলুম। মঠ প্রতিষ্ঠার কথা শুনেই আতঙ্ক হয়েছিল এখনই বুঝি চাঁদা চেয়ে বসবেন, না দিলে কানহাইয়া বাবার শাপের ভয় দেখাবেন। যাক, শ্রদ্ধা যখন নাস্তি তখন চাঁদাও নবডঙ্কা। আপনার ওই বিরাট বদনাটায় কি আছে?

জটাধর বললেন, বদনা বলবেন না। এর নাম রুদ্র কমণ্ডলু, কানু মহারাজের ফরমাশে গজানন শেঠজী বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অ্যালুমিনিয়মের কারখানা আছে কিনা।

রামতারণ প্রশ্ন করলেন, কি আছে ওটাতে? চলবল করছে যেন।

—আজ্ঞে, এতে আছে চাঙ্গায়নী সুধা, আপনাদের জন্যেই এনেছি।

রামতারণ বললেন, মৃতসঞ্জীবনী সুধা জানি, চাঙ্গায়নী আবার কি?

—এ এক অপূর্ব বস্তু মুখুজ্যে মশাই, কানু মহারাজের মহৎ আবিষ্কার। খেলে মন প্রাণ চাঙ্গা হয় তাই চাঙ্গায়নী সুধা নাম।

—মদ নাকি ?

—মহাভারত! কানু মহারাজ মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন না, চা পর্যন্ত খান না। চাঙ্গায়নীতে কি আছে শুনবেন ? আপনাদের আর জানতে বাধা কি, কিন্তু দয়া করে ফরমুলাটি গোপন রাখবেন।

কপিল গুপ্ত বললেন, ভয় নেই বকশী মশাই, আমরা এই ক জন ছাড় আর কেউ টের পাবে না।

—তবে শুনুন। এতে আছে কুড়িটি কবরেজী গাছ-গাছড়া, কুড়ি রকম ডাক্তারী আরক, কুড়ি রকম হোমিও গ্লোবিউল, কুড়ি দফা হেকিমী দাবাই, তা ছাড়া তান্ত্রিক স্বর্ণভস্ম হীরকভস্ম বায়ুভস্ম ব্যোমভস্ম, রাজ্যের ভিটামিন, আর পোয়াটাক ইলেকট্রিসিটি। আর আছে হিমালয়জাত সোমলতা, যাকে আপনারা সিদ্ধি বলেন, আর কাশ্মীরী মকরন্দ। এই সব মিশিয়ে বকযন্ত্রে চোলাই করে প্রস্তুত হয়েছে। কানু ঠাকুর বলেন, এই চাঙ্গায়নী সুধাই হচ্ছে প্রাচীন ঋষিদের সোমরস, উনি শুধু ফরমুলাটি যুগোপযোগী করেছেন।

অতুল হালদার উরুতে চাপড়া মেরে বললেন, আরে মশাই এই রকম জিনিসই তো আজ দরকার। একটু আগেই বলেছিলুম কিঞ্চিৎ সিদ্ধির শরবত হলেই আমাদের এই বিজয়া সম্মিলনীটি নিখুঁত হয়।

রামতারণ বললেন, অত ব্যস্ত হয়ো না হে অতুল, জটাধরের চাঙ্গায়নী যে নেশার জিনিস নয় তা জানলে কি করে ?

জটাধর বকশী তাঁর প্রকাণ্ড জিহ্বাটি দংশন করে বললেন, কি যে বলেন মুখুজ্যে মশাই! নেশার জিনিস কি আপনাদের জন্যে আনতে পারি, আমার কি ধর্মজ্ঞান নেই ? এতে সিদ্ধি আছে বটে, কিন্তু তা মামুলী ভাঙ নয়, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শোধন করে তার মাদকতা একেবারে নিউট্রালাইজ করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যাকে বলে হৃদ্য বৃষ্য বল্য মেধ্য, এই চাঙ্গায়নী হল তাই। খেলে

শরীর চাঙ্গা হবে, ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি তীক্ষ্ম হবে, চিত্তে পুলক আসবে, সব গ্লানি আর অশান্তি দূর হবে। কপিলবাবু, একটু ট্রাই করে দেখুন না। চায়ের বাটিটা আগে ধুয়ে নিন, জিনিসটা খুব শুদ্ধভাবে খেতে হয়।

কপিল গুপ্ত তাঁর চায়ের বাটি ধুয়ে এগিয়ে ধরে বললেন, খুব একটুখানি দেবেন কিন্তু। এই সিকিটি দয়া করে গ্রহণ করুন, আপনার কানহাইয়া মঠের জন্যে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য।

সিকিটি নিয়ে জটাধর তাঁর দশসেরী রুদ্রকমণ্ডলুর ঢাকনি খুললেন। ভিতর থেকে একটি ছোট হাতা বার করে তারই এক মাত্রা কপিল গুপ্তর বাটিতে ঢেলে দিয়ে বললেন, শ্রদ্ধয়া পেয়ম্।

অতুল হালদার বললেন, আমাকেও একটু দাও হে জটাধর মহারাজ। এই নাও ছুঠো দোয়ানি।

বীরেশ্বর সিংগিও চার আনা দক্ষিণা দিয়ে এক হাতা নিলেন। চেখে বললেন, চমৎকার বানিয়েছেন জটাধরজী, অনেকটা কোকা কোলার মতন।

অতুল হালদার বললেন, দূর মুখ্খু, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! সেদিন হংগোরিয়ান এমবাসির পার্টিতে মিল্কপঞ্চ খেয়েছিলুম, তার আগে ফ্রেঞ্চ কনসলের ডিনারে শ্যাম্পেনও খেয়েছি, কিন্তু এই চাঙ্গায়নী সুধার কাছে সে সব লাগে না। ওঃ, কি চীজই বানিয়েছ জটাই বাবা! মিষ্টি টক নোনতা ঝাল, ঈষৎ তেতো, ঈষৎ কষা, সব রসই আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি একবারে লাগসই। ঝাঁজও বেশ, বোধ হয় ইলেট্রিসিটির জন্যে, পেটে গিয়ে চিনচিন করে শক দিচ্ছে। দাও হে আর এক হাতা।

রামতারণ মুখুজ্যে বললেন, আমার আবার বাতের ব্যামো, ডায়াবিটিসও একটু আছে। চাঙ্গায়নী একটু খেলে বেড়ে যাবে না তো হে জটাধর?

জটাধর বললেন, বাড়বে কি মশাই, একেবারে নির্মূল হবে,

শরীরের সমস্ত ব্যাধি, মনের সমস্ত গ্লানি, হৃদয়ের যাবতীয় জ্বালা বেমালুম ভ্যানিশ করবে। মুখ হাঁ করুন তো, এক হাতা ঢেলে দিচ্ছি, ভক্তিভরে সেবন করুন। শ্রদ্ধয়া পেয়ং, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্।

—নাঃ, তুমি দেখছি বেজায় নাছোড়বান্দা, কিছু আদায় না করে ছাড়বে না। নাও, পুরোপুরি একটা টাকাই নাও।

বৃদ্ধ রামতারণ মুখুজ্যের সদ্‌দৃষ্টান্তে সকলেই উৎসাহিত হয়ে চাঙ্গায়নী সেবন করলেন। তিন হাতা খাবার পর বীরেশ্বর সিংগি কাঁদোকাঁদো হয়ে বললেন, জটাধরজী, আমার মনে সুখ নেই, বড় কষ্ট, বড় অপমান, বউটা হরদম বলে, বোকারাম হাঁদারাম ভ্যাবা-গঙ্গারাম।

জটাধর বললেন, আর একটু চাঙ্গায়নী খান বীরেশ্বরবাবু, সব দুঃখ ঘুচে যাবে। আপনি হলেন বীরপুংগব পুরুষসিংহ, কার সাধ্য আপনার অপমান করে! বোকারাম বললেই হল! দেখবেন আজ থেকে আর বলবে না, সবাই আপনাকে ভয় করবে।

রামতারণ বললেন, ওহে জটায়ু পক্ষী, তোমার চাঙ্গায়নী সত্যিই খাসা জিনিস। এই নাও দু টাকা, একটু বেশী করে দাও তো। গিন্নী কেবলই বলে, বাহাত্তুরে বেআক্কেলে বুড়ো, ভীমরতি ধরেছে। মাগী আমাকে ভালমানুষ পেয়ে গ্র্যাহ্যির মধ্যে আনে না, বড়লোকের বেটী বলে ভারী দেমাক। আরে বাপের কত টাকা আমার ঘরে এনেছিস? আজ বাড়ি গিয়ে দেখে নেব, বেশ একটু তেজ পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে।

জটাধর বললেন, এই চাঙ্গায়নীতে সৌরতেজ রুদ্রতেজ ব্রহ্মতেজ সব আছে মুখুজ্যে মশাই। আপনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ঋষিদের বংশধর, আপনার পূর্বপুরুষরা সোমযাগ করতেন, কলসী কলসী সোমরস খেতেন। আপনার আবার তেজের ভাবনা! নিন, চায়ের পেয়ালা ভরতি করে দিলুম, চোঁ করে গলাধঃকরণ করে ফেলুন। পাঁচ টাকা দক্ষিণা—শ্রদ্ধয়া দেয়ং, শ্রদ্ধয়া পেয়ম্।

কালীবাবুর টি ক্যাবিনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই অল্পাধিক চাঙ্গায়নী সুধা পান করলেন। কিন্তু জিনিসটির প্রভাব সকলের উপর সমান হল না। কপিল গুপ্ত গম্ভীর হয়ে বিড়বিড় করে ম্যাকবেথ আবৃত্তি করতে লাগলেন। বীরেশ্বর সিংগি এবং আরও দুজনে কচি ছেলের মতন খুঁতখুঁত করে কাঁদতে লাগলেন। দু-তিন জন মেজেতে শুয়ে পড়ে নিদ্রামগ্ন হলেন। অতুল হালদার দাঁড়িয়ে উঠে হাত নেড়ে থিয়েটারী সুরে বলতে লাগলেন, শাহজাদী সম্রাটনন্দিনী, মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে? রামতারণ মুখুজ্যে বেঞ্চের উপর উবু হয়ে বসে তুড়ি দিয়ে রামপ্রসাদী গাইতে লাগিলেন—

কালী, একবার খাঁড়াটা নেব ;
তোমার লকলকে জিব কেটে নিয়ে মা,
ভক্তিভরে কেটে নিয়ে মা,
বাবা শিবের শ্রীচরণে দেব।

কালীবাবু তাঁর টেবিলের পিছনে বসে সমস্ত নিরীক্ষণ করছিলেন। এখন এগিয়ে এসে জটাধরকে প্রশ্ন করলেন, আজ কত টাকা হাতালে জটাধরবাবু?

জটাধর বললেন, চাঁদার কথা বলছেন? অতি সামান্য, বড়জোর পঞ্চাশ টাকা। আপনার মক্কেলরা তো কেউ টাকার আণ্ডিল নয়, সকলেরই দেখছি অত্যভক্ষ্য ধনুগুণ।

—আমার দোকানে ব্যবসা করলে আমাকে কমিশন দিতে হয় তা বোঝ তো?

—বিলক্ষণ বুঝি। এই নিন পাঁচ টাকা, টেন পারসেন্টের কিছু বেশী পোষাবে।

—তোমার ওই বদনাটায় আর কিছু আছে না কি?

—আছে বই কি, চায়ের কাপের দু কাপ হবে। খাবেন?

—দাম কিন্তু দেব না।

—আপনার কাছে আবার দাম কি। এই নিন, সবটাই খেয়ে ফেলুন।

কালীবাবু দু পেয়ালা চাঙ্গায়নী পান করলেন, একটু পরেই তাঁর চোখ ঢুলুঢুলু হল।

জটাধর বললেন, টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ে একটু বিশ্রাম করুন কালীবাবু। ভাববেন না, দশ মিনিটের মধ্যেই আপনারা সবাই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা—আমার টাকা একটু কম পড়েছে, কিছু হাওলাত চাই, শৃঙ্গেরী মঠে যাবার রাহাখরচ, টাকা পঁচিশ হলেই চলবে। আপনার ক্যাশ থেকে নিলুম। আপত্তি নেই তো? একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিই?........তাও নয়? থ্যাঙ্ক ইউ কালীবাবু আপনি মহাশয় ব্যক্তি, বন্ধুকে একটু সাহায্য করতে আপত্তি করবেন কেন। টাকাটা আমার নামে আপানার খাতায় ডেবিট করবেন, আবার যেদিন আসব সুদ সুদ্ধ শোধ করব।

শিবনেত্র হয়ে জড়িত কণ্ঠে কালীবাবু বললেন, আবার কবে দেখা পাব?

—সবই ঠাকুরের ইচ্ছে কালীবাবু। কানহাইয়া বাবা যখনই এখানে টানবেন তখনই এসে পড়ব। আচ্ছা, এখন আসি, দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছি। একটু সজাগ থাকবেন, বড় চোরের উপদ্রপ। নমস্কার।

১৮৭৮

বটেশ্বরের অবদান

বটেশ্বর সিকদার একজন প্রখ্যাত গ্রন্থকার এবং বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, অর্থাৎ পেশাদার লেখক। যাঁদের লেখা ছাড়া অন্য কর্ম নেই তাঁদের প্রায় অর্থাভাব দেখা যায়, কিন্তু বটেশ্বর ধনী লোক। এই ব্যতিক্রমের কারণ—তিনি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক, শুধু বড় বড় উপন্যাস লেখেন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেনীর লেখকদের মতন ছোট গল্প প্রবন্ধ কবিতা রম্যরচনা ভ্রম্যরচনা ইত্যাদি লিখে প্রতিভার অপচয় করেন না। তাঁর কোনও উপন্যাস সাত শ পৃষ্ঠার কম নয় এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের বুভুক্ষু পাঠক-পাঠিকারা তা গোগ্রাসে পড়ে ফেলেন এবং পরবর্তী রচনার জন্য ব্যগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করেন। সম্প্রতি তাঁর পঁয়ষট্টিতম জন্মদিনের উৎসব খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকালবেলা বটেশ্বর তাঁর সাধনকক্ষে বসে লিখছেন এবং মাঝে মাঝে একটি বড় টিপট থেকে চা ঢেলে খাচ্ছেন, এমন সময় একটি অচেনা যুবক ঘরে এসে ঝুঁকে নমস্কার করে বলল, আমার নাম প্রিয়ব্রত রায়, পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারবেন কি?

আগন্তুকের বয়স প্রায় ত্রিশ, সুশ্রী চেহারা, সজ্জায় দারিদ্র্যের লক্ষণ নেই, পারিপাট্যও নেই। বটেশ্বর একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, ব'স। নতুন পত্রিকা বার করছ, তার জন্যে আমার লেখা চাও, এই তো? আগেই বলে দিচ্ছি, অমি কল্পতরু নই, যে চাইবে তাকেই লেখা দিতে পারি না। একটা আশীর্বাণী যদি চাও তো দিতে পারি, দশ টাকা লাগবে।

প্রিয়ব্রত বলল, আজ্ঞে, লেখার জন্যে আপনাকে বিরক্ত করতে আসি নি, শুধু একটি কথা জানতে এসেছি। 'প্রগামিণী' পত্রিকায় 'কে

থাকে কে যায়' নামে আপনার যে গল্পটি বার হচ্ছে তা শেষ হতে আর ক মাস লাগবে দয়া করে বলবেন কি ?

—আরও ছ-সাত মাস লাগবে। কেন বল তো ? কেমন লাগছে লেখাটা ?

—অতি চমৎকার, সব চরিত্র যেন জীবন্ত। বড্ড কৌতূহল হচ্ছে তাই জানতে এসেছি—গল্পের নায়িকা ওই অলকা মেয়েটি যে টি-বি স্যানিটেরিয়মে আছে, সে সেরে উঠবে তো ?

প্রিয়ব্রতর আগ্রহ দেখে বটেশ্বর খুশী হলেন। একটু হেসে বললেন, তা তোমাকে বলব কেন ? প্লট আগেই ফাঁস করে দিলে রচনার রসভঙ্গ হয়।

হাত জোড় করে প্রিয়ব্রত বলল, সার, দয়া করে অলকাকে বাঁচিয়ে দেবেন।

—তোমার তো বড় অদ্ভুত আবদার হে ! গল্পের নায়িকার জন্য এত ভাবনা কেন ? লোকে মিলনান্ত বিয়োগান্ত দু রকম গল্পই চায়, তোমার ফরমাশ মতন আমি লিখতে পারি না, মিলনান্ত চাও তো আমার 'কাড়াকাড়ি', 'ভেটানা' এই সব পড়তে পার।

প্রিয়ব্রত করুণ স্বরে বলল, দয়া করুন সার।

—তুমি একটি আস্ত পাগল। এখন যাও, আমার ঢের কাজ। অলকার জন্যে মাথা খারাপ না করে নিজের চিকিৎসা করাও গে, নিশ্চয় তোমার মনের রোগ আছে।

প্রিয়ব্রত বিষণ্নমুখে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে গেল।

রাত সাড়ে নটার সময় বটেশ্বর খেতে যাচ্ছেন এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার ধরে বললেন, কাকে চান ?....হাঁ, আমিই বটেশ্বর। আপনি কে ?

উত্তর এল—নমস্কার। আমি ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যে, আপনার কাছে একটু বিশেষ দরকার আছে। কাল সকালে আটটার সময় যদি যাই আপনার অসুবিধা হবে না তো ?

বটেশ্বর বললেন, না না, আপনি আসতে পারেন। কি দরকার বলুন তো ?

—সাক্ষাতেই সব বলব সার। আচ্ছা নমস্কার।

ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যের নাম বটেশ্বর শুনেছেন। বছর দুই হল বিলাত থেকে ফিরেছেন, বয়স বেশী নয়, খুব নাকি ভাল সার্জন, বেশ পসার হয়েছে।

পরদিন সকালে সঞ্জীব ডাক্তার এসে বললেন, গুড মর্নিং সার, আপনার মহামূল্য সময় আমি নষ্ট করব না, দশ মিনিটের মধ্যেই বক্তব্য শেষ করব। ওঃ কি আশ্চর্য্য আপনার ক্ষমতা! 'প্রগামিণী' পত্রিকায় 'কে থাকে কে যায়' নামে যে গল্পটি লিখছেন তার তুলনা নেই, দেশ সুদ্ধ লোক মুগ্ধ হয়ে গেছে। শরৎ চাটুজ্যে তারাশংকর বনফুল প্রবোধ সান্যাল সবাইকে কাত করে দিয়েছেন মশাই।

বটেশ্বর সহাস্যে বললেন, আপনার তো খুব প্র্যাকটিস শুনতে পাই, আমার লেখা পড়বার সময় পান কি করে ?

—সময় করে নিতে হয় সার, না পড়লে যে চলে না। সর্বত্র এই গল্পটির কথা শুনি, আমাদের মেডিক্যাল ক্লাবে পর্যন্ত। সেদিন একটি বৃদ্ধ লোকের হার্নিয়া অপারেশন করছি, অ্যানিসথেটিকের ঝোঁকে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—কি খাসা মেয়ে অলকা, জিতা রহো অলকা! আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুর দল তো আপনার অলকার জন্যে খেপে উঠেছে। ধন্য আপনি! সকলেই বলে, এখনকার সাহিত্যসম্রাট হচ্ছেন শ্রীবটেশ্বর সিকদার, তাঁর কাছে দামোদর নশকর গল্পসরস্বতী

দাঁড়াতেই পারেন না। এখন আমার নিবেদন জানাই। আমার বন্ধু-বর্গের তরফ থেকে অনুরোধ করতে এসেছি—অলকা মেয়েটিকে চটপট সারিয়ে দিন, সবাই তার জন্য চিন্তিত হয়ে উঠেছে। স্যানিটেরিয়ম থেকে বেশ সুস্থ করে ফিরিয়ে আনুন। একবারে থরো কিওর চাই, বুঝলেন? তার স্বামী হেমন্তর অবস্থা তো বেশ ভালই, অলকাকে নিয়ে সে সিমলা কি উটকামণ্ড চলে যাক, সেখানে তিনটি মাস কাটিয়ে বেশ মোটাসোটা করে ঘরে নিয়ে আসুক।

বটেশ্বর কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, তা তো হবার জো নেই ডাক্তার চ্যাটার্জি, আমার এই রচনাটি যে ট্রাজেডি। অলকা বাঁচবে না।

—বলেন কি মশাই, আলবাত বাঁচবে। আধুনিক চিকিৎসায় টি-বি রোগী শতকরা নব্বুইজন সেরে ওঠে। অলকার ভাল ট্রিটমেণ্ট করান, পি-এ-এস আইসোনায়াজাইড, স্ট্রেপ্টোমাইসিন এই সব ওষুধ দিন। বলেন তো আমার বন্ধু ডাক্তার বড়ালের সঙ্গে একটা কনসলটেশনের ব্যবস্থা করি।

বটেশ্বর বিব্রত হয়ে পড়লেন। কাল এক পাগল এসেছিল, আজ আর এক বড় পাগলের কবলে তিনি পড়েছেন। কিন্তু এই সঞ্জীব ডাক্তার গুণগ্রাহী লোক, এঁকে ধমক দিয়ে হাঁকিয়ে দেওয়া চলে না। এঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর নিরর্থক উপদেশ থেকে অব্যহতি লাভের জন্য বটেশ্বর মনে করলেন, গল্পের পরিণামটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। বললেন, আপনি ভুলে যাচ্ছেন ডাক্তার চ্যাটার্জি অলকা সত্যিকারের মানুষ নয়, আমার উপন্যাসের নায়িকা। তাকে বাঁচালে আমার প্লটটি মাটি হবে। অলকা মরবে, তার দু বছর পরে তার স্বামী হেমন্তর সঙ্গে শর্বরীর বিয়ে হবে, ওই যে মেয়েটি পাঁচটি বৎসর হেমন্তর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

টেবিলে কিল মেরে সঞ্জীব ডাক্তার বললেন, অ্যাবসর্ড, তা হতেই পারে না। অলকার স্বামী হল তার যকের ধন, অন্য মেয়ে তাকে নেবে কেন?

—শর্বরীর কথাটাও ভেবে দেখুন ডাক্তার চ্যাটার্জি। রূপে গুণে বিদ্যায় স্বাস্থ্যে সে অলকার চাইতে ভাল। এত বৎসর প্রতীক্ষার পর হেমন্তকে না পেলে তার বুক যে ফেটে যাবে!

—ফাটলেই হল! বুক অত সহজে ফাটে না মশাই, খুব শক্ত টিশুতে তৈরী। হার্ট খারাপ হয় তো চিকিৎসা করাবেন, ডিজিটালিস অ্যামিনোফাইলিন খেলিন এই সব দেবেন। বুকে বোরিক কমপ্রেস, তিসির পুলটিস আর আইসব্যাগ লাগাবেন। শর্বরীর বিয়ে নাই বা দিলেন, তাকে রাজকুমারী অমৃত কাউরের কাছে পাঠিয়ে দিন, তিনি তাকে নার্সিং শেখাবার ব্যবস্থা করবেন।

—আপনি আমার লেখা পড়ে উত্তেজিত হয়েছেন, কাল্পনিক পাত্র-পাত্রীদের জীবন্ত মনে করেছেন, এ আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু একটু স্থির হয়ে লেখকের দিকটাও বিবেচনা করুন। মিলনান্ত বিয়োগান্ত দু রকম গল্পই আমাদের লিখতে হয়। ভগবান সুখ দেন, দুঃখ দেন, মানুষকে রক্ষা করেন, আবার মারেনও। তিনি মিলন-বিরহ দিয়ে সংসার সৃষ্টি করেছেন। আমরা লেখকরা ভগবানেরই অনুসরণ করি। লোক নিজে শোক পেতে চায় না, কিন্তু ট্রাজেডি বেশ উপভোগ করে। সেই জন্যই তো মহাকবিরা সীতা, অজমহিষী ইন্দুমতী, ওফেলিয়া, ডেসডিমোনা ইত্যাদির সৃষ্টি করেছেন। ভগবান সব সময় দয়া করেন না, আমরাও করি না।

—কি বলছেন মশাই, ভগবানের নকল করবেন এতদূর আস্পর্ধা। ভগবান নাচার, সব সময় দয়া করলে তাঁর চলে না, তা বোঝেন? ইঁদুরকে যদি দয়া করেন তো বেড়াল উপোস করবে। মাছ মুরগি পাঁঠা ভেড়াকে দয়া করলে আপনার আমার পেটই ভরবে না। তিনি যখন মানুষকে দয়া করেন তখন মাইক্রোব ধ্বংস হয়, আবার মাইক্রোবকে দয়া করলে মানুষ মরে। নিজের হাত-পা বাঁধা বলেই ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, বলেছেন—আমার হয়ে তোরাই যতটা পারিস দয়া করবি, মনে রাখিস অহিংসাই পরম ধর্ম। গল্প লিখেছেন

বলেই আপনি মানুষ খুন করবেন এ কি রকম কথা! সেকালে বাল্মীকি কালিদাস শেকস্পীয়ার কি লিখেছেন তা ভুলে যান। এটা হল গান্ধীজীর যুগ, বিয়োগান্ত রচনা একদম চলবে না। যারা ট্রাজেডি লেখে আর তা পড়তে ভালবাসে তারা মরবিড, প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুর। মানুষের তো দুঃখের অভাব নেই, তার ওপর আবার মনগড়া-দুঃখের কাহিনী চাপাবেন কেন? আনন্দের গল্প লিখুন, মানুষকে আর কাঁদাবেন না, শুধু হাসাবেন। আপনাদের ভাবনা কি, কলমের আঁচড়েই তো সৃষ্টি স্থিতি লয় করতে পারেন। অলকাকে বাঁচাতেই হবে, বুঝলেন সিকদার মশাই? শারলক হোম্‌সকে কোনান ডয়েল মেরে ফেলেছিলেন, কিন্তু পাঠকদের ধমক খেয়ে আবার বাঁচিয়ে দিলেন। আপনিই বা বাঁচাবেন না কেন?

উত্যক্ত হয়ে বটেশ্বর বললেন, মাপ করবেন.ডাক্তার চ্যাটার্জি, আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না। আমরা লে-ম্যান লেখকরা তো আপনাদের চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করি না, আপনারাই বা লেখকদের হুকুম করবেন কেন? অনধিকারচর্চা কোনও পক্ষেই ভাল নয়।

সঞ্জীব ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি অনধিকারচর্চা করি না, ডাক্তারের কাজ প্রাণরক্ষা, আপনি খুন করতে যাচ্ছেন তাতে আপত্তি জানানো আমার কর্তব্য। বেশ, যা খুশি করুন, আপনার পরম ভক্ত দু লাখ পাঠক আর চার লাখ পাঠিকা চটে গিয়ে আপনাকে শাপ দেবে, আপনার এই কুকর্মের ফল পরলোকে ভুগতে হবে। একটু সাবধানে থাকবেন মশাই, এখনকার ছোকরারা ভাল নয়। আচ্ছা, চললুম। যদি হাড়টাড় ভাঙে তো খবর দেবেন। নমস্কার।

সঞ্জীব ডাক্তার বটেশ্বরের মন খারাপ করে দিয়ে চলে গেলেন। গতকাল সকালে যে ছোকরা এসেছিল—প্রিয়ব্রত রায়—সে পাগল হলেও শান্তশিষ্ট। কিন্তু এই সঞ্জীব ডাক্তার দুর্দান্ত উন্মাদ। শুধু উন্মাদ নয়, মনে হয় ফাজিল বকাটে আর মাতালও বটে। এমন

লোকের চিকিৎসায় পসার হল কি করে? যাই হ'ক, পাগলদের কথায় বটেশ্বর কর্ণপাত করবেন না, তাঁর সংকল্পিত প্লট কিছুতেই বদলাবেন না। কিন্তু সঞ্জীব ডাক্তার ভয় দেখিয়ে গেছে, সাবধানে থাকতে হবে।

তিন দিন পরের কথা। বিকালবেলা দোতলার বারান্দায় বসে বটেশ্বর চুরুট টানছেন। তাঁর বাতের বেদনাটা বেড়ে উঠেছে, সিঁড়ি দিয়ে নামাওঠায় কষ্ট হয়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে গৃহিণী কাশী-পুরে তাঁর ছোট বোনের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। বটেশ্বরের কোথাও যাবার জো নেই, কথা কইবার লোকও নেই। তাঁর অনুরক্ত বন্ধুদের কেউ যদি এখন এসে পড়েন তো তিনি খুশী হন।

চাকর এসে খবর দিল, একজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন। বটেশ্বর বললেন, এখানে নিয়ে আয়।

একটি সুবেশা চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মেয়ে তাঁর কাছে এল, একটু মোটা হলেও বেশ সুন্দরী বটে। সে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ে হাত দিলে। বটেশ্বর বললেন, থাক, থাক, ওই হয়েছে। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—চিনতে পারছেন না? আমি কদম্বানিলা চ্যাটার্জি, সিনেমার ছবিতে আমাকে দেখেন নি? মধ্যগগনের তারকা না হলেও আমাকে সবাই উদীয়মানা মনে করে।

—বেশ বেশ। সিনেমা বড় একটা দেখি না, খবরও বিশেষ রাখি না। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন ওই চেয়ারটায়।

—আমাকে 'আপনি' বলবেন না সার।

কদম্বানিলা পান চিবুতে চিবুতে কথা বলছিল, সেই বেআদবি দেখে বটেশ্বর একটু অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটির নম্র ব্যবহারে তাঁর বিরাগ কেটে গেল, ভাবলেন, আমার সামনে সিগারেট ফুঁকছে

না এই ঢের। প্রশ্ন করলেন, কদম্বানিলা তো ছদ্মনাম, তোমার আসল নামটি কি?

—তা যে বলতে নেই সার। সন্ন্যাসী আর সিনেমা-তারার পূর্ব নাম জানানো বারণ, গুরুর নিষেধ থাকে কি না। কদম্বানিলা বলতে যদি অসুবিধে হয় তো আপনি কদু বলবেন।

—উঁহু, কদু চলবে না, পুরো নামটাই বলব। এখন কি দরকারে এসেছ তা বল।

মাথা পিছনে হেলিয়ে চোখ আধবোজা করে গদ্‌গদস্বরে কদম্বানিলা বলল, উঃ কি আশ্চর্য গল্প আপনি লিখেছেন দাদু, ওই 'প্রগামিণী' পত্রিকায় যেটি ক্রমশ বেরুচ্ছে! সবাই ধন্য ধন্য করছে, বলছে এত বড় সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত আর হয় নি। আমি একটি প্রস্তাব এনেছি, বিজনেস প্রোপোজাল। এই গল্পটির ছবি অতি চমৎকার হবে। লাল নেবুচাঁদ নাজার দশ লাখ পর্যন্ত খরচ করতে প্রস্তুত আছেন। আপনার নায়িকা অলকার পার্ট আমিই নেব। দেবকী বোস কি অন্য কোনও উপযুক্ত লোককে ডিরেকশনের ভার দেওয়া হবে। তা হাজার দশ টাকা কি আরও বেশী লালাজী আপনাকে দেবেন, আমাকেও মন্দ দেবেন না। এখন আপনি রাজী হলেই হয়।

খুশী হয়ে বটেশ্বর বললেন, তা আমার আর আপত্তি কি, তুমি নায়িকা সাজলে খুব ভালই হবে। কিন্তু গল্পটি শেষ হতে এখনও তো ছ-সাত মাস লাগবে।

—তার জন্যে ভাববেন না দাদু। আমারও এখন অনেক এনগেজমেণ্ট, সাত মাস আমি বোম্বাইএ ব্যস্ত থাকব, নেবুচাঁদজীও থাকবেন। তিনি এখন শুধু আপনার মতটি জানতে চান, পাকা কথাবার্তা সাত মাস পরেই হবে। কিন্তু এর মধ্যে আপনি আর কাউকে কথা দিয়ে ফেলবেন না যেন।

—না, না, তা কেন দেব।

—আপনি দেখে নেবেন, আমার অভিনয় কি ওআণ্ডারফুল হবে, আপনার ওই অলকাকে আমার খুব ভাল লেগেছে কিনা। উঃ ছবির শেষে অলকা যখন বেশ মোটাসোটা হয়ে তার তিন মাসের খোকাটিকে কোলে নিয়ে পর্দায় দেখা দেবে তখন হাততালিতে হাউস একেবারে ফেটে পড়বে, আর আপনি উপস্থিত থাকলে লোকে আপনাকে কাঁধে তুলে নাচবে।

বটেশ্বর ত্রস্ত হয়ে বললেন, এই মাটি করলে, সব শেয়ালের এক রা! আমাকে পাগল না করে তোমরা ছাড়বে না দেখছি। শোন কদম্বানিলা, আমার গল্পটি বিয়োগান্ত, অলকা মরবে, দু বছর পরে তার স্বামী হেমন্তর সঙ্গে শর্বরীর বিয়ে হবে।

চমকে উঠে চোখ কপালে তুলে কদম্বানিলা বলল, অ্যা, অলকাকে মারবেন! তবে আমি ওতে নেই, ও আমি পারব না।

—নিশ্চয় পারবে, ট্রাজেডির নায়িকা সেজেও তো চমৎকার অভিনয় করা যায়।

—তা হতেই পারে না, মরতে আমি মোটেই রাজী নই, অলকা সেজেও নয়। আপনি সব মাটি করে দিলেন দাদু, মিছেই এখানে এসে আপনাকে বিরক্ত করলুম। তা হলে চললুম, গল্পসরস্বতী দামোদর নশকরের সঙ্গেই কথা বলি গিয়ে তাঁর 'মানস-মরালী' উপন্যাসটি অপূর্ব হয়েছে, তার নায়িকা মঞ্জুলার পার্টটিও আমার বেশ পছন্দ।

বটেশ্বর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দিন কতক আগে 'দুন্দুভি' পত্রিকায় একটা গণ্ডমুর্খ সমালোচক লিখেছিল—দামোদর নশকরের গল্প যুগ-চেতনা সমাজচেতনা যৌনচেতনায় পরিপূর্ণ, বটেশ্বর সিকদারের রচনা একেবারে অচেতন, শুধু চর্বিতচর্বণ। এই সমালোচনা পড়ার পর থেকে দামোদরের নাম শুনলে বটেশ্বর খেপে ওঠেন। উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে বললেন, খবরদার ওটার কাছে যেয়ো না। অত ব্যস্ত

হচ্ছ কেন, ছু দিন সময় আমাকে দাও, ভেবে দেখি অলকাকে বাঁচিয়ে গল্পটি মিলনান্ত করা চলে কিনা।

—ভাবনার যে সময় নেই দাছু। কালই আমি বোম্বাই চলে যাচ্ছি, আজকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত করে নেবুচাঁদজীকে জানাতে হবে

গালে হাত দিয়ে একটু ভেবে বটেশ্বর বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, অলকাকে বাঁচিয়েই রাখব, শর্বরীই না হয় মরবে। অন্য কারও কাছে তোমাকে যেতে হবে না। জান কদম্বানিলা, আমরা গল্পলিখিয়েরা হচ্ছি সর্বশক্তিমান, কলমের খোঁচায় সৃষ্টি স্থিতি লয় করতে পারি।

কদম্বানিলা উৎফুল্ল হয়ে বলল, থ্যাংক ইউ দাছু, এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতন কথা। দিন পায়ের ধুলো। কিন্তু বেশ ভাল করে শেষ করতে হবে, শেষ দৃশ্যে ছেলে কোলে করে অলকার আসা চাই। এখন চললুম, নেবুচাঁদজীকে সুখবরটা দিইগে।

বটেশ্বর সিকদার প্রতিশ্রুতি পালন করলেন, তাঁর গল্প 'কে থাকে কে যায়' মিলনান্তরূপেই সমাপ্ত হল। কিন্তু আট মাস হতে চলল, কদম্বানিলার দেখা নেই কেন? তার ঠিকানাটাও জানেন না যে চিঠি লিখে খবর দেবেন।

সকাল বেলা বটেশ্বর তাঁর নীচের ঘরে বসে নিবিষ্ট হয়ে একটি নূতন গল্প লিখছেন—'মন নিয়ে ছিনিমিনি।' সহসা একটা চেনা গলার আওয়াজ তাঁর কানে এল—আসতে পারি সিকদার মশাই?

ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যে ঘরে প্রবেশ করলেন, তাঁর পিছনে প্রিয়ব্রত রায় এবং একটি অচেনা মেয়ে। সঞ্জীব ডাক্তার বললেন, গুড মর্নিং সার। ওঃ আপনার সেই গল্পটিকে একেবারে মহত্তম অবদান বানিয়েছেন মশাই! একে নিশ্চয় চিনতে পেরেছেন—প্রিয়ব্রত রায়,

যাকে আপনি পাগল বলে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই দেখুন আপনার অলকা, আপনি যার প্রাণরক্ষা করেছেন।

বটেশ্বরকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে অলকা একটি পাতলা কাগজে মোড়া বড় কৌটো রাখল। সঞ্জীব ডাক্তার বললেন, আপনার জন্যে অলকা নিজের হাতে ছানার মালপো করে এনেছে, খাবেন সার।

হতভম্ব হয়ে বটেশ্বর বললেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

—এটা হল আপনার গল্পের সত্যিকার উপসংহার। বুঝিয়ে দিচ্ছি শুনুন।—এই অলকা হচ্ছে প্রিয়ব্রতর স্ত্রী, আমার শালী—মানে আমার স্ত্রীর মাসতুতো বোন। অলকা বছর খানিক স্যানিটেরিয়মে ছিল, বেশ সেরেও উঠেছিল, কুক্ষণে এর হাতে এল 'প্রগামিণী' পত্রিকা। আপনার গল্প পড়তে পড়তে এর মাথায় এক বেয়াড়া ধারণা এল—গল্পের অলকা যদি বাঁচে তবেই আমি বাঁচব, সে যদি মরে তবে আমিও মরব। আমরা অনেক বোঝালুম, ওসব রাবিশ গল্প পড়ে মাথা খারাপ ক'রো না, তুমি তো সেরেই উঠছ। কিন্তু অলকার বদখেয়াল কিছুতেই দূর হল না, রেগুলার অবসেশন। অগত্যা ওর স্বামী এই প্রিয়ব্রত আপনার দ্বারস্থ হল, আপনি ওকে পাগল বলে হাঁকিয়ে দিলেন। তার পর আমি এসে আপনাকে একটি সারগর্ভ লেকচার দিলুম, আপনি তো চটেই উঠলেন। তখন আমার স্ত্রী বলল, তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না, যত সব অকম্মার ধাড়ী, আমিই যাচ্ছি, দেখি বুড়োকে বাগ মানাতে পারি কিনা। সে আপনার সঙ্গে দেখা করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ হাসিল করল। আপনি গল্পের প্লট বদলালেন, অলকাও চটপট সেরে উঠল। এখন কি রকম মুটিয়েছে দেখুন।

বটেশ্বর বললেন, কিন্তু আমার কাছে যিনি এসেছিলেন তিনি তো সিনেমা-অভিনেত্রী, কদম্বানিলা চ্যাটার্জি।

—ওর চোদ্দপুরুষ কখনও সিনেমায় নামে নি। ও হল আমার

স্ত্রী অনিলা, নাম ভাঁড়িয়ে কদম্বানিলা সেজে আপনাকে ঠকিয়ে গেছে। অতি ধড়িবাজ মহিলা মশাই। যাক, এখন আপনি এই আসল অলকাকে ভাল করে আশীর্বাদ করুন দেখি।

—হাঁ হাঁ, নিশ্চয় করব। মা অলকা, চিরায়ুষ্মতী হও, সুখে থাক, স্বামীর সোহাগিনী হও, সুসন্তানের জননী হও, লক্ষ্মী তোমার ঘরে অচলা হয়ে থাকুন। আচ্ছা ডাক্তার, সব তো বুঝলুম, কিন্তু আপনার স্ত্রী অনিলা না কদম্বানিলা এলেন না কেন?

—আসবে কি করে মশাই! সে আছে মেটার্নিটি হোমে, তার একটা খোকা হয়েছে, পাক্কা দশ পাউণ্ড ওজন। অনিলা চাঙ্গা হয়ে উঠুক, তার পর আপনার কাছে এসে ধাপ্পাবাজির জন্যে মাপ চাইবে।

১৮৭৮

নির্মোক নৃত্য

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, তোমার মতলবটা কি উর্বশী? এই স্বর্গধামে তো পরম সুখে আছ, উত্তম বাসগৃহ, সুন্দর প্রমোদকানন, মহার্ঘ বেশভূষা, প্রচুর বেতন, সবই তো ভোগ করছ। এসব ত্যাগ করে মর্ত্যলোকে যেতে চাও কেন? এখন রাজা পুরূরবা সেখানে নেই যে তোমাকে মাথায় করে রাখবেন। স্বর্গে তুমি চির-যৌবনা অনিন্দিতা সুরেন্দ্রবন্দিতা, কিন্তু মর্ত্যে গেলেই দু দিনে বুড়িয়ে যাবে, তখন যতই প্রসাধন লেপন কর তোমার দিকে কেউ ফিরে তাকাবে না।

উর্বশী নতমস্তকে বললেন, দেবরাজ, এখানে আমার অরুচি ধরেছে। সব পুরুষকেই আমি জয় করেছি, তাদের একঘেয়ে চাটুবাক্য আমার আর ভাল লাগে না। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে আমার অসংখ্য ভক্ত জুটবে, অর্থও প্রচুর পাব। জরার লক্ষণ দেখলে আবার না হয় এখানে চলে আসব।

—তোমার অত্যন্ত অহংকার হয়েছে দেখছি। এমন তোমার আদরের অভাবটা কি?

—মানুষের কাছে ঢের বেশী আদর পাব। মর্ত্যের এক কবি লিখেছেন, 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল, তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।' অমরাবতীর কোন্ কবি এমন লিখতে পারে?

—কবিরা বিস্তর মিছে কথা লেখে। যদি প্রমাণ করতে পার যে এখনকার পুরুষকে তুমি জয় করেছ তবে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। দেবর্ষি আর মহর্ষিদের কাবু করতে পার?

—তাঁরা তো সেই কবে কাবু হয়ে গেছেন।

—আচ্ছা, তোমাকে পরীক্ষা করব। দিব্য মানব জান? যাঁরা

স্বর্গে মর্তে অবাধে আনাগোনা করেন, যেমন সনৎকুমার সনাতন সনক সদানন্দ। এঁরা হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। ঘাঁটাতে চাই না, অত্যন্ত বদরাগী মুনি। তবে আরও তিন জন সম্প্রতি এখানে বেড়াতে এসেছেন, কুতুক, পর্বত, আর কর্দম ঋষি। এঁরা বেশ শান্তস্বভাব আর একবারে নির্বিকার। এঁদের কাবু করতে পারবে?

—যদি পুরুষ হন তবে কাবু করতে পারব না কেন?

—শুধু পুরুষ নন, ওঁরা মহাপুরুষ।

—তবে ওঁদের মহাকাবু করব।

—উত্তম কথা। ওঁরা হলেন দেবর্ষি নারদের বন্ধু। নারদকে বলব তোমার নাচ দেখবার জন্যে আমার সভায় ওঁদের নিমন্ত্রন করে আনবেন।

নারদের মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে তিন ঋষি প্রীত হলেন। বললেন, আমরা ময়ূরনৃত্য খঞ্জননৃত্য দেখেছি, বানর-ভল্লুকাদির নৃত্যও দেখেছি, কিন্তু নারীনৃত্য কখনও দেখি নি। দেখবার জন্য খুব কৌতূহল আছে। কিন্তু উর্বশী তো শুনেছি অপ্সরা, সে নারী বটে তো?

নারদ বললেন, এমন নারী যার জন্যে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা।' তার নৃত্য দেখলে তোমরা মুগ্ধ হবে। এখন ইন্দ্রসভায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও।

পর্বত ঋষির দাড়ি গলা পর্যন্ত, কর্দমের বুক পর্যন্ত, আর কুতুক ঋষির হাঁটু পর্যন্ত। এঁরা যথাসাধ্য ভব্য বেশ ধারণ করে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। পর্বত একটি বল্কল পরলেন, বল্কল না থাকায় কর্দম শুধু কৌপীন ধারণ করলেন। মহামুনি কুতুক একবারে সর্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন, তাঁর বল্কলও নেই কৌপীনও নেই, অগত্যা তিনি দিগম্বর হয়েই রইলেন। নারদ বললেন, ওহে কুতুক, অন্তত একটি তৃণগুচ্ছের

মেখলা পরে নাও। কুতুক বললেন, কোনও প্রয়োজন নেই, আজানু লম্বিত শ্মশ্রুই আমার বসন।

নবাগত তিন ঋষিকে পাদ্য অর্ঘ্য আসন ইত্যাদি দিয়ে যথাবিধি সংকার করে ইন্দ্র বললেন, হে মহাতেজা তপঃসিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিত্রয়, আমার মুখ্যা অপ্সরা উর্বশী আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত একটি অভিনব নৃত্য দেখাবে—নির্মোক নৃত্য, মর্ত্যলোকের প্রতীচ্য-খণ্ডের ম্লেচ্ছগণ যাকে বলে স্ট্রিপ-টীজ। এখানে অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ সকলেই সমবেত হয়েছেন, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাও আছেন। আপনাদের আগমনে আমরা সকলেই কৃতার্থ হয়েছি। এখন অনুমতি দিন, উর্বশী নৃত্য আরম্ভ করুক।

আগন্তুক তিনি ঋষির মুখপাত্র মহামুনি কুতুক বললেন, হাঁ হাঁ, বিলম্বে প্রয়োজন কি, আমরা নৃত্য দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

লাস্যনৃত্যের উপযুক্ত বেশভূষার উপর একটি আলখাল্লা বা ঘেরা-টোপ পরে উর্বশী ইন্দ্রসভায় প্রবেশ করলেন। সকলকে প্রণাম করে যুক্তকরে বললেন, হে মহাভাগ দেবগণ এবং অগ্নিকল্প ঋষিগণ, আমি যে নির্মোক নৃত্য দেখাব তাতে আমার দেহ ক্রমে ক্রমে অপাবৃত হবে। আপনাদের তাতে আপত্তি নেই তো?

কুতুক তার মাথা আর বিপুল দাড়ি নেড়ে বললেন, আপত্তি কিসের? যাবতীয় জন্তুর ন্যায় তোমার দেহও পঞ্চভূতের সমষ্টি। তার অভ্যন্তরে নারীসত্তা কোথায় আছে তাই আমরা দেখতে চাই।

উর্বশী পুনর্বার সবিনয়ে বললেন, আমার নৃত্যে যদি অসভ্য বা কুৎসিত কিছু দেখতে পান তো দয়া করে জানাবেন, তৎক্ষণাত আমি নৃত্য সংবরণ করব।

ঘেরাটোপ ফেলে দিয়ে উর্বশী তাঁর মণিমুক্তাস্বর্ণময় দৃষ্টি-বিভ্রমকর উজ্জ্বল বেশ প্রকাশ করলেন। তার পর কিছুক্ষণ নৃত্য করে তাঁর উত্তরীয় বা ওড়না খুলে ফেলে দিলেন।

পর্বত ঋষি হাত তুলে বললেন, উর্বশী, নিবৃত্ত হও, তোমার নৃত্যে শালীনতার অত্যন্ত অভাব দেখছি, এই চিত্তপীড়াকর নৃত্য আমরা দেখতে চাই না।

মহামুনি কুতুক ধমক দিয়ে বললেন, তোমার চিত্তপীড়া হয়েছে তো আমাদের কি? তুমি চক্ষু মুদ্রিত করে থাক, নৃত্য চলুক।

উর্বশী চুপি চুপি ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ, পর্বত ঋষি কাবু হয়েছেন।

নৃত্য চলতে লাগল। পর্বত ঋষি দুই হাতে চোখ ঢাকলেন, কিন্তু কৌতূহল দমন করতে না পেরে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে উর্বশী তাঁর দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত করলেন। তখন কর্দম ঋষি চোখ ঢেকে বললেন, উর্বশী, তোমার এই জুগুপ্সিত নৃত্য দেখলে আমাদের তপস্যা নষ্ট হবে ক্ষান্ত হও।

কুতুক ভর্ৎসনা করে বললেন, কেন ক্ষান্ত হবে? তোমার সহ্য না হয় তো উঠে যাও এখান থেকে।

সহসা চক্ষুর ইঙ্গিতে উর্বশী ইন্দ্রকে জানালেন যে কর্দমও কাবু হয়েছেন।

তার পর উর্বশী ক্রমশ তাঁর সমস্ত আবরণ আর আভরণ খুলে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন এবং অবশেষে 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি' প্রকাশ করে পাষাণবিগ্রহবৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সভাস্থ দেবগণ দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ বললেন, সাধু সাধু!

কুতুক বললেন, থামলে কেন উর্বশী, আরও নির্মোক ত্যাগ কর।

নারদ বললেন; আর নির্মোক কোথায়? উর্বশী তো সমস্তই মোচন করেছে।

কুতুক বলিলেন, ওই যে, ওর সর্বগাত্রে একটি পদ্মপলাশতুল্য শুভ্রারক্ত মসৃণ আবরণ রয়েছে।

—আরে ও তো ওর গায়ের চামড়া।

—ওটাও খুলে ফেলুক।

—পাগল হলেন নাকি হে কুতুক? গায়ের চামড়া তো শরীরেরই অংশ, ও তো পরিচ্ছদ নয়।

—পরিচ্ছদ না হ'ক নির্মোক তো বটে। ওই খোলসটাও খুলে ফেলুক, নীচে কি আছে দেখব।

নারদ বললেন, কি আছে শোন। চর্মের নীচে আছে মেদ, তার নীচে মাংস, তার নীচে কংকাল।

—তার নীচে কি আছে?

—কিচ্ছু নেই।

—যার প্রভাবে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা', উর্বশীর সেই নারীত্ব কোথায় আছে?

—নারীত্ব আছে ওর বসনে, আভরণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ভাবভঙ্গীতে, আর অনুরাগী পুরুষের চিত্তে। তুমি তো বীতরাগ, চিত্ত পুড়িয়ে খেয়েছ, দেখবে কি করে?

মহামুনি কুতুক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমাকে প্রতারিত করবার জন্যে এখানে ডেকে এনেছ? এই উর্বশী একটা অন্তঃসারশূন্য জন্তু, ছাগদেহের সঙ্গে ওর দেহের প্রভেদ কি? ওহে পর্বত, ওহে কর্দম, চল আমরা যাই, এখানে দেখবার কিছু নেই।

উর্বশীর লাঞ্ছনা দেখে মেনকা ঘৃতাচী মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরার দল আনন্দে করতালি দিলেন।

কুতুক পর্বত ও কর্দম সভা ত্যাগ করলে উর্বশী নতমুখে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

ইন্দ্র বললেন, উর্বশী, শান্ত হও, নিরন্তর জয়লাভ করাও ভাগ্যে ঘটে না, আমিও বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলাম।

উর্বশী বললেন, একে কি পরাজয় বলে দেবরাজ? ওই কুতুক ঋষি একটা অপুরুষ অপদার্থ দগ্ধেন্দ্রিয় উন্মাদ, ওকে দিয়ে এই সভায় আমার এমন অপমান করিয়ে আপনার কি লাভ হল? আমি অমরাবতীতে থাকব না, মর্ত্যেও যাব না, তপশ্চর্যা করব।

অনন্তর উর্বশী মাথা মুড়োলেন, তুলসীমালা পরলেন, তিলকচর্চা করলেন, এবং নিত্যধাম গোলোকে গিয়ে হরিপাদপদ্মে আশ্রয় নিলেন।

১৮৭৮

ডম্বরু পণ্ডিত

আচার্য রোহিত তাঁর শিষ্য ডম্বরুকে বললেন, বৎস, তুমি নিখিল বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছ, স্নাতক হবার পরেও এখানে দশ বৎসর স্নাতকোত্তর গবেষণা করেছ, তোমার যৌবনও উত্তীর্ণপ্রায়। আর আমার কাছে বৃথা কালক্ষেপ করে লাভ কি? এখন তুমি এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গার্হস্থ্যে প্রবেশ কর।

ডম্বরু প্রণিপাত করে রোহিতের চরণে একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণখণ্ড রেখে বললেন, গুরুদেব, আমি অতি দরিদ্র, এই যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা, গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।

শিষ্যের মস্তকে করার্পণ করে রোহিত প্রসন্নবদনে বললেন, ওহে ডম্বরু, তুমি পঁচিশ বৎসর আমার যে সেবা করেছ তাই প্রচুর দক্ষিণা, অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। আমি জানি তুমি দরিদ্র, এই স্বর্ণখণ্ড তোমার পথের সম্বল হ'ক।

ডম্বরু বললেন, গুরুদেব, আপনার দয়ার সীমা নেই। যাত্রার পূর্বে আপনার কাছে আরও কিঞ্চিৎ বিদ্যা ভিক্ষা চাচ্ছি।

রোহিত সহাস্যে বললেন, বৎস, নিমজ্জিত কুম্ভের ন্যায় তুমি বিদ্যায় পরিপ্লুত হয়েছ, তোমার অন্তরে আর বিন্দুমাত্র ধারণের স্থান নেই। এখন কোনও গুণবান নৃপতিকে তুষ্ট করে তাঁর সভাকবি বা সভাপণ্ডিত হও। কিন্তু নির্বোধ আত্মগর্বী লোকের সংশ্রবে থেকো না, তাদের দানও নিও না।

ডম্বরু নতমস্তকে যুক্তকরে বললেন, গুরুদেব, আমাকে একটি উপাধি দেবেন না?

—কি উপাধি তুমি চাও?

—যদি যোগ্য মনে করেন তবে কৃপা করে আমাকে বিশ্ববিদ্যোদধি উপাধি দিন।

রোহিত হাস্য করে বললেন, তথাস্তু। হে পণ্ডিত ডম্বরু বি শ্ব বিদ্যোদধি, তোমার সর্বত্র জয় হ'ক। দেবী সরস্বতী তোমাকে রক্ষা করুন, দেবগুরু বৃহস্পতি তোমাকে সুবুদ্ধি দিন।

পথে যেতে যেতে ডম্বরু একটি প্রশস্তি রচনা করলেন। কিছু দিন পর্যটনের পর তিনি শুনলেন কাশীরাজ বিতর্দন অতি গুণবান নৃপতি। তাঁরই আশ্রয়ে বাস করবেন এই স্থির করে ডম্বরু রাজসভায় উপস্থিত হয়ে এই প্রশস্তি পাঠ করলেন—

চন্দ্র সূর্য ম্লান তব যশের প্রভায়,
পরাজিত শত্রুকুল ছুটিয়া পালায়।
দেববৃন্দ হতমান নিরানন্দ অতি,
অসূয়ায় শয্যাগত ইন্দ্র সুরপতি।
উর্বশী মেনকা রম্ভা ছাড়ি স্বর্গধাম
তোমারে ঘিরিয়া নৃত্য করে অবিরাম।
পদ্মালয়া করেছেন তোমারে বরণ,
একাকী বৈকুণ্ঠে হরি করেন ক্রন্দন।
ডম্বরু পণ্ডিত আমি গাহি তব জয়,
মহারাজ, মোর প্রতি কিবা আজ্ঞা হয়?

কাশীরাজ বিতর্দন প্রীত হয়ে বললেন, বাঃ, অতি সুন্দর প্রশস্তি। কোষপাল, এই বিপ্রকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দাও।

ডম্বরু মাথা নেড়ে বললেন, না মহারাজ, নির্বোধ আত্মগর্বী লোকের দান আমি নিতে পারি না।

আশ্চর্য হয়ে রাজা বললেন, নির্বোধ আত্মগর্বী বলছ কাকে?

—আপনাকে। আমার প্রশস্তিতে যে উৎকট অত্যুক্তি আছে তা আপনি অম্লানবদনে মেনে নিয়েছেন।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিতর্দন বললেন, নির্বোধ আত্মগর্বী তুমি নিজে! যদি ব্রাহ্মণ না হতে তবে ধৃষ্টতার জন্য তোমাকে শূলে চড়াতাম। কোষপাল, এক রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে এই গণ্ডমূর্খকে বিদায় কর।

মুদ্রা না নিয়েই ডম্বরু কাশীরাজসভা ত্যাগ করলেন। তার পর বহু দিন পর্যটন করে বৎসরাজধানী কৌশাম্বী নগরীতে উপস্থিত হলেন এবং বৎসরাজ পুরঞ্জয়ের সভায় গিয়ে পূর্ববৎ প্রশস্তি পাঠ করলেন।

পুরঞ্জয় বললেন, অতি উত্তম রচনা। কোষপাল, এই পণ্ডিত-প্রবরকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দাও।

ডম্বরু পূর্ববৎ মাথা নেড়ে বললেন, না মহারাজ, নির্বোধ আত্ম-গর্বীর দান আমি নিতে পারি না, গুরুদেবের নিষেধ আছে। আমার প্রশস্তিতে যে উৎকট চাটুবাক্য আছে তা আপনি বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন।

ক্রুদ্ধ হয়ে পুরঞ্জয় বললেন, ওহে দ্বিজগর্দভ, দেবতা রাজা আর প্রণয়িনীর স্তুতিতে অতিরঞ্জন থাকেই, তা অলংকার শাস্ত্রসম্মত। আমি তোমার কবিত্বই বিচার করেছি, সত্যাসত্য গ্রাহ্য করি নি। কোষপাল, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ ব্রাহ্মণকে এক রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে বিদায় কর।

দক্ষিণা না নিয়েই ডম্বরু প্রস্থান করলেন। অনেক দিন পরে তিনি দশার্ণ দেশে উপস্থিত হলেন এবং সেখানকার রাজা উদায়ুধের সভায় গিয়ে পূর্ববৎ প্রশস্তি পাঠ করলেন।

উদায়ুধ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ওহে চাটুকার মিথ্যাভাষী ব্রাহ্মণ, ব্যাজস্তুতি দ্বারা তুমি আমার অপমান করেছ। দূর হও রাজ্য থেকে।

উৎফুল্ল হয়ে ডম্বরু বললেন, সাধু সাধু! মহারাজ, আপনার জয় হ'ক, আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, আমার প্রশস্তিতে যে অত্যুক্তি আছে তা মেনে নেন নি। আপনি নির্বোধ নন, আত্মগর্বীও নন, তবে উদ্ধত বটে। আমি আপনারই আশ্রয়ে বাস করব। আমার সংসারযাত্রার জন্য যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিন এবং একটি সুলক্ষণা সুপাত্রীও যোগাড় করে দিন যাকে বিবাহ করে আমি গৃহী হতে পারি।

অট্টহাস্য করে উদায়ুধ বললেন, হে পণ্ডিতমূর্খ, তোমার স্পর্ধা কম নয় যে আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছ! তোমার তুল্য ধৃষ্ট কপটভাষী পুরুষকে আমি আশ্রয় দিতে পারি না। কোষপাল, দশ রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে এই উন্মাদকে বিদায় কর।

ডম্বরু মুদ্রা নিলেন না।

ক্ষুব্ধ ডম্বরু আবার পথ চলতে লাগলেন। তাঁর সম্বল সেই ক্ষুদ্র সুবর্ণখণ্ড বিক্রয় করে যে অর্থ পেয়েছিলেন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। অপরাহ্নকালে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে তিনি মালব রাজ্যে উপস্থিত হলেন। শিপ্রা নদীর তীরে এসে ডম্বরু ভাবতে লাগলেন, অহো দুরদৃষ্ট! রাজাদের পরীক্ষার জন্য আমি যে উপায় অবলম্বন করেছিলাম তা বিফল হয়েছে, দুই রাজা নির্বোধ প্রতিপন্ন হয়েছেন, তৃতীয় রাজা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও অকারণে আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন। এখন কি করা যায়? হে দেবী সরস্বতী, আমাকে রক্ষা কর।

নদীতীরে উপবিষ্ট হয়ে ডম্বরু ব্যাকুল মনে বাগ্‌দেবীকে ডাকতে লাগলেন। সহসা শুনতে পেলেন, মধুর কণ্ঠে কে বলছে—দ্বিজবর, আপনি কি বিপদাপন্ন?

চমকিত হয়ে ডম্বরু দেখলেন, এক সদ্যঃস্নাতা সিক্তবসনা সুন্দরী

তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে ডম্বরু বললেন, ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে! আমাকে রক্ষা কর।

বীণানিক্কণের ন্যায় হাস্য করে সুন্দরী বললেন, দেবী টেবী নই, আমি সামান্যা শিল্পিনী। আমার নাম শিলীন্ধ্রী, রাজপুরীর অঙ্গনাদের জন্য পুষ্পালংকার রচনা করে জীবিকা নির্বাহ করি। নদীতে স্নান করে উঠে দেখলাম আপনি কাতরোক্তি করছেন। দয়া করে বলুন কি হয়েছে।

ডম্বরু বললেন, আমি বৃহস্পতিকল্প আচার্য রোহিতের প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত ডম্বরু বিশ্ববিদ্যোদধি। নিখিল শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে সম্প্রতি গুরুর আশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছি। তিনি বলেছেন, বৎস, তুমি বিদ্যায় পরিপ্লুত হয়েছ, এখন কোনও নৃপতিকে তুষ্ট করে তাঁর সভাকবি বা সভাপণ্ডিত হও, কিন্তু নির্বোধ আর আত্মগর্বী লোকের সংশ্রবে থেকো না, তাদের দানও নিও না। আমি একে একে কাশীরাজ বৎসরাজ ও দশার্ণরাজের সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পরীক্ষা করেছি, কিন্তু দেখলাম প্রথম দুই রাজা নির্বোধ আত্মগর্বী, এবং তৃতীয় রাজা বুদ্ধিমান হলেও অত্যন্ত উদ্ধত ও ক্রোধী, আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি এখন নিঃস্ব শ্রান্ত ক্ষুধাতুর, কি করা উচিত স্থির করতে পারছি না।

শিলীন্ধ্রী বললেন, আপনি দয়া করে আমার কুটীরে এসে বিশ্রাম ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। সংকোচ করবেন না, আমি আমার বৃদ্ধা জননীর সহিত বাস করি। কাল অবন্তীরাজের সভায় যাবেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান নরপতি, নিশ্চয় আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।

ডম্বরু বললেন, ভদ্রে, আমি আজই অবন্তীরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে চাই। যদি সফলকাম হই তবেই তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব, নতুবা দেবী সরস্বতীর আরাধনায় প্রায়োপবেশনে প্রাণ বিসর্জন দেব।

শিলীন্ধ্রী প্রশ্ন করলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি নৃপতিদের কিরূপে পরীক্ষা করেছিলেন ?

ডম্বরু আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। শিলীন্ধ্রী স্মিতমুখে বললেন পণ্ডিতবর, আপনি মিথ্যা প্রিয়বাক্য বলেছিলেন সেজন্য অভীষ্ট ফল পান নি। অবন্তীরাজ তীক্ষ্মবুদ্ধি গুণগ্রাহী, তাঁর কাছে গিয়ে আপনি সত্যভাষণ করুন, তাঁর দোষ গুণ সবই কীর্তন করুন।

ডম্বরু বললেন, সুন্দরী, তোমার মন্ত্রণা মন্দ নয়, মিথ্যা স্তুতি করে তিন বার ব্যর্থকাম হয়েছি, এবারে সত্য স্তুতি করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এদেশের রাজার দোষ গুণ আমি কিছুই জানি না, সত্যভাষণ কি করে করব ?

শিলীন্ধ্রী বললেন, ভাববেন না, আমি আপনাকে সমস্ত শিখিয়ে দিচ্ছি। একটু পরেই মহারাজ সান্ধ্যসভায় সমাসীন হবেন, আপনি সেখানে চলুন, আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব।

ডম্বরুকে উপদেশ দিতে দিতে কিছু দূর তাঁর সঙ্গে গিয়ে শিলীন্ধ্রী বললেন, বামে ওই কুঞ্জবনের মধ্যে আমার গৃহ। দক্ষিণের ওই পথ রাজভবনের সিংহদ্বারে শেষ হয়েছে, আপনি সোজা চলে যান।

শিলীন্ধ্রী প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

মালবরাজ বিক্রমাদিত্য তাঁর রাজধানী অবন্তী অর্থাৎ উজ্জয়িনীর সভা অলংকৃত করে বসে আছেন। দৈনিক রাজকার্য তিনি প্রাতঃকালীন সভাতেই সম্পন্ন করে থাকেন এখন এই সান্ধ্যসভায় চিত্তবিনোদনের জন্য সভাসদ্‌বর্গের সহিত মিলিত হয়েছেন।

রুক্ষকেশ মলিনবেশ ধূলিধূসরদেহ ডম্বরু রাজসভায় প্রবেশ করলেন, ব্রাহ্মণ দেখে কেউ তাঁকে বাধা দিল না। রাজার সম্মুখে

এসে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে করতল বিন্যস্ত করে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না।

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনাকে অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত দেখছি। আপনি হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালন করুন, দুগ্ধপান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, তার পর সুস্থ হলে আপনার বক্তব্য বলবেন। প্রতিহারী, এই বিপ্রকে বিশ্রামকক্ষে নিয়ে গিয়ে সেবার ব্যবস্থা কর।

ডম্বরু বললেন, মহারাজ, আমি সংকল্প করেছি, আমার বক্তব্য শুনে যদি আপনি প্রসন্ন হন তবেই জলস্পর্শ করব। অতএব যা বলছি অবধান করুন—

মহাবল মহামতি বিক্রম ভূপতি,
তব রাজ্যে প্রজাগণ সুখে আছে অতি।
শিষ্ট জন দুগ্ধ ঘৃত মৎস্য মাংসে তুষ্ট,
শূলে চড়িয়াছে যত দুরাচার দুষ্ট।
বহু জ্ঞানী গুণী আছে আশ্রয়ে তোমার,
অধিকন্তু কতিপয় আছে চাটুকার।
আছে নবরত্ন তব যশস্বী প্রচণ্ড,
যদিও কয়েক জন শুধু কাচখণ্ড।
আছে তব তিন ভার্যা মহিষী প্রেয়সী,
দশ উপভার্যা নৃত্যগীতপটীয়সী।
তথাপি অবলা বালা শিলীন্ধ্রীর প্রতি
কেন তব লোভ ওহে প্রৌঢ় নরপতি?
বিশ্ববিদ্যোদধি আমি ডম্বরু পণ্ডিত,
নির্ভয়ে কহিয়া থাকি যাহা সমুচিত।
নিবেদন করিলাম লোকে যাহা কয়,
মহারাজ, মোর প্রতি কিবা আজ্ঞা হয়?

ডম্বরুর ভাষণ শুনে বিক্রমাদিত্যের গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল আরক্ত

হল। নবরত্নসভার দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনারা কি বলেন?

বেতালভট্ট বললেন, মহারাজ, এই বিশ্ববিদ্যোদধির উপযুক্ত পুরস্কার—মস্তকমুণ্ডন, দধিলেপন ও গর্দভবাহনে বহিষ্কার।

রাজা আবার প্রশ্ন করলেন, কবি কালিদাস কি বলেন?

কালিদাস বললেন, মহারাজ, অনুমতি দিন এই ব্রাহ্মণকে আমি অন্তরালে নিয়ে যাই। কিছুক্ষণ পরে আবার এঁকে আপনার সকাশে আনব।

রাজা অনুমতি দিলেন। ডম্বরুর হাত ধরে কালিদাস বললেন, পণ্ডিত, এস আমার সঙ্গে। মাথা নেড়ে হাত টেনে ডম্বরু বললেন, রাজার অভিপ্রায় না জেনে আমি 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'।

ডম্বরুর কানে কানে কালিদাস বললেন, রাজা প্রসন্ন হয়েছেন। আমার সঙ্গে এস, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

দুই দণ্ড কাল অতীত হলে কালিদাস রাজসভায় ফিরে এলেন, তাঁর পশ্চাতে দু জন রাজভৃত্য ডম্বরুকে ধরাধরি করে এনে রাজার সম্মুখে অর্ধশয়ান অবস্থায় রাখল। ডম্বরুর দেহ পরিষ্কৃত, মস্তক তৈলাক্ত, উদর স্ফীত, চক্ষু অর্ধনিমীলিত।

উদ্‌বিগ্ন হয়ে বিক্রমাদিত্য প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে এই ব্রাহ্মণের?

কালিদাস বললেন, ভয় নেই মহারাজ। এই ডম্বরু পণ্ডিত পথশ্রমে ও ক্ষুধায় অবসন্ন ছিলেন, তার ফলে এঁর কিঞ্চিৎ বুদ্ধিভ্রংশও হয়েছিল। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে ইনি স্নান ক'রে নব বস্ত্র প'রে খাদ্য গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ উপবাসের পর গুরুভোজনের জন্য ইনি উত্থানশক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। তথাপি এঁর ভাষণের পরিশিষ্টস্বরূপ আরও কিছু আপনাকে এখনই নিবেদন করতে চান।

—বেশ তো, কি বলতে চান বলুন না।

—মহারাজ, আকণ্ঠ দধি চিপিটক রম্ভা লড্ডু ভোজনের ফলে এঁর বাক্‌শক্তিও এখন লোপ পেয়েছে, অথচ নিজের বক্তব্য জানাবার জন্য ইনি ব্যগ্র। যদি অনুমতি দেন তবে এঁর প্রতিনিধি হয়ে আমিই নিবেদন করি।

বিক্রমাদিত্য অনুমতি দিলেন। ডম্বরুর পূর্ব ইতিহাস বিবৃত করে কালিদাস বললেন, মহারাজ, এই ডম্বরু পণ্ডিত বিশ্ববিদ্যোদধি হলেও অতি সরল মতি এবং লোকব্যবহারে অনভিজ্ঞ। রাজসভায় আসার পূর্বে দুর্দৈবক্রমে শিলীন্ধ্রীর সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই ব্যাপিকা প্রগল্‌ভা দুর্বিনীতা রমণী এঁকে যা শিখিয়েছে তাই ইনি শুক পক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করেছেন।

রাজা বললেন, ডম্বরু তাঁর ভ্রম বুঝতে পেরেছেন?

—মহারাজ, ডম্বরু বলতে চান, আপনার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় শিলীন্ধ্রী বাক্যই উনি মেনে নিয়েছিলেন। এখন উদরপূর্তির পর ইনি বুঝেছেন যে পরপ্রত্যয়ে চালিত হওয়া মূঢ়বুদ্ধির লক্ষণ। অতএব ইনি আপনার আশ্রয়ে থেকে আপনার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে যথার্থ প্রশস্তি রচনা করতে চান। আপনি কৃপা করে ডম্বরুর প্রার্থনা পূরণ করুন, এঁকে অন্যতম সভাসদের পদ দিন।

—কোন্ কর্মের ইনি যোগ্য?

—মহারাজ, আপনার সভায় বিদূষক নেই, ডম্বরুকে বিদূষক নিযুক্ত করুন।

—বলেন কি! ইনি তো শুষ্ককাষ্ঠতুল্য নীরস, কৌতুকের কিছু-মাত্র বোধ আছে মনে হয় না।

—মহারাজ, কৌতুক উৎপাদনের সহজাত শক্তি এঁর আছে, নিজের অজ্ঞাতসারেই ইনি আপনার এবং এই রাজসভার সকলের মনোরঞ্জন করতে পারবেন, যেমন আজ করেছেন।

রাজা সহাস্যে বললেন, উত্তম প্রস্তাব। ওহে ডম্বরু পণ্ডিত,

তোমাকে বিদূষকের পদ দিলাম। মন্ত্রী, কবি কালিদাসের সঙ্গে পরামর্শ করে তুমি ডম্বরুর জন্য উপযুক্ত বৃত্তি ও বাসগৃহের ব্যবস্থা করে দাও।

এতক্ষণে ডম্বরু কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করলেন। চক্ষু উন্মীলিত করে হাতে ভর দিয়ে উঠে বললেন, মালবপতি মহামতি বিক্রমাদিত্যের জয়! মহারাজ, আমার আর একটি প্রার্থনা আছে। গুরুদেব আমাকে গৃহী হতে বলেছেন, অতএব আমার জন্য একটি সুলক্ষণা সৎকুলোদ্ভবা সুবিনীতা সুপাত্রীর সন্ধানের আজ্ঞা হ'ক।

বিক্রমাদিত্য তাঁর দণ্ডনায়ককে সম্বোধন করে বললেন, ওহে বীরভদ্র, এই ব্রাহ্মণের জন্য একটি সুপাত্রীর সন্ধান কর। আর, শিলীন্ধ্রীনাম্নী যে রমণী আমার মহিষীদের জন্য পুষ্পালংকার রচনা করে, তাকে রাজনিন্দার অপরাধে দণ্ড দাও—মস্তকমুণ্ডন, দধিলেপন, এবং গর্দভারোহণে বহিষ্কার।

ব্যাকুল হয়ে ডম্বরু বললেন, মহারাজ, বুদ্ধিহীনা অবলা সরলা বালার অপরাধ মার্জনা করুন।

রাজা বললেন, ওহে বীরভদ্র, এই ডম্বরু পণ্ডিত যদি সেই দুর্বিনীতা নারীর পাণিগ্রহণ করেন তবে তাকে নিষ্কৃতি দিবে।

ডম্বরু পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

১৩৭৮

দুই সিংহ

বেচারাম সরকার খুব ধনী লোক, যুদ্ধের সময় কনট্রাক্টরি করে প্রচুর রোজগার করেছেন। এখন তাঁর কারবার বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু তার জন্যে খেদও নেই। বেচারামের লোভ অসীম নয়, তিনি থামতে জানেন। যা জমিয়েছেন তাতেই তিনি তুষ্ট, বরং ব্যবসার ঝঞ্ঝাট আর পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এখন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

বেচারাম সুশিক্ষিত নন। তাঁর পত্নী সুবালা সেকেলে পাড়াগেঁয়ে মহিলা, একটু আধটু গল্পের বই পড়েন, তাও সব বুঝতে পারেন না। তাঁদের দুই সন্তান সুমন্ত আর সুমিত্রা কলেজে পড়ছে, তাদের রুচি আধুনিক, বাপ-মায়ের কথাবার্তা আর চালচলনে লজ্জা পায়। তারা স্পষ্টই বলে—বাবা কেবল টাকাই রোজগার করেছেন, শুধু পাঞ্জাবী গুজরাটী মারোয়াড়ী আর বড়-সায়েব ছোট-সায়েবদের সঙ্গে মিশেছেন, কালচার কৃষ্টি সংস্কৃতি কাকে বলে জানেন না। আর মা তো কেবল সেকরা আর গহনা আর গোছা গোছা পান আর জরদা-সুরতি নিয়েই আছেন। বাবা, তুমি তোমার ওই সেকেলে ঝোলা গোঁফটা কামিয়ে ফেল, চুল ব্যাক-ব্রশ করতে শেখ। এখনও তো তেমন বুড়ো হও নি, একটু স্মার্ট হও। আর মা, তোমার দাঁতের দিকে তো চাওয়া যায় না, পান-দোক্তা খেয়ে আতা-বিচির মতন কালো করেছ। সব তুলে ফেলে নতুন দাঁত বাঁধাও। আর তো বাবার কাজের চাপ নেই, এখন তোমরা দুজনে চালচলন বদলাও, সভ্য সমাজে যাতে মিশতে পার তার চেষ্টা কর।

বেচারাম আর সুবালা অতি সুবোধ বাপ-মা। ছেলেমেয়ের কথা শুনে হেসে বললেন, বেশ তো, এতদিন আমরা তোদের মানুষ

করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, এখন তোরাই আমাদের তালিম দিয়ে সভ্য করে নে।

বাপ-মাকে অভিজাত সভ্য সমাজের যোগ্য করবার জন্যে ছেলে-মেয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেল। বিখ্যাত ক্লাব 'সজ্জন সংগতি'র নাম আপনারা শুনে থাকবেন। তার সেক্রেটারি কপোত গুহ বার-অ্যাট-ল আর তাঁর স্ত্রী শিঞ্জিনী গুহর সঙ্গে সুমন্ত আর সুমিত্রার আলাপ আছে। দুজনে গুহ দম্পতিকে ধরে বসল তাঁরা যেন বেচারাম আর সুবালাকে পালিশ করবার ভার নেন। কপোত আর শিঞ্জিনী সানন্দে রাজী হলেন এবং বেচারামের বাড়িতে ঘন ঘন আসতে লাগলেন। কর্তার তালিমের ভার মিস্টার গুহ আর গিন্নীর ভার মিসেস গুহ নিলেন। বেচারাম কৃপণ নন, নিজেদের শিক্ষার জন্যে উপযুক্ত মাসিক দক্ষিণার প্রস্তাব করলেন। কপোত গুহ প্রথমে ভদ্রোচিত কুণ্ঠা প্রকাশ করে অবশেষে নিতে রাজী হলেন। ঘর সাজানো, খাবার ব্যবস্থা, পোশাক, গহনা, কথাবার্তার কায়দা, সব বিষয়েই সংস্কারের চেষ্টা হতে লাগল। বেচারাম গোঁফহীন হলেন, ব্যাক-ব্রশ করলেন, বাড়িতে ধুতির বদলে ইজার পরতে লাগলেন। কিন্তু সুবালা কিছুতেই পান-দোক্তা ছাড়লেন না, দাঁত বাঁধাতেও রাজী হলেন না। শিঞ্জিনী বার বার সতর্ক করে দিলেও সুবালার গ্রাম্য উচ্চারণ দূর হল না।

সম্প্রতি বিম্বিসার রোডে বেচারামবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি হয়েছে, তার প্ল্যান কপোত গুহই আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন। গৃহপ্রবেশ হয়ে যাবার কিছুদিন পরে সুমন্ত বলল, বাবা, এবারে বাড়িতে একটা পার্টি লাগাও। তোমার আত্মীয় কুটুম্ব বড়-সায়েব ছোট-সায়েব লোহাওয়ালা সিমেণ্টওয়ালা ওরা তো সেদিন চর্ব্য চূষ্য ভোজ খেয়ে

গেছে, ওদের ডাকবার দরকার নেই। পার্টিতে শুধু বাছা বাছা লোক নিমন্ত্রণ কর।

বেচারাম বললেন, আমার তো বাপু রাজা-রাজড়া আর বনেদী লোকের সঙ্গে আলাপ নেই, গায়ে পড়ে নিমন্ত্রণ করতেও পারি না। দু-একজন মন্ত্রী উপমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁদের বলতে পারি। গুহ সায়েব কি বলেন?

কপোত গুহ বললেন, অ্যারিস্টোক্রাটদের এখন নাই বা ডাকলেন, দিন কতক পরে তারা নিজেরাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ব্যস্ত হবে। আমি বলি কি, বাড়িতে নামজাদা হোমরাচোমরা সাহিত্যিকদের একটা সম্মিলন করুন, জাঁকালো টি-পার্টি। যদি দু-একটি সিংহ আনবার ব্যবস্থা হয় তবে সকলেই খুব আগ্রহের সঙ্গে আসবেন।

—বলেন কি মিস্টার গুহ, সিংহ কোথায় পাব?

—সিংহ বুঝলেন না? যাকে বলে লায়ন। অর্থাৎ খুব নামজাদা গুণী লোক, যাকে সবাই দেখতে চায়।

সুমন্ত বলল, লায়নের চাইতে লায়নেস আরও ভাল। যদি দু-একটি এক নম্বরের সিনেমা স্টার আনতে পারেন, এই ধরুন হ্লাদিনী মণ্ডল আর মরালী ব্যানার্জি—

কপোত গুহ মাথা নেড়ে বললেন, ঘরোয়া পার্টিতে ও রকম সিংহিনী আনা চলবে না, আমাদের সমাজ এখনও অতটা উদার হয় নি। তা ছাড়া সাহিত্যিকদের মধ্যে বুড়ো অনেক আছেন, তাঁরা একটু লাজুক, হয়তো অস্বস্তি বোধ করবেন। সাহিত্যিক সিংহিনী পাওয়া গেলে ভাল হত, কিন্তু এখন তাঁরা দুর্লভ। কবে পার্টি দিতে চান?

সুমন্ত আর সুমিত্রা বলল, সরস্বতী পূজোর দিন পার্টি লাগান, বেশ হবে।

কপোত গুহ বললেন, উঁহু, সেদিন চলবে না, সাহিত্যিক সুধীদের

নানা জায়গায় বাণীবন্দনায় যেতে হবে। দু-তিন দিন পরে করা যেতে পারে।

বেচারাম বললেন, বেশ, পঁচিশে জানুআরি হল রবিবার, সেই দিনই পার্টি দেওয়া যাক। কাকে কাকে ডাকবেন?

—শিঞ্জিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে ফর্দ করব। বেশী নয়, জন পঁচিশ-ত্রিশ হলেই বেশ হবে। এখন যঁদের নাম মনে পড়ছে বলি শুনুন। বটেশ্বর সিকদার আর দামোদর নশকর গল্পসরস্বতী এঁরাই হলেন এখনকার লিটেরারি লায়ন, এই দুই সিংহকে আনতেই হবে।

সুমিত্রা বলল, ওঁদের দুজনের বনে না শুনেছি।

—তাতে ক্ষতি হবে না, এখানে পার্টিতে এসে তো ঝগড়া করতে পারবেন না। তার পর গিয়ে রাজলক্ষ্মী দেবী সাহিত্য-ভাস্বতীকে বলতে হবে, উনি সিংহিনী না হলেও ব্যাঘ্রিনী বটেন। সেকেলে আর একেলে কবি গোটা চারেক হলেই চলবে, কবিদের আকর্ষণ গল্পওয়ালাদের চাইতে ঢের কম। প্রগামিণী পত্রিকার সম্পাদক অনুকূল চৌধুরী মশায়কে সভাপতি করা যাবে। আর কালাচাঁদ চোঙদারকে তো বলতেই হবে।

সুমন্ত প্রশ্ন করল, তিনি আবার কে?

—জান না? দুন্দুভি পত্রিকার সম্পাদক।

সুমিত্রা বলল, সেটা তো শুনেছি একটা বাজে পত্রিকা।

—মোটেই বাজে নয়, বিস্তর পাঠক। প্রতি সংখ্যায় বাছা বাছা নামজাদা লেখকদের গালাগাল দেওয়া হয়, লোকে খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে।

—পাঠকরা রাগ করে না?

—রাগ করবে কেন। নামী লোকের নিন্দে সকলেরই ভাল লাগে। সেকালে যে সব পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করত তাদের বিস্তর পাঠক জুটত। কবির ভক্তরাও পড়ে বলত, হে হে

হে, কি মজার লিখেছে দেখ! তবে কালাচাঁদ চোঙদারের একটা প্রিন্সিপ্‌ল আছে, ছোটখাটো লেখকদের গ্রাহ্য করে না, আর যে সব বড় বড় লেখক নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দেন তাঁদের ও রেহাই দেয়।

—বার্ষিক বৃত্তি কি রকম? ব্ল্যাকমেল নাকি?

—তা বলতে পার। শুনেছি দামোদর নশকর প্রতি বৎসর পূজোর সময় কালাচাঁদকে আড়াই শ টাকা দেন। উনি যে গল্পসরস্বতী উপাধি পেয়েছেন তা কালাচাঁদেরই চেষ্টায়। বটেশ্বর সিকদার একগুঁয়ে কঞ্জুস লোক, এক পয়সা দেন না, তাই দুন্দুভির প্রতি সংখ্যায় তাঁকে গালাগাল খেতে হয়। তবে কালাচাঁদ উপকারও করে। জন তিন-চার ছোকরা কতকগুলো অশ্লীল বই লিখেছিল, কিন্তু তেমন কাটতি হয় নি। তারা কালাচাঁদকে বলল, দয়া করে আপনার পত্রিকায় আমাদের ভাল করে গালাগাল দিন, আমাদের লেখা থেকে চয়েস প্যাসেজ কিছু কিছু তুলে দিন। বেশী দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই, পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, তাই নিন সার। কালাচাঁদ রাজী হল, তার ফলে সেই বইগুলোর কাটতি খুব বেড়ে গেল। তার পর গিয়ে দামামা পত্রিকার সম্পাদক গৌরচাঁদ সাঁপুইকেও বলতে হবে। সে ছোকরা ব্ল্যাকমেল নেয় না, তবে বড়লোক লেখকদের টাকা খেয়ে তাদের রাবিশ রচনার প্রশংসা ছাপে, তা ছাড়া প্রতি সংখ্যায় কালাচাঁদকে চুটিয়ে গাল দেয়। যাক ও সব কথা। আমি কালকেই ফর্দ করে ফেলব—কাদের ডাকতে হবে, কি খাওয়ানো হবে, বসবার কি রকম ব্যবস্থা হবে—সবই স্থির করে ফেলব।

নির্দিষ্ট দিনে প্রীতিসম্মিলন বা টি-পার্টির আয়োজন হল। বাড়ির সামনের মাঠে শামিয়ানা খাটানো হয়েছে, ছোট ছোট টেবিলের চার পাশে চেয়ার সাজিয়ে নিমন্ত্রিতদের চা খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। শামিয়ানার এক দিকে বেদীর উপর সভাপতি অনুকূল চৌধুরী, দুই সিংহ অর্থাৎ প্রধান অতিথি বটেশ্বর আর দামোদর, রাজলক্ষ্মী দেবী, এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোক বসবেন। সভায় বক্তৃতা বিশেষ কিছু হবে না, শুধু বেচারাম অভ্যাগতদের স্বাগত জানাবেন, তার পর অনুকূল চৌধুরী গৃহস্বামীর কিঞ্চিৎ গুণকীর্তন কার তাঁর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবেন। আশা আছে বটেশ্বর আর দামোদরও বেচারামের কৃতিত্ব আর বদান্যতা সম্বন্ধে কিছু বলবেন।

সভাপতি এবং দুই সিংহের জন্য তিনটি ভাল চেয়ার আনা হয়েছে, একটি মাইসোরের চন্দন কাঠের আর দুটি কাশ্মীরী আখরোট অর্থাৎ ওআলনট কাঠের। প্রথম চেয়ারটির পিছন দিকে একটু বেশী উঁচু আর নকশাদার, সেজন্যে খুব জাঁকালো দেখায়। কপোত গুহ একই রকম তিনটি চেয়ার আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যোগাড় করতে পারেন নি। শামিয়ানার নেপথ্যে চড়কডাঙা স্ট্রিংব্যাণ্ডের তিন-জন বেহালাবাদক মোতায়েন আছে। তারা খুব আস্তে বাজাবে, যাতে অতিথিদের কথাবার্তার ব্যাঘাত না হয়।

নিমন্ত্রিত লোকেরা ক্রমে ক্রমে এসে পৌঁছুলেন। বেচারাম, তাঁর ছেলে-মেয়ে, এবং কপোত আর শিঞ্জিনী গুহ অতিথিদের সমাদর করে বসিয়ে দিলেন। বেচারাম-গৃহিণী সুবালা কিছুতেই এই দলের মধ্যে থাকতে রাজী হলেন না, তিনি রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে ফিসফিস করে একটু আলাপ করেই সরে পড়লেন এবং মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। প্রায় সকলের শেষে বটেশ্বর সিকদার আর দামোদর নশকর উপস্থিত হলেন। দৈবক্রমে এঁদের আগমন এক সঙ্গেই হল, প্রত্যেকের সঙ্গে গুটি কতক কমবয়সী খাস ভক্তও এল।

বেচারাম আর কপোত সসম্ভ্রমে অভিনন্দন করে দুই মহামান্য সিংহকে শামিয়ানার ভিতরে নিয়ে গেলেন।

সভাপতি অনুকূল চৌধুরী আগেই এসেছিলেন। তিনি একটি কাশ্মীরী চেয়ারে বসলেন। বটেশ্বর বয়সে বড়, সেজন্য কপোত গুহ তাঁকে চন্দন কাঠের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। সুমিত্রা তাঁর গলায় একটি মোটা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিল। পাশের কাশ্মীরী চেয়ারটা দেখিয়ে কপোত গুহ দামোদরকে বললেন, বসতে আজ্ঞা হক। দামোদর বসলেন না, মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কপোত গুহ আবার বললেন, দয়া করে বসুন সার। দামোদর ভ্রুকুটি করে উত্তর দিলেন, ও চেয়ারে আমি বসতে পারি না।

সভায় একটা গুঞ্জন উঠল। জন কতক অতিথি দুই সিংহের কাছে এগিয়ে এলেন। দুন্দুভি-সম্পাদক কালাচাঁদ চোঙদার বলল, দামোদরবাবু এই দু নম্বর চেয়ারে কিছুতেই বসতে পারেন না, তাতে এঁর মর্যাদার হানি হবে, ইনিই এখনকার সাহিত্যসম্রাট। বটেশ্বরবাবুর প্রতি আমি কটাক্ষ করছি না, তবে আমরা চাই উনি ওই ভাল চেয়ারটি দামোদরবাবুর জন্যে ছেড়ে দিন।

দামামা-সম্পাদক গৌরচাঁদ সাঁপুই চেঁচিয়ে বলল, খবরদার বটেশ্বরবাবু, উঠবেন না, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। এখনকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট আপনিই।

কালাচাঁদ বলল, ননসেন্স। দামোদরবাবুর উপাধি আছে গল্প-সরস্বতী, বটেশ্বরের কি আছে শুনি? ঘোড়ার ডিম।

গৌরচাঁদ বলল, এই কথা? ওই ভূপেশ রাজেন অবনী নুরুদ্দিন নবকেষ্ট, এগিয়ে এস তো। আমরা ছ জন ছোট-গাল্পিক, বড়-গাল্পিক, রম্য-লিখিয়ে, কবি, সম্পাদক আর সমালোচক—আমরা নিখিল বাঙালী সাহিত্যিকবর্গের প্রতিনিধিরূপে অত্র সভায় অস্মিন মুহূর্তে শ্রীযুক্ত বটেশ্বর সিকদার মহাশয়কে উপাধি দিলাম—অপ্রতিদ্বন্দ্বী গল্পশিল্পসম্রাট। যার সাহস আছে সে আপত্তি করুক।

আমার দস্তানা নেই, এই বাঁ পায়ের মোজাটা খুলে ফেলে চ্যালেঞ্জ করছি, আমার সঙ্গে যে লড়তে চায় সে মোজা তুলে নিক। সবতাতে আমি রাজী আছি—ঘুষি, গাঁট্টা, লাটি, থান ইট, যা চাও।

মোজা তুলে নিতে কেউ এগিয়ে এল না। গৌরচাঁদ বলল, নুরু ভাই, জেরাসে শাঁখ বাজা। নুরুদ্দিনের মুখ থেকে বিজয়সূচক কৃত্রিম শঙ্খধ্বনি নির্গত হল—পোঁ-ও-ও।

কালাচাঁদ চিৎকার করে বলল, বটেশ্বরবাবু, ভাল চান তো এখনই চেয়ার ভেকেট করুন। কি, উঠবেন না? ও দামোদরবাবু, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, আপনার হকের আসন দখল করুন, এই চেয়ার-টাতেই আপনি বসে পড়ুন।

দামোদর বললেন, ওতে বসবার জায়গা কই?

কালাচাঁদ আর তার দু জন বন্ধু দামোদরকে ধরে বটেশ্বরের কোলের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল—খবরদার উঠবেন না, আমরা আপনাকে ব্যাক করব। এই বুড়ো বটেশ্বর কতক্ষণ আপনার আড়াই-মনী বপু ধারণ করতে পারে দেখা যাক।

হট্টগোল আরম্ভ হল। রাজলক্ষ্মী সাহিত্যভাস্বতী বললেন, ছি ছি ছি, আপনাদের লজ্জা নেই, ছোট ছেলের মতন ঝগড়া করছেন! দু জনেই নেমে পড়ুন চেয়ার থেকে, আসুন আমরা সবাই চায়ের টেবিলে গিয়ে বসি।

কালাচাঁদ বলল, কারও কথা শুনবেন না দামোদরবাবু, গ্যাঁট হয়ে বটেশ্বরের কোলে বসে থাকুন।

গৌরচাঁদ বলল, ঠেলা মেরে দামোদরকে ফেলে দিন বটেশ্বরবাবু, চিমটি কাটুন, কাতুকুতু দিন।

সমাগত অতিথিদের এক দল বটেশ্বরের পক্ষে আর এক দল দামোদরের পক্ষে হল্লা করতে লাগল। অবশেষে মারামারির উপক্রম হল। অনুকূল চৌধুরী হাত জোড় করে দুই দলকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না।

কপোত গুহ চুপি চুপি বেচারামকে বললেন, গতিক ভাল নয়, পুলিসে খবর দেওয়া যাক, কি বলেন ?

সুমন্ত বলল, উঁহু, বরং ফায়ার ব্রিগেডে টেলিফোন করি, হোজ পাইপ থেকে জলের তোড় গায়ে লাগলে দুই সিংগি আর সব কটা শেয়াল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সুমিত্রা বলল, ও সবের দরকার নেই, বিশ্রী একটা স্ক্যাণ্ডাল হবে। লড়াই থামাবার ব্যবস্থা আমি করছি। এই বলে সে সভা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির ফটকের বাইরে গেল।

বেচারাম সরকারের বাড়ির পাশে একটা খালি জমি আছে, পাড়ার জয়-হিন্দ ক্লাবের ছেলেরা সেখানে পাণ্ডাল খাড়া করে খুব জাঁকিয়ে বাণীবন্দনা করেছে। তিন দিন আগে পূজো চুকে গেছে, কিন্তু ফুর্তির জের টানবার জন্যে এ পর্যন্ত বিসর্জন হয় নি, আজ সন্ধ্যায় তার আয়োজন হচ্ছে। পাণ্ডালের ভিতর থেকে দেবমূর্তি বার করা হয়েছে। লাউড স্পীকারটা মাটিতে নামানো হয়েছে, কিন্তু বিজলীর তার খোলা হয় নি, এখনও একটানা রেকর্ড-সংগীত উদ্‌গিরণ করছে। সামনে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। গুটিকতক ছেলে-মেয়ে মুখোশ পরে তৈরী হয়ে আছে, তারা চলন্ত লরির উপর দেবীমূর্তির সামনে নাচবে।

এই জয়-হিন্দ ক্লাবের পূজোয় বেচারামবাবু মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছেন, অন্য রকমেও অনেক সাহায্য করেছেন, সেজন্যে তাঁর বাড়ির সবাইকে ক্লাবের ছেলেরা খুব খাতির করে। সেক্রেটারি প্রাণধন নাগের কাছে এসে সুমিত্রা বলল, দেখুন, বাড়িতে মহা বিপদ, আপনাদের সাহায্য চাচ্ছি—

ব্যস্ত হয়ে প্রাণধন বলল ; কি করতে হবে হুকুম করুন, সব তাতে রেডি আছি, আমরা যথাসাধ্য করব, যাকে বলে আপ্রাণ।

সুমিত্রা সংক্ষেপে জানাল, তাদের বাড়ির পার্টিতে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে জনকতক গুণ্ডা মারামারির মতলবে আছে। দুই সিংহ অর্থাৎ প্রধান অতিথি একই চেয়ারে বসেছেন, তাঁদের রোখ চেপে গেছে কেউ চেয়ারের দখল ছাড়বেন না। ওঁদের সরিয়ে দেওয়া দরকার, নইলে বিশ্রী একটা কাণ্ড হবে।

প্রাণধন বলল, ঠিক আছে, আপনি ভাববেন না। আগে আপনার দুই সিংগির গতি করব, তার পর আমাদের বিসর্জন। মা সরস্বতী না হয় ঘণ্টাখানিক ওয়েট করবেন। ওরে ভূতো বেণী মটরা হেবো, জলদি আমার সঙ্গে আয়। নিরঞ্জন সিং, লরিতে স্টার্ট দাও, আমরা এখনই আসছি।

চারজন অনুচরের সঙ্গে তাড়াতাড়ি শামিয়ানায় ঢুকে প্রাণধন বলল, ও সিংগি মশাইরা, শুনছেন? চেয়ার থেকে নেমে পড়ুন কাইগুলি, কেন লোক হাসাবেন?

কালাচাঁদ আর গৌরচাঁদ এক সঙ্গে বলল, খবরদার চেয়ার ছাড়বেন না।

প্রাণধন বলল, বটে? এই ভূতো বেণী মটরা হেবো, এগিয়ে আয় তুরন্ত। সিংগি মশাইরা, যদি নিতান্তই না নামেন তবে দুজনেই চেয়ারের হাতল বেশ শক্ত করে ধরে টাইট হয়ে বসুন।

নিমেষের মধ্যে প্রাণধনের দল দুই সিংহ সমেত চেয়ারটা তুলে বাইরে এনে লরিতে চাপিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও উঠে পড়ে বলল, চালাও নিরঞ্জন সিং, সিধা আলীপুর চিড়িয়াখানা। লাউড স্পীকারটা তখনও মাটিতে পড়ে গর্জন করছে—অত কাছাকাছি বঁধু থাকা কি ভালো-ও-ও।

জুএর সামনে এসে লরি থামল। বটেশ্বর আর দামোদরকে খালাস করে প্রাণধন করজোড়ে বলল, কিছু মনে করবেন না মশাইরা। শুনেছি আপনারা বিশ্ববিখ্যাত লোক, শুধু দু বেটা গুণ্ডার খপ্পরে পড়ে খেপে গিয়েছিলেন। সবই গেরোর ফের দাদা,

কি করবেন বলুন। ঘাবড়াবেন না, আপনাদের ড্রাইভারদের বলা আছে তারা আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটর নিয়ে এসে পড়বে। ততক্ষণ আপনারা একটু গল্প-গুজব করুন, দুটো সুখ দুঃখের কথা কন। আচ্ছা, আসি তবে, নমস্কার।

সিংহসমাগমের অতর্কিত পরিণাম দেখে প্রীতিসম্মিলনের সকলেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। কালাচাঁদ আর গৌরচাঁদ বেগতিক দেখে সদলে সরে পড়ল। অতিথিরাও অনেক বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু আয়োজন একবারে পণ্ড হল বলা যায় না। অতিথিদের মধ্যে অনুকূল চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি চোদ্দ-পনরো জন মাথাঠাণ্ডা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা রয়ে গেলেন। সকলেই বেচারামবাবুকে আন্তরিক সমবেদনা জানালেন, বটেশ্বর-দামোদরের কেলেঙ্কারি আর কালাচাঁদ-গৌরচাঁদের গুণ্ডামির নিন্দা করলেন, বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ করলেন, মাছের কচুরি, মাংসের চপ, চিঁড়ে ভাজা, কেক সন্দেশ চা প্রচুর খেলেন, তার পর গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন।

১৮৭৮

কামরূপিণী

শীতকাল, বিকাল বেলা। শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনে একটি দল গঙ্গার কাছে মাঠের উপর শতরঞ্চি পেতে বসেছেন। দলে আছেন—

প্রবীণ অধ্যাপক নিকুঞ্জ ঘোষ, তাঁর স্ত্রী উর্মিলা, আর মেয়ে ইলা বয়স পনরো।

নিকুঞ্জর শালা নবীন অধ্যাপক বীরেন দত্তর স্ত্রী সুরুচি, আর তার ছেলে নুটু, বয়স ছয়।

বৃদ্ধ শীতল চৌধুরী। বীরেন দত্তর সঙ্গে এঁর কি একটা দূর সম্পর্ক আছে। ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই এঁকে শীতুমামা বলে ডাকে।

বীরেন দত্তর আসতে একটু দেরি হবে। নববিবাহিত বন্ধু মেজর সুকোমল গুপ্ত সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী আর শাশুড়ির সঙ্গে আসাম থেকে কলকাতায় এসেছেন। বীরেন তাঁদের নিয়ে আসবে।

শীতল চৌধুরী বললেন, তোমাদের এ কি রকম পিকনিক? খাবার জিনিস কিছুই সঙ্গে আন নি, শুধু হাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরতে হবে নাকি?

সুরুচি বলল, ভয় নেই শীতুমামা। ওঁর সঙ্গে সবই এসে পড়বে, সস্ত্রীক সশাশুড়ীক মেজর সুকোমল গুপ্ত আর দেদার খাবার। গুপ্তর বউ আর শাশুড়ী নিজের হাতে সব খাবার তৈরি করে আনবেন। বউভাতের ভোজটা আমাদের পাওনা আছে, এখানেই খাওয়াবেন।

নুটু বলল, ও শীতুমামা, কাল যে গল্পটা বলছিলে তা তো শেষ হয় নি। খেতে অনেক দেরি হবে, ততক্ষণ গল্পটা বল না।

শীতুমামা বললেন, আচ্ছা বলছি শোন।--তার পর রাজা তো

খুব সানাই ভেঁপু রামশিঙা ঢাক ঢোল জগঝম্প বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে সুয়োরানীকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন। পঞ্চাশটা শাঁখ বেজে উঠল, রাজার মাসী পিসী মামীরা খুব জিব নেড়ে হুলুলুলু করলেন। বেচারী দুয়োরানী মনের দুঃখে তাঁর খোকাকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। এখন, সেই সুয়োরানীটা ছিল রাক্ষুসী। সাত দিন যেতে না যেতে রাজার কাছে খবর এল— হাতিশালায় হাতি মরছে, ঘোড়াশালায় ঘোড়া মরছে, শুধু তাদের হাড় দাঁত আর ন্যাজ পড়ে আছে।

নুটু বলল, সুয়োরানী ওসব চিবুতে পারে না বুঝি ?

নুটুর মা সুরুচি ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর খোকা, ও ছাই গল্প শুনতে হবে না। শীতুমামা, আপনি এইসব বিদকুটে গল্প কেন বলেন ? এতে ছোট ছেলেদের মনে একটা খারাপ ছাপ পড়ে।

নিকুঞ্জ ঘোষ হেসে বললেন, আরে না না। সব দেশেরই রূপকথায় একটু উৎকট ব্যাপার থাকে, তাতে ছোট ছেলেমেয়ের কোনও অনিষ্ট হয় না। তারা বেশ বোঝে যে সবই বানিয়ে বলা হচ্ছে। নয় রে নুটু ?

নুটু বলল, হুঁ। আমিও গল্প বানাতে পারি।

সুরুচি বলল, যাই হ'ক, শীতুমামা আপনি ওসব বেয়াড়া মিথ্যে গল্প বলবেন না।

শীতুমামা বললেন, বেশ, মা-লক্ষ্মীর যখন আপত্তি আছে তখন বলব না। নুটু, তুই বরং তোর মায়ের কাছে রামায়ণের গল্প শুনিস, শূর্পণখা রাক্ষুসীর কথা, খুব ভাল সত্যি গল্প। কিন্তু একটা কথা তোমাদের জানা দরকার। রূপকথার সবটাই মিথ্যে এমন বলা যায় না। যা ঘটে তাই কতক রটে।

নিকুঞ্জ-পত্নী ঊর্মিলা বললেন, আচ্ছা, শীতুমামা, রাক্ষুসী সুয়োরানী, পাতালপুরীর রাজকন্যা, সোনার কাঠি রুপোর কাঠি কামরূপ-

কামিখ্যের মায়াবিনী যারা ভেড়া বানিয়ে দেয়—এ সবে আপনি বিশ্বাস করেন ?

—কিছু কিছু করি বইকি, বিশেষ করে ওই ভেড়া বানাবার কথা যা বললে।

নিকুঞ্জ-কন্যা ইলা বলল, ভেড়ার কথাটা খুলে বলুন না শীতুমামা।

—নাঃ থাক। নুটুর মায়ের যখন আপত্তি।

নিকুঞ্জ ঘোষ বললেন, লোকের কৌতূহলে খোঁচা দিয়ে চুপ করে থাকা ঠিক নয়, খোলসা করে বলে ফেলাই ভাল।

সুরুচি বলল, বেশ তো, শীতুমামা ভেড়ার গল্পটা খোলসা করেই বলুন, কিন্তু বেশী বেয়াড়া কথাগুলো বাদ দেবেন।

শীতুমামা বললেন, নাঃ থাক গে। বরং একটু ভগবৎপ্রসঙ্গ হ'ক। ইলা ভাই, তুমি একটি রবীন্দ্রসংগীত গাও, সেই 'মাথা নত করে দাও' গানটি।

সুরুচি বলল, অত মান ভাল নয় শীতুমামা। আমি মাপ চাচ্ছি, আপনি ভেড়ার গল্প বলুন।

নুটু বলল, না, আগে সেই রাক্কুসী সুয়োরানীর গল্প হবে।

সুরুচি বলল, তুই থাম খোকা। রাক্কুসীর চাইতে ভেড়াওয়ালী ভাল। বলুন শীতুমামা।

শীতল চৌধুরী বলতে লাগলেন।—

পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। বলভদ্র মর্দরাজকে তোমরা চিনবে না, তার বাপ রামভদ্র মর্দরাজ বালেশ্বর জেলার একজন বড় জমিদার ছিলেন, রাজা বললেই হয়। তাঁর এস্টেটে আমি তখন কাজ করতুম। বলভদ্রর বয়স ত্রিশের নীচে, সুপুরুষ, মেজাজ ভাল, শিকারের খুব শখ। একদিন সে আমাকে বলল, ও শীতলবাবু,

কেবলই সেরেস্তার কাজ নিয়ে থাকলে তোমার মাথা বিগড়ে যাবে। বাবাকে বলে তোমার বিশ দিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে কিমাপুর চল, উত্তরপূর্ব আসামে, খাস জায়গা, দেদার শিকার। সেখানে আঠারো-শিঙা হরিণ পাওয়া যায়, আকারে খুব বড় নয়, কিন্তু শিঙ দুটো অতি অদ্ভুত, প্রত্যেকটার নটা ফেঁকড়া।

সব খরচ বলভদ্র যোগাবে, আমার কাজ হবে শুধু মোসাহেবি, সুতরাং রাজী হলুম। কিমাপুর জায়গাটা একটু দুর্গম, ব্রহ্মপুত্রের ওপারে ভুটান রাজ্যের লাগাও, তবে কামরূপ জেলাতেই পড়ে। পথ ভাল নয়, কোনও রকমে মোটর চলে। শিকারী বলে বলভদ্রর খুব খ্যাতি ছিল, সহজেই আসাম গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে সব রকম দরকারী পারমিট পেয়ে গেল। একটা বড় হডসন মোটর গাড়ি, অনেক খাবার জিনিস ড্রাইভার, আর একজন চাকর নিয়ে আমরা কিমাপুর ডাক-বাংলায় উঠলুম। রোজই শিকারের চেষ্টা হত, নানা রকম জানোয়ারও পাওয়া যেত, কিন্তু আঠারো-শিঙা হরিণের দেখা নেই। ওখানকার লোকরা বলল, আরও উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যাবে। খানিক দূর পর্যন্ত কোনও রকমে মোটর চলবে, তার পর হেঁটে যেতে হবে।

সকাল আটটার সময় আমরা যাত্রা করলুম। গাড়িতে বলভদ্র, আমি, ড্রাইভার কিরপান সিং, আর তার পাশে একজন ভুটিয়া, সে পথ দেখাবে। রাস্তা অতি খারাপ, দু বার টায়ার পাংচার হল, তিন মাইল যেতেই বেলা এগারোটা বাজল। গরম বেশ, খিদেও পেয়েছে। আমরা বিশ্রামের উপযুক্ত জায়গা খুঁজছি, এমন সময় দেখতে পেলুম গাছের আড়ালে একটি সুন্দর ছোট বাংলা। আমরা একটু এগিয়ে যেতেই সেই বাংলা থেকে একটি অপূর্ব সুন্দরী বেরিয়ে এলেন। নিখুঁত গড়ন, খুব ফরসা, তবে নাক একটু খাঁদা আর চোখ পটল-চেরা নয়. লংকা-চেরা, বলা যেতে পারে। আমরা নমস্কার করে নিজেদের পরিচয় দিলুম। সুন্দরী জানালেন, তাঁর নাম মায়াবতী

কুরুঙ্গি, এখন একলাই আছেন, তাঁর সঙ্গিনী মাসী-মা চাকরকে নিয়ে কিমাপুরের হাটে গেছেন। মায়াবতী খাঁটী বাংলাতেই কথা বললেন, সাদর আহ্বানে কৃতার্থ হয়ে আমরা আতিথ্য স্বীকার করলুম।

বলভদ্র মর্দরাজের ভঙ্গী দেখে বোঝা গেল সে প্রথম দর্শনেই প্রচণ্ড প্রেমে পড়েছে, তার মুখার স্বরে গদ্‌গদ ভাব ফুটে উঠেছে। আমাদের ভুটিয়া গাইড লাদেন গাম্পা চুপি চুপি আমাকে বলল, ওই মেমসাহেবটা ভাল নয়, পালিয়ে চলুন এখান থেকে। কিন্তু তার কথা কে গ্রাহ্য করে। বলভদ্র প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে আর আমিও মুগ্ধ হয়ে গেছি।

মায়াবতী আমাদের খুব সৎকার করলেন। বললেন, আঠারো-শিঙা হরিণের সীজন এখন নয়, তারা শীতকালে পাহাড় থেকে নেমে আসে। মিস্টার মর্দরাজ আর মিস্টার চৌধুরী যদি দু মাস পরে আসেন তখন নিশ্চয় শিকার মিলবে। আমরা বহু ধন্যবাদ এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলুম।

পথে গোটাকতক পাখি মেরে আমরা কিমাপুর ডাকবাংলায় ফিরে এলুম। তার পর দিন বলভদ্র আবার মায়াবতীর কাছে গেল, শরীরটা একটু খারাপ হওয়ায় বাংলাতেই রইলুম। অনেক বেলায় ফিরে এসে বলভদ্র বলল, শোন শীতলবাবু, আমি ওই মিস মায়াবতীকে বিয়ে করব পনরো দিন পরে ওকে নিয়ে কলকাতায় যাব। তুমি কালই চলে যাও, বালিগঞ্জে একটা ভাল বাড়ি ঠিক করে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি অনেক বোঝালুম, অজ্ঞাতকুলশীলাকে হঠাৎ বিয়ে করা উচিত নয়, তার বাবাও তা পছন্দ করবেন না। কিন্তু বলভদ্র কোনও কথা শুনল না, অগত্যা আমি পরদিনই কলকাতায় রওনা হলুম।

পনরো দিন পরে বলভদ্রের ড্রাইভার কিরপান সিং আমার কাছে এসে খবর দিল—বলভদ্র হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে, কোথায় গেছে কেউ

জানে না, মেমসাহেব মায়াবতীও বলতে পারলেন না। জেরা করে জানলুম, চার দিন আগে গাড়িটা বিগড়ে যাওয়ায় বলভদ্র সকালবেলা মায়াবতীর কাছে হেঁটে গিয়েছিল। মনিব ফিরে এলেন না দেখে পরদিন কিরপান সিং খোঁজ নিতে গেল। গিয়ে দেখল, সেখানে শুধু মায়াবতী আর তাঁর বুড়ী মাসী আছেন। তাঁরা বললেন, বলভদ্র গতকাল সকালে এসেছিলেন বটে, কিন্তু এখান থেকে কোথায় গেছেন তা তাঁরা জানেন না। কিরপান সিং আরও দেখল, একটি বাদামী রঙের নধর ভেড়া বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে, একটা ধামা থেকে ভিজে ছোলা খাচ্ছে।

সুরুচি বলল, শীতুমামা, আপনি কি বলতে চান সেই ভেড়াটাই বলভদ্র মর্দরাজ ?

—আমি কিছুই বলতে চাই না। যা শুনেছি তাই হুবহু জানালুম, বিশ্বাস করা না করা তোমাদের মর্জি।

নুটু বলল, শীতুমামা ভেড়াটা ছোলা খাচ্ছিল কেন ? সেখানে বুঝি ঘাস নেই ?

ইলা বলল, বুঝলি না খোকা, গ্রাম-ফেড মটন তৈরি হচ্ছিল। উঃ আপনি খুব বেঁচে গেছেন শীতুমামা।

এই সময়ে সুরুচির স্বামী বীরেন দত্ত এবং তার সঙ্গে দুটি মহিলা এসে পৌঁছুলেন। খাবারের ঝুড়ি নিয়ে দুজন অনুচরও এল। মহিলাদের একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, আর একজনের বাইশ-তেইশ। দুজনেই অসাধারণ সুন্দরী, যদিও চোখ আর নাক একটু মঙ্গোলীয় ছাঁদের।

বীরেন দত্ত পরিচয় করিয়ে দিল—ইনি হচ্ছেন সুকোমল গুপ্তর শাশুড়ী ঠাকরুন মিসেস মায়াবতী মর্দরাজ, আর ইনি সুকোমলের স্ত্রী মিসেস মোহিনী গুপ্ত। আমাদের আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে, এঁরা অনেক রকম খাবার তৈরি করলেন কিনা।

ইলা ফিসফিস করে বলল, শীতুমামা, এই মায়াবীই আপনার সেই তিনি নাকি ?

শীতুমামা বললেন, চুপ চুপ।

নিকুঞ্জ ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, কই, মেজর গুপ্ত এলেন না ?

মধুর কণ্ঠে মোহিনী গুপ্ত বললেন, সুকোমল ? তার কথা আর বলবেন না, পুওর ফেলো। কোথায় উধাও হয়েছে কিছুই জানি না।

আঁতকে উঠে ইলা ফিসফিস করে বলল, কি সর্বনাশ !

মায়াবতী বললেন, মিলিটারী সার্ভিসের মতন ওঁচা চাকরি আর নেই, হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেয়ে কিছু না জানিয়েই চলে গেছে। আপনারা খেতে বসে যান, নয়তো সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মোহিনী আর আমি পরিবেশন করছি।

বীরেন দত্ত বললেন, শীতুমামা, সব জিনিস নির্ভয়ে খেতে পারেন। আপনি মন্ত্র নিয়েছেন, নিষিদ্ধ মাংস এখন আর খান না, তাই এঁরা চিকেন বাদ দিয়েছেন। কাটলেট ফ্রাই পাই চপ সিককাবাব সবই পবিত্র ভেড়ার মাংসে তৈরী, এঁদের স্পেশিয়ালিটিই হল ভেড়া হেঁ হেঁ হেঁ, এঁরা কামরূপ-কামিখ্যার মহিলা কিনা।

ইলা বলল, ওরে মা রে !

নিকুঞ্জ ঘোষ বললেন, কই আপনারা কিছু নিলেন না ?

মায়াবতী স্মিতমুখে বললেন, আমরা একটু আগেই খেয়েছি।

শিউরে উঠে ইলা বলল ইঁ হিঁ হিঁ, ওরে বাবা রে !

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সুরুচি বলল, আমার গা গুলুচ্ছে, গঙ্গার ধারে বসি গিয়ে।

ঊর্মিলা বললেন, আমারও কেমন কেমন বোধ হচ্ছে, আমিও যাই।

ইলাও তার মায়ের সঙ্গে গেল।

বীরেন ব্যস্ত হয়ে পিছনে পিছনে গিয়ে বলল, এঁরা ছ বোতল সোডাও এনেছেন, একটু খাও, নশিয়া কেটে যাবে।

সুরুচি বলল, ও আক থু! রাক্কুসীদের জলস্পর্শ করব না।

বাড়ি ফিরে এসে সব কথা শুনে বীরেন বলল, ছি ছি, কি কেলেঙ্কারি করলে তোমরা! এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী। শীতুমামার গাঁজাখুরী গল্পটা বিশ্বাস করলে! উনি নিজে তো গাণ্ডে পিণ্ডে খেয়েছেন।

১৮৭৮

কাশীনাথের জন্মান্তর

প্রায় দেড় শ বৎসর আগেকার কথা। তখন কলকাতার বাঙালী হিন্দুসমাজে নানারকম পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তার কোনও লক্ষণ রাঘবপুর গ্রামে দেখা দেয় নি। কাশীনাথ সার্বভৌম সেই গ্রামের সমাজপতি, দিগ্‌গজ পণ্ডিত, যেমন তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান তেমনি বিষয়বুদ্ধি। তাঁর সন্তানরা কলকাতা হুগলি বর্ধমান কৃষ্ণনগর মুরশিদাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তিনি নিজে তাঁর গ্রামেই থাকেন, জমিদারি দেখেন, তেজারতি আর দেবসেবা করেন, একটি চতুষ্পাঠীরও ব্যায় নির্বাহ করেন।

একদিন শেষরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী কালীমাতা আবির্ভূত হয়ে বলছেন, বৎস কাশীনাথ, তোমার বয়স শত বর্ষ অতিক্রম করেছে, তুমি সুদীর্ঘকাল ইহলোকের সুখদুঃখ ভোগ করেছ। আর কেন, এখন দেহরক্ষা কর।

কাশীনাথ বললেন, মা কৈবল্যদায়িনী, এখন তো মরতে পারব না। আমার জাজ্বল্যমান সংসার, চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন। আঠারোটি পুত্রকন্যা, এক শ পঁচিশটি পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী। প্রপৌত্র প্রদৌহিত্র প্রভৃতি বোধ হয় হাজার খানিক জন্মেছিল, তাদের অনেকে মরেছে কিন্তু এখনও প্রচুর জীবিত আছে। তাছাড়া বিস্তর শিষ্য আমার চতুষ্পাঠীতে পড়ে, আমি তাদের পালন ও অধ্যাপনা করি। এই সব স্নেহভাজনদের ত্যাগ করা অতীব কষ্টকর। তোমার জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণের সংকল্প করেছি, তাও উদ্‌যাপন করতে হবে। কলকাতার কিরিস্তানী অনাচার যদি এই গ্রামে প্রবেশ করে তবে আমাকেই তা রোধ করতে হবে। আমার ছেলেদের দিয়ে কিছু হবে না, তারা স্বার্থপর, নিজেদের ধান্দা নিয়েই

ব্যস্ত। বয়স বেশী হলেও আমার শরীর এখনও শক্ত আছে। অতএব কৃপা করে আরও দশটি বৎসর আমাকে বাঁচতে দাও।

কালীমাতা, ভ্রূকুটি করে অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কাশীনাথ সার্বভৌমের চতুর্থ পক্ষের পত্নী রাসেশ্বরী বললেন, আজ যে তোমার তিনটি প্রপৌত্রপুত্র আর পাঁচটি প্রদৌহিত্রপুত্রের অন্নপ্রাশন, তার হুঁশ আছে? তুমি চট করে স্নান আহ্নিক সেরে এস, তোমাকেই তো হোমযাগ করতে হবে।

গঙ্গায় স্নান করে এসে কাতরকণ্ঠে কাশীনাথ বললেন, সর্বনাশ হয়েছে গিন্নী, কালসর্প আমাকে দংশন করেছে, আমার মৃত্যু আসন্ন। মা করালবদনী, এ কি করলে, হায় হায়, সংকল্পিত কর্ম সমাপ্ত না হতেই আমাকে পরলোকে পাঠাচ্ছ!

শাস্ত্রে বলে, যার যেমন ভাবনা তার তেমনি সিদ্ধিলাভ হয়। কাশীনাথ যদি শ্রীরামপুরের পাদরীদের কবলে পড়ে খ্রীষ্টান হতেন তবে মৃত্যুর পর শেষবিচারের প্রতীক্ষায় তাঁকে সুদীর্ঘ কাল জড়ীভূত হয়ে থাকতে হত, সরীসৃপাদি যেমন শীতকালে থাকে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, সেজন্য তাঁর পারলৌকিক পরিণাম অবিলম্বে সংঘটিত হল।

মৃত্যুর পরেই কাশীনাথ উপলব্ধি করলেন, তিনি সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে শূন্যে অবস্থান করছেন, তাঁর প্রাণহীন দেহ অঙ্গনে তুলসী-মঞ্চের সম্মুখে পড়ে আছে। তাঁর পত্নী আর আত্মীয়বর্গ চারিদিকে বিলাপ করছেন, প্রতিবেশীরা বলছেন, ওঃ, একটা ইন্দ্রপাত হল! ক্ষণকাল পরেই তিনি প্রচণ্ড বেগে ব্যোমমার্গে দক্ষিণ দিকে বাহিত হয়ে যমলোকে উপনীত হলেন।

যম বললেন, এস হে কাশীনাথ। তোমার সুকৃতি-দুষ্কৃতির বিচার এবং তদুপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, সংক্ষেপে বলছি শোন।

পুণ্যকর্মের তুলনায় তোমার পাপকর্ম অল্প। রামগতি ভট্টাচার্যের জমির কিয়দংশ তুমি অন্যায় ভাবে দখল করেছিলে, তিন বার আদালতে মিথ্যা হলফ করেছিলে, প্রথম ও মধ্য বয়সে বন্ধুপত্নী ও বধূস্থানীয় কয়েক জনের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করেছিলে, মূষিকের ন্যায় অজস্র সন্তান উৎপাদন করেছিলে, অন্তিম কাল পর্যন্ত বিষয়চিন্তায় মগ্ন ছিলে। এ ছাড়া আর যা করেছ সবই সৎকার্য। নিয়মিত দুর্গোৎসবাদি করেছ, গঙ্গাস্নান তীর্থভ্রমণ বারব্রতাদি এবং ব্রাহ্মণের যাবতীয় কর্তব্য পালন করেছ, কদাপি অখাদ্য ভোজন কর নি। দুষ্কৃতির জন্য তুমি পঞ্চাশ বৎসর নরকবাস করবে, তার পর পুণ্যকর্মের ফল স্বরূপ এক শত বৎসর স্বর্গবাস করবে। আচ্ছা, এখন যাও, কর্মফল ভোগ কর গিয়ে।

নির্দিষ্ট কাল নরকভোগ আর স্বর্গভোগের অন্তে কাশীনাথ পুনর্বার যমসকাশে আহূত হলেন। যম বললেন, ওহে কাশীনাথ, তোমার প্রাক্তন কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হয়েছে, এখন তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। বিধাতা তোমার উপর প্রসন্ন, তুমি অভীষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ করতে পারবে। বল, কি প্রকার জন্ম চাও, ধনী বণিকের বংশধর হয়ে, দরিদ্র জ্ঞানী ধর্মাত্মার পুত্র রূপে, না শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে ?

কাশীনাথ উত্তর দিলেন, ধর্মরাজ, মৃত্যুকালে আমার অনেক কামনা অতৃপ্ত ছিল। দয়া করে এই ব্যবস্থা করুন যাতে আমার বর্তমান বংশধরের গৃহেই প্রত্যাবর্তন করতে পারি। আমার প্রপৌত্রের পুত্র শ্রীমান ভবানীচরণ আমার অতিশয় স্নেহভাজন ছিল, তারই সন্তান করে আমাকে ধরাধামে পাঠান।

যম বললেন, কি বলছ হে কাশীনাথ! জীবিত কালেই তুমি অধস্তন পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত দেখেছিলে। তোমার মৃত্যুর পর দেড় শ

বৎসর কেটে গেছে, তাতে আরও ছ পুরুষ হয়েছে এখন যে বংশধর সে তোমার সপিণ্ডও নয়, তার সঙ্গে তোমার কতটুকু সম্পর্ক? তার পুত্র হয়ে জন্মালে তোমার কি লাভ হবে? আরও তো ভাল ভাল বংশ আছে।

কাশীনাথ বললেন, প্রভু, দয়া করে সেই অধস্তন একাদশসংখ্যক বংশধরের গৃহেই আমাকে পাঠিয়ে দিন। ব্যবধান যতই থাকুক, সে আমার তথা শ্রীমান ভবানীচরণের সন্তান অতীব স্নেহের পাত্র। তাকে দেখবার জন্য আমি উৎকণ্ঠ হয়ে আছি।

—তুমি তাকে চিনবে কি করে? তোমার বর্তমান স্মৃতি তো থাকবে না, জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র শিশু রূপে প্রসূত হয়ে তুমি ক্রমে ক্রমে বড় হবে, জ্ঞানার্জনও করবে, কিন্তু বিগত কালের সঙ্গে তোমার নবজীবনের যোগ থাকবে না।

—প্রভু, আমার প্রার্থনাটি অবধান করুন। নারীগর্ভে ন মাস দশ দিন বাস করার পর শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হতে আমি চাই না। জ্ঞানবান জাতিস্মর করেই আমাকে পাঠিয়ে দিন।

—মরবার সময় তোমার বয়স এক শ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হয়েছিল। সেই বয়স নিয়েই জন্মাতে চাও নাকি?

—আজ্ঞে না। জরাজীর্ণ স্থবির হয়ে যদি পৃথিবীতে যাই তবে নবজন্ম ক দিন ভোগ কয়ব? আমাকে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের যুবা করে পাঠিয়ে দিন।

—তোমার আকাঙ্খা অতি অদ্ভুত। গর্ভবাস করবে না, যুবা রূপে নবজন্ম লাভ করবে, পূর্বস্মৃতি বিদ্যমান থাকবে, বর্তমান বংশধরের গৃহে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হবে। এই তো তুমি চাও?

—আজ্ঞে হাঁ।

—আচ্ছা, তাই হবে। দেখাই যাক না এর ফল কি হয়। তোমা র গোত্র কি?

—ভরদ্বাজ।

যমরাজ মুহূর্তকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন, তার পর বললেন, ধরাধামে অনেক সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। তুমি যদি স্বাভাবিক নিয়মে শিশু রূপে ভূমিষ্ঠ হতে তবে ক্রমে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যেতে। কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব সমাজে হঠাৎ অবতরণের ফলে সংকটে পড়বে। তোমার অসুবিধা যাতে অত্যধিক না হয় তার জন্য আমি যথাসম্ভব ব্যবস্থা করছি।

যম তাঁর এক অনুচরকে বললেন, আজ দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এই জীবাত্মা ত্রিশ বৎসরের যুবা রূপে ধরাধামে ফিরে যাবে। একে পশ্চিম বঙ্গের আধুনিক ভাষা শিখিয়ে দাও, সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ অপভ্রষ্ট ইংরেজী আর হিন্দীও। বর্তমান কালের উপযুক্ত পরিচ্ছদ, নিতান্ত প্রয়োজন অন্যান্য বস্তু, এবং প্রচুর অর্থও একে দেবে। একটি নিষ্ক্রান্তি বটিকাও দেবে। তার পর কলিকাতা নগরীতে নিয়ে গিয়ে শ্রীমধুসূদন রোডে তিন নম্বর বাড়ির ফটকের সামনে একে সুপ্ত অবস্থায় রেখে দেবে। ওহে কাশীনাথ, তোমার বংশধর চক্রধর মুখুজ্যের কাছে তোমাকে পাঠাচ্ছি। তোমার পূর্বনামই বজায় থাকবে। যদি দেখ যে বর্তমান সমাজব্যবস্থা তোমার পক্ষে কষ্টকর, কিছুতেই তুমি সইতে পারছ না, তবে নিষ্ক্রান্তি বটিকাটি খেয়ো। তা হলে তৎক্ষণাৎ যমলোকে ফিরে আসবে এবং অবিলম্বে পুনর্বার সনাতন রীতিতে জন্মগ্রহণ করবে।

চক্রধর মুখুজ্যে ধনী লোক, বাস্তুবিবর্ধন করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তিন নম্বর শ্রীমধুসূদন রোডে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি। সকালে আটটার আগে তিনি বিছানা ছেড়েওঠেন না, কিন্তু আজ ভোর বেলায় তাঁর স্ত্রী সুরূপা ঠেলে দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। চক্রধর জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

—নীচে গোলমাল হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না? বারান্দায় দাঁড়িয়ে খোঁজ নাও কি হয়েছে। আমার বাপু ভয় করছে।

চক্রধর বারান্দা থেকে দেখলেন গেটের সামনে অনেক লোক জমা হয়ে কলরব করছে। প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে লালবাহাদুর?

দারোয়ান লালবাহাদুর বলল, কে একজন বাবু ফটকের সামনে রাস্তার উপর পড়ে আছে কি মরে গেছে বোঝা যাচ্ছে না।

নেমে এসে চক্রধর দেখলেন, তাঁর বাড়ির ফটকের ঠিক বাইরে একটা চামড়ার ব্যাগ মাথায় দিয়ে আগন্তুক বেহুঁশ হয়ে শুয়ে আছে। বার কতক জোরে ঠেলা দিতেই লোকটি মিটমিট করে তাকাল তার পর আস্তে আস্তে উঠে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলল, তারা ব্রহ্মময়ী করালবদনী, কোথায় আনলে মা?

চক্রধর বললেন, কে হে তুমি? এখন নেশা ছুটেছে? কি খেয়েছিলে, মদ না চণ্ডু?

—আমি শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায় সার্বভৌম, আবার এসে পৌঁছেছি। তুমিই চক্রধর? শ্রীমান ভবানীচরণের বংশধর? আহা, কত বড়টি হয়েছ! ঘরে চল বাবাজী, সব কথা বলছি।

কাশীনাথের আত্মকথা শুনে চক্রধর স্থির করলেন, লোকটা নেশাখোর নয়, মিথ্যাবাদী জুয়াচোরও নয়, কিন্তু এর মাথা খারাপ। প্রশ্ন করলেন, তোমার ওই ব্যাগে কি আছে?

—তা তো জানি না, তুমিই খুলে দেখ। এই যে, আমার পইতেতে চাবি বাঁধা রয়েছে, খুলে নাও।

চক্রধর ব্যাগ খুললেন। গোটাকতক ধুতি গেঞ্জি পাঞ্জাবি, একটা এণ্ডির চাদর, একজোড়া চটি, একটা গামছা, আরশি চিরুনি ইত্যাদি। নীচে একটা পোর্টফোলিও। সেটা খুলে চক্রধর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, প্রায় পাঁচ লাখ টাকার গভর্নমেণ্ট কাগজ এবং ভাল ভাল শেয়ার, নগদ দু হাজার টাকার নোট আর দশ টাকার আধুলি সিকি আনি ইত্যাদি।

—সব তোমারই নামে দেখছি। কি করে পেলে ?

—কিছুই জানি না বাবাজী, সবই জগদম্বার লীলা আর যমরাজের ব্যবস্থা।

চক্রধর অনেক ক্ষণ ভাবলেন। লোকটি পাগল হলেও গুছিয়ে বলে। একে হাতছাড়া করা চলবে না, বাড়িতেই রাখতে হবে, চিকিৎসাও করাতে হবে। বয়স তো বেশী নয়, বড় জোর ত্রিশ। তাঁর একমাত্র মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর ভাইঝি চন্দনা তো রয়েছে! এই কাশীনাথের সঙ্গে বিয়ে দিলে সেই বাপ-মা-মরা মেয়েটার একটা চমৎকার গতি হয়ে যায়। পাঁচ লাখ টাকার ইনভেস্টমেণ্ট কি সোজা কথা! লোকটা যদি তিন বৎসর আগে আসত তবে চক্রধর নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতেন।

চক্রধর বললেন, শোন হে কাশীনাথ। তুমি আমার পূর্বপুরুষ হলেও আপাতত আমার চাইতে অনেক ছোট, তোমার বয়স বোধ হয় ত্রিশ হবে, আর আমার হল গিয়ে ষাট। তোমার ইতিহাস আমি জানলুম, কিন্তু আর কাকেও ব'লো না, লোকে তোমাকে পাগল ভাববে। তুমি আমার জ্ঞাতি, ছেলেবেলায় তোমাদের পাড়াগাঁ থেকে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পালিয়েছিলে, এখন সন্ন্যাসে অরুচি হওয়ায় আমার আশ্রয়ে এসেছ, এই তোমার পরিচয়। তুমি আমাকে বলবে কাকাবাবু, আমি তোমাকে বলব কাশী বাবাজী। তোমার সম্পত্তির কথা খবরদার কাকেও বলবে না, বুঝলে ?

কাশীনাথ বললেন, হাঁ, বুঝেছি। কিন্তু তোমার বাড়িতে আমি থাকব কি করে ? তুমি তো দেখছি ম্লেচ্ছ হয়ে গেছ। পেঁয়াজের গন্ধ পাচ্ছি, পাশের জমিতে মুরগি চরছে। একটি প্রৌঢ়াকে দেখলুম, চটি জুতো পরে চটাং চটাং করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, ঘোমটা নেই, প্যাটপ্যাট করে আমার দিকে চাইল।

—উনি তোমার কাকীমা।

—ও, তা বেশ। কিন্তু স্ত্রীলোক জুতো পরে কেন ? ঘোর কলি।

—ঠিক বলেছ বাবাজী, ঘোর কলি। এই কলিযুগের সঙ্গেই তোমাকে মানিয়ে চলতে হবে।

—তুমি বোধ হয় মুসলমান বাবুর্চীর রান্না খাও? তা আমি মরে গেলেও খেতে পারব না।

—না না, বাবুর্চী আছে বটে, কিন্তু মুসলমান নয়, হরিজন, জাতে চামার।

—রাধামাধব! আমি স্বপাকে খাব, আজ শুধু ফলার। আমার থাকবার আলাদা ব্যবস্থা করে দাও।

—বেশ তো, আমার বাড়ির নীচের তলায় পূব দিকের অংশে তুমি থাকবে, একবারে আলাদা আর নিরিবিলি।

চক্রধর ডাকলেন, চন্দনা, ও চন্দনা।

একটি মেয়ে ঘরে এল। চক্রধর বললেন, এটি আমার ভাইঝি। প্রণাম কর্ রে, ইনি তোর কাশী দাদা, দূর সম্পর্কে আমার ভাইপো।

চন্দনা প্রণাম করে চলে গেল। কাশীনাথ বললেন তোমাদের কাণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। মেয়েটার মাথায় সিঁদুর নেই কেন? কপাল পুড়েছে নাকি?

চক্রধর বললেন, না না, ওর বিয়েই হয়নি। খুব ভাল মেয়ে, বি এ. পাস করেছে।

—দুর্গা দুর্গা! এত বড় ধাড়ী মেয়ের বিবাহ হয় নি? বিবি বানাচ্ছ দেখছি।

—আচ্ছা কাশীনাথ, তোমার বিবাহের মতলব আছে তো?

—আছে বইকি। একজন ভাল ঘটক লাগাও।

—আমার ভাইঝি এই চন্দনাকে বিয়ে কর না?

—তুমি উন্মাদ হলে নাকি চক্রধর? এক গোত্রে বিবাহ হবে কি করে? তা ছাড়া ও রকম বেয়াড়া স্ত্রী আমার পোষাবে না। সদ্‌বংশের লজ্জাবতী নিষ্ঠাবতী মেয়ে চাই। বিদ্যার দরকার নেই, রান্না

আর ঘরকন্নার সব কাজ জানবে, বারব্রত পালন করবে, তোমার গিন্নী আর ভাইঝির মতন ধিঙ্গী হলে চলবে না।

—মুশকিলে ফেললে কাশীনাথ। তুমি যেরকম পাত্রী চাও তেমন মেয়ে ভদ্র ঘরে আজকাল লোপ পেয়েছে। আচ্ছা, যতটা সম্ভব তোমার পছন্দসই পাত্রীর জন্যে আমি চেষ্টা করব। এখন তুমি স্নান আর সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে আহারাদি কর।

চক্রধর মুখুজ্যে ভাবতে লাগলেন। লোকটা পাগল, কিন্তু কথা-বার্তা অসংলগ্ন নয়, সেকেলে মতিগতি হলেও বুদ্ধিমান বলা চলে। আশ্চর্য ব্যাপার, কাশীনাথ অত টাকা পেল কোথা থেকে? যাই হক, ওকে আটকে রাখতে হবে, সম্পত্তি যাতে আমার কাছেই গচ্ছিত রাখে তার ব্যবস্থা করতে হবে। চন্দনার সঙ্গে বিয়ে হলে খাসা হত, একবারে আমার হাতের মুঠোয় এসে পড়ত। ওর পছন্দমত পাত্রীই বা পাই কোথায়? সেকেলে নিষ্ঠাবতী মেয়ে হবে, পাগল স্বামীকে সামলাবে, আবার আমার বশে চলবে। হঠাৎ চক্রধরের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। আচ্ছা, গয়েশ্বরীর সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না? তার তো খুব নিষ্ঠা আর আচার-বিচার, বুদ্ধি খুব, আমাকেও খাতির করে, সব বিষয়ে আমার মত নেয়। টাকার লোভে কাশীনাথকে বিয়ে করতে হয়তো রাজী হবে। কিন্তু বয়সের তফাতটা যে বড্ড বেশী।

গয়েশ্বরী সম্পর্কে চক্রধরের ভাগনী, জেঠতুতো বোনের মেয়ে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হলেও এখনও তিনি কুমারী। বাপ মা অল্প বয়সে মারা গেলে চক্রধরই অভিভাবক হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে ভাগনীর তত্ত্বাবধান বেশী দিন করতে হয় নি। গয়েশ্বরী অসাধারণ মহিলা, অল্প লেখাপড়া আর নানা রকম শিল্পকর্ম শিখেই তিনি স্বাবলম্বিনী হলেন। তাঁর নারীবস্ত্রশালা খুব লাভের ব্যবসা। পাঁচ জন

উদ্‌বাস্তু মেয়ে আর দু জন দরজী গয়েশ্বরীর দোকানে কাজ করে, তিনটে সেলাইএর কল চলে, খদ্দেরের খুব ভিড়। চক্রধর অনেক বার ভাগনীর বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গয়েশ্বরী বলেছেন, ও সব হবে না, আমি কত কষ্ট করে ব্যবসাটি খাড়া করেছি, আর এখন একটা উটকো মিনসে এসে কর্তামি করবে তা আমি সইব না। চক্রধর স্থির করলেন, খুব সাবধানে কথাটা পাত্র আর পাত্রীর কাছে পাড়তে হবে।

দৈবক্রমে চার দিন পরেই কাশীনাথ আর গয়েশ্বরীর একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল।

চক্রধরের বাড়ির একতলায় পূর্বদিকের অংশ কাশীনাথ স্বতন্ত্র হয়ে বাস করতে লাগলেন। তিনি স্বপাকে খান, চক্রধরের একজন পুরনো চাকর তাঁর ফরমাশ খাটে। একদিন সকালবেলা প্রাতঃকৃত্য সেরে কাশীনাথ গড়িয়াহাট মার্কেটে বাজার করতে গেছেন। জামাই-ষষ্ঠীর জন্যে সেদিন বাজারে খুব ভিড়। কাশীনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভাবছিলেন, এ যে ঘোর কলি, বারো আনা সের বেগুন! সব জিনিসই অগ্নিমূল্য, দেশে মন্বন্তর হয়েছে নাকি? কাশীনাথ দুটি কাঁচকলা কিনবেন বলে ভিড়ের মধ্যে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছিলেন এমন সময় অকস্মাৎ থপাস করে গয়েশ্বরীর সঙ্গে তাঁর কলিশন হল।

কাশীনাথের অপরাধ নেই। তিনি রোগা বেঁটে মানুষ, পিছনের ভিড়ের ঠেলা সামলাতে না পেরে সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় গয়েশ্বরী উলটো দিক থেকে আসছিলেন। তিনি স্থূলকায়, সুতরাং তাঁর দেহই পতনোন্মুখ কাশীনাথের ধাক্কা প্রতিহত হল। গয়েশ্বরী পড়ে গেলেন না, অত্যন্ত রেগে গিয়ে

বললেন, আ মরণ ছোঁড়া, নেশা করেছিস নাকি ? ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে ঢলে পড়িস এতদূর আস্পর্ধা !

কাশীনাথ বললেন, ক্ষমা করবেন ঠাকরুন, ভিড়ের চাপে এমন হল, আমি ইচ্ছে করে অপরাধ করি নি ।

গয়েশ্বরী বললেন, এক শ বার অপরাধ করেছিস, হতভাগা বেহায়া বজ্জাত !

এক দল লোক গয়েশ্বরীর পক্ষ নিয়ে এবং আর এক দল কাশীনাথের হয়ে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ করল। গয়েশ্বরীকে অনেকেই চেনে। একজন টিকিধারী পুরুত ঠাকুর বললেন, ও গয়া দিদি, ব্যাপারটি তো সোজা নয়, তোমাকে প্রায়শ্চিত্তির করতে হবে ।

চার-পাঁচ জন চিৎকার করে বলতে লাগল, নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি লোকটা কে হে, পাড়া-গাঁ থেকে এসেছ বুঝি ! ধাক্কা লাগাবার আর মানুষ পেলে না, গয়েশ্বরী দেবীর গায়ে ঢলে পড়লে কোন্ আক্কেলে ? এক্ষুনি বার কর পঞ্চাশটি টাকা, প্রায়শ্চিত্তিরের খরচ, নইলে তোমার নিস্তার নেই ।

এই সময়ে চক্রধরের একজন চাকর এসে পড়ায় কাশীনাথ বেঁচে গেলেন। পুরুত ঠাকুরটি বললেন, তা বেশ তো, গয়া দিদি আর এই কাশীনাথ ছোকরা দুজনেই যখন চক্রধরবাবুর আপনার লোক তখন তিনিই একটা মীমাংসা করবেন ।

চক্রধর মুখুজ্যে বোঝেন যে তপ্ত অবস্থায় ঘা দিলেই লোহার সঙ্গে লোহা জুড়ে যায়। তিনি কালবিলম্ব না করে প্রথমে তাঁর ভাগনীকে প্রস্তাবটি জানালেন। গয়েশ্বরী আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি মামা ? চক্রধর সবিস্তারে জানালেন, লোকটা বাতিকগ্রস্ত হলেও ভালমানুষ, সহজেই পোষ মানবে, আর তার বিস্তর টাকাও আছে। বয়স কম তাতে হয়েছে

কি ? আজকাল ও সব কেউ ধরে না। গয়েশ্বরী অতি বুদ্ধিমতী মহিলা, মামার প্রস্তাবটি সহজেই তাঁর হৃদয়ংগম হল। পরিশেষে বললেন, তা ও ছোঁড়া যদি রাজী হয় তো আমার আর আপত্তি কি, লোকে কি বলবে তা আমি গ্রাহ্য করি না।

কাশীনাথ অত সহজে বাগ মানলেন না। বললেন, কি পাগলের মতন বলছ চক্রধর কাকা! গয়েশ্বরীর বয়েস যে আমার প্রায় ডবল। সেকালে কুলীন কন্যার অমন বিবাহ হত বটে, কিন্তু আমি তো পেশাদার পাণিগ্রাহী নই।

চক্রধর বললেন, বেশ করে সব দিক ভেবে দেখ কাশী বাবাজী। মেয়েটি অতি নিষ্ঠাবতী, সব রকম বার ব্রত পালন করে, মায় আমড়া-ষষ্ঠী পর্যন্ত। দরজীর দোকান চালায় বটে, কিন্তু ওর চালচলন তোমারই মতন সেকেলে। দোকানটা তোমারই হাতে আসবে, তোমার আয় বেড়ে যাবে!

—কিন্তু বয়েসের যে আকাশ-পাতাল তফাত।

—খুব ঠিক কথা। তোমার ইতিহাস যা বলেছ তাতে তোমার আসল বয়েস এখন দু শ পঞ্চাশের বেশী, আর গয়েশ্বরীর মোটে উনপঞ্চাশ। তোমার তুলনায় ও তো খুকী। আরও বুঝে দেখ, তোমার শরীরটাই জোয়ান, কিন্তু মনটা দু সেঞ্চুরি পিছিয়ে আছে। গয়েশ্বরীর সঙ্গে তোমার মনের মিল সহজেই হবে। আরও একটা কথা, আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন, মেয়েদের পূর্ণযৌবন হয় পঞ্চাশের পরে। মর্তমান কলা খেয়েছ তো? পাকলেই সুতার হয় না। যার খোসাটি কালচিটে হয়ে কুঁচকে গেছে, শাঁসটি মজে গিয়ে একটু নরম হয়েছে, সেই পরিপক্ব কলাই অমৃত। মেয়েরাও সেই রকম। এখনকার পঞ্চাশীর কাছে তোমাদের সেকেলে ষোড়শী-টোড়শী দাঁড়াতেই পারে না।

চক্রধরের যুক্তি শুনে কাশীনাথ ধীরে ধীরে বশে এলেন। একটু চিন্তা করে বললেন, আমি যখন মারা গিয়েছিলাম তখন আমার চতুর্থ

পক্ষের স্ত্রী রাসেশ্বরীর বয়েস ছিল তোমার ভাগনী গয়েশ্বরীরই মতন। এখন মনে হচ্ছে রাসেশ্বরীই গয়েশ্বরী হয়ে ফিরে এসেছে। আচ্ছা, তুমি ঘটক লাগাতে পার।

—আমিই তো ঘটক। গয়েশ্বরীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সে রাজী আছে। এখন পাকা দেখাটা হয়ে গেলেই বিবাহ হতে পারবে। আজ বিকেল বেলা তুমি তার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ ক'রো।

—তোমারও উপস্থিত থাকা চাই চক্রকাকা।

—না না, তা দস্তুর নয়, শুধু তোমরা দুজনে আলাপ করবে।

কাশীনাথকে দেখে গয়েশ্বরী একটু হেসে বললেন, কি হে ছোকরা, আমাকে মনে ধরেছে তো?

কাশীনাথ নীরবে উপরে নীচে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

—তোমার নাকি পাঁচ লাখ টাকা আছে? শোন কত্তা, বিয়েটা চুকে গেলেই সব টাকা আমার হাতে দেবে। তুমি যে রকম হ্যালাখ্যাপা মানুষ তোমার হাতে টাকা থাকলে গেছি আর কি, লোক সব ঠকিয়ে নেবে। আমার মামাবাবুটিকেও বিশ্বাস করি না।

কাশীনাথ বললেন, ভয় নেই গয়েশ্বরী ঠাকরুন, আমাকে ঠকাতে পারে এমন মানুষ ভূভারতে নেই। যা মতলব করেছি বলি শোন। মেয়েছেলের দোকানদারি ভাল নয়, বিয়ের পর তোমার দোকানটা বেচে দেব। তার টাকা আর আমার যা আছে তা দিয়ে তেজারতি করব। চক্রকাকা বলেন আজকাল জমিদারি কেনা যায় না। তোমার কোনও অভাব রাখব না, এক গা গহনা গড়িয়ে দেব। এই কলকাতা হচ্ছে অসুরের শহর, ভয়ংকর জায়গা, আমরা রাঘবপুর গ্রামে গিয়ে বাস করব। বাড়ি বাগান পুকুর গোয়াল সব হবে, একটি দেবমন্দির আর চতুষ্পাঠীও হবে।

গয়েশ্বরী হাত নেড়ে ঝংকার করে বললেন, আ মরি মরি, কি মতলবই ঠাউরেছ ঠাকুর মশাই! পাগল কি আর গাছে ফলে, তুমি একটি আস্ত উন্মাদ পাগল। শোন হে ছোকরা, তোমার স্ত্রী হলেও আমি বয়সে বড়, গুরুজন তুল্যি। আমার হেপাজতে তুমি থাকবে, আমার বশেই তোমাকে চলতে হবে।

কাশীনাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, তার পর 'তারা ব্রহ্মময়ী রক্ষা কর মা' বলেই চলে গেলেন।

সন্ধ্যাহ্নিকের পর কাশীনাথ ইষ্টদেবীকে নিজের অবস্থা নিবেদন করলেন।—এ কি বিপদে ফেললে মা! তোমারই বা দোষ কি, নিজের কুবুদ্ধিরই ফল ভোগ করছি। পৃথিবীতে কলি যে এত প্রবল হয়েছে তা তো ভাবতে পারি নি। ব্রাহ্মণের বাড়ি বাবুর্চী রাঁধছে, মুরগি ধরছে, বুড়ী মাগীরা জুতো পরে খটমটিয়ে চলছে, ধাড়ী মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। ছোট লোকের আস্পর্ধা বেড়ে গেছে, ব্রাহ্মণকে গ্রাহ্য করে না, সামনেই বিড়ি খায়। এখানে জাত ধর্ম কিছুই রক্ষা পাবে না। ওই গয়েশ্বরী একটা ভয়ংকরী খাণ্ডার মাগী, ওকে বিয়ে করলে আমার নরকভোগের আর বাকী থাকবে না। চক্রধর একটা পাষণ্ড কুলাঙ্গার, আমার বংশধর হতেই পারে না, যমরাজ নিশ্চয় ভুল করে ওর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। কালী কৈবল্যদায়িনী, উপায় বাতলাও মা।

শেষরাত্রে কাশীনাথ স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী আবির্ভূত হয়ে হাত নেড়ে বলছেন, সরে পড় কাশীনাথ। তখনই কাশীনাথের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বুঝলেন, এই পাপ সংসারে ফিরে আসা তাঁর মস্ত বোকামি হয়েছে। মন স্থির করে কাশীনাথ তখনই যমদত্ত সেই নিষ্ক্রান্তি বটিকাটি গিলে ফেললেন এবং অবিলম্বে যমলোকে প্রয়াণ করলেন।

সকালবেলা কাশীনাথকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, থ্রম্বোসিস। এত কম বয়সে বড় একটা দেখা যায় না, তবে পাগলদের এরকম হয়ে থাকে।

চক্রধর তখনই কাশীনাথের পইতে থেকে চাবি নিতে গেলেন, কিন্তু পেলেন না। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা দখল করতে গেলেন কিন্তু, তাও খুঁজে পেলেন না। নিশ্চয় গয়েশ্বরী ভোগা দিয়ে সেটা হাতিয়েছে এই ভেবে তিনি ভাগনীর বাড়ি ছুটলেন। দুজনের তুমুল ঝগড়া হল কিন্তু ব্যাগ পাওয়া গেল না। কাশীনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যমদত্ত সম্পত্তি যম-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

১৮৭৮

গগন চটি

হাতিবাগানের দরজী আবুবকর মিঞা আর তার বউ রমজানী বিবি সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে ঈদের চাঁদ দেখছিল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস রমজানীর নজরে পড়ল। সে তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, ও মিঞা, আসমানের মধ্যিখানে ছোট্ট কাটারির মতন জ্বলজ্বল করছে ওটা কি গো? আবুবকর অনেকক্ষণ ঠাহর করে বলল, কাটারি নয় রে ওটা পয়জার, দেখছিস না তালতলার চটির মতন গড়ন। বোধ হয় মল্লিকবাবুরা ফানুস উড়িয়েছে।

আবুবকরের অনুমান ঠিক নয়, কারণ পরদিন এবং তার পর রোজই সন্ধ্যার পর আকাশে দেখা গেল। এই অদ্ভুত বস্তু ফানুসের মতন এদিক ওদিক ভেসে বেড়ায় না, আকাশে স্থির হয়েও থাকে না, চাঁদ আর গ্রহ-নক্ষত্রর মতন এর উদয় অস্ত হয়। উদীয়মান জ্যোতিঃসম্রাট তারক সান্যালকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ওটা রাহু বলেই মনে হচ্ছে, মহাবিপদের পূর্বলক্ষণ। এই কথা শুনে প্রবীণ জ্যোতিঃসম্রাট শশধর আচার্য বললেন, তারকটা গোমূর্খ, রাহু হলে মুণ্ডুর মতন গড়ন হত না? ওটা কেতু, ল্যাজের মতন দেখাচ্ছে। অতি ভীষণ দুর্নিমিত্ত সূচনা করছে। তোমাদের উচিত গ্রহশান্তির জন্য যাগ করা আর অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসংকীর্তন।

একটা আতঙ্ক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। খবরের কাগজে নানারকম মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। একজন লিখলেন, বোধ হয় উড়ন চাকতি, ধাক্কা লেগে তুবড়ে গিয়ে চটিজুতোর মতন দেখাচ্ছে। আর একজন লিখলেন, নিশ্চয় ল্যাজকাটা ধূমকেতু সূর্যের আর একটু

কাছে এলেই নূতন ল্যাজ গজাবে, তার ঝাপটায় পৃথিবী চুরমার হতে পারে।

প্রবীণ হেডপণ্ডিত কুঞ্জবিহারী তলাপাত্র কাগজে লিখলেন, এই আকাশচারী ভয়ংকর পাদুকা কোন্ মহাপুরুষের? দেখিয়া মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। মধ্যশিক্ষাপর্ষদের খামখেয়াল দেখিয়া সেই স্বর্গস্থ তেজস্বী মহাত্মার ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছে, তাই তাঁহার এক পাটি বিনামা গগনতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই উড্ডুক্কু গগন-চটি শীঘ্রই শিক্ষাপর্ষদের মস্তকে নিপতিত হইবে।

সরকার-বিরোধী দলের অন্যতম মুখপাত্র বিরূপাক্ষ মণ্ডল লিখলেন, না, বিদ্যাসাগরের চটি নয়, তার শুঁড় এত বড় ছিল না। এই আসমানী পয়জার হচ্ছে স্বর্গস্থ মনীষী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের। যত সব মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতালের কেলেঙ্কারি দেখে তিনি খেপে উঠেছেন, হাতের কাছে অন্য হাতিয়ার না পেয়ে এক পাটি চটি ছেড়েছেন। কর্তারা হুঁশিয়ার।

ভক্তকবি হেমন্ত চট্টরাজ লিখলেন, এই গগন-চটি মানুষের নয়, এ হচ্ছে মূর্তিমান ঐশ রোষ। চুরি ঘুষ ভেজাল মিথ্যাচার ব্যভিচার ভণ্ডামি ইত্যাদি পাপের বৃদ্ধি, রাজ্যসরকারের অকর্মণ্যতা, ধনীদের বিলাসবাহুল্য, ছেলেমেয়েদের সিনেমোন্মাদ, এই সব দেখে নটরাজ চঞ্চল হয়েছেন, প্রলয়নাচন নাচবার জন্য ডান পা বাড়িয়েছেন, তা থেকেই এই রুদ্র চটি গগনতলে খসে পড়েছে। প্রলয়ংকর রুদ্রতাণ্ডব শুরু হতে আর দেরি নেই, জগতের ধ্বংস একবারে আসন্ন। দেশের ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ যদি শীঘ্র ধর্মপথে ফিরে না আসে তবে এই রুদ্ররোষ সকলকেই ব্যাপাদিত করবে।

কিন্তু আনাড়ী লোকদের এই সব জল্পনা শিক্ষিত জনের মনে লাগল না। বিশেষজ্ঞরা কি বললেন? বিশ্বম্ভর কটন মিল, বিশ্বম্ভর ব্যাংক, বিশ্বম্ভরী পত্রিকা ইত্যাদির মালিক শ্রীবিশ্বম্ভর চক্রবর্তী একজন সর্ববিদ্যাবিশারদ লোক, কোনও প্রশ্নের উত্তরে তিনি 'জানি

না' বলেন না। কিন্তু গগন-চটির কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু গম্ভীরভাবে উপর নীচে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়লেন। কয়েকজন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বললেন, এখন কিছু বলা যায় না, তবে নক্ষত্র নয় তা নিশ্চিত, কারণ এর গতিপথ বিষুববৃত্তের ঠিক সমান্তরাল নয়। এই আগন্তুক জ্যোতিষ্কটি গ্রহের মতন বিপথগামী। পুচ্ছহীন ধূমকেতু হতে পারে। তা ভয়ের কারণ আছে বইকি। সাদা চোখে যতই ছোট দেখাক বস্তুটি নিশ্চয় প্রকাণ্ড। দেখা যাক আমাদের কোদাইক্যানাল মানমন্দির আর গ্রীনিচ প্যালোমার ইত্যাদি থেকে কি রিপোর্ট আসে।

রিপোর্ট শীঘ্রই এল, দেশ-বিদেশের সমস্ত বিখ্যাত মানমন্দির থেকে একই সংবাদ প্রচারিত হল। দুর্বোধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাদ দিয়ে যা দাঁড়ায় তা এই।—সূর্যের নিকটতম গ্রহ হচ্ছে বুধ (মার্করি), তার পরে আছে শুক্র (ভিনস), তার পর আমাদের পৃথিবী, তার পর মঙ্গল (মার্স), তার পর বহু দূরে বৃহস্পতি (জুপিটার)। আরও দূরদূরান্তরে শনি (সাটার্ন), ইউরেনস, নেপচুন আর প্লুটো। মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষের মাঝামাঝি পথে প্রকাণ্ড এক ঝাঁক অ্যাস্টারয়েড বা ছোট ছোট খণ্ডগ্রহ সূর্যকে পরিক্রম করে। তারাই একটা হঠাৎ কক্ষভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীর নিকটে এসে পড়েছে। এই খণ্ডগ্রহটি গোলাকার নয়। ভারতীয় জ্যোতিষীরা এর নাম দিয়েছেন গগন-চটি অর্থাৎ হেভেনলি স্লিপার। আপাতত আমরাও সেই নাম মেনে নিলাম। এই গগন-চটির কিঞ্চিৎ স্বকীয় দীপ্তি আছে, তার উপর সূর্যকিরণ পড়ায় আরও দীপ্তিমান হয়েছে। পৃথিবী থেকে এর বর্তমান দূরত্ব পৌনে দু কোটি মাইল, প্রায় দু বৎসরে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। এর আয়তন আর ওজন চন্দ্রের প্রায় দ্বিগুণ। এত বড় অ্যাস্টারয়েডের অস্তিত্ব জানা ছিল না। অনুমান হয়, গোটা

কতক খণ্ডগ্রহের সংঘর্ষ আর মিলনের ফলে উৎপন্ন হয়ে এই গগন-চটি ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। এর উত্তাপ আর স্বকীয় দীপ্তিও সংঘর্ষ- জনিত। এই বৃহৎ অ্যাস্টারয়েড নিকটে আসায় মঙ্গল গ্রহ আর চন্দ্রের কক্ষ একটু বেঁকে গেছে, আমাদের জোয়ার ভাটার সময়ও কিছু বদলেছে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব এখন পর্যন্ত যা আছে তাতে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই, তবে সন্দেহ হচ্ছে গগন-চটি ক্রমেই কাছে আসছে। যদি বেশী কাছে আসে তবে আমাদের এই পৃথিবীর পরিণাম কি হবে তা ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

এই বিবৃতির ফলে অনেকে ভয়ে আঁতকে উঠল, কয়েকজন স্থূলকায় ধনী হার্টফেল করে মারা গেল। অনেকে পেটের অসুখ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি আর হাঁপানিতে ভুগতে লাগল। হিন্দু-ধর্মের নেতৃস্থানীয় স্বামী-মহারাজগণ, মুসলমান মোল্লা-মওলানাগণ এবং খ্রীষ্টীয় পাদরীগণ নিজের নিজের শাস্ত্র অনুসারে হিতোপদেশ দিতে লাগলেন। সাহিত্যিকরা উপন্যাস কবিতা রম্যরচনা প্রভৃতি বর্জন করে পরলোকের কথা লিখতে লাগলেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকের দুশ্চিন্তা দেখা গেল না, বরং গগন-চটির হুজুগে পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা জমে উঠল। শেয়ারবাজারে বিশেষ কোনও তেজমন্দি দেখা গেল না, সিনেমার ভিড়ও কমল না।

কিছুদিন পরেই দফায় দফায় যে জ্যোতিষিক সংবাদ আসতে লাগল তাতে লোকের পিলে চমকে উঠল, রক্ত জল হয়ে গেল। গগন-চটি নামক এই দুষ্টগ্রহ ক্রমশ পৃথিবীর নিকটবর্তী হচ্ছে এবং মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে পরস্পর টানাটানি চলছে। চন্দ্রসমেত পৃথিবী আর গগন-চটি যেন মিলে মিশে তাল-গোল পাকাবার চেষ্টায় আছে। হিসাব করে দেখা গেছে, পাঁচ মাসের মধ্যেই চন্দ্র আর গগন-চটির সংঘর্ষ হবে, তার পর দুটোই হুড়মুড় করে

পৃথিবীর উপর পড়বে। তার ফল যা দাঁড়াবে তার তুলনায় লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা তুচ্ছ। সংঘাতের কিছু পূর্বেই বায়ুমণ্ডল লুপ্ত হবে, সমুদ্র উৎক্ষিপ্ত হবে, সমস্ত প্রাণী রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরবে। চরম ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করণীয় নেই।

বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করলেন—আমাদের করণীয় অবশ্যই আছে। সেকালে বৃদ্ধরা একটি ছড়া বলতেন—If cold air reach you through a hole, Go make your will and mend your soul। কিন্তু এই আগন্তুক গগন-চটি ছিদ্রাগত শীতল বায়ু নয়, মানবজাতির পাপের জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত মৃত্যুদণ্ড, আমাদের সকলকেই ধ্বংস করবে। উইল করা বৃথা, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে আমাদের আত্মার ত্রুটি অবশ্যই শোধন করতে হবে। অতএব সরল অন্তঃকরণে সমস্ত পাপ স্বীকার কর, নিরন্তর প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা কর, সকল শত্রুকে ক্ষমা কর, যে কদিন বেঁচে আছ যথাসাধ্য অপরের দুঃখ দূর কর।

ইহুদী মুসলমান আর বৌদ্ধ ধর্মনেতারাও অনুরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন। আদি-শংকরাচার্যের একমাত্র ভাগিনেয়ের বংশধর ১০০৮শ্রী ব্যোমশংকর মহারাজ একটি হিন্দী পুস্তিকা ছাপিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ কপি বিলি করলেন। তার সার মর্ম এই।—অয় মেরে বচ্চে, হে আমার বৎসগণ, মৃত্যুভয় ত্যাগ কর। আমার বয়স নব্বই পেরিয়েছে, আর তোমরা প্রায় সকলেই আমার চাইতে ছোট, কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কারণ ভবযন্ত্রণার ভোগ বালক-বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই সমান। আমাদের আত্মা শীঘ্রই দেহপিঞ্জর থেকে মুক্তি পেয়ে পরমাত্মায় লীন হবে, এ তো পরম আনন্দের কথা, এতে ভয়ের কি আছে? কিন্তু অশুচি অবস্থায় দেহত্যাগ করা চলবে না, তাতে নরকগতি হবে। তোমরা হয়তো জান, কোনও বড় অপারেশনের আগে রোগীকে উপবাসী রাখা হয় এবং জোলাপ আর এনিমা দিয়ে তার কোষ্ঠ সাফ করা হয়। যখন রোগীর পাকস্থলী

শূন্য, মূত্রাশয়ও শূন্য, সর্ব শরীর পরিষ্কৃত, তখনই ডাক্তার অস্ত্রপ্রয়োগ করেন। শুচিতার জন্য এত সতর্কতার কারণ—পাছে সেপটিক হয়। এখন ভেবে দেখ, অ্যাপেনডিক্স বা হার্নিয়া বা প্রস্টেট ছেদনের তুলনায় প্রাণ-বিসর্জন কত গুরুতর ব্যাপার। মৃত্যুকালে যদি মনে কিছুমাত্র কালুষ্য বা কল্মষ বা কিল্বিষ থাকে তবে আত্মার সেপসিস অনিবার্য। পাপক্ষালন না করেই যদি তোমরা প্রাণত্যাগ কর তবে নিঃসন্দেহে সোজা নরকে যাবে। অতএব আর বিলম্ব না করে সরল মনে লজ্জা ভয় ত্যাগ করে সমস্ত পাপ স্বীকার কর, তাতেই তোমার শুচি হবে। চুপি চুপি বললে চলবে না, জনতার সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে, কিংবা ছাপিয়ে প্রচার করতে হবে, যেমন আমি করছি। ওই পুস্তিকার শেষে তফসিল ক আর খ-এর মৎকৃত যাবতীয় দুষ্কর্মের তালিকা পাবে—কতগুলো ছারপোকা মেরেছি, কতবার লুকিয়ে মুরগি খেয়েছি, কতবার মিথ্যা বলেছি, কতজন ভক্তিমতী শিষ্যার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করেছি—সবই খোলসা করে বলা হয়েছে। তোমরাও আর কালবিলম্ব না করে এখনই পাপক্ষালনে রত হও।

বিলাতে অক্সফোর্ড গ্রুপের উদ্যোগে দলে দলে নরনারী দুষ্কৃতি স্বীকার করতে লাগল, অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশেও অনুরূপ শুদ্ধির আয়োজন হল। ভারতবাসীর লজ্জা একটু বেশী, সেজন্য ব্যোম-শংকরজীর উপদেশে প্রথম প্রথম বিশেষ ফল হল না। কিন্তু সম্প্রতি প্যালোমার মানমন্দির থেকে যে রিপোর্ট এসেছে তার পরে কেউ আর চুপ করে থাকতে পারে না। গগন-চটি আরও কাছে এসে পড়েছে, তার ফলে পৃথিবীর অভিকর্ষ বা গ্রাভিটি কমে গেছে, আমরা সকলেই একটু হালকা হয়ে পড়েছি। আর দেরি নেই, শেষের সেই ভয়ংকর দিনের জন্য প্রস্তুত হও।

মনুমেণ্টের নীচে আর শহরের সমস্ত পার্কে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ চিৎকার করে পাপ স্বীকার করতে লাগল। বড়বাজার থেকে

একটি বিরাট প্রসেশন ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে বেরুল এবং নেতাজী সুভাষ রোড হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করতে লাগল। বিস্তর মান্যগণ্য লোক তাতে যোগ দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে করুণ কণ্ঠে নিজের নিজের দুষ্কর্ম ঘোষণা করতে লাগলেন, কিন্তু ব্যাণ্ডের আওয়াজে তাঁদের কথা ঠিক বোঝা গেল না।

বিলাতী রেডিওতে নিরন্তর বাজতে লাগল—Nearer my God to Thee। দিল্লীর রেডিওতে 'রঘুপতি রাঘব' এবং লখনউ আর পাটনায় 'রাম নাম সচ হৈ' অহোরাত্র নিনাদিত হল। কলকাতায় ধ্বনিত হল—'সমুখে শান্তিপারাবার'। মস্কো রেডিও নীরব রইল, কারণ ভগবানের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সদ্‌ভাব নেই। অবশেষে সোভিএট রাষ্ট্রদূতের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমাদের রাষ্ট্রপতি কমিউনিস্ট প্রজাবৃন্দের আত্মার সদ্‌গতির নিমিত্ত গয়াধামে অগ্রিম পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করলেন।

বৃহৎ চতুঃশক্তি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিএট যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের শাসকবর্গ গত পঞ্চাশ বৎসরে যত কুকর্ম করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে White Book প্রকাশ করলেন এবং একযোগে ঘোষণা করলেন—সব মানুষ ভাই ভাই, কিছুমাত্র বিবাদ নাই। পাকিস্তানের কর্তারা বললেন, য়হ বাত তো ঠিক হৈ, হিন্দী পাকী ভাই ভাই, লেকিন আগে কাশ্মীর চাই।

জগদ্‌ব্যাপী এই প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে শুধু একজনের কোনও রকম চিত্তচাঞ্চল্য দেখা গেল না। ইনি হচ্ছেন হাঠখোলার ভুবনেশ্বরী দেবী। বয়স আশি পার হলেও ইনি বেশ সবলা, সম্প্রতি দ্বিতীয় বার কেদার-বদরী ঘুরে এসেছেন। প্রচুর সম্পত্তি, স্বামী পুত্র কন্যার ঝঞ্ঝাট নেই, শুধু একপাল আশ্রিত কুপোষ্য আছে, তাদের ইনি কড়া শাসনে রাখেন। ভুবনেশ্বরী খুব ভক্তিমতী মহিলা,

গীতগোবিন্দ গীতা আর গীতাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করেছেন। কিন্তু পাড়ার লোকে তাঁকে ঘোর নাস্তিক মনে করে, কারণ তিনি কোনও রকম হুজুগে মাতেন না। তাঁর ভয়ার্ত পোষ্যবর্গ ব্যাকুল হয়ে অনুরোধ করল, কর্তা-মা, গগন-চটি উদয় হয়েছেন, প্রলয়ের আর দেরি নেই। জগন্নাথ ঘাটে সভা হচ্ছে, সবাই পাপ কবুল করছে, আপনিও করে ফেলুন। মন খোলসা হলে শান্তিতে মরতে পারবেন।

ভুবনেশ্বরী ধমক দিয়ে বললেন, পাপ যা করেছি তা করেছি, ঢাক পিটিয়ে সবাইকে তা বলতে যাব কেন রে হতভাগারা? গগন-চটি না ঢেঁকি, আকাশে লাখ লাখ তারা আছে, আর একটা না হয় এল, তাতে হয়েছে কি? তোরা বললেই প্রলয় হবে? মরতে এখন ঢের দেরি রে, এখনই হা-হুতোশ করছিস কেন? ভগবান আছেন কি করতে? আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে'—রবি ঠাকুরের এই গান শুনিস নি? মানুষকেই যদি ঝাড়ে বংশ লোপাট করে ফেলেন তবে ভগবানের আর বেঁচে সুখ কি? লীলাখেলা করবেন কাকে নিয়ে? যা যা, নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমো গে।

কিসে কি হয় কিছুই বলা যায় না। হয় তো ভুবনেশ্বরীর কথায় ত্রিভুবনেশ্বরের একটু চক্ষুলজ্জা হল। হয়তো কার্যকারণ পরম্পরায় প্রাকৃতিক নিয়মেই যা ঘটবার তা ঘটল। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে তিন ইঞ্চি হরফে ছাপা হল—ভয় নেই, দুষ্ট গ্রহ দূর হচ্ছে। বড় বড় জ্যোতিষীরা একযোগে জানিয়েছেন, বৃহস্পতি শনি ইউরেনস আর নেপচুন এই চারটে প্রকাণ্ড গ্রহের সঙ্গে এক রেখায় আসার ফলে গগন-চটির পিছনে টান পড়েছে, সে দ্রুতবেগে পুরাতন কক্ষে নিজের সঙ্গীদের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। অতি অল্পের জন্য আমাদের পৃথিবী বেঁচে গেল।

বিপদ কেটে যাওয়ায় জনসাধারণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, কিন্তু যাঁরা

অসাধারণ তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। দেশের হোমরাচোমরা মান্যগণ্যদের প্রতিনিধিস্থানীয় একটি দল দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নিবেদন করলেন, হুজুর, আমরা যে বিস্তর কসুর কবুল করে ফেলেছি এখন সামলাব কি করে? প্রধানমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের চীফ জস্টিসের মত চাইলেন। তিনি রায় দিলেন, পুলিসের পীড়নের ফলে কেউ যদি অপরাধ স্বীকার করে তবে তা আদালতে গ্রাহ্য হয় না। গগন-চটির আতঙ্কে লোকে যা বলে ফেলেছে তারও আইনসম্মত কোনও মূল্য নেই, বিশেষত যখন স্ট্যাম্প কাগজ কেউ অ্যাফিডাভিট করে নি।

বৃহৎ চতুঃশক্তি এবং ইউ-এন-ও গোষ্ঠীভুক্ত ছোট বড় সকল রাষ্ট্র একটি প্রোটোকলে স্বাক্ষর করে ঘোষণা করলেন, গগন-চটির আবির্ভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে আমরা যেসব প্রলাপোক্তি করেছিলাম তা এতদ্বারা প্রত্যাহৃত হল। এখন আবার পূর্বাবস্থা চলবে।

গগন-চটি সুদূর গগনে বিলীন হয়েছে, কিন্তু যাবার আগে সকলকেই বিলক্ষণ ঘা কতক দিয়ে গেছে। আমাদের মান ইজ্জত ধূলিসাৎ হয়েছে, মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে আর দাঁড়াবার জো নেই।

১৮৭৯

অদল বদল

কালিদাসের মেঘদূত ব্যাপারটা কি বোধ হয় আপনারা জানেন। যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তাই একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি। কুবেরের অনুচর এক যক্ষ কাজে ফাঁকি দিত, সেজন্য প্রভুর শাপে তাকে এক বৎসর নির্বাসনে থাকতে হয়। সে রামগিরিতে আশ্রম তৈরি করে বাস করতে লাগল। আষাঢ়ের প্রথম দিনে যক্ষ দেখল, পাহাড়ের মাথায় মেঘের উদয় হয়েছে, দেখাচ্ছে যেন একটি হস্তী বপ্রক্রীড়া করছে। অঞ্জলিতে সদ্য ফোটা কুড়চি ফুল নিয়ে সে মেঘকে অর্ঘ্য দিল এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দে একটি সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করল। তার সার মর্ম এই।—ভাই মেঘ, তোমাকে একবার অলকাপুরী যেতে হচ্ছে। ধীরে সুস্থে যেয়ো, পথে কিঞ্চিৎ ফুর্তি করতে গিয়ে যদি একটু দেরি হয়ে যায় তাতে ক্ষতি হবে না। অলকার বউদিদি আমার বিরহিণী প্রিয়া আছেন, তাঁকে আমার বার্তা জানিয়ে আশ্বস্ত ক'রো। ব'লো আমার শরীর ভালই আছে, কিন্তু চিত্ত তাঁর জন্য ছটফট করছে। নারায়ণ অনন্তশয্যা থেকে উঠলেই অর্থাৎ কার্তিক মাস নাগাদ শাপের অবসান হবে, তার পরেই আমরা পুনর্মিলিত হব।

কালিদাস তাঁর যক্ষের নাম প্রকাশ করেন নি, শাপের এক বৎসর শেষ হলে সে নিরাপদে ফিরতে পেরেছিল কিনা তাও লেখেন নি। মহাভারতে উদ্যোগপর্বে এক বনবাসী যক্ষের কথা আছে, তার নাম স্থূণাকর্ণ। সেই যক্ষ আর মেঘদূতের যক্ষ একই লোক তাতে সন্দেহ নেই। কালিদাস তাঁর কাব্যের উপসংহার লেখেন নি, মহাভারতেও যক্ষের প্রকৃত ইতিহাস নেই। কালিদাস আর ব্যাসদেব যা অনুক্ত রেখেছেন সেই বিচিত্র রহস্য এখন উদ্‌ঘাটন করছি।

যক্ষপত্নীকে যক্ষিণী বলব, কারণ তার নাম জানা নেই। পতির বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে যক্ষিণী দিনযাপন করছিল। একটা বেদীর উপর সে প্রতিদিন একটি করে ফুল রাখত আর মাঝে মাঝে গুনে দেখত ৩৬৫ পূরণের কত বাকী। অবশেষে এক বৎসর পূর্ণ হল, কার্তিক মাসও শেষ হল, কিন্তু যক্ষের দেখা নেই। যক্ষিণী উৎকণ্ঠিত হয়ে আরও কিছুদিন প্রতীক্ষা করল, তার পর আর থাকতে না পেরে কুবেরের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

কুবের বললেন, কে গা তুমি? খুব সুন্দরী দেখছি, কিন্তু কেশ অত রুক্ষ কেন? বসন অত মলিন কেন? একটি মাত্র বেণী কেন?

যক্ষিণী সরোদনে বলল, মহারাজ, আপনার সেই কিংকর যাকে এক বৎসরের জন্য নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন, আমি তারই দুঃখিনী ভার্যা। আজ দশ দিন হল এক বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এখনও আমার স্বামী ফিরে এলেন না কেন?

কুবের বললেন, ব্যস্ত হচ্ছ কেন, ধৈর্য ধর, নিশ্চয় সে ফিরে আসবে। হয়তো কোথাও আটকে পড়েছে। তার জোয়ান বয়সে, এখানে শুধু নাক-থেবড়া যক্ষিণী আর কিন্নরীই দেখেছে, বিদেশে হয়তো কোনও রূপবতী মানবীকে দেখে তার প্রেমে পড়েছে। তুমি ভেবো না, মানবীতে অরুচি হলেই সে ফিরে আসবে।

সজোরে মাথা নেড়ে যক্ষিণী বলল, না না, আমার স্বামী তেমন নন, অন্য নারীর দিকে তিনি ফিরেও তাকাবেন না। এই সেদিন একটি মেঘ এসে তাঁর আকুল প্রেমের বার্তা আমাকে জানিয়ে গেছে। প্রভু আপনি দয়া করে অনুসন্ধান করুন, নিশ্চয় তাঁর কোনও বিপদ হয়েছে, হয়তো সিংহব্যাঘ্রাদি তাঁকে বধ করেছে।

কুবের বললেন, তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন? তোমার স্বামী যদি ফিরে নাই আসে তবু তুমি অনাথা হবে না। আমার অন্তঃপুরে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে, আমি তোমাকে খুব সুখে রাখব।

যক্ষিণী বলল, ও কথা বলবেন না প্রভু, আপনি আমার পিতৃস্থানীয়। আপনার আজ্ঞায় আমার স্বামী নির্বাসনে গিয়েছিলেন, এখন তাঁর দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হয়েছে, তাঁকে ফিরিয়ে আনা আপনারই কর্তব্য। যদি তিনি বিপদাপন্ন হন তবে তাঁকে উদ্ধার করুন, যদি মৃত হন তবে নিশ্চিন্ত সংবাদ আমাকে এনে দিন, আমি অগ্নিপ্রবেশ করে স্বর্গে তাঁর সঙ্গে মিলিত হব।

বিব্রত হয়ে কুবের বললেন, আঃ তুমি আমাকে জ্বালিয়ে মারলে। বেশ, এখনই আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে যাচ্ছি, রামগিরি জায়গাটা দেখবার ইচ্ছাও আমার আছে। তুমিও আমার সঙ্গে চল। ওরে, শীঘ্র পুষ্পক রথ জুততে বলে দে। আর তোরা দুজন তৈরি হয়ে নে, আমার সঙ্গে যাবি।

রামগিরি প্রদেশে একটি ছোট পাহাড়ের উপর যক্ষ তার আশ্রম বানিয়েছিল। সেখানে পৌঁছে কুবের দেখলেন, বাড়িটি বেশ সুন্দর, দরজা জানালাও আছে, কিন্তু সবই বন্ধ। কুবেরের আদেশে তাঁর এক অনুচর দরজার ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ওহে স্থূণাকর্ণ, এখনই বেরিয়ে এস, মহামহিম রাজরাজ কুবের স্বয়ং এসেছেন, তোমার বউও এসেছে।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। কুবের বললেন, বাড়িতে কেউ নেই মনে হচ্ছে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া যাক।

যক্ষিণী বলল, অমন কাজ করবেন না মহারাজ। আমার স্বামী এই বাড়িতেই আছেন, আমি মাছ ভাজার গন্ধ পাচ্ছি, নিশ্চয় উনি রান্নায় ব্যস্ত আছেন, কেউ তো সাহায্য করবার লোক নেই। আমিই ওকে ডাকছি। ওগো, শুনতে পাচ্ছ? আমি এসেছি, মহারাজও এসেছেন। রান্না ফেলে রেখে চট করে বেরিয়ে এসো।

একটি জানালা ঈষৎ ফাঁক হল। ভিতরে থেকে নারীকণ্ঠে উত্তর

এলো, অ্যাঁ, প্রিয়ে তুমি এসেছ, প্রভু এসেছেন ? কি সর্বনাশ, তাঁর সামনে আমি বেরুব কি করে ?

আশ্চর্য হয়ে কুবের বললেন, কে গো তুমি ? এখনই বেরিয়ে এসো নয় তো বাড়িতে আগুন লাগবে।

তখন দরজা খুলে একটি অবগুণ্ঠিতা নারীমূর্তি বেরিয়ে এল। কুবের ধমক দিয়ে বললেন, আর ন্যাকামি করতে হবে না, তোমার ঘোমটা খোল।

মাথা নীচু করে ঘোমটাবতী উত্তর দিল, প্রভু, এ মুখ দেখাব কি করে ?

কুবের বললেন, পুড়িয়েছ নাকি ? ভেবো না, শিব যাতে চড়েন সেই বৃষভের সদ্যোজাত গোময় লেপন করলেই সেরে যাবে।

যক্ষিণী হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে এক টানে ঘোমটা খুলে ফেলল। মাথা চাপড়ে নারীমূর্তি বলল, হায় হায়, এর চাইতে আমার মরণই ভাল ছিল।

কুবের প্রশ্ন করলেন, কে তুমি ? সেই স্থূণাকর্ণ যক্ষটা কোথায় গেল ? তুমি তার রক্ষিতা নাকি ?

—মহারাজ, আমিই আপনার হতভাগ্য কিংকর স্থূণাকর্ণ, দৈব-দুর্বিপাকে এই দশা হয়েছে, কিন্তু আমার কোনও অপরাধ নেই। প্রিয়ে, আমরা নিতান্তই হতভাগ্য, শাপান্ত হলেও আমাদের মিলন হবার উপায় নেই।

যক্ষিণী বলল, মহারাজ, ইনিই আমার স্বামী, ওই যে, জোড়া ভুরু রয়েছে, নাকের ডগায় সেই তিলটিও দেখা যাচ্ছে। হা নাথ, তোমার এমন দশা কেন হল ? কোন্ দেবতাকে চটিয়েছিলে ?

যক্ষ বলল, পরের উপকার করতে গিয়ে আমার এই দুরবস্থা হয়েছে। এই জগতে কৃতজ্ঞতা নেই, সত্যপালন নেই।

যক্ষিণী বলল, তুমি মেয়েমানুষ হয়ে গেলে কি করে ?

কুবের বললেন, এ রকম হয়ে থাকে। বুধপত্নী ইলা আগে পুরুষ

ছিলেন, হরপার্বতীর নিভৃত স্থানে প্রবেশের ফলে স্ত্রী হয়ে যান। বালী-সুগ্রীবের বাপ ঋক্ষরজা এক সরোবরে স্নান করে বানরী হয়ে গিয়েছিলেন। যাই হক, স্থূণাকর্ণ, তুমি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে বল।

যক্ষ বলতে লাগল।—মহারাজ, প্রায় তিন মাস হল কিছু শুখনো কাঠ সংগ্রহের জন্য আমি নিকটবর্তী ওই অরণ্যে গিয়েছিলাম। দেখলাম, গাছের তলায় একটি ললনা বসে আছে আর আকুল হয়ে অশ্রুপাত করছে।

যক্ষিণী প্রশ্ন করল, মাগী দেখতে কেমন?

—সুন্দরী বলা চলে, তবে তোমার কাছে লাগে না। কাঠখোট্টা গড়ন, মুখে লাবণ্যেরও অভাব আছে। মহারাজ, তারপর শুনুন। আমি সেই নারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভদ্রে, তোমার কি হয়েছে? যদি বিপদে পড়ে থাক তবে আমি যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করব।

সে এই আশ্চর্য বিবরণ দিল।—মহাশয়, আমি পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা শিখণ্ডিনী, কিন্তু লোকে আমাকে রাজপুত শিখণ্ডী বলেই জানে। পূর্বজন্মে আমি ছিলাম কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা। স্বয়ংবরসভা থেকে ভীষ্ম আমাদের তিন ভগিনীকে হরণ করেছিলেন, তাঁর বৈমাত্র ভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য। আমি শাল্বরাজের প্রতি অনুরক্তা জেনে ভীষ্ম আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শাল্ব বললেন, রাজকন্যা, আমি তোমাকে নিতে পারি না, কারণ ভীষ্ম তোমাকে হরণ করেছিলেন, তাঁর স্পর্শ নিশ্চয় তোমাকে পুলকিত করেছিল। তখন আমি ভগবান পরশুরামের শরণ নিলাম। তিনি ভীষ্মকে বললেন, তোমারই কর্তব্য অম্বাকে বিবাহ করা। ভীষ্ম সম্মত হলেন। পরশুরাম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন,

কিন্তু কোনও ফল হল না। ভীষ্মের জন্যই আমার নারীজন্ম বিফল হয় এই কারণে ভীষ্মের বধকামনায় আমি কঠোর তপস্যা করলাম। তাতে মহাদেব প্রীত হয়ে বর দিলেন—তুমি পরজন্মে দ্রুপদকন্যা রূপে ভূমিষ্ঠ হবে, কিন্তু পরে পুরুষ হয়ে ভীষ্মকে বধ করবে। মহাদেবের বরে দ্রুপদ গৃহে আমার জন্ম হল। কন্যা হলেও রাজপুত্র শিখণ্ডী রূপেই আমি পালিত হয়েছি, অস্ত্রবিদ্যাও শিখেছি। যৌবনকাল উপস্থিত হলে দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হল। কিন্তু কিছুদিন পরেই ধরা পড়ে গেলাম। আমার পত্নী দাসীকে দিয়ে তার মায়ের কাছে বলে পাঠাল—মাগো, তোমাদের ভীষণ ঠকিয়েছে, যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ সে পুরুষ নয়, মেয়ে।

এই দুঃসংবাদ শুনে আমার শ্বশুর হিরণ্যবর্মা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি দূত পাঠিয়ে আমার পিতা দ্রুপদকে জানালেন, দুর্মতি, তুমি আমাকে প্রতারিত করেছ। আমি সসৈন্যে তোমার রাজ্যে যাচ্ছি, চারজন চতুরা যুবতীও আমার সঙ্গে যাচ্ছে, তারা আমার জামাতা শিখণ্ডীকে পরীক্ষা করবে। যদি দেখা যায় যে সে পুরুষ নয় তবে তোমাকে আমি অমাত্যপরিজনসহ বিনষ্ট করব।

পিতার এই দারুণ বিপদ দেখে আমি গৃহত্যাগ করে এই বনে পালিয়ে এসেছি। আমার জন্যই স্বজনবর্গ বিপন্ন হয়েছেন, আমার আর জীবনে প্রয়োজন কি। আমি এখানেই অনাহারে জীবন বিসর্জন দেব।

মহারাজ, শিখণ্ডিনীর এই ইতিহাস শুনে আমার অত্যন্ত অনুকম্পা হল। আমি তাকে বললাম, তুমি কি চাও বল। আমি ধনপতি কুবেরের অনুচর, তাদের বস্তুও দিতে পারি।

শিখণ্ডিনী বলল, যক্ষ, আমায় পুরুষ করে দাও।

আমি বললাম, রাজকন্যা, আমার পুরুষত্ব কয়েক দিনের জন্য তোমাকে ধার দেব, তাতে তুমি তোমার পিতা ও আত্মীয়বর্গকে

দশার্ণরাজের ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তুমি এখানে এসে আমার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেবে। আমার শাপান্ত হতে আর বিলম্ব নেই, প্রিয়ার সঙ্গে মিলনের জন্য আমি অধীর হয়ে আছি, অতএব তুমি সত্বর ফিরে এসো।

মহারাজ, শিখণ্ডিনী সেই যে চলে গেল তার পর আর আসে নি। সেই মিথ্যাবাদিনী দ্রুপদনন্দিনী ধাপ্পা দিয়ে আমার পুরুষত্ব আদায় করে পালিয়েছে, তার বদলে দিয়ে গেছে তার তুচ্ছ নারীত্ব।

যক্ষের কথা শুনে যক্ষিণী বলল, একটা অজানা মেয়ের কান্নায় ভুলে গিয়ে তোমার অমূল্য সম্পদ তাকে দিয়ে দিলে! নাথ, তুমি কি বোকা, কি বোকা!

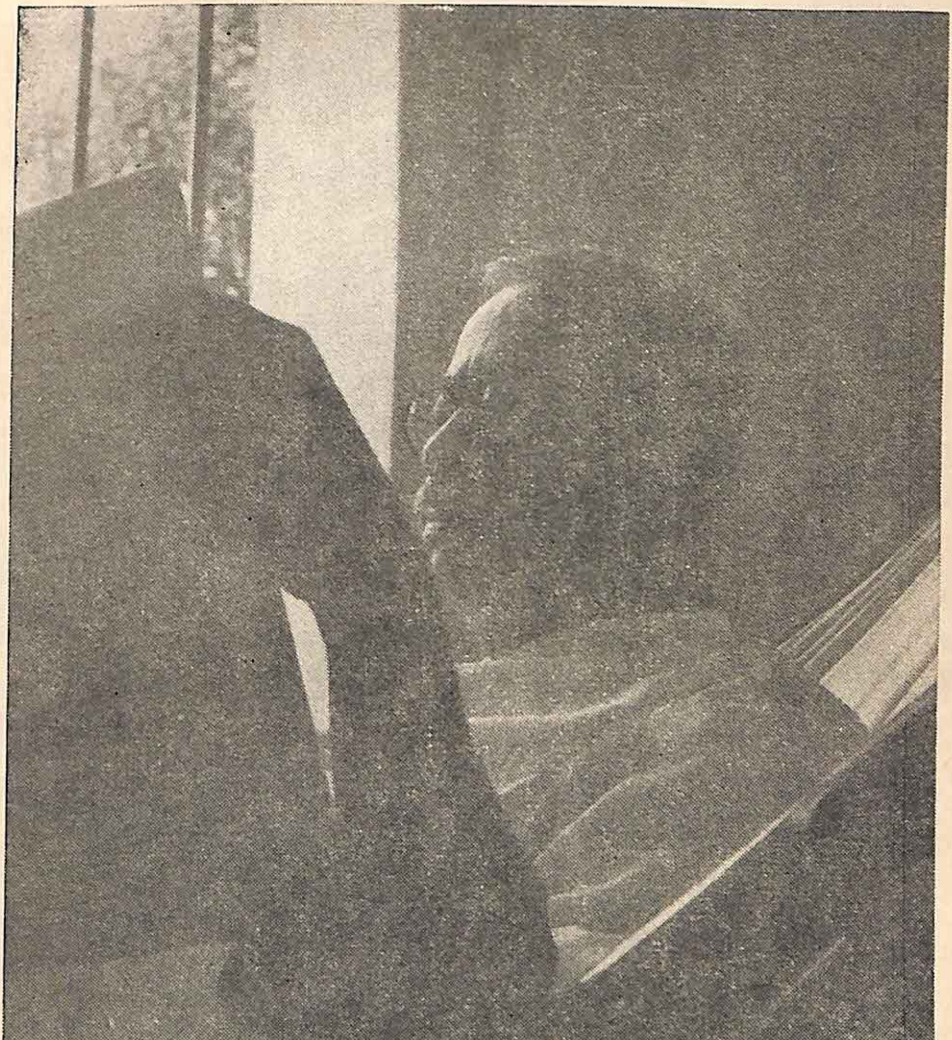
কুবের বললেন, তুমি একটি গজমূর্খ গর্দভ গাড়ল। যাই হক, এখনই আমি তোমার পুরুষত্ব উদ্ধার করে দেব। চল আমার সঙ্গে।

সকলে পঞ্চাল রাজ্যে উপস্থিত হলেন। রাজধানী থেকে কিছু দূরে এক নির্জন বনে পুষ্পক রথ রেখে কুবের তাঁর এক অনুচরকে বললেন, দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীকে সংবাদ দাও—বিশেষ প্রয়োজনে ধনেশ্বর কুবের তোমাকে ডেকেছেন, যদি না এস তবে পঞ্চাল রাজ্যের সর্বনাশ হবে।

শিখণ্ডী ব্যস্ত হয়ে তখনই এসে প্রণাম করে বললেন, যক্ষরাজ, আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

কুবের বললেন, শিখণ্ডী, তুমি আমার কিংকর এই স্থূণাকর্ণকে প্রতারিত করেছ, এর প্রিয়ার সঙ্গে মিলনে বাধা ঘটিয়েছ, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা রক্ষা কর নি। যদি মঙ্গল চাও তবে এখনই এর পুরুষত্ব প্রত্যর্পণ কর।

শিখণ্ডী বললেন, ধনেশ্বর, আমি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পালন করব, আমার বিলম্ব হয়ে গেছে তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। এই যক্ষ



রাজশেখর বসু

—জন্ম—

১৮ই মার্চ, ১৮৮০

—মৃত্যু—

২৭শে এপ্রিল, ১৯৬০

আমার মহোপকার করেছেন, কৃপা করে আরও কিছুদিন আমায় সময় দিন।

কুবের বললেন, কেন, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি ?

—যক্ষরাজ, যে বিপদ আসন্ন ছিল তা কেটে গেছে। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার সঙ্গে যে যুবতীরা এসেছিল তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে তাঁকে বলেছে, আপনার জামাতা পূর্ণমাত্রায় পুরুষ বরং ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। এই কথা শুনে শ্বশুর মহাশয় অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আমার পিতার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং বিস্তর উপঢৌকন দিয়ে সদলবলে প্রস্থান করেছেন। যাবার সময় তাঁর কন্যাকে বোকা মেয়ে বলে ধমক দিয়ে গেছেন। আমি এই যক্ষ মহাশয়ের কাছে আর এক মাস সময় ভিক্ষা চাচ্ছি, তার মধ্যেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত হবে। ভীষ্মকে বধ করেই আমি স্থূণাকর্ণের ঋণ শোধ করব।

কুবের বললেন, মহারথ ভীষ্মকে বধ করবে এ কথা অবিশ্বাস্য। তিনিই তোমাকে বধ করবেন, সেই সঙ্গে তোমার পুরুষত্বও বিনষ্ট হবে। ও সব চলবে না, তুমি এই মুহূর্তে স্থূণাকর্ণের পুরুষত্ব প্রত্যর্পণ কর এবং তোমার স্ত্রীত্ব ফিরিয়ে নাও। নতুবা আমি সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে এখনই তোমার শ্বশুরের কাছে যাব। তোমার প্রতারণার কথা জানলেই তিনি সসৈন্যে এসে পঞ্চাল রাজ্য ধ্বংস করবেন।

ব্যাকুল হয়ে শিখণ্ডী বললেন, হা, আমার গতি কি হবে।

কুবের বললেন, ভাবছ কেন, তোমার ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন আছেন, পঞ্চপাণ্ডব ভগিনীপতি আছেন, পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ আছেন। তাঁরাই ভীষ্মবধের ব্যবস্থা করবেন।

শিখণ্ডী বললেন, তা হবার জো নেই। ভীষ্ম পাণ্ডবদের পিতামহ, আর দ্রোণ তাদের আচার্য। এই দুই গুরুজনকে তারা বধ করবেন না এই কারণে ভীষ্মবধের ভার আমার উপর আর দ্রোণবধের ভার ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর পড়েছে।

কুবের কোনও আপত্তি শুনলেন না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে শিখণ্ডী যক্ষকে পুরুষত্ব প্রত্যর্পণ করে নিজের স্ত্রীত্ব ফিরিয়ে নিলেন। তখন কুবেরের সঙ্গে যক্ষ আর যক্ষিণী পরমানন্দে অলকাপুরীতে চলে গেল।

বিষণ্ণমনে অনেকক্ষণ চিন্তা করে শিখণ্ডী কৃষ্ণসকাশে এলেন। দৈবক্রমে দেবর্ষি নারদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ বললেন, একি শিখণ্ডী, তোমাকে এমন অবসন্ন দেখছি কেন? দুদিন আগেও তোমার বীরোচিত তেজস্বী মূর্তি দেখেছিলাম এখন আবার কোমল স্ত্রীভাব দেখছি কেন?

শিখণ্ডী বললেন, বাসুদেব, আমার বিপদের অন্ত নেই।

নারদ বললেন, তোমরা বিশ্রম্ভালাপ কর, আমি এখন উঠি।

শিখণ্ডী বললেন, না না দেবর্ষি, উঠবেন না। আপনি তো আমার ইতিহাস সবই জানেন, আপনার কাছে আমার গোপনীয় কিছু নেই।

সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে শিখণ্ডী বললেন, কৃষ্ণ, তুমি পাণ্ডব আর পঞ্চালদের সুহৃদ, আমার ভগিনী কৃষ্ণা তোমার সখী। আমাকে সংকট হতে উদ্ধার কর। বিগত জন্ম থেকেই আমার সংকল্প আছে যে ভীষ্মকে বধ করব, মহাদেবের বরও আমি পেয়েছি। কিন্তু পুরুষত্ব না পেলে আমি যুদ্ধ করব কি করে?

কৃষ্ণ বললেন, তোমার সংকল্প ধর্মসংগত নয়। নারী হয়ে জন্মেছ, অলৌকিক উপায়ে পুরুষ হতে চাও কেন? ভীষ্মকে বধ করবার ভার অন্য লোকের উপর ছেড়ে দাও। দেবর্ষি কি বলেন?

নারদ বললেন, ওহে শিখণ্ডী, কৃষ্ণ ভালই বলেছেন। শাল্বরাজ আর ভীষ্ম তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাতে হয়েছে কি? পৃথিবীতে আরও পুরুষ আছে। তুমি যদি সম্মত হও তবে আমি

তোমার পিতাকে বলব, তিনি যেন কোন সৎপাত্রে তোমাকে অর্পণ করেন। তাতেই তোমার নারীজন্ম সার্থক হবে। তোমার পত্নীরও একটা গতি হয়ে যাবে, সে তোমার সপত্নী হয়ে সুখে থাকবে।

শিখণ্ডী বললেন, অমন কথা বলবেন না দেবর্ষি। মহাদেব আমাকে যে বর দিয়েছেন তা অবশ্যই সফল হবে। কৃষ্ণ তোমার অসাধ্য কিছু নেই, তুমি আমাকে পুরুষ করে দাও।

কৃষ্ণ বললেন, আমি বিধাতা নই যে অঘটন ঘটাব। সেই যক্ষের মতন কেউ যদি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে অঙ্গ বিনিময় করে তবেই তুমি পুরুষ হতে পারবে। কিন্তু সেরকম নির্বোধ আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। দেবর্ষি, আপনি তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়ান, আপনার জানা আছে?

নারদ বললেন, আছে, তুমিও তাঁকে জান। শোন শিখণ্ডী, বৃন্দাবন ধামে কৃষ্ণের এক দূর সম্পর্কের মাতুল আছেন। তিনি গোপবংশীয়, নাম আয়ান ঘোষ। অতি সদাশয় পরোপকারী লোক, কিন্তু বড়ই মনঃকষ্টে আছেন, ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন, সংসারে আসক্তি নেই। তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও।

শিখণ্ডী বললেন, বাসুদেব, তুমি আমার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করে শ্রীআয়ানকে একটি পত্র দাও, তাই নিয়ে আমি তাঁর কাছে যাব।

কৃষ্ণ বললেন, পাগল হয়েছ? আমার নাম যদি ঘুণাক্ষরে উল্লেখ কর তবে তখনই তিনি তোমাকে বিতাড়িত করবেন। দেখ শিখণ্ডী, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, অকারণে আমি কয়েকজনের বিরাগভাজন হয়েছি—কংস, শিশুপাল, আর আমার পূজ্যপাদ মাতুল এই আয়ান ঘোষ। এমন কি, আমার পুত্র শাম্বের শ্বশুর দুর্যোধনও আমার শত্রু হয়েছেন।

শিখণ্ডী বললেন, তবে উপায়?

নারদ বললেন, উপায় তোমারই হাতে আছে। নারীর ছলা-কলা আর পুরুষের কূটবুদ্ধি দুটিই তোমার স্বভাবসিদ্ধ, তাই দিয়েই কাজ উদ্ধার করতে পারবে। চল আমার সঙ্গে, শ্রীআয়ানের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

বৃন্দাবনের এক প্রান্তে লোকালয় হতে বহু দূরে যমুনাতীরে একটি কুটীর নির্মাণ করে আয়ান ঘোষ সেখানে বাস করেন। বিকাল বেলা নদীপুলিনে বসে তিনি রাবণরচিত শিবতাণ্ডব স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেন, এমন সময় শিখণ্ডীর সঙ্গে নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আয়ান বললেন, দেবর্ষি, আমি ধন্য যে আপনার দর্শন পেলাম। এই সুন্দরীকে তো চিনতে পারছি না।

নারদ বললেন ইনি পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা শিখণ্ডিনী। ভগবান শূলপাণি একটি কঠোর ব্রত পালনের ভার এঁর উপর দিয়েছেন। সেই ব্রত উদ্‌যাপিত না হওয়া পর্যন্ত এঁকে অনূঢ়া থাকতে হবে। কিন্তু কোনও সদাশয় ধর্মপ্রাণ পুরুষের সাহায্য ভিন্ন এঁর সংকল্প পূর্ণ হবে না। মহামতি আয়ান, আমি দিব্যচক্ষুতে দেখছি তুমিই সেই ভগবান পুরুষ। এঁর অনুরোধ রক্ষা কর, ব্রত সম্পাত হলেই এই অশেষ গুণবতী ললনা তোমাকে পতিত্বে বরণ করবেন, তোমার জীবন ধন্য হবে।

একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে আয়ান বলেন, হা দেবর্ষি, আমার জীবন কি করে ধন্য হবে? আমার সংসার থাকতেও নেই, গৃহ শূন্য। লোকে আমাকে অবজ্ঞা করে, অপদার্থ কাপুরুষ বলে, অন্তরালে ধিক্‌কার দেয়। তাই জনসংস্রব বর্জন করে এই নিভৃত স্থানে বাস করছি। এই বরবর্ণিনী রাজকন্যা আমার ন্যায় হতভাগ্যের কাছে কেন এসেছেন?

শিখণ্ডী মধুর কণ্ঠে বললেন, গোপশ্রেষ্ঠ মহাত্মা আয়ান, আপনার গুণরাশি শুনে দূর থেকেই আমি মোহিত হয়েছিলাম, এখন আপনাকে দেখে আমি অভিভূত হয়েছি, আপনার চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করছি।

আয়ান বললেন, আমার বঞ্চিত ধিকৃকৃত জীবনে এমন সৌভাগ্যের উদয় হবে তা আমি স্বপ্নেও আশা করি নি। মনোহারিণী শিখণ্ডিনী, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আমার কাছে তুমি কি চাও বল।

শিখণ্ডী বললেন, দেবর্ষি, আপনিই এঁকে বুঝিয়ে দিন।

ব্রতের কথা সংক্ষেপে জানিয়ে নারদ বললেন, গোপেশ্বর আয়ান, মহাদেবের বরে শিখণ্ডিনী অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবেন, তোমাকে কেবল এক মাসের জন্য এঁকে তোমার পুরুষত্ব দান করতে হবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তার মধ্যেই সমাপ্ত হবে, ভীষ্মও স্বর্গলাভ করবেন তার পরেই রাজা দ্রুপদ তাঁর এই কন্যাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করবেন, পঞ্চাল রাজ্যের অর্ধ অংশ ও বিস্তর সবৎসা ধেনুও যৌতুক স্বরূপ দেবেন। বৃন্দাবনের অপ্রিয় স্মৃতি পশ্চাতে ফেলে রেখে তুমি নূতন পত্নীসহ নূতন দেশে পরম সুখে রাজত্ব করবে।

ক্ষণকাল চিন্তার পর আয়ানের দ্বৈধ দূর হল, তিনি তাঁর ভাবী বধূর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। পুনর্বার পুরুষত্ব লাভ করে শিখণ্ডী হৃষ্টচিত্তে নারদের সঙ্গে চলে গেলেন। আর স্ত্রীরূপা আয়ান কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করে অসূর্যম্পশ্যা হয়ে শিখণ্ডিনীর প্রত্যাশায় দিন যাপন করতে লাগলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দশম দিনে শিখণ্ডীর বাণে জর্জরিত হয়ে ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলেন। তার আটদিন পরে যুদ্ধ

সমাপ্ত হল। কিন্তু শিখণ্ডী আয়ানের কাছে এলেন না, তাঁর আসবার উপায়ও ছিল না। অশ্বত্থামা গভীর নিশীথে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করে যাঁদের হত্যা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শিখণ্ডীও ছিলেন।

আয়ানের ভাগ্যে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব লাভ হল না, তাঁর পুরুষত্বও শিখণ্ডীর সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর জীবন বিফল হল এমন কথা বলা যায় না। কালক্রমে আয়ানের এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবর্তন হল। তিনি মনঃপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে আয়ানী নামে খ্যাত হলেন, শ্রীখোল বাজাতে শিখলেন, এবং ব্রজমণ্ডলে যে ষোল হাজার গোপিনী বাস করত তাদের নেত্রী হয়ে নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন করতে লাগলেন।

১৮৭৯

রাজমহিষী

হংসেশ্বর রায় খুব ধনী লোক। রাধানাথপুরে তাঁর যে জমিদারি ছিল তা এখন সরকারের দখলে গেছে, কিন্তু তাতে হংসেশ্বরের গায়ে অাঁচড় লাগে নি। কলকাতায় অফিস অঞ্চলে আর শৌখিন পাড়ায় তাঁর ষোলটা বড় বড় বাড়ি আছে, তা থেকে মাসে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা আয় হয়। তা ছাড়া বন্ধকী কারবার আর বিস্তর শেয়ারও আছে। হংসেশ্বরের বয়স পঞ্চাশ। তাঁর পত্নী হেমাঙ্গিনী সংসারে অনাসক্ত, বিপুল শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়ে ঔষধ আর পুষ্টিকর পথ্য খেয়ে গল্পের বই পড়ে দিন কাটান আর মাঝে মাঝে বাড়ির লোকেদের ধমক দেন—যত সব কুঁড়ের বাদশা জুটেছে। এঁদের একমাত্র সন্তান চকোরী, সম্প্রতি .এম. এ. পাস করেছে।

কলকাতা হংসেশ্বরের ভাল লাগে না। তাঁর যে সব শখ আছে তার চর্চার পক্ষে রাধানাথপুরই উপযুক্ত স্থান, তাই ওখানেই তিনি বাস করেন। তাঁর প্রকাণ্ড বাগান আছে, গরু আর হাঁস-মুরগি আছে। কৃষিজাত দ্রব্য আর পশুপক্ষীর যত প্রদর্শনী হয় তাতে তাঁর আম কাঁঠাল লাউ কুমড়ো গরু হাঁস মুরগিই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়। সম্প্রতি তিনি পশ্চিম পাঞ্জাবের গুজরানওআলা থেকে একটি ভাল জাতের মোষ আনিয়েছেন, তার জন্যে তাঁর এক পাকিস্তানী বন্ধুকে প্রচুর ঘুষ দিতে হয়েছে। তিনি মোষটির নাম রেখেছেন রাজমহিষী। কিছু দিন আগে তার প্রথম বাচ্চা হয়েছে। আগামী ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাট্‌ল শো-তে তিনি এই মোষটিকে পাঠাবেন। তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন তালদিঘির রায়সাহেব মহিম বাঁড়ুজ্যে, তাঁর একটি মুলতানী মোষ আছে। হংসেশ্বর আশা করেন তাঁর রাজমহিষীই রাজ্য গোল্ড মেডাল পাবে।

হংসেশ্বরের মেয়ে চকোরী কলকাতায় তার মামাদের তত্ত্বাবধানে থেকে কলেজে পড়ত। এখন পড়া শেষ করে রাধানাথপুরে তার বাপ-মায়ের কাছে আছে, মাঝে মাঝে দু-দশ দিনের জন্যে কলকাতায় যায়। চকোরী লম্বা রোগা, দাঁত বড় বড়, চোয়াল উঁচু, গায়ের স্বাভাবিক রঙ ময়লা। সর্বাঙ্গীণ পরিপাটী মেক-আপ সত্ত্বেও তাকে সুন্দরী বলে ভ্রম হয় না। চকোরীর হিংসুটে সখীরা বলে, রূপে তো আহামরি বিদ্যাধরী, গুণে মা মনসা, শুধু ওর বাপের সম্পত্তির লোভে খোসামুদেগুলো জোটে।

মেয়ের বিবাহের জন্যে হেমাঙ্গিনীর কিছুমাত্র চিন্তা নেই, হংসেশ্বরও ব্যস্ত নন। তিনি বলেন, চকোরী হুঁশিয়ার হিসেবী মেয়ে, বোকা-হাবার মতন চোখ বুজে বাজে লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়বে না, চটক দেখে বা মিষ্টি-মধুর বুলি শুনেও ভুলবে না। তাড়াহুড়োর দরকার কি, আজকাল তো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের পরে মেয়েদের বিয়ের রেওয়াজ হয়েছে। চকোরী সুবিধে মতন নিজেই যাচাই করে একটা ভাল বর জুটিয়ে নেবে।

চকোরীর প্রেমের যত উমেদার আছে তার মধ্যে সব চেয়ে নাছোড়-বান্দা হচ্ছে বংশীধর। সম্প্রতি সে পি-এচ. ডি. ডিগ্রী পেয়ে টালিগঞ্জ কলেজে একটা প্রোফেসারি পেয়েছে, বটানি আর জোঅলজি পড়ায়। তার-বাবা শশধর চৌধুরী দু বছর হল মারা গেছেন। তিনি উকিল ছিলেন, হংসেশ্বরের কলকাতার সম্পত্তি তদারক করতেন! বংশীধরের মামার বাড়ি রাধানাথপুরে, সেখানে সে মাঝে মাঝে যায়। চকোরীর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তার পরিচয় আছে, হংসেশ্বরকে সে কাকাবাবু বলে।

পূজোর ছুটিতে বংশীধর রাধানাথপুরে এসেছে। একদিন সে চকোরীকে বলল, আর দেরি কেন, তোমার লেখাপড়া শেষ হয়েছে,

আমারও যেমন হক একটা চাকরি জুটেছে। এখন আর তোমার আপত্তি কিসের? তুমি রাজী হলেই তোমার বাবাকে বলব।

চকোরী বলল, ব্যাপারটি যত সোজা মনে করছ তা নয়। আমার তরফ থেকে বলতে পারি, তোমাকে আমার পছন্দ হয়, বেশ শান্তশিষ্ট, যদিও নামটা বড় সেকেলে, বংশীধর শুনলেই মনে হয় সাপুড়ে। কিন্তু প্রেমে হাবুডুবু খাবার মেয়ে আমি নই। বাবাকে যদি রাজী করাতে পার তবে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই। তবে বাবা লোকটি সহজ নন, নানা রকম ফেচাং তুলবেন। তোমার যদি সাহস আর জেদ থাকে তাঁকে বলে দেখতে পার।

পরদিন সকালে হংসেশ্বরের কাছে গিয়ে বংশীধর সবিনয়ে নিবেদন করল যে তার কিছু বলবার আছে। হংসেশ্বর তখন তাঁর মোষের প্রাতঃকৃত্য তদারক করছিলেন। বংশীধরকে বললেন, একটু সবুর কর। তার পর তিনি রাজমহিষীর পরিচারককে বললেন, এই গোপীরাম, বেশ পরিষ্কার করে গা মুছিয়ে দিবি, খবরদার একটুও কাদা যেন লেগে না থাকে। একি রে নাকের ডগায় মশা কামড়েছে দেখছি, ওর ঘরে ডিডিটি দিস নি বুঝি?

গোপীরাম বলল, বহুত দিয়েছি হুকুম করেন তবে আমার গাঁও থেকে চারঠো বগুলা মাঙাতে পারি।

—বগুলা কি জিনিস?

—বগ-পাখি হুজুর। গোহালে রাখলে মখ্‌খি মচ্ছড় পতিংগা মকড়া সব টপাটপ খেয়ে ফেলবে, ভঁইসী আর তার বাচ্চা বহুত আরামসে নিদ যাবে।

—বগ থাকবে কেন, পালিয়ে যাবে।

—না হুজুর, ওদের পংখ্‌ একটু ছেঁটে দিব, উড়তে পারবে না। পনদ্র দিন বাদ গাঁও সে আমার এক চাচা আসবে, বলেন তো বগুলা আনতে লিখে দিব, চার বগুলায় বিশ টাকা অন্দাজ খর্চ পড়বে।

—বেশ, আজই লিখে দে।

গোপীরামকে আরও কিছু উপদেশ দিয়ে হংসেশ্বর তাঁর অফিস-ঘরে বংশীধরকে নিয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, তার পর বংশী, ব্যাপারটা কি হে।

হংসেশ্বর বললেন, অ। চকোরীকে বিয়ে করতে চাও এই তো? বংশীধর সভয়ে বলল, আজ্ঞে হাঁ।

হংসেশ্বর বললেন, শোন বংশী, আমি স্পষ্ট কথার মানুষ। পাত্র হিসেবে তুমি ভালই, দেখতে চকোরীর চাইতে ঢের বেশী সুশ্রী, বিদ্যাও আছে, যত দূর জানি চরিত্রও ভাল। কিন্তু তোমার আর্থিক অবস্থা তো সুবিধের নয়। কলকাতায় একটা সেকেলে পৈতৃক বাড়ি আছে বটে, কিন্তু সেখানে তোমার মা দিদিমা ভাই বোন ভাগনেরা গিশগিশ করছে, সেই ভিড়ের মধ্যে চকোরী এক মিনিটও টিকতে পারবে না। তার পর তোমার আয়। মাইনে কত পাও হে? দু শ? পরে আড়াই শ হবে? খেপেছ, ওই টাকায় চকোরীকে পুষতে চাও? তার সাবান ক্রীম পাউডার পেণ্ট এই সবের খরচই তো মাসে আড়াই শ-র ওপর। তুমি হয়তো ভেবেছ মেয়ে-জামাইএর ভরণ-পোষণের জন্যে আমি মাসে মাসে মোটা টাকা দেব। সেটি হবে না বাপু।

বংশীধর বলল, আমি গরিব হলেই বা ক্ষতি কি কাকাবাবু? চকোরী আপনার একমাত্র সন্তান, সে যাতে সুখে থাকে তার জন্যে আপনি অর্থসাহায্য করবেন এ তো স্বাভাবিক। আপনার অবর্তমানে ওই তো সব পাবে।

—অবর্তমান হতে ঢের দেরি হে, আমি এখনও চল্লিশ বছর বাঁচব, তার আগে এক পয়সাও হাতছাড়া করব না। মেয়ে যদ্দিন আইবুড়ো তদ্দিন আমার খরচে নবাবি করুক আপত্তি নেই, বিয়ের পর সমস্ত ভার তার স্বামীকে নিতে হবে। আর যদিই বা তোমাদের আমি যোগাই তাতে তোমার মাথা হেঁট হবে না? বাপের মাইনের গোলাম স্বামীর ওপর কোনও মেয়ের শ্রদ্ধা থাকে না। আমিই বা চ্যারিটি-বয় জামাই করতে যাব কেন?

বংশীধর কাতর স্বরে বলল, তবে কি আমার কোনও আশা নেই ?

—আশা থাকতে পারে। তুমি উঠে পড়ে লেগে যাও যাতে তোমার রোজগার বাড়ে। তোমার মাসিক আয় আড়াই হাজার হলেই আমার আর আপত্তি থাকবে না।

—অত টাকা আয়ের তো কোনও আশা দেখছি না। আর, চকোরী কি তত দিন সবুর করবে ?

—সবুর করবে কিনা আমি কি করে বলব। তুমিই তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পার। হাঁ, আর একটা কথা তোমার জেনে রাখা দরকার। চকোরীকে ভাঁপতা দিয়ে রাজী করিয়ে যদি আমার অমতে তাকে বিয়ে কর তবে আমার সমস্ত সম্পত্তি হরিণঘাটায় দান করব, গো-মহিষ-ছাগাদি পশু আর হংস-কুক্কুটাদি পক্ষীর উৎকর্ষকল্পে। আর, চকোরী আমার সম্পত্তি পেলেই বা তোমার কি সুবিধে হবে ? সে অতি ঝানু মেয়ে, কাকেও বিশ্বাস করে না, ব্যাংকের চেকবুক তোমাকে দেবে না, বিষয় যা পাবে তাতেও তোমাকে হাত দিতে দেবে না। বড় জোর তোমার সিগারেটের খরচ যোগাবে আর জন্মদিনে কিছু উপহার দেবে, এক সুট ভাল পোশাক, কি রিস্টওয়াচ, কিংবা একটা শার্পার-নাইন্টি কলম। চকোরীকে বিয়ে করার মতলব ছেড়ে দেওয়াই তোমার পক্ষে ভাল।

বংশীধর বিষণ্ন মনে চলে গেল। বিকাল বেলা তার কাছে সব কথা শুনে চকোরী বলল, বাবা যে ওই রকম বলবেন তা আমি আগে থাকতেই জানি।

বংশীধর বলল, চকোরী, তোমার বাবার সম্পত্তি তাঁরই থাকুক, আমার তাতে লোভ নেই। তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালবাস তবে ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না ? প্রেমের জন্যে নারী কি না ছাড়তে পারে যদি ভালবাসা থাকে তবে আমার সেকেলে ছোট বাড়িতে আর সামান্য আয়েই তুমি সুখী হতে পারবে।

চকোরী হেসে বলল, শোন বংশী। প্রেম খুব উঁচুদরের জিনিস, আর তোমার ওপর আমার তা নেহাত কম নেই। কিন্তু টাকাহীন প্রেম আর চাকাহীন গাড়ি দুইই অচল, কষ্টের সংসারে ভালবাসা শুকিয়ে যায়। 'ধনকে নিয়ে বনকে যাব থাকব বনের মাঝখানে, ধন-দৌলত চাই না শুধু চাইব ধনের মুখপানে'—এ আমার পোষাবে না বাপু। তোমাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্যে বাবা অবশ্য অনেকটা বাড়িয়ে বলেছেন, আমাকে একবারে হার্টলেস রাক্ষসী বানিয়েছেন। কিন্তু আমি অতটা বেয়াড়া নই। তবে বাবা নিতান্ত অন্যায় কিছু বলেন নি। আমি বলি কি তোমার ওই প্রোফেসরি ছেড়ে দিয়ে কোনও ভাল চাকরির চেষ্টা কর। বাবার সঙ্গে মন্ত্রীদের আলাপ আছে, ওঁকে ধরলে নিশ্চয় একটা ভাল পোস্ট তোমাকে দেওয়াতে পারবেন। প্রথমটা মাইনে কম হলেও পরে আড়াই-তিন হাজার হওয়া অসম্ভব নয়।

—তত দিন আমার জন্যে তুমি সবুর করে থাকবে।

—গ্যারান্টি দিতে পারব না। অক্ষয় প্রেম একটা বাজে কথা, ভবিষ্যতে তোমার আমার দুজনেরই মতিগতি বদলাতে পারে। যা বলি শোন। একটা ভাল সরকারী চাকরির জন্যে নাছোড়বান্দা হয়ে বাবাকে ধর। কিন্তু এখনই নয়, ওঁর মাথার এখন ঠিক নেই, দিনরাত ওই মোষটার কথা ভাবছেন। বাবার গুপ্তচর খবর এনেছে, তালদিঘির সেই মহিম বাঁড়ুজ্যের মুলতানী মোষ নাকি রোজ সাড়েকুড়ি সের দুধ দিচ্ছে, আমাদের রাজমহিষীর চাইতে কিছু বেশী, যদিও দুটোই সমবয়সী তরুণী মোষ। বাবা তাই উঠে পড়ে লেগেছেন, রাজ-মহিষীকে কাপাস বিচির খোল, চীনাবাদাম, পালং শাগ, কড়াইশুঁটি, গাজর, টোমাটো, নারকেল-কোরা, কমলানেবুর রস, এই সব পুষ্টিকর জিনিস খাওয়াচ্ছেন, ভাইটামিন বি-কমপ্লেক্সও দিচ্ছেন। এগজিবিশনটা আগে চুকে যাক। রাজমহিষী যদি গোল্ড মেডাল পায় তবে বাবা খুব দিল-দরিয়া হবেন, তখন তাঁকে চাকরির জন্যে ধরবে।

আর এক মাস পরেই পশ্চিমবঙ্গ-গবাদি-পশু-প্রদর্শনী, কিন্তু হংসেশ্বর মহা বিপদে পড়েছেন, রাজমহিষী খাওয়া প্রায় ত্যাগ করেছে, দুধও নামমাত্র দিচ্ছে। যত নষ্টের গোড়া ওই গোপীরাম, রাজমহিষীর প্রধান সেবক। সে তার ইয়ারদের সঙ্গে রাসপূর্ণিমার মেলায় গিয়ে খুব তাড়ি খেয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, পুলিস এলে তাদের সঙ্গে বীরদর্পে লড়ে একটা কনস্টেবলের মাথা ফাটিয়েছিল। তার ফলে তাকে গ্রেপতার করে থানায় চালান দেওয়া হয়। খবর পেয়ে তাকে খালাস করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন, কলকাতা থেকে ভাল ব্যারিস্টার পর্যন্ত আনলেন। আদালতে তিনি প্রার্থনা করলেন, মোটা জরিমানা করে আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হক। কিন্তু হাকিম তা শুনলেন না, ছ মাস জেলের হুকুম দিলেন। তখন ব্যারিস্টার বললেন, ইওর অনার, এই গোপীরাম যদি জেলে যায় তবে শ্রীহংসেশ্বর রায়ের সর্বনাশ হবে। তাঁর বিখ্যাত চ্যাম্পিয়ান বফেলো রাজমহিষী গোপীরামের বিরহে খাওয়া বন্ধ করেছে। না খেলে সে আগামী ক্যাট্‌ল শো-তে দাঁড়াবে কি করে? অতএব ইওর অনার দয়া করে মোটা জামিন নিয়ে আসামীকে এক মাসের জন্যে ছেড়ে দিন, প্রদর্শনী শেষ হলেই সে জেলে ঢুকবে। কিন্তু হাকিমটি অত্যন্ত এক-গুঁয়ে আর অবুঝ, কোনও আবদার শুনলেন না। তাই গোপীরাম এখন জেলে রয়েছে।

হংসেশ্বর পূর্বে বুঝতে পারেন নি যে মোষটা গোপীরামের এত নেওটা হয়ে পড়েছে। এখন তিনি অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছেন। গোপীরামের সহকারীরা কেউ ভয়ে এগোয় না, কাছে গেলেই রাজমহিষী গুঁতুতে আসে। শুধু হংসেশ্বরকে সে কাছে আসতে আর গায়ে হাত বুলুতে দেয়, কিন্তু তিনি খুব সাধাসাধি করেও তাকে খাওয়াতে পারলেন না।

হংসেশ্বরের এই সংকট শুনে বংশীধর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। তিনি তখন এক ছড়া সিংগাপুরী কলা মোষের নাকের সামনে

ধরে লোভ দেখাচ্ছেন আর খাবার জন্যে অনুনয় করছেন, কিন্তু মোষ ঘাড় ফিরিয়ে নিচ্ছে।

বংশীধর বলল, কাকাবাবু, আমি কোনও সাহায্য করতে পারি কি?

হংসেশ্বর খেঁকিয়ে বললেন, গুঁতো খাবার ইচ্ছে হয় তো এগিয়ে আসতে পার।

হঠাৎ বংশীধরের মাথায় একটা মতলব এল। হংসেশ্বরের কাছ থেকে সরে এসে সে গোপীরামের সহকারীদের সঙ্গে কথা কয়ে রাজমহিষী সম্বন্ধে অনেক খবর জেনে নিল। তার পরদিন ভোরের ট্রেনে সে বর্ধমান জেলে গোপীনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তার উদ্দেশ্য শুনে জেলার খুশী হয়ে অনুমতি দিলেন।

রাধানাথপুরে ফিরে এসেই হংসেশ্বরের কাছে গিয়ে বংশীধর বলল, কাকাবাবু, ভাববেন না, আপনার মোষ যাতে খায় তার ব্যবস্থা আমি করছি।

হংসেশ্বর বললেন, ব্যবস্থাটা কি রকম শুনি? তুমি ওকে খাওয়াতে গেলেই তো গুঁতিয়ে দেবে।

—আমি নয়, আপনিই ওকে খাওয়াবেন। গোপীরামের সঙ্গে দেখা করে আমি সব হদিস জেনে নিয়েছি। ব্যাপার হচ্ছে এই।—মোষটাকে খাওয়াবার সময় গোপীরাম তার গায়ে হাত বুলিয়ে একটা গান গাইত। সেই গানটি না শুনলে রাজমহিষীর আহারে রুচি হয় না।

—এতো বড় অদ্ভুত কথা।

—আজ্ঞে, রুশ বিজ্ঞানী প্যাভলভ একেই বলেছেন কণ্ডিশণ্ড্ রিফ্লেক্স। আপনাকে গানটি শিখে নিতে হবে।

হংসেশ্বর বললেন, গান-টান আমার আসে না। যাই হক, গানটা কি শুনি?

বংশীধর বলল, কাকাবাবু, আমারও একটা কণ্ডিশন আছে। আগে কবুল করুন—মোষ যদি আগের মতন খায় তবে আমাকে খুব মোটা বকশিশ দেবেন।

—কি চাও তুমি? চকোরীর সঙ্গে বিয়ে?

—চকোরীর কথা পরে হবে। আপনার তিনখানা বাড়ি আমাকে দেবেন, ব্রার্বোন রোডের সেই আটতলাটা, চৌরঙ্গীর ছতলাটা, আর সাদার্ন অ্যাভিনিউএর তেতলটা।

—ওঃ, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় ছোকরা! ওই তিনটে বাড়ি থেকে মাসে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার আসে তা জান?

—আজ্ঞে জানি বইকি। কিন্তু ওর কমে তো পারব না কাকাবাবু। ওই আয় যখন আমার হবে তখন চকোরীর সঙ্গে বিয়ে দিতে আপনার আর আপত্তি থাকবে না। আপনারও কিছু সুবিধে হবে, ইনকম ট্যাক্স আর ওয়েল্‌থ ট্যাক্স কম লাগবে।

—তুমি এত বড় শয়তান তা জানতাম না। যাই হক, যখন অন্য উপায় নেই তখন তোমার কথাতেই রাজী হলুম। রাজমহিষী যদি পেট ভরে খায় তবে তোমাকে ওই তিনটে বাড়ি দেব। কিন্তু যদি না খায় তবে তুমি এ বাড়ির ত্রিসীমায় আসবে না।

—যে আজ্ঞে।

—কথা তো দিলুম, এখন গানটা কি শুনি?

—আজ্ঞে, শোনাতে লজ্জা করছে, গানটা ঠিক ভদ্র সমাজের উপযুক্ত নয় কিনা। কিন্তু অন্য উপায় তো নেই আমার কাছেই আপনাকে শিখে নিতে হবে। গোপীরামের গানটা হচ্ছে—

সোনামুখী রাজভঁইসী পাগল করেছে
যাদু করেছে রে হামায় টোনা করেছে।
ঝমে ঝমে ঝঁয় ঝঁয়, ঝমে ঝমে ঝঁয়।

—ও আবার কি রকম গান ?

—গানটার একটু ইতিহাস আছে। গোপীরাম আগে দারভাঙ্গায় থাকত। সেখানে একটা পাগল বাঙালীদের বাড়ীর সামনে ওই গানটা গাইত, তবে তার প্রথম লাইনটা একটু অন্য রকম—সোনামুখী বাঙালিনী পাগল করেছে। এই গান শুনলেই বাড়ির লোক দূর দূর করে পাগলটাকে তাড়িয়ে দিত। গোপীরাম সেই গানটা শিখে এসেছে, শুধু বাঙালিনীর জায়গায় রাজভঁইসী করেছে। আপনি আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে শিখুন, আজ রাত দশটা পর্যন্ত রিহার্সাল চলুক।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় রাজী হয়ে হংসেশ্বর গানটা শেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বংশীধর বার বার সতর্ক করে দিল—রাজমহিষী নয় কাকাবাবু, বলুন রাজভঁইসী, আমায় নয়, বলুন হামায়। উচ্চারণটা ঠিক গোপীরামের মতন হওয়া দরকার। হঁা এইবার হয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানিক গলা সাধলেই সুরটি আয়ত্ত হবে।

সকাল বেলা হংসেশ্বর বললেন, দেখ বংশী, রাজমহিষীকে খাওয়াবার সময় তুমি আমার পিছনে থেকে প্রম্‌ট করবে, আমার সঙ্গে থাকলে তোমাকে গুঁতিয়ে দেবে না। আর একটা কথা—শুধু তুমি আর আমি থাকব, আর কেউ থাকলে আমি গাইতে পারব না।

বংশীধর বলল, ঠিক আছে, অন্য কারও থাকবার দরকার নেই।

দু বালতি রাজভোগ বংশীধর রাজমহিষীর জন্যে বয়ে নিয়ে গেল, হংসেশ্বর তা গামলায় ঢেলে দিলেন। বংশীধর পিছনে গিয়ে বলল, কাকাবাবু, এইবার গানটা ধরুন।

মোষের পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে হংসেশ্বর মধুর স্বরে বললেন ;

লক্ষ্মী সোনা আমার, পেট ভরে খাও, নইলে গায়ে গত্তি লাগবে কেন, দুধ আসবে কেন, সেই মুলতানীটা যে তোমাকে হারিয়ে দেবে। হুঁ হুঁ হুঁ—

সোনামুখী রাজভঁইসী পাগল করেছে,
জাদু করেছে রে হামায় টোনা করেছে—

ঘোষ ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। বংশীধর ফিসফিস করে বলল, থামবেন না কাকাবাবু, বেশ দরদ দিয়ে বার বার গাইতে থাকুন, শেষ লাইনের সুরে ভুল করবেন না, ঝমে ঝমে ঝঁয় ঝঁয় ঝমে ঝমে ঝঁয়—নিনি ধাপ্‌পা পা মা মাগ্‌গা গা রে সা।

তাল-মান-লয় ঠিক রেখে হংসেশ্বর তিনবার গানটা শেষ করলেন, তার পর চতুর্থবার ধরলেন—সোনামুখী রাজভঁইসী ইত্যাদি।

সহসা ঘোষ মাথা নামিয়ে গামলায় মুখ দিল। তার পর সেই নির্জন প্রাঙ্গনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মৃদু মন্দ আওয়াজ উঠল—চবৎ চবৎ চবৎ। রাজমহিষী ভোজন করছেন।

পরবর্তী ঘটনাবলী সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। পনরো দিনের মধ্যেই রাজমহিষীর বপু গজেন্দ্রাণীর তুল্য হল, গায়ে স্বল্প লোমের ফাঁকে ফাঁকে নিবিড় আলতা-কালির রঙ ফুটে উঠল, বিপুল পয়োধর থেকে প্রত্যহ পঁচিশ সের দুধ বেরুতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গ-গবাদি-পশু-প্রদর্শনীতে সে মহিম বাঁড়ুজ্যেদের মুলতানী এবং অন্যান্য প্রতিযোগিনীদের অনায়াসে হারিয়ে দিল। রাজ্যপালী তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন, কৃষিমন্ত্রী সন্তর্পণে এক ছড়া রজনীগন্ধার মালা তার গলায় পরিয়ে দিলেন। রাজমহিষী প্রসন্ন হয়ে সেই অর্ঘ্যটি গ্রহণ করে চিবুতে লাগল।

বংশীধরের নতুন আবদার শুনে হংসেশ্বর বললেন, আবার চাকরির শখ হল কেন? আমার বুকে বাঁশ দিয়ে তো যত পেরেছ বাগিয়ে নিয়েছ।

বংশীধর বলল, আজ্ঞে, একটা ভাল পোস্ট না পেলে যে আমার সেল্ফ-রেসপেক্ট থাকবে না। লোকে বলবে, ব্যাটা শ্বশুরের বিষয় পেয়ে নবাবি করছে।

(একটি ইংরেজী গল্পের প্লটের অনুসরণে। লেখকের নাম মনে নেই।)

১৮৭৯

নবজাতক

সোমনাথের বউ উমা আসন্নপ্রসবা। পাশের ঘরে ডাক্তার নর্স ধাই মোতায়েন আছে। বাইরের বসবার ঘরে শুভাকাঙ্ক্ষী স্বজনবর্গ অপেক্ষা করছে, উমা আর সোমনাথ দুজনেরই ইচ্ছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবামাত্র যেন সকলের আশীর্ব্বাদ পায়। সোমনাথ অস্থির হয়ে এ ঘর ও ঘর করে বেড়াচ্ছে। ডাক্তার বার বার তাকে বোঝাচ্ছেন, অত উতলা হচ্ছেন কেন, হলেনই বা প্রথম পোয়াতী, আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই, কিছুমাত্র চিন্তার কারণ নেই।

সন্ধ্যা সাড়ে সাত। উদীয়মান জ্যোতিঃসম্রাট তারক সান্যাল তার হাতঘড়ি দেখে বলল, রেডিওর সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছি, করেক্ট টাইম। যদি ঠিক আটটা পাঁচ মিনিটে সনাতন ভূমিষ্ঠ হয় তবে সে রাজচক্রবর্তী হবে। ডাক্তারের উচিত ততক্ষণ ছেলেকে ঠেকিয়ে রাখা।

নাস্তিক ভূজঙ্গ ভঞ্জ বলল, যত সব গাঁজা। তোমাদের জ্যোতিষ তো আগাগোড়া ভুল, জন্মক্ষণ ঠিক করেই বা কি হবে? যে আসছে সে তোমার কথা শুনবে না, ডাক্তারের বাধাও মানবে না, নিজের মর্জিতে যথাকালে বেরিয়ে আসবে। আর, ছেলে হবে তাই বা ধরে নিচ্ছ কেন?

—নির্ঘাত ছেলে হবে। আমি সোমনাথের বউএর কররেখা দেখেছি, তা ছাড়া খনার ফরমুলা কষে ভাগশেষ এক পেয়েছি—একে সুত দুইএ সুতা তিন হইলে গর্ভ মিথ্যা।

সোমনাথ হঠাৎ ছুটে এসে মাথার চুল টেনে বলল, ওঃ, আর তো যন্ত্রণা দেখতে পারি না। কি পাপই করেছি, আমার জন্যেই এত কষ্ট পাচ্ছে।

সোমনাথের ভগিনীপতি পাঁচুবাবু বললেন, তোমার মুণ্ডু। পাপ কিচ্ছু কর নি, মানবধর্ম পালন করেছ, বউকে শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছ। না দিলে চিরকাল গঞ্জনা খেতে। তবে হাঁ, যদি তাকে তিন বারের বেশী আঁতুড় ঘরে পাঠাও তবে তোমাকে বর্বর স্বার্থপর সমাজ-বিদ্রোহী বলব। কুইন ভিক্‌টোরিয়ার যুগ আর নেই, গণ্ডা গণ্ডা সন্তানের জন্ম দিলে দেশের লোক কৃতার্থ হবে না।

পণ্ডিত হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, ওহে সোমনাথ, বউমাকে জম্ভলার নাম নিতে বল। অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী, তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ গর্ভিণী বিশল্যা ভবেৎ। অর্থাৎ গোদাবরীর তীরে জম্ভলা রাক্ষসী থাকে, তার নাম স্মরণ করলেই গর্ভিণীর যন্ত্রণা দূর হয়ে সুপ্রসব হয়।

তারক জ্যোতিষী বলল, এখন নয়, আটটা বেজে তিন মিনিটের সময় জম্ভলার নাম নিতে বলবেন! কাল সকালেই আমি কোষ্ঠী গণনায় লেগে যাব, প্রাচ্য আর প্রাশ্চাত্ত্য সিদ্ধান্ত, ভৃগু আর জ্যাডকিল, দুটোরই সমন্বয় করব, প্রাচীন নবগ্রহ আর আধুনিক ইউরেনস, নেপচুন প্লুটো কিছুই বাদ দেব না। দেখে নেবেন আমার ভবিষ্যৎ গণনা কি নির্ভুল হবে।

পাঁচুবাবু বললেন, ভবিষ্যৎ তো পরের কথা, সন্তানের বর্তমান হালচাল কিছু বলতে পার?

—না বর্তমান আমার গণ্ডির বাইরে, আমার কারবার শুধু ভবিষ্যৎ নিয়ে।

হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, গীতায় আছে, জীবের শুধু মধ্য অবস্থা অর্থাৎ জীবিতাবস্থাই আমরা জানতে পারি, তার পূর্বে কি ছিল এবং মরণের পরে কি হবে তা অব্যক্ত। সোমনাথের সন্তান এখন অতীত আর বর্তমানের সন্ধিক্ষণে রয়েছে। এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যা আছে বলছি শুনুন। পরলোকবাসী মানবাত্মার পাপ-পুণ্যের ফলভোগ যখন সমাপ্ত হয় তখন সে মর্ত্যলোকে পতিত হয়

এবং মেঘে প্রবেশ করে জলময় রূপ পায়। সেই জল বৃষ্টি রূপে পত্র পুষ্প ফল মূল ওষধি বনস্পতি সঞ্চারিত হয় এবং তা ভক্ষণের ফলে নরনারীর দেহে শুক্র শোণিত উৎপন্ন হয়। গর্ভাধানকালে শুক্রের আধিক্যে পুরুষ, শোণিতের আধিক্যে স্ত্রী, এবং উভয়ের সমতায় ক্লীবের সৃষ্টি হয়। জরায়ুমধ্যস্থ ভ্রূণ প্রথম দিনে পঙ্কতুল্য, পাঁচ দিনে বুদ্‌বুদ, সাত দিনে পেশী, এক পক্ষে অর্বুদ, পঁচিশ দিনে ঘন, এবং এক মাসে কঠিন আকার পায়। দুই মাসে মস্তক, তিন মাসে গ্রীবা, চার মাসে ত্বক, পাঁচ মাসে নখ ও রোম, ছ মাসে চক্ষু কর্ণ নাসা আর মুখের সৃষ্টি হয়। সপ্তম মাসে ভ্রূণ স্পন্দিত হয়, অষ্টম মাসে বুদ্ধি যোগ হয়, এবং নবম মাসে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা পায়। জন্মের পরেই শিশুর অনুভূতি হয়। তার পর সে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, প্রাক্তন কর্ম অনুসারে সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করে, এবং মৃত্যুর পরে পুনর্বার দেহান্তর পায়।

পাঁচুবাবু বললেন, ওহে প্রফেসর অনাদি, তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে?

বায়োলজিস্ট অনাদি রায় বললেন, সত্যার্থী মশায় নেহাত মন্দ বলেন নি। আমরা যা জানি তা বলছি শুনুন। প্রথমে দুটি অতি ক্ষুদ্র কোষের সংযোগ, তা থেকে ক্রমশ অসংখ্য কোষের উৎপত্তি, তারই পরিণাম এই মানবদেহ। প্রথম কয়েক মাস ভ্রূণকে মানুষ বলে চেনা যায় না, মনে হয় মাছ টিকটিকি বা বেরাল-ছানা। কোটি কোটি বৎসরে মানুষের যে ক্রমিক রূপান্তর হয়েছে, জরায়ুস্থ ভ্রূণ যেন তারই পুনরভিনয় করে। চার-পাঁচ মাসে তার চেহারা মানুষের মতন হয়, সে হাত-পা নাড়ে, মাঝে মাঝে মাথা দিয়ে গর্ভধারিণীকে গুঁতো মারে, হয়তো আঙুলও চোষে। গর্ভবাসকালে সে শ্বাস নেয় না, কিন্তু দেড় মাসের হলেই ভ্রূণের বুক ধুকধুক করতে থাকে। পুষ্টির জন্যে যা দরকার সবই তার মায়ের রক্ত থেকে ফুল বা প্লাসেণ্টার মধ্যে ফিলটার হয়ে গর্ভনাড়ী

দিয়ে ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করে। জরায়ুস্থ তরল পদার্থের মধ্যে সে যেন জলচর প্রাণী রূপে বাস করছিল, ভূমিষ্ঠ হয়েই সে হঠাৎ স্থলচর হয়ে যায়। দু-এক মিনিটের মধ্যেই সে শ্বাস নেবার চেষ্টা করে, খাবি খেয়ে কেঁদে ওঠে, নাক মুখ দিয়ে লালা বার করে ফেলে। নবজাত মনুষ্যশাবক লম্বায় এক হাতের কম, ওজনে প্রায় সাড়ে তিন সের, মাথা বড়, পেট লম্বা, হাত-পা ছোট ছোট। মা বাপ ভাই বোনের সঙ্গে তার চেহারার যতই মিল থাকুক, সে একজন স্বতন্ত্র অদ্বিতীয় মানুষ। প্রথম কয়েক মাস সে সমবয়সী ছাগল-ছানার চাইতেও অসহায়, কিন্তু তার পর তার শক্তি আর বুদ্ধি ক্রমশ বাড়তে থাকে।

হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, অনাদিবাবু শুধু স্থূল দেহের উৎপত্তির বিবরণ দিলেন, কিন্তু মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার আর আত্মার কথা তো বললেন না।

অনাদি রায় বললেন, ও সব কিছুই জানি না সত্যার্থী মশায়, বলব কি করে?

সোমনাথ কান খাড়া করে ছিল, হঠাৎ একটু অস্ফুট আর্তনাদ শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল। তারক সান্যাল তার হাত-ঘড়িতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল। আর সকলে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তার পর হঠাৎ আওয়াজ এল—ওয়াঁ ওয়াঁ।

তারক জ্যোতিষী বলল, আটটা বেজে তিন মিনিট, আহাহা, আর দু মিনিট পরে হলেই খাসা হত। যাই হক, আমার গণনায় ভুল হয় নি, পুত্র সন্তানই হয়েছে।

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বলল, তুমি জানলে কি করে?

—ওই যে, হুলো বেরালের মতন ডেকে উঠল। মেয়ে হলে উয়াঁ উয়াঁ করত।

কবি শ্রীকণ্ঠ নন্দী এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। এখন বললেন. তারকবাবুর কথা ঠিক। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে লিখেছেন, জনক রাজা লাঙল চালাতে চালাতে হঠাৎ দেখলেন, মাটির ডেলা থেকে ছোট্ট একটি মেয়ে বেরিয়েছে, 'উঙা উঙা করি কাঁদে যেন সৌদামিনী।'

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বলল, তারকের মতন গুনে বলতে সবাই পারে। হয় ছেলে না হয় মেয়ে, এই দুটোর মধ্যে একটা যদি বাই চান্স মিলে যায় তাতে বাহাদুরিটা কি ?

সোমনাথের ভাগনী তোতা শাঁখ বাজাতে বাজাতে এসে বলল, মামীর খোকা হয়েছে, এই অ্যাত্তো বড়, গোলাপ ফুলের মতন লাল টুকটুকে।

পাঁচুবাবু বললেন, লাল টুকটুকে রঙ একমাসের মধ্যেই নবঘনশ্যাম হয়ে যাবে। তোর মামা কি করছে রে ?

—নর্স বলছে চলে যেতে, কিন্তু মামা ঘর থেকে নড়বে না খালি খালি ছেলের দিকে চেয়ে আছে।

—হুঁ। প্রথম যখন ছেলে হল ভাবলুম বাহা বাহা রে। সোমনাথের সেই দশা হয়েছে। আর দেরি করে কি হবে, আমাদের আশীর্বাদটা এখনই সেরে ফেলা যাক। সোমনাথকে ডাকবার দরকার নেই, পরে জানিয়ে দিলেই চলবে। সে এখন পুত্রের চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করতে থাকুক। সত্যার্থী মশায়, আপনিই আরম্ভ করুন।

গলায় খাঁকার দিয়ে হরিবিষ্ণু সত্যার্থী সুর করে বলতে লাগলেন—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসংবিৎসুখসাগরেঽস্মিন্
লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

এই নবকুমার স্বাস্থ্যবান বিত্তবান ধর্মপ্রাণ হয়ে বেঁচে থাকুক, পরম

জ্ঞান লাভ করুক, পরব্রহ্ম রূপ অপারসংবিৎসুখসাগরে তার চিত্ত লীন হক, তাতেই তার কুল পবিত্র হবে, জননী কৃতার্থা হবেন, বসুন্ধরা পুণ্যবতী হবেন। এর চাইতে বড় আশীর্বাদ আমার জানা নেই।

পাঁচুবাবু হাত নেড়ে বললেন, এ কি রকম বেয়াড়া আশীর্বাদ করলেন সত্যার্থী মশায়! সোমনাথের ছেলের চিত্ত যদি পরব্রহ্ম লীন হয়ে যায় তবে আর রইল কি? ওর বাপ মা আত্মীয় স্বজন যে মহা ফেসাদে পড়বে।

হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, বেশ তো, আপনি নিজের মনের মতন একটি আশীর্বাদ করুন না।

পাঁচুবাবু বললেন, শুনুন। আশীর্বাদ করি, এই ছেলে সুস্থ দেহে দিন দিন বাড়তে থাকুক, বেশী অসুখে ভুগে যেন বাপ-মাকে না জ্বালায়। সুন্দর সবল খোকা হয়ে বালগোপালের মতন উপদ্রব করুক, যথাকালে লেখাপড়া শিখুক, ভাল রোজগার করুক, প্রেমে পড়ে বিয়ে করুক কিংবা বিয়ে করে প্রেমে পড়ুক। সে তেজস্বী বীরপুরুষ হক। গুণ্ডা হতে বলছি না, কিন্তু এক চড়ের বদলে তিন চড় যেন ফিরিয়ে দিতে পারে, দরকার হলে সে যেন দশের জন্যে লড়তে পারে, উড়তে পারে। জাহাজ চালাতে পারে। সে যেন অলস বিলাসী হুজুগে না হয়, নাচ গান আর সিনেমা নিয়ে না মাতে, চোর ঘুষখোর মাতাল লম্পট না হয়। বহু লোককে সে প্রতিপালন করুক, প্রচুর উপার্জন করে জনহিতার্থে ব্যয় করুক, কিন্তু বেশী টাকা জমিয়ে রেখে যেন বংশধরদের মাথা না খায়। তার অসংখ্য বন্ধু হক, গোটা কতক শত্রুও হক, নইলে সে আত্মগর্বী হয়ে পড়বে। সে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ যত খুশি চর্চা করুক, কিন্তু যেন বুদ্ধ যিশু শংকর আর শ্রীচৈতন্যের মতন সংসারত্যাগী না হয়। তার মহাপুরুষ পরমপুরুষ বা অবতার হবার কিছুমাত্র দরকার নেই। তবে হাঁ বঙ্কিমচন্দ্র কাটছাঁট করে যে রকম bowdlerized নির্দোষ সর্বগুণান্বিত আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ

খাড়া করেছেন সে রকম যদি হতে পারে তাতে আমাদের আপত্তি নেই। মোট কথা আমরা চাই সোমনাথের ব্যাটা একজন মান্য গণ্য স্বনামধন্য চৌকশ পরিপূর্ণ পুং পুরুষ হয়ে উঠুক, যাকে বলে hundred per cent he-man.

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বলল, পাঁচু-দা ভালই বলেছেন, তবে ওঁর আশীর্বাদে বুর্জোআ ভাব প্রকট হয়েছে। প্রজার ভাগ্য আর রাষ্ট্রের ভাগ্য এক সঙ্গে জড়িত, রাষ্ট্রের সংস্কার না হলে প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হতে পারে না। অতএব রাষ্ট্র আর প্রজা দুইএরই মঙ্গলকামনায় আমি বলছি—এই সদ্যোজাত ভারত-সন্তান যেন এমন শাসনতন্ত্রের আশ্রয় পায় যা তাকে সর্বাত্মক শিক্ষা দেবে, তার সামর্থ্যের উপযুক্ত কর্ম দেবে, তার প্রয়োজনের উপযুক্ত জীবিকার ব্যবস্থা করবে, সে যেন কায়মনোবাক্যে রাষ্ট্র বিধির বশবর্তী হয়, তার চিত্ত পরব্রহ্মে লীন না হয়ে যেন রাষ্ট্রেই লীন হয়। সে যেন বোঝে, সে রাষ্ট্রেরই একটি অবয়ব, হাত পা প্রভৃতির মতন সেও এক বিরাট মস্তিষ্কের অধীন, তার স্বাতন্ত্র্য নেই।

পাঁচুবাবু বললেন, তুমি বলতে চাও এই শিশু রাষ্ট্রদাস হয়ে জন্মেছে, চিরকাল রাষ্ট্রদাস হয়েই থাকবে। তার নিজের মতে চলবার বা আপত্তি জানাবার অধিকার নেই যত অধিকার শুধু রাষ্ট্রের বিরাট মস্তিষ্ক অর্থাৎ চাঁদেরই আছে। ওসব চলবে না বাপু, সোমনাথের অপত্য কর্তাভজা হয়ে কলের পুতুলের মতন হাত পা নাড়বে কিংবা পিঁপড়ে মৌমাছির মত বাঁধাধরা সংস্কারের বশে একঘেয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে তা আমরা চাই না। ওহে শ্রীকণ্ঠ কবি, তোমার কণ্ঠ নীরব কেন? তুমি একটি আশীর্বাণী বল।

শ্রীকণ্ঠ নন্দী বললেন, বলবার অবসর পাচ্ছি কই? স্বর্গ থেকে একটি শিশু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে আদর করে ঘরে তুলবেন, তা

নয়, শুধু বায়োলজি ব্রহ্মনির্বাণ সমাজতত্ত্ব আর রাজনীতির কচকচি। আসুন আমরা নবজাতককে অভিনন্দন জানাই, মহাত্মা কবীর যেমন তাঁর পুত্র কমালকে পেয়ে বলেছিলেন তেমনি সোমনাথের হয়ে আমরাও বলি—

অজব মুসাফির ঘর মে আয়া ধরো মংগল থাল,
উজ্জর বংশ কবীর কা উপজে পুত কমাল।

—আশ্চর্য পথিক ঘরে এসেছে, মঙ্গল থাল ধরে তাকে বরণ কর ; কবীরের বংশ উজ্জ্বল হল, পুত্র কমাল জন্মেছে। অথবা টেনিসনের মতন উদাত্ত কণ্ঠে সম্ভাষণ করুন—

Out of the deep, may child. out of the deep,
From that great deep, before our world begins,
Whereon the spirit of God moves as he will…
From that true world within the world we see,
Whereof our world is but the bounding shore…
With this ninth moon, that sends the hidden sun
Down you dark sea, thou comest, darling boy.

কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতন বলুন—

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্য কালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দস্রোতে—

গরুচোরের মতন সলজ্জ মুখে সোমনাথ ঘরে এসে বলল, চা করতে বলি? তার সঙ্গে কচুরি আর রসগোল্লা ?

পাঁচুবাবু বললেন, রাম বল। তোমার তো এখন জাতাশৌচ, এ বাড়ির কোনও জিনিস আমাদের খাওয়া চলবে না, কি বলেন সত্যার্থী মশায় ? এক মাস কাটুক, তোমার বউ চাঙ্গা হয়ে উঠুক,

তার পর খোকাকে কোলে নিয়ে আমাদের যত ইচ্ছে হয় পরিবেশন করবে।

তোতা বলল, বা রে খোকাকে কোলে নিয়ে বুঝি পরিবেশন করা যায়!

—আচ্ছা আচ্ছা, খোকা না হয় তোর মামার কোলে থাকবে।

—আর যদি মামার—

—তা হলে তোর মামার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে।

১৮৭৯

চিঠি বাজি

সুকান্ত দত্ত অতি ভাল ছেলে, এম, এস-সি পাস করার কিছুদিন পরেই পি-এচ, ডি ডিগ্রী পেয়েছে। একটি ভাল চাকরি যোগাড় করে প্রায় বছরখানিক সিন্দ্রির সার-কারখানায় কাজ করছে। তার বাপ-মা নেই, মামাই তাকে মানুষ করেছেন।

আজ সকালের ডাকে মামার কাছ থেকে সুকান্ত একটা চিঠি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন—

সুকান্ত, তোমার বিবাহ স্থির করেছি, বিজয়লক্ষ্মী কটন মিলের কর্তা বিজয় ঘোষের মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে। বনেদী বংশ, বিজয়বাবু আমাদের কাছাকাছি শাঁখারীপাড়াতে থাকেন। মেয়েটি সুশ্রী, খুব ফরসা, বি, এস-সি পাস করতে পারে নি, তবে বেশ চালাক। ফোটো পাঠালুম। তোমারই উচিত ছিল নিজে দেখে পাত্রী পছন্দ করা, কিন্তু একালের ছেলে হয়ে কেন যে তুমি আমার উপর ভার দিলে তা বুঝতে পারি না। যাই হক, আমি যথাসাধ্য দেখে শুনে এই পাত্রী স্থির করেছি, আশা করি তোমারও পছন্দ হবে। তেইশে ফাল্গুন বিবাহ, পাঁচ সপ্তাহ পরেই। তুমি এখন থেকে চেষ্টা কর যাতে পনরো দিনের ছুটি পাও। বিবাহের অন্তত দুদিন আগে তোমার আসা চাই।

সুকান্ত মামার চিঠিটা মন দিয়ে পড়ল, ফোটোটাও ভাল করে দেখল। কিছুক্ষণ ভেবে সে তার রঙের বাক্স থেকে তিন-চার রকম রঙ নিয়ে এক টুকরো কাগজে লাগাল এবং নিজের বাঁ হাতের কবজির উপর কাগজখানা রেখে বার বার দেখল তার গায়ের রঙের সঙ্গে মিল হয়েছে কিনা। তার পর আরও খানিকক্ষণ ভেবে এই চিঠি লিখল—

শ্রীযুক্তা সুনন্দা ঘোষ সমীপে। আমার সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। মামাবাবুর চিঠিতে জানলুম আপনি খুব ফরসা। আমার রঙ কিন্তু খবু ময়লা। হয়তো আপনি শুনেছেন শ্যামবর্ণ, কিন্তু তাতে অনেক রকম শেড বোঝায়। আমার গায়ের রঙ ঠিক কি রকম তা আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করি, সেজন্যে এক টুকরো কাগজে রঙ লাগিয়ে পাঠাচ্ছি, আমার বাঁ হাতের কবজির উপর পিঠের সঙ্গে মিল আছে। এই রকম গাঢ় শ্যা বর্ণ স্বামীতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে দয়া এক করে লাইন লিখবেন—আপত্তি নেই। আমার ঠিকানা লেখা খাম পাঠালুম ! যদি আপত্তি থাকে তবে চিঠি লেখবার দরকার নেই। পাঁচ দিনের মধ্যে আপনার উত্তর না পেলে বুঝব আপনি নারাজ। সে ক্ষেত্রে আমি মামাবাবুকে জানাব যে এই সম্বন্ধ আমার পছন্দ নয়, অন্য পাত্রী দেখা হক। ইতি। সুকান্ত।

চার দিন পরে উত্তর এল।—ডক্টর সুকান্ত দত্ত সমীপে। আপত্তি নেই। কিন্তু প্রকৃত খবর আপনি পান নি, আমার গায়ের রঙ আপনার চাইতে ময়লা, কনে দেখাবার সময় আমাকে পেণ্ট করে আপনার মামাবাবুকে ঠকানো হয়েছিল। কিন্তু আপনার মতন সত্যবাদী ভদ্রলোককে আমি ঠকাতে চাই না। আমার কাছে ছবি আঁকবার রঙ নেই। আপনি যে নমুনা পাঠিয়েছেন সেই কাগজ থেকে এক টুকরো কেটে তার উপর একটু ব্ল্যাক কালি লাগিয়ে আমার হাতের রঙের সমান করে পাঠালুম।

পুরুষের কালো রঙে কেউ দোষ ধরে না, কিন্তু সবাই ফরসা মেয়ে খোঁজে, যে জোঁক-কালো সেও অপ্সরী বিদ্যাধরী বউ চায়। আপনি সংকোচ করবেন না, আমার কালো রঙে আপত্তি থাকলে সম্বন্ধ বাতিল করে দেবেন। আর আপত্তি না থাকলে দয়া করে পাঁচ দিনের মধ্যে এক লাইন লিখে জানাবেন। ইতি। সুনন্দা।

চিঠি পেয়েই সুকান্ত উত্তর লিখল।—আপনার রঙ আমার চাইতে

এক পোঁচ বেশী ময়লা হলেও আমার আপত্তি নেই। তবে সত্য কথা বলব। প্রথমটা মন খুঁতখুঁত করেছিল কারণ সুন্দরী বউ একটা সম্পদ, স্বামীর গৌরব আর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু পরেই মনে হল, এ রকম ভাবা নিতান্ত মূর্খতা। ফোটো দেখে বুঝেছি আপনার সৌষ্ঠবের অভাব নেই তাই যথেষ্ট। রঙ ময়লা হলেই মানুষ কুৎসিত হয় না।

আমার একটা বদভ্যাস আছে, জানানো উচিত মনে করি। রোজ পনরো-কুড়িটা সিগারেট খাই। আমার এক বউদিদি বলেন, সিগারেট-খোরদের নিশ্বাসে একটা বিশ্রী মুখপোড়া গন্ধ হয়, তাদের বউরা তা পছন্দ করে না, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারে না। দু-চারটে বাঙালীর মেয়ে যারা মেমদের দেখাদেখি সিগারেট ধরেছে তাদের অবশ্য আপত্তি হতে পারে না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সে দলের নন। আপনার আপত্তি থাকলে এক লাইন লিখে জানাবেন, আমি সম্বন্ধ বাতিল করে দেব। সুকান্ত।

চারদিন পরে সুনন্দার উত্তর এল।—মুখপোড়া গন্ধে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু শুনেছি সিগারেট খেলে নাকি ক্যানসার হয়। আপনি ওটা ছেড়ে দিয়ে হুঁকো ধরুন না কেন? তার গন্ধেও আমার আপত্তি নেই। আমারও একটা বিশ্রী অভ্যাস আছে, রোজ বিশ-পঁচিশ খিলি পান আর দোক্তা খাই। দাঁতের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। যারা পান-দোক্তা খায় তাদের নিশ্বাসে নাকি অ্যামোনিয়ার গন্ধ থাকে। আমার ছোট ভাই লম্বুর নাক অত্যন্ত সেনসিটিভ, কুকুরের চাইতেও। রেডিওতে যখন কৃষ্ণসোহাগিনী দেবীর কীর্তন হয় তখন লম্বু অ্যামোনিয়ার গন্ধ পায়। আবার গ্রামোফোনে যখন ওস্তাদ বড়ে গোলাম মওলার দরবারী কানাড়ার রেকর্ড বাজে তখন লম্বু রশুনের গন্ধ পায়। আমার বদভ্যাসে আপনার আপত্তি না থাকলে এক লাইন লিখে জানাবেন, নতুবা সম্বন্ধ ভেঙে দেবেন। ইতি। সুনন্দা।

সুকান্ত উত্তর লিখল।—আপনি যখন সিগারেটের দুর্গন্ধ সইতে

রাজী আছেন তখন আপনার পান-দোক্তায় আমার আপত্তি নেই। তা ছাড়া আমাদের এই কারখানায় অজস্র অ্যামোনিয়া তৈরি হয়, তার ঝাঁজ আমার সয়ে গেছে। আপনার হুঁকোর প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখব।

কোনও বিষয়ে আমি আপনাকে ঠকাতে চাই না, সেজন্যে আমার আর একটি ত্রুটি আপনাকে জানাচ্ছি। পুরুষরা যেমন অনন্যপূর্বা পত্নী চায়, মেয়েরাও তেমনি এমন স্বামী চায় যে পূর্বে কখনও প্রেমে পড়ে নি। আমি স্বীকার করছি আমি অক্ষতহৃদয় নই। ডেপুটি কমিশনার লালা তোপচাঁদ ঝোপড়ার মেয়ে সুরঙ্গীর সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। তার বাপ মায়ের তেমন আপত্তি ছিল না, কিন্তু শেষটায় সুরঙ্গীই বিগড়ে গেল। সম্প্রতি সে কমার্স ডিপার্টমেণ্টের মিস্টার হনুমন্থিয়াকে বিয়ে করেছে। লোকটা মিশ কালো, যমদূতের মতন গড়ন, তবে মাইনে আমার প্রায় তিন গুণ। আমার হৃদয়ের ক্ষত এখন অনেকটা সেরে গেছে, আপনার সঙ্গে বিবাহের পর একেবারে বেমালুম হবে আশা করি। সুরঙ্গীর একটা ফোটো আমার কাছে আছে, আপনার সামনেই সেটা পুড়িয়ে ফেলব।

সুরঙ্গীর বিবাহ হয়ে যাবার পরে আমার খেয়াল হল যে আমারও শীঘ্র বিবাহ হওয়া দরকার। অবসরকালে আমি ছবি আঁকি, ফোটো তুলি, নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করি। গৃহস্থালির ঝঞ্ঝাট পোহানোর জন্যে একজন গৃহিণী থাকলে আমি নিশ্চিত হয়ে নিজের শখ নিয়ে অবসরযাপন করতে পারি এখন আমার জ্ঞান হয়েছে, হঠাৎ প্রেমে পড়া বোকামি, একত্র বাস করার ফলে একটু একটু করে স্ত্রী-পুরুষের যে ভালবাসা জন্মায় তাই খাঁটি জিনিস। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে তাকে তো দেখবার উপায় নেই, তথাপি মা বাপের স্নেহের অভাব হয় না। সেই রকম বিবাহের আগে পাত্রী না দেখলেও কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। সেজন্যেই মামাবাবুর উপর সব ছেড়ে দিয়েছি।

আমার স্বভাব চরিত্র মতামত সবই আপনাকে জানালুম। আপত্তি না থাকলে একটু খবর দেবেন, ইতি সুকান্ত।

সুনন্দার উত্তর এল।—আপনার স্বভাব চরিত্র আর মতামতে আমার আপত্তি নেই। যেসব চিঠি লিখেছেন তা থেকে বুঝেছি আপনি অতি সত্যনিষ্ঠ অকপট সাধুপুরুষ। অতএব আমিও অকপটে আমার গলদ জানাচ্ছি। পবনকুমার পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে পড়ত, তার সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। কিন্তু সে ভাদুড়ী ব্রাহ্মণ, সেকেলে গোঁড়া বাপ-মা আমাকে পুত্রবধূ করতে মোটেই রাজী হলেন না। পবন এখন ব্যাংগালোরে আছে, খুব একটা বড় পোস্ট পেয়েছে। তাকে পুরো ভুলতে পারি নি, তবে আপনার মতন মহাপ্রাণ স্বামী পেলে একদম ভুলে যাব তাতে সন্দেহ নেই। আমি বলি কি, সুরঙ্গী আর পবনের ফোটো পুড়িয়ে কি হবে, বরং একই ফ্রেমে দুটো ছবি বাঁধিয়ে শোবার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা যাবে। তাতে বিষে বিষক্ষয় হবে, কি বলেন? আপনার অভিপ্রায় জানাবেন। ইতি। সুনন্দা।

সুকান্ত উত্তর লিখল।—সুনন্দা, তোমাকে আজ নাম ধরে সম্বোধন করছি, কারণ আমাদের দুজনের মধ্যে এখন আর কোনও লুকোচুরি রইল না, বিবাহের বাধাও কিছু নেই। লোকে বলে আমি একটু বেশী গম্ভীর প্রকৃতির লোক। শুভাকাঙ্খী বন্ধুরা অধিকন্তু বলে আমি একটু বোকা। তোমার চিঠি পড়ে বুঝেছি তুমি আমুদে মানুষ, আর মামাবাবুর চিঠিতে জেনেছি বি, এস, সি ফেল হলেও তুমি বেশ চালাক। মনে হচ্ছে তোমার আর আমার স্বভাব পরস্পরের পূরক অর্থাৎ কমপ্লিমেণ্টারি। সাইকোলজিস্টদের মতে এই হল আসল রাজযোটক, আদর্শ দম্পতির লক্ষণ। আজ ষোলই ফাল্‌গুন, সাতদিন পরেই আমাদের বিবাহ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের আনন্দ এখনই কল্পনায় উপভোগ করছি। তোমার সুকান্ত।

কিছুদিন পরে সুনন্দার চিঠি এল।—যাঃ, ভেস্তে গেল, এমন মুশকিলেও মানুষ পড়ে। পবন ভাদুড়ী এখানে এসেছে। কাল

আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, দেখ সুনন্দা, এখন আমি স্বাধীন, ভাল রোজগার করি, বাপ মায়ের বশে চলবার কোনও দরকার নেই। তুমি আমার সঙ্গে চল, বাঙ্গালোরে সিভিল বা হিন্দু ম্যারেজ যা চাও তাই হবে।

এই তো পরিস্থিতি। আমার অবস্থাটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। পবন ভাদুড়ীকে হাঁকিয়ে দেওয়া আমার সাধ্য নয়, কালই অর্থাৎ আপনার নির্ধারিত বিবাহের দু'দিন আগেই পবনের সঙ্গে আমি পালাচ্ছি। কিন্তু আপনার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে, আপনার ব্যবস্থা না করে আমি যাচ্ছি না। আমার বোন নন্দা আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট। দেখতে আমারই মতন, তবে রঙ বেশ ফরসা। সেও বি.এস-সি ফেল। ঝকঝকে দাঁত, পান দোক্তা খায় না, এ পর্যন্ত প্রেমেও পড়েনি। আপনার সব চিঠিই সে পড়েছে, পড়ে ভীষণ মোহিত হয়েছে। আপনাকে বিয়ে করবার জন্যে মুখিয়ে আছে। ডক্টর সুকান্ত, দোহাই আপনার, কোনও হাঙ্গামা বাধাবেন না, বাড়ির কাকেও কিছু বলবেন না। আপনাদের প্রোগ্রাম অনুসারে বরযাত্রী নিয়ে যথাকালে আমাদের বাড়ীতে আসবেন, পুরুত যে মন্ত্র পড়াবে সুবোধ বালকের মতন তাই পড়বেন, আমার বাবা নন্দাকেই আপনার হাতে সম্প্রদান করবেন। তাকে পেলে নিশ্চয় আপনি সুখী হবেন। আপনি তো গৃহস্থালি দেখবার জন্যে একটি গৃহিণী চান, সুতরাং সুনন্দার বদলে নন্দাকে পেলেও আপনার চলবে। নিজের বোনের প্রশংসা করা ভাল দেখায় না, নয়তো চুটিয়ে লিখতুম নন্দা কি রকম চমৎকার মেয়ে। আজ বিদায়, এর পর সুযোগ পেলে আপনার সঙ্গে দেখা করে আমি ক্ষমা চাইব। ইতি। সুনন্দা।

সুনন্দার চিঠি পড়ে সুকান্ত হতভম্ব হল, খুব রেগেও গেল। কিন্তু সে যুক্তিবাদী র‍্যাশনাল লোক। একটু পরেই বুঝে দেখল, সুনন্দার প্রস্তাব মন্দ নয়, গৃহিণীই যখন দরকার তখন এক পাত্রীর বদলে আর এক পাত্রী হলে ক্ষতি কি। সুকান্ত স্থির করল সে হাঙ্গামা বাধাবে না, কোনও রকম খোঁজও করবে না, সম্পূর্ণভাবে মামার বশে চলবে, তিনি যেমন ব্যবস্থা করবেন তাই মেনে নেবে।

সুকান্ত কলকাতায় এলে তার মামার বাড়ীর কেউ সুনন্দা সম্বন্ধে কিছুই বলল না, কোনও রকম উদ্বেগও প্রকাশ করল না। যথাকালে বরযাত্রীদের সঙ্গে সুকান্ত বিয়েবাড়ীতে উপস্থিত হল। সেখানেও গোলযোগের কোনও লক্ষণ তার নজরে পড়ল না।

সুকান্ত দেখল, ষোল-সতরো বছরের একটি ছেলে নিমন্ত্রিতদের পান আর সিগারেট পরিবেশন করছে, কন্যাপক্ষের লোকে তাকে লম্বু বলে ডাকছে। তাকে ইশারা করে কাছে ডেকে সুকান্ত চুপি চুপি প্রশ্ন করল, তুমি সুনন্দার ছোট ভাই লম্বু?

লম্বু বলল, আজ্ঞে হাঁ।

—এদিকের খবর কি?

—খবর সব ভালই। দিদিকে এখন সাজানো হচ্ছে, একটু পরেই তো বিয়ের লগ্ন।

—সুনন্দা চলে গেছে?

—কি বলছেন আপনি, বিয়ের কণে কোথায় চলে যাবে?

—তোমার আর এক দিদি নন্দা, তার খবর কি?

—বা রে! আমার তো একটি দিদি, তার সঙ্গেই তো আপনার বিয়ে হচ্ছে।

সুকান্ত চোখ কপালে তুলে বলল, ও!

রাত বারোটার পরে বাসরঘরে অন্য কেউ রইল না। সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল, তুমি সুনন্দা, না নন্দা?

—দুইই। পোশাকী নাম সুনন্দা, আটপৌরে ডাকনাম নন্দা।

—চিঠিতে অত সব মিছে কথা লিখলে কেন?

—কোনও কুমতলব ছিল না। সত্যবাদী উদারচরিত ভাবী বরকে একটু বাজিয়ে দেখছিলুম সইবার শক্তি কতটা আছে।

—তোমার সেই পবননন্দন ভাদুড়ীর খবর কি?

—হাওয়া হয়ে উবে গেছে, তার অস্তিত্বই নেই। আমার কাছে একটি হনুমানজীর ভাল ছবি আছে, তোমার সেই সুরঙ্গীর ফোটোর সঙ্গে বাধিয়ে রাখলে বেশ হবে না?

—তুমি একটি ভীষণ বকাটে মেয়ে। সেইজন্যেই বি.এস-সি-তে ফেল করেছ।

ঝুনি মিত্তির আমার ডবল বকাটে, সে ফার্স্ট হল কি করে? আমি অঙ্কে কাঁচা, ম্যাক্সওয়েলের থিওরিটা মোটেই বুঝতে পারিনা, আর ওইটেরই কোশ্চেন ছিল।

—কেন, ও তো খুব সোজা অঙ্ক। বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। ভি ইকোয়াল টু রুট ওভার ওআন বাই কাপ্পা মিউ—

—থাক থাক, বাসর ঘরে অঙ্ক কষলে অকল্যাণ হয়।

—আচ্ছা কাল বুঝিয়ে দেব।

—কাল তো কালরাত্রি, বর-কনের দেখা হবার জো নেই। সেই পরশু ফুলশয্যায় দেখা হবে।

—বেশ তো, তখন বুঝিয়ে দেব।

—ফুলশয্যায় অঙ্ক কষলে মহাপাতক হয় তা জান? ঠাকুমার আবার আড়িপাতা রোগ আছে, যদি শুনতে পান যে নাতজামাই ফুলশয্যায় অঙ্ক কষছে তবে গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাবেন। তাড়া কিসের, আমি তো পালাচ্ছি না। বছর খানিক যাক, তার পর বুঝিয়ে দিও।

—আচ্ছা তাই হবে। এখন ঘুমনো যাক, কি বল? দেখ
সুনন্দা, তুমি খাসা দেখতে।

—তাই নাকি? তোমার দৃষ্টি তো খুব তীক্ষ্ম।

—সুনন্দা, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান?

—আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে?

—ঠিক তা নয়। মনে হচ্ছে—

—মনে হক গে, এখন ঘুমও।

১৮৭৯

সত্যসন্ধ বিনায়ক

বিনায়ক সামন্ত হাসপাতালে মারা গেছে। অখ্যাত হলেও সে অসামান্য, মহাত্মা গান্ধীর মতনই সে একগুঁয়ে সত্যাগ্রহী ছিল। তফাৎ এই--গান্ধীজী অবস্থা বুঝে রফা করতে পারতেন, কিন্তু বিনায়কের তেমন বুদ্ধি ছিল না। একজন অর্ধোন্মাদ নিজের খেয়ালে বা অন্যের প্ররোচনায় গান্ধীজীকে মেরেছিল। বিনায়ক মরেছে অসংখ্য লোকের দুর্নীতি আর নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে। তার মৃত্যুর জন্যে হয়তো আমরা সকলেই একটু আধটু দায়ী। আমরা বাধ্য হয়ে অনেক অন্যায় করে থাকি, আরও অনেক সয়ে থাকি, তারই পরিণাম বিনায়কের অপমৃত্যু। মরা ভিন্ন তার গত্যন্তর ছিল না, কারণ কাণ্ডজ্ঞানহীন নিষ্পাপ একগুঁয়ে কর্মবীরের জগতে স্থান নেই। কিন্তু পাপাচরণ না করলে এই পাপময় সংসারে জীবনধারণ অসম্ভব এই মোট কথাটা বিনায়ক বুঝত না।

যারা তাকে চিনত তাদের সকলেরই বিশ্বাস যে বিনায়কের মাথায় বিলক্ষণ গোল ছিল, ঠিক পাগল না হলেও তাকে বাতিকগ্রস্ত বলা যায়। কিন্তু সে যে অত্যন্ত সাধু আর দেশপ্রেমী ছিল তাতে কারও সন্দেহ নেই। অল্প বয়সে সে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিল, পরে স্বদেশী আর অসহযোগ নিয়ে মেতেছিল। তারপর একে একে কংগ্রেস কমিউনিস্ট প্রজা-সোস্যালিস্ট হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি নানা দলে মিশে অবশেষে সে স্থির করেছিল, রাজনীতি অতি জঘন্য কুটিল পন্থা, সব দল ত্যাগ করে শুধু সত্যের শরণ নিতে হবে, প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোক শুধু সত্যেরই ঘোষণা করতে হবে, তার পরিণাম কি দাঁড়াবে ভাববার দরকার নেই। অর্থাৎ সর্বধর্মান পরিত্যজ্য, আর মা ফলেষু কদাচন—গীতার এই দুই মন্ত্রই সে মেনে নিয়েছিল।

বিনায়কের সঙ্গে অনেক কাল দেখা হয়নি, তার পর একদিন সে অদ্ভুত বেশে আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় উপস্থিত হল। পরনে ফিকে বেগনী রঙের ধুতি-পাঞ্জাবী, কাঁধ থেকে একটা থলি ঝুলছে, তারও রঙ বেগনী। আমি আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলুম, ব্যাপার কি বিনায়ক, এখন কোন পার্টিতে আছ? বাইরে একটি দঙ্গল দেখছি, ওরা তোমার চেলা নাকি?

বিনায়ক বলল, ওদের ভেতরে আসতে বলব? দশ জন আছে, আপনার এই তক্তপোশে জায়গা না হয় তো মেঝেতেই বসবে।

অনুমতি দিলে বিনায়কের সঙ্গীরা ঘরে এসে কতক তক্তপোশে কতক মেঝেতে বসে পড়ল। তাদের বয়স ষোলো থেকে ত্রিশের মধ্যে, সকলের বেগনী সাজ আর কাঁধে ঝুলি। চায়ের ফরমাশ দিচ্ছিলুম, কিন্তু বিনায়ক বলল, আমরা নেশা করি না, চা সিগারেট পান কিচ্ছু না।

বললুম, খুব ভাল, এখন আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত কর। নতুন পার্টি বানিয়েছ দেখছি, নাম কি, উদ্দেশ্য কি, সব খোলসা করে বল।

বিনায়ক বলল, আমাদের দলের নাম সত্যসন্ধ সংঘ। উদ্দেশ্য, নির্ভয়ে সত্যের প্রচার। এই ইলেকশনে আমরা লড়ব।

—বল কি হে! তোমাদের পার্টির মেম্বার ক জন? টাকার জোর আছে? কংগ্রেস কমিউনিস্ট, প্রজা-সোস্যালিস্ট হিন্দু মহাসভা এদের সঙ্গে লড়তে চাও কোন্ সাহসে? তোমাদের ভোট দেবে কে?

পরম ঘৃণায় মুখভঙ্গী করে বিনায়ক বলল, আমরা ইলেকশনে দাঁড়াব না, নিজের জন্যে বা বিশেষ কারও জন্যে ভোট চাইব না। আমাদের উদ্দেশ্য ভোটারদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া, যাতে তারা ধূর্ত লোকের কথায় ভুলে অপাত্রে ভোট না দেয়।

—খুব সাধু সংকল্প। তোমাদের বেগনী সাজের মানে কি?

—বেগনী হচ্ছে সত্যের প্রতীক।

—এ যে নতুন কথা শোনাচ্ছ। সাদাইতো সত্যের রঙ।

—আজ্ঞে না। সাদা হচ্ছে সব চাইতে ভেজাল রঙ, সমস্ত রঙের খিচুড়ি, ফিজিক্স পড়ে দেখবেন। বুঝিয়ে দিচ্ছি শুনুন। কংগ্রেসের রঙ সাদা, কমিউনিস্টদের লাল, হিন্দুমহাসভার নারঙ্গী বা গেরুয়া। বৌদ্ধ জৈন শ্রমণদের রঙ হলদে, পাকিস্তানী পীরদের সবুজ, জাহাজী খালাসী আর মোটর মিস্ত্রীদের নীল, এবং মেটে হচ্ছে চাষা আর মজুরের রঙ। বাকী থাকে বেগনী, সব চেয়ে সূক্ষ্ম তরঙ্গের রঙ, তাই আমরা নিয়েছি। আমাদের ম্যানিফেস্টো পড়ছি, মন দিয়ে শুনুন।—

—হে দেশের লোক, স্ত্রী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই, সাবধান সাবধান। যা বলছি আপনাদেরই মঙ্গলের জন্যে, আমাদের কিছুমাত্র স্বার্থ নেই। ইলেকশনে আপনারা অবশ্যই ভোট দেবেন, কিন্তু খবরদার, ফন্দিবাজ লোকের কথায় ভুলবেন না। যারা ভোট চাইবে তাঁদের সম্বন্ধে ভাল রকম খোঁজ নেবেন, কন্যাদানের পূর্বে ভাবী জামাই সম্বন্ধে যেমন খোঁজ নেন তার চাইতে ঢের বেশী খোঁজ ভোট দানের পূর্বে নেবেন। কারও উপরোধ শুনবেন না, বক্তৃতায় ভুলবেন না, খুব বিচার করে যোগ্যতম পাত্রকে ভোট দেবেন। কংগ্রেস, প্রজাতন্ত্রী, কমিউনিস্ট, হিন্দু-মহাসভিস্ট, ইত্যাদি হলেই লোক ভাল হয় না, কোনও দলের মাতব্বর হলেই সে দেশের মঙ্গল করবে এমন কথা বিশ্বাস করবেন না। চোর ঘুষখোর কুচরিত্রকে ভোট দেবেন না, মাতাল গেঁজেল আফিমখোর লম্পট পরনারী সক্তকে ভোট দেবেন না। যারা বলে—রাতারাতি তোমাদের সব দুঃখ দূর করব, বেকার কেউ থাকবে না, সকলেই কাজ পাবে, বাড়ি পাবে, মজুর আর চাষীদের রোজগার ডবল হবে, খাদ্য বস্ত্র সবাই সস্তায় পাবে, ট্যাক্স কমবে,—সেই ধাপ্পা-বাজ মিথ্যাবাদীকে ভোট দেবেন না। যারা কোটিপতিদের বন্ধু,

যাদের ছেলে জামাই ভাইপো কোটিপতিদের আফিসে চাকরী করে, যাদের ইলেকশনের খরচ কোটিপতিরা যোগায়, তারা ভোট চাইতে এলে দূর দূর করে হাকিয়ে দেবেন। যাদের প্ররোচনায় ছোট ছোট ছেলেরা ভোটের দালাল হয়ে পথে পথে চিৎকার করে, সেই শিশুমস্তকভক্ষকদের ভোট দেবেন না। যাদের নিজেদের বিচারের শক্তি নেই, বিদেশী প্রভুর হুকুমে ওঠে বসে, বিদেশী প্রভুর কোনও দোষই যারা দেখতে পায় না, সেই কর্তাভজাদের কথায় কান দেবেন না। যারা গরিব শিক্ষকদের জন্যে কুলী মজুরদের চাইতে কম মাইনে বরাদ্দ করে, অথচ হোমরা চোমরা অফিসারদের তিন চার হাজার দিতে আপত্তি করে না, সেই একচোখা স্নবদের ভোট দেবেন না। বড় বড় কুকর্মের তদন্তের জন্যে যারা কমিশন বসায় অথচ তদন্তের ফল চেপে রাখে, দুর্নীতির পোষক সেই কুটিল লোকদের ভোট দেবেন না। যারা খাদ্যে ভেজাল দেয়, কালো বাজার চালায়, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, বিপন্ন ইসলাম আর বিপন্না গোমাতার দোহাই দেয়—

বাধা দিয়ে বললুম, হয়েছে হয়েছে, তোমার বক্তব্য বুঝেছি। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মতন লোকও তোমার টেস্টে ফেল করবেন। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ একদম খাঁটী মানুষ পাবে কোথায়? শুকদেব গোস্বামী গৌতম বুদ্ধ আর চৈতন্য মহাপ্রভুর মতন লোক দিয়ে বজেট তৈরি হবে না, হরিণঘাটার দুধের ব্যবস্থাও হবে না। যারা কাজের লোক তাদের চরিত্র দোষ ধরলে চলে না। মাতাল আর লম্পট যদি অন্য বিষয়ে সাধু হয়, কোটিপতি যদি দাতা হয়, একটু আধটু চোর হলেও কেউ যদি বুদ্ধিমান সুবক্তা জনহিতৈষী হয় তবে তাকে ভোট দিলে অন্যায় হবে না, সচ্চরিত্র বোবা গোবরগনেশ দিয়ে দেশের কোন্ কাজ চলবে?

তক্তপোশে চাপড় মেরে বিনায়ক বলল, সব কাজ চলবে, সচ্চরিত্র খাঁটী লোক বিধানসভায় ঢুকে নিজের শক্তি দেখাবার সুযোগই এ পর্যন্ত পায় নি। দেশের লোক যদি হুঁশিয়ার হয়, অসাধু

ধূর্তদের যদি ভোট না দেয়, তবেই ভাল লোক নির্ব্বাচিত হবে এবং নিজের শক্তি দেখাবার সুযোগ পাবে।

—তোমাদের চলে কি করে? আগে তো তুমি ঘুঘুডাঙ্গা হাই-স্কুলের মাস্টার ছিলে, এখনও আছ নাকি?

—সে ইস্কুল থেকে আমাকে তাড়িয়েছে। এখন একটা কোচিং ক্লাশ খুলেছি, এরাও কজন তাতে পড়ায়। এই ভূপেশ জিতেন আর শৈলেনের বাপদের অবস্থা ভাল, এদের রোজগারের দরকার নেই। এই বিনয় মেয়েদের গান শেখায়, আর এই সুবল বদরীনাথ চৌধুরীর ফার্মে চাকরী করে।

—বল কি হে! ভেজাল ঘি বিক্রীর জন্যে বদরীনাথ অনেক-বার গ্রেপ্তার হয়েছে, বিস্তর ঘুষ আর তদবিরের জোরে প্রতিবার খালাস পেয়েছে।

—আপনি ঠিক জানেন?

—নিশ্চয়। আরে আমিই তো ওর উকিল ছিলুম।

বিনায়ক বলল, এই সুবল, তুই আজই কাজে ইস্তফা দিবি।

সুবল বলল, তা হলে খাব কি?

—দুদিন না খেলে মরবি না, চেষ্টা করে অন্য কোথাও কাজ জুটিয়ে নিবি।

আমি বললুম, ওহে বিনায়ক, তোমার সংকল্প অতি মহৎ তা তো বুঝলুম। আমাদের কাছে কি চাও বল।

—আপনাদের সব রকম সাহায্য চাই। প্রচারপত্র দিচ্ছি, চেনা লোকদের মধ্যে যত পারবেন বিলি করবেন, সত্যসন্ধ সংঘের উদ্দেশ্যটি সকলকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন, আর আমাদের খরচের জন্যে যথাসাধ্য দান করবেন।

আমার বন্ধু হরিচরণবাবু বললেন, ভেরি সরি। আমাদের হচ্ছে পুঁটিমাছের প্রাণ, জলে বাস করি, হাঙর কুমির ঘড়েল রাঘব-বোয়াল সকলের সঙ্গেই সদ্‌ভাব রাখতে হবে।

আর এক বন্ধু কালীচরণ বললেন, ঠিক কথা। নিউট্রাল থাকাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ পলিসি, কর্তৃত্ব যারাই পাক আমাদের তাতে কি। কংগ্রেসীরা এত দিন বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, এখন না হয় অন্য দল কিছু লাভ করুক।

আর এক বন্ধু শিবচরণ বললেন, শুনুন বিনায়কবাবু। আপনারা যা করছেন তার নাম সিডিশন্, বৃটিশ যুগে একেই বলা হত ওয়েজিং ওআর, রাজদ্রোহ। এখন রাজা একটি নয়, এক পাল রাজা, বিধানসভায় আর লোকসভায় যখন যাঁরা গদি পান তাঁরাই আমাদের রাজা। ভোট যাকে খুশি দেব, তা তো কেউ দেখতে যাচ্ছে না, কিন্তু কোনও দলকেই চটাতে পারব না মশাই।

বিনায়ক প্রশ্ন করল, দাদা কি বলেন?

দাদা অর্থাৎ আমি বললুম, শোন বিনায়ক এখানে যাঁরা আড্ডা দিচ্ছেন এঁরা সবাই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর তোমরাও সাধুসজ্জন। তোমার মতন আমি পুরোপুরি সত্যসন্ধ নই, তবু এই বৈঠকে মনের কথা খুলে বলতে আপত্তি নেই। আমরা হচ্ছি সংসারী লোক, দুনিয়ার সঙ্গে রফা করে চলতে হয়। এই দেখ না, শ্রীযুক্ত সুধাবিন্দু নন্দী বিধান সভায় দাঁড়াচ্ছেন। লোকটি যেমন মাতাল তেমনি লম্পট, দুটো খোরপোষের মামলা এখনও ঝুলছে। কিন্তু ইনি আমার একজন বড় মক্কেল। যদি শোনেন যে আমি তোমাদের সাহায্য করছি তবে আমাকে আর কেস দেবেন না। তার পর মিস্টার রাধাকান্ত বসু, লোকসভার ক্যাণ্ডিডেট। বিখ্যাত চোর আর ঘুষখোর। কিন্তু তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার ছোট মেয়ের বিবাহ স্থির হয়েছে। এখন যদি তোমার কথা রাখি তবে অমন ভাল সম্বন্ধটি ভেস্তে যাবে।

বিনায়ক বলল, জেনে শুনে চোর ঘুষখোরের ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন?

—তাতে ক্ষতিটা কি, মেয়ে তো সুখে থাকবে। তা ছাড়া

আমার বেয়াই মিস্টার বাসু চোর বলে আমার জামাইও যে চোর হবে এমন কথা সায়েন্সে বলে না, আবার দেখ, আমার বড়ছেলেটা কোনও গতিকে এম. এ. পাস করে বেকার বসে আছে আর কমরেডদের পাল্লায় পড়ে বিগড়ে যাচ্ছে। তার একটা ভাল পোস্টের জন্যে শ্রীগিরধারীলাল পাচাড়ী চেষ্টা করছেন। আমার বিশিষ্ট বন্ধু, কিন্তু চুটিয়ে কালোবাজার চালান আর পাকিস্তানে চাল আটা তেল কাপড় পাচার করেন। তুমি কি বলতে চাও তাঁকে চটিয়ে দিয়ে আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব ?

বিনায়ক বলল, তবে আপনাদের কাছে কোনও আশা নেই।

—দেখ বিনায়ক, তোমরা যে মহৎ ব্রত নিয়েছ তাতে আমার অন্তত খুব সিমপ্যাথি আছে। তবে বুঝতেই পারছ, আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়েছি। চাও তো কিছু টাকা দিতে পারি, কিন্তু সেটা যেন প্রকাশ না হয়।

বিনায়ক বলল, থাক টাকা এখন চাই না। আচ্ছা, আমরা চললুম, নমস্কার।

দু সপ্তাহ পরে বিনায়ক আবার আমার কাছে এল। আগের মতন বড় দল সঙ্গে নেই, মোটে তিন জন এসেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, খবর কি বিনায়ক, কাজ কেমন চলছে ?

বিনায়ক বললেন, শাস্ত্রে আছে, শ্রেয়স্কর ব্যাপারে বহু বিঘ্ন, তা অতি ঠিক। আমাদের দলের সাতজন ভেগেছে।

—বল কি ! কোথায় গেল তারা ?

—দু জন চাকরি নিয়ে দশটা পাঁচটা আপিস করছে, তাদের ফুরসত নেই। দুটি ছেলে বাপের ধমকে ঠাণ্ডা হয়ে লেখাপড়ায় মন দিয়েছে। সেই বিনয় ছোকরা মেয়েদের যে গান শেখাত, প্রেমে পড়েছে, তারও কিছুমাত্র ফুরসত নেই। আরও দুজন আপনার

ভাবী বেয়াই মিস্টার রাধাকান্ত বাসু আর মুরুব্বী গিরধারীলাল পাচাড়ীর দালাল হয়ে শিঙে মুখে দিয়ে গর্জ্জন করছে—ভোট দিন, ভোট দিন। সেদিন সন্ধ্যার সময় একটা গুণ্ডা এসে আমাকে শাসিয়ে গেছে।

—খুব মুশকিলে পড়েছ দেখছি। খরচের জন্যে কিছু টাকা নেবে?

—তা দিন, কিন্তু দান নয়, কর্জ্জ। আপনি যদি আমাদের সংঘের সহযোগিতা করতেন তবেই দান নিতে পারতুম। টাকাটা যত শীঘ্র পারি শোধ করে দেব।

—সে তো ভাল কথা, তোমার আত্মসম্মান বজায় থাকবে। কিন্তু দেশব্যাপী দুর্নীতি আর তার পোষক বড় বড় লোকদের সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে কি করে? কোন্ দিন হয়ত গুণ্ডার হাতে প্রাণ হারাবে। আমি বলি কি, তোমার এই হোপলেস ব্রতটা ছেড়ে দাও। ভাল অথচ নিরাপদ সংকার্য্য তো অনেক আছে; তারই একটা বেছে নাও—আর্ত-ত্রাণ, রোগীর সেবা, গরিবের ছেলেমেয়ের শিক্ষা, পতিতার উদ্ধার—

—দেখুন মশাই সব কাজ সকলের জন্যে নয়ত, আমি নিজের পথ বেছে নিয়েছি, না হয় একলাই চলব। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যারা প্রথমে দাঁড়িয়েছিল তারা কজন ছিল? অন্য নিরাপদ সংকর্ম বেছে নেয় নি কেন? তারা প্রাণ দিয়েছে, আবার অন্য লোক তাদের স্থান নিয়েছে। আমার এই ব্রত হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ, আমিই না হয় প্রথম শহীদ হব। দেখবেন আমার পরে আরও অনেক লোক এই কাজে লাগবে, প্রথমে অল্প, তার পরে দলেদলে, আচ্ছা, চললুম, নমস্কার।

দশদিন পরে সকালবেলা একটি ছেলে এসে বলল, বিনু-দা এই টাকার থলিটা আপনাকে দিতে বলেছেন। সাড়ে সাত টাকা কম আছে, ওটা আমিই এর পর শোধ করে দেব।

টাকা নিয়ে আমি বললুম, না না, বাকীটা আর শোধ দিতে হবে না। বিনায়কের খবর কি ?

—কাল রাত থেকে হাসপাতালে আছেন, বাঁচবার আশা নেই। শেষ রাত্রে আমার সঙ্গে একটু কথা বলেছিলেন, আপনার ধার শোধ দেবার জন্যে। আজ সকাল থেকে আর জ্ঞান নেই। বড্ড টাকার টানাটানি ছিল, প্রায় একমাস ধরে নামমাত্র খেতেন, অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। কাল সন্ধ্যাবেলা রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, সেই সময় রাধাকান্ত বোসের মোটর তাঁকে চাপা দেয়।

হাসপাতালে যখন পৌঁছলুম তখন বিনায়ক মারা গেছে। তার দলের তিনজন উপস্থিত ছিল।

বিনায়ককে যে টাকা দিয়েছিলুম তার সমস্তই সে ফিরিয়ে দিয়েছে, সাড়ে সাত টাকা ছাড়া। আমার সাহায্যের মূল্য সেই সাড়ে সাত। যদি দু-তিন হাজার তাকে দিতুম তাতেই বা সে কি করতে পারত ? সে চেয়েছিল আন্তরিক সক্রিয় সাহায্য, তা দেওয়া আমার মতন লোকের পক্ষে অসম্ভব। বিনায়কের মহা ভুল, সে দুষ্কৃতদের বিনাশ করতে চেয়েছিল, যে কাজ যুগে যুগে অবতারদেরই করবার কথা। পাগলা বিনায়ক, অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে প্রদীপ্ত অনলে পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ হারিয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা, কিন্তু এরই নাম ভবিতব্য, আমাদের সাধ্য কি যে তার অন্যথা করি। নাঃ, আমাদের আত্মগ্লানির কারণ নেই।

১৮৭৯

যযাতির জরা

মহারাজ যযাতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে বললেন, বৎস, পঁচিশ বৎসর আমি তোমার প্রদত্ত যৌবন উপভোগ করেছি, তুমি তার পরিবর্তে আমার জরার গুরু ভার বহন করেছ। আমার আর ভোগ বিলাশে রুচি নেই। এখন বুঝেছি, কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনা শান্ত হয় না, ঘৃত সংযোগে অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়, অতএব বিষয় তৃষ্ণা ত্যাগ করাই উচিত। আমার পাঁচ পুত্রের মধ্যে তুমি কনিষ্ঠ হলেও গুনে শ্রেষ্ঠ। তোমার ভ্রাতারা সকলেই স্বার্থপর, কেউ আমার অনুরোধ রাখেনি, কিন্তু তুমি দ্বিরুক্তি না করে তোমার নবীন যৌবন আমাকে দিয়েছিলে এবং তার পরিবর্তে আমার পলিত কেশ গলিত দন্ত লোল চর্ম আর দুর্বল ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়েছিলে। পুত্র, এখন জরা ফিরিয়ে দিয়ে তোমার যৌবন নাও, আমার রাজ্যও নাও। তুমি মনোমত সুন্দরী কন্যা বিবাহ কর, সুদীর্ঘকাল জীবিত থেকে ঐশ্বর্য ভোগ কর, আমি সংসার ত্যাগ করে বনগমন করব।

এইখানে একটু পূর্বকথা বলা দরকার। যযাতির প্রথমা পত্নী দেবযানী, শুক্রাচার্যের কন্যা। তাঁর দুই পুত্র হয়েছিল। দ্বিতীয়া পত্নী শর্মিষ্ঠা, দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা। তাঁর তিন পুত্র, পুরু কনিষ্ঠ। শর্মিষ্ঠাকে যযাতি লুকিয়ে বিবাহ করেছিলেন, তা জানতে পেরে দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পিতার আশ্রমে চলে যান। শুক্রাচার্যের শাপে যযাতি অকালেই ষাট বৎসরের বৃদ্ধের তুল্য জরাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

যযাতির বাক্য শুনে পুরু যুক্ত করে সবিনয়ে বললেন, পিতা, আমাকে ক্ষমা করুন। একবার আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করেছিলাম, কিন্তু আপনার এই নূতন আজ্ঞা পালনের অভিরুচি আমার নেই, আপনি কৃপা করে প্রত্যাহার করুন। আমি যৌবন

ফিরে চাই না, আপনিই তা ভোগ করতে থাকুন, আমি জরাতেই তুষ্ট।

যযাতি বললেন, পুত্র, তুমি আমাকে অবাক করলে। আমার অনুরোধে তুমি জরা নিয়েছিলে, কালক্রমে সেই জরা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তা থেকে মুক্ত হতে কেন চাওনা তা আমি বুঝতে পারছি না।

পুরু বললেন, পিতা, আমাদের দুজনের বর্তমান অবস্থাটা বিচার করে দেখুন। যখন আপনি আমার যৌবন নিয়ে আপনার জরা আমাকে দিয়েছিলেন তখন আমার বয়স ছিল বিশ, আর আপনার ছিল ষাট। তার পর পঁচিশ বৎসর কেটে গেছে। এখন আপনি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পৌঢ়, আর আমি পঁচাশি বৎসরের স্থবির। আপনার পৌঢ়তার প্রতি আমার কিছুমাত্র লোভ নেই। জরাগ্রস্ত হবার পর থেকে আমি শাস্ত্রপাঠ যোগচর্চ্চা আর আধ্যাত্মচিন্তায় নিরত আছি, ইন্দ্রিয় ভোগে আমার আসক্তি নেই, সর্ববিধ বিষয়তৃষ্ণা লোপ পেয়েছে। আমি দারপরিগ্রহ করিনি, পরমা সুন্দরী রমণী দেখলেও আমার চিত্ত চাঞ্চল্য হয় না, অতি সুস্বাদু মাংস বা মিষ্টান্নেও আমার রুচি নেই। এই শান্তিময় অবস্থার আমি পরিবর্তন করতে চাই না। এখন আমি মোক্ষলাভের জন্য তপস্যা করছি, আপনার সঙ্গে বয়স বিনিময় করলে আমার পঁচিশ বৎসরের সাধনা পণ্ড হবে।

যযাতি এমন স্বাস্থ্যবান সবল মধ্যবয়স্ক, তাঁর চুল আর গোঁপে মোটেই পাক ধরেনি, দেখলে ত্রিশ বৎসরের যুবা বলেই মনে হয়। তাঁর পুত্র পুরু পঁচাশি বৎসরের বৃদ্ধ, মাথায় এখনও কিছু পাকা চুল অবশিষ্ট আছে, মুখে প্রকাণ্ড সাদা দাড়ি-গোঁফ। প্রৌঢ় যযাতি তাঁর মহাস্থবির পুত্রকে কিঞ্চিৎ ভয় করেন, লজ্জাও করেন। পুরুর কথা শুনে বললেন, পুত্র আমি তোমার তপশ্চর্যার হানি করতে চাইনা, কিন্তু আমার গতি কি হবে? এই যৌবন তুল্য দুর্মদ প্রৌঢ়ত্ব আর যে সহ্য হচ্ছে না।

পুরু বললেন, পিতা, কোনও স্থবির সদ্‌বিপ্র বা সৎক্ষত্রিয়কে আপনার প্রৌঢ়ি দান করুন, তার পরিবর্তে তাঁর জরা গ্রহণ করুন। আপনি মন্ত্রীকে আদেশ দিলে তিনি রাজ্যের সর্বত্র ঢক্কা বাজিয়ে ঘোষণা করবেন, প্রার্থীর অভাব হবে না, যোগ্যতমের সঙ্গেই আপনি বয়স বিনিময় করবেন। এখন আমাকে গমনের অনুমতি দিন, আমি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সংকল্প করেছি, তারই আয়োজন করতে হবে।

পুরু চলে গেলে পঞ্চাশ জন রাজ ভার্যা অন্তঃপুর থেকে এসে ব্যাকুল হয়ে যযাতিকে বেষ্টন করলেন। প্রথমা মহিষী দেবযানী সেই যে রাগ করে পিত্রালয়ে চলে গিয়েছিলেন তার পরে আর ফিরে আসেন নি। দ্বিতীয়া মহিষী শর্মিষ্ঠার বয়স এখন ষাট। তিনি কারও সঙ্গে মেশেন না, অন্তরালে থেকে ধর্মকর্মে কালযাপন করেন। পুনর্যৌবন লাভের পর যযাতি ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশটি বিবাহ করেছেন, এই সকল পত্নীদের বয়স এখন চল্লিশ থেকে পঁচিশ। এঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে প্রবীণা সেই পৃথুলাঙ্গী সপত্নীদের মুখপাত্রী হয়ে যযাতিকে বললেন, আর্যপুত্র, এ কি রকম কথা শুনছি? আপনি নাকি আপনার যৌবন পুরুকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর পঁচাশি বৎসরের জরা নেবেন?

যযাতি বললেন সেই রকমই তো ইচ্ছা। যৌবন আর ভাল লাগে না, এখন বৈরাগ্য অবলম্বন করব। কিন্তু পুরু বেঁকে দাঁড়িয়েছে, সে আর আগেকার মতন পিতৃভক্ত আজ্ঞাপালক পুত্র নয়, তার জরা ছাড়তে চায় না, যেন কতই দুর্লভ সামগ্রী। যদি নিতান্তই তাকে বশে আনতে না পারি তবে কোনও স্থবির ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে আমার বয়স দিয়ে তাঁর জরা নেব।

রাজপত্নীদের মধ্যে যিনি কনিষ্ঠা সেই করঞ্জাক্ষী বললেন, মহারাজ, এই যদি আপনার অভিপ্রায় ছিল তবে আমাদের

পানিগ্রহণ করেছিলেন কেন? আপনি বহু পত্নীর স্বামী, নিজের যৌবন ভোগ করার পর আবার পুত্রের যৌবন ভোগ করেছেন, আপনার যৌবনে অরুচি হতে পারে, কিন্তু আমাদের তো হয়নি। আমাদের অনাথা করে যদি জরা গ্রহণ করেন তবে আপনার মহাপাপ হবে।

যযাতি বললেন, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আমার সংকল্প বদলাতে পারি না। তোমাদের সকলকেই আমি পত্নীত্ব থেকে মুক্তি দিলাম, প্রচুর অর্থও রাজকোষ থেকে পাবে। ইচ্ছা করলে আবার বিবাহ করতে পার।

করঞ্জাক্ষী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, মহারাজ, আপনার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। আমরা সকলেই সন্তানবতী, কে আমাদের পত্নীত্বে বরণ করবে? সবৎসা ধেনুর যে মূল্য সবৎসা নারীর তা নেই।

যযাতি বললেন, আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। নূতন পতি যদি নাও জোটে তথাপি সুখে থাকতে পারবে। এখন যাও, আমার বিস্তর কাজ।

পুত্রের মত পরিবর্তনের জন্য যযাতি অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনও ফল হল না। তখন তাঁর আজ্ঞানুসারে রাজমন্ত্রী এই ঘোষণা করলেন।—ভো ভো বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন সদ্‌বংশজাত স্থবির ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ, অবধান করুন। কুরুরাজ যযাতির আর যৌবন ভোগের ইচ্ছা নেই, কোনও জরাগ্রস্ত সৎপাত্রের সঙ্গে তাঁর বয়স বিনিময় করতে চান। শ্রীযযাতির বর্তমান বয়স পঁয়তাল্লিশ, পূর্ণ যৌবনেরই তুল্য। প্রার্থী স্থবির গণ আগামী অমাবস্যায় পূর্বাহ্ণে হস্তিনাপুরে রাজ ভবনের চত্বরে উপস্থিত হবেন। মহারাজ স্বয়ং নির্বাচন করবেন, যাঁকে যোগ্য মনে করবেন তার সঙ্গেই বয়স বিনিময় করবেন। তাঁর সিদ্ধান্তের কোনও প্রতিবাদ গ্রাহ্য হবে না।

নির্দিষ্ট দিনে প্রায় এক হাজার জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হস্তিনাপুরে এলেন। এঁদের বয়স একশ থেকে ষাট। কেউ কুঁজো হয়ে পড়েছেন, লাটিতে ভর দিয়ে চলেন। কেউ দৃষ্টি হীন, অপরের হাত ধরে এসেছেন। কেউ চলতেই পারেন না, ডুলিতে বয়ে এসেছেন। যযাতির সংকল্পের সংবাদ পেয়ে দেবলোক থেকে অশ্বিনীকুমার আর দেবর্ষি নারদও কৌতূহল বশে উপস্থিত হলেন, কিন্তু আত্মপ্রকাশ না করে অগোচরে রইলেন।

সমবেত প্রার্থিগনকে স্বাগত জানিয়ে যযাতি তাঁদের পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন এমন সময় একদল বৃদ্ধা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন! তাঁদের নেত্রী একজন বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণী। তাঁর মস্তক প্রায় কেশ-শূন্য, ললাটে বৈধব্যের প্রতিষেধক একটি প্রকাণ্ড সিন্দূরের ফোঁটা, পরিধানে রক্তবর্ণ পট্টবাস। ইনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, কুরুরাজ যযাতি, শাস্ত্রে আছে—যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব আর অবিবেকিতা, এর প্রত্যেকটি অনর্থকর, দুর্দৈবক্রমে আপনাতে চারটিই একত্র হয়েছে। এক যৌবনেই রক্ষা নেই, আপনি দুই যৌবন ভোগ করেছেন, সুতরাং যৌবনাক্রান্ত ধেড়ে-রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ কি প্রকার জীব তা ভালই জানেন। যে বৃদ্ধের সঙ্গে আপনি বয়স বিনিময় করবেন সে নিশ্চয় যুবতী ভার্যা ঘরে আনবে। তখন তার বৃদ্ধা পত্নীর কি দশা হবে ভেবে দেখেছেন কি?

যযাতি কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, হুঁ, আপনার আশঙ্কা যথার্থ। ওহে মন্ত্রী, এখনই ঘোষণা করে দাও—যাঁদের পত্নী জীবিত আছেন তাঁদের সঙ্গে আমি বয়স বিনিময় করব না। একটি করে স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী স্বরূপ দিয়ে তাঁদের বিদায় কর।

যাঁদের বাদ দেওয়া হল তাঁরা প্রণামী নিলেন, কিন্তু কেউ চলে গেলেন না, রাজা কাকে মনোনীত করেন দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যে পঙ্গু ব্রাহ্মণ ডুলিতে এসেছিলেন তিনি রাজার সম্মুখে এসে

ডুলিতে বসেই বললেন, মহারাজের জয় হক। আমি মহাকুলীন বিপ্র কুলীরক, বয়স শত বর্ষ, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, আমার পাঁচ পত্নীই একে একে গত হয়েছেন। আমার তুল্য যোগ্যপাত্র কোথাও পাবেন না, অতএব আমার সঙ্গেই বয়স বিনিময় করুন।

নমস্কার করে যযাতি বললেন, দ্বিজোত্তম কুলীরক, আমি জরা কামনা করি, কিন্তু পঙ্গুত্ব চাইনা। মন্ত্রী, এঁকে পাঁচ-স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিদায় কর।

তার পর এক বক্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধ তাঁর দুই পৌত্রের হাত ধরে যযাতির কাছে এসে বললেন, মহারাজ, আমার নাম কিঞ্চুলুক, কার্তবীর্যার্জুনের বংশধর, বয়স আশি। চোখে ভাল দেখতে পাইনা, অগাধ বিদ্যা বুদ্ধির জন্য লোকে আমাকে প্রজ্ঞাচক্ষু বলে। বহু পুত্র-পৌত্র সত্বেও আমি অসুখী, সকলেই আমাকে অবহেলা করে। সম্পত্তির লোভে আমার মৃত্যুকামনা করে। আপনার পরিপক্ক যৌবন পেলে আমি পুনর্বার দার পরিগ্রহ করে সুখী হতে পারব।

যযাতি বললেন, মহামতি কিঞ্চুলুক, আমি জরা চাই, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞাচক্ষুতে আমার কাজ চলবে না। মন্ত্রী, পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে এঁকে বিদায় কর।

বহু প্রার্থী একে একে এসে রাজসম্মুখে নিজের নিজের গুণাবলী বিবৃত করলেন, কিন্তু যযাতি কাকেও তাঁর মহৎ দানের যোগ্য পাত্র মনে করলেন না। সহসা একটা গুঞ্জন উঠল, জনতা সসম্ভ্রমে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিল। দুজন পক্ককেশ পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধ একটি অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী ললনার হাত ধরে রাজার সম্মুখে এলেন।

যযাতি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কে আপনারা দ্বিজদ্বয়? এই বরবর্ণিনী সুন্দরী যাঁর আগমনে সভা উদ্‌ভাসিত হয়েছে ইনিই বা কে?

দুই বৃদ্ধের মধ্যে যিনি বয়সে বড় তিনি বললেন, মহারাজ, আমরা বিন্ধ্যপাদস্থ তপোবন বিল্বাশ্রম থেকে আসছি। মহাতপা

ভল্লাতক ঋষির নাম শুনে থাকবেন, আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভীতক, আর কনিষ্ঠ এই হরীতক। এই রূপবতী কুমারী হচ্ছেন সুবর্তরাজ মিত্রসেনের কন্যা মনোহরা। প্রৌঢ়বয়সে মিত্রসেনের পত্নী বিয়োগ হলে তিনি বানপ্রস্থ গ্রহণের সংকল্প করলেন এবং পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করে একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য উদ্‌যোগী হলেন। কিন্তু এই মনোহরা বললেন, পিতা, বিবাহ থাকুক, আমিও বনে যাব, নইলে আপনার সেবা করবে কে? কন্যার অত্যন্ত আগ্রহ দেখে মিত্রসেন সম্মত হলেন এবং তাঁর কুলগুরু আমাদের পিতা ভল্লাতকের আশ্রমের নিকটে কুটীর নির্ম্মাণ করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। আমাদের পিতার অনেক বয়স হয়েছিল, কিছুকাল পরে তিনি স্বর্গে গেলেন। সম্প্রতি রাজা বসুমিত্রও পনরো বৎসর অরণ্যবাসের পর দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি বললেন, হা, কন্যাকে অনূঢ়া রেখেই আমাকে যেতে হচ্ছে, গুরুপুত্র বিভীতক ও হরীতক, এর ভার তোমরা নাও, কাল বিলম্ব না করে এর বিবাহ দিও, কিন্তু বৃদ্ধের সঙ্গে কদাচ নয়, বৃদ্ধপতিতে আমার কন্যার রুচি নেই। রাজার মৃত্যুর পর আমরা মহা সমস্যায় পড়লাম। আমরা দুজনেই বৃদ্ধ, সে কারণে মনোহরার মনোমত পাত্র নই। এমন সময় ভাগ্যক্রমে আপনার ঘোষণা শুনলাম, তাই সত্বর এখানে এসেছি। মহারাজ, সকল বিষয়েই আমি এই কন্যার যোগ্য পাত্র, আমার সঙ্গেই আপনার বয়স বিনিময় করুন, তা হলে আমাদের বিবাহে কোনও বাধা থাকবে না।

হরীতক উত্তেজিত হয়ে বললেন, মহারাজ, আমার দাদার প্রস্তাব মোটেই ন্যায় সংগত নয়। আমি ওঁর চাইতে রূপবান ও বিদ্বান, মনোহরার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান ত কম, ওর ত্রিশ, আমার ষাট, আর দাদার পঁয়ষট্টি আমি এখনই যোগ্যতর পাত্র, মহারাজের যৌবন পেলে তো কথাই নেই।

বিভীতক ধমক দিয়ে বললেন, তুই চুপ কর মূর্খ। জ্যেষ্ঠের পূর্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হতেই পারে না।

যযাতি বললেন, রাজকন্যা, তোমার অভিমত কি? তুমি যাকে চাও তাকেই আমার যৌবন দেব। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে কাকে যোগ্যতর মনে কর?

মনোহরা বললেন, দুজনেই সমান।

যযাতি বললেন, সুন্দরী, তুমি আমাকে বড়ই সমস্যায় ফেললে, এই বিভীতক আর হরীতকের মধ্যে আমি কোনও ইতরবিশেষ দেখছিনা। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর।

নিজের কুচকুচে কালো বাবরি চুলে হাত বুলিয়ে আর রাজকীয় মোটা গোঁফে চাড়া দিয়ে যযাতি বললেন, যৌবন তো আমার রয়েইছে বেশ পরিপুষ্ট যৌবন, তা যদি দান না করে রেখেই দিই? আমিই যদি তোমাকে বিবাহ করি তা হলে কেমন হয় মনোহরা?

বিভীতক আর হরীতক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এ কি রকম কথা মহারাজ! আপনি ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করেছেন যে আপনার যৌবন অন্যকে দান করবেন, এখন বিপরীত কথা বলছেন কেন?

সমবেত বৃদ্ধদের কয়েক জন চিৎকার করে হাত নেড়ে বললেন, মহারাজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে আপনি রৌরব নরকে যাবেন। আমাদের ডেকে এনে বঞ্চনা করবেন এত দূর আস্পর্দ্ধা।

জনতা থেকে নিনাদ উঠল—চলবে না, চলবে না।

ব্যাপার গুরুতর হচ্ছে দেখে নারদ আর অশ্বিনীকুমারদ্বয় আত্মপ্রকাশ করলেন। যযাতি সসম্ভ্রমে তাঁদের পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিতে গেলেন, কিন্তু নারদ বললেম, মহারাজ, ব্যস্ত হয়ো না, উপস্থিত সংকট থেকে আগে মুক্ত হও।

যযাতি বললেন, দেবর্ষি, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, আপনিই বলুন এখন আমার কর্তব্য কি।

নারদ বললেন তুমি সত্যভ্রষ্ট হয়েছ। পুরুকে ডাক, সেই তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যবস্থা করবে।

যযাতির আহ্বানে পুরু জনসভায় এলেন। পূজনীয়গণকে বন্দনা করে বললেন, পিতা, আমাকে আবার এর মধ্যে জড়াতে চান কেন? আমার যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান এখনও সমাপ্ত হয় নি, যজ্ঞান্ত স্নান না করেই আপনার আদেশে এসেছি। বলুন কি করতে হবে।

যযাতি নীরব রইলেন। নারদ বললেন, রাজপুত্র, তোমার পিতার কিঞ্চিৎ চিত্তবিকার হয়েছে, তাঁর সংকল্প সিদ্ধির ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। এই সভায় উপস্থিত বৃদ্ধগণের মধ্যে কে যোগ্যতম, কার সঙ্গে যযাতি বয়স বিনিময় করবেন তা তুমিই স্থির কর।

পুরু প্রশ্ন করলেন, ওই বিদ্যুদ্‌বল্লরী তুল্য ললনা যাঁর দুটি হাত দুই বৃদ্ধ ধরে আছেন, উনি কে?

নারদ বললেন, উনি স্বর্গত সুবর্তরাজ মিত্রসেনের কন্যা মনোহরা। ওই দুই বৃদ্ধ ওঁর পিতার গুরুপুত্র, বিভীতক ও হরীতক। ওঁরা দুজনেই মনোহরার পাণিপ্রার্থী, যযাতির যৌবনও ওঁরা চান। কিন্তু তোমার পিতা বড় সমস্যায় পড়েছেন, কার সঙ্গে বয়স বিনিময় করবেন তা স্থির করতে পারছেন না।

পুরু বললেন, সমস্যা তো কিছুই দেখছি না, আমি এখনই মীমাংসা করে দিচ্ছি। রাজকন্যা, ওই দুই বৃদ্ধের মধ্যে কাকে যোগ্যতর মনে কর?

মনোহরা বললেন, দুজনেই সমান।

একটু চিন্তা করে পুরু বললেন, বরবর্ণিনী মনোহরা, তোমার সহিত নিভৃতে কিছু পরামর্শ করতে চাই। ওই অশোক তরুর ছায়ায় চল।

অশোকতরু তলে কিছুক্ষণ আলাপের পর পুরু সকলের সমক্ষে এসে বললেন, পরমারাধ্য পিতৃদেব, ত্রিলোকপূজ্য দেবর্ষি, দেববৈদ্য অশ্বিনীদ্বয়, এবং সমবেত ভদ্রগণ, অবধান করুন। আজ সহসা আমার উপলব্ধি হয়েছে, পিতার আজ্ঞা পালন না করে আমি অপরাধী হয়েছি। এখন উনি আমাকে ক্ষমা করুন, ওঁর যৌবনের পরিবর্তে আমার জরা গ্রহণ করুন। এই রাজকুমারী মনোহরা আমাকেই পতিত্বে বরণ করবেন।

নারদ আর দুই অশ্বিনীকুমার বললেন, সাধু সাধু! জনতা থেকে ধ্বনি উঠল, রাজা যযাতির জয়, যুবরাজ পুরুর জয়! বিভীতক আর হরীতক বিরস বদনে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন।

যযাতি মৃদুস্বরে আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ছি ছি ছি, এই যদি করবি তবে সেদিন অমন তেজ দেখিয়ে আমার কথায় 'না' বললি কেন? এত লোকের সামনে ধাষ্টামো করবার কি দরকার ছিল?

দুই অশ্বিনীকুমার বললেন, মহারাজ যযাতি, রাজপুত্র পুরু, আমরা এখনই অস্ত্রোপচার করে তোমাদের জরা-যৌবন পরিবর্তিত করে দিচ্ছি, অস্ত্রভাণ্ড আমার সঙ্গেই আছে।

নারদ বললেন, তোমাদের কিছুই করতে হবে না, পিতা-পুত্রের পুণ্যবলে বিনা অস্ত্রেই পরিবর্তন ঘটবে।

পুরু তাঁর পিতার চরণ স্পর্শ করলেন। পুরুর মস্তকে করার্পণ করে যযাতি বললেন, পুত্র, আমার যৌবন তোমাতে সংক্রমিত হক, তোমার জরা আমাতে প্রবেশ করুক।

তৎক্ষণাৎ বিনিময় হয়ে গেল।

১৮৭৯

চমৎকুমারী

ইত্যাদি গল্প

চমৎকুমারী

বক্রেশ্বর দাস সরকারী গুণ্ডা দমন বিভাগের একজন বড় কর্মচারী। শীতের মাঝামাঝি এক মাসের ছুটি নিয়ে নববিবাহিত পত্নী মনোলোভার সঙ্গে সাঁওতাল পরগনায় বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে বুড়ো চাকর বৈকুণ্ঠ আছে। এঁরা গনেশমুণ্ডায় লালকুঠি নামক একটি ছোট বাড়িতে উঠেছেন। জায়গাটি নির্জন, প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর।

বক্রেশ্বরের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, মনোলোভার পঁচিশের নীচে। বক্রেশ্বর বোঝেন তিনি সুদর্শন নন, শরীরে প্রচুর শক্তি থাকলেও তাঁর যৌবন শেষ হয়েছে। কিন্তু মনোলোভার রূপের খুব খ্যাতি আছে, বয়সও কম। এই কারণে বক্রেশ্বরের কিঞ্চিৎ হীনতাভাব অর্থাৎ ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে।

প্রভাত মুখুজ্যে মহাশয় একটি গল্পে একজন জবরদস্ত ডেপুটির কথা লিখেছেন। একদিন তিনি যখন বাড়িতে ছিলেন না তখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এক পূর্বপরিচিত ভদ্রলোক দেখা করেন। ডেপুটিবাবু তা জানতে পেরে স্ত্রীকে যথোচিত ধমক দেন এবং আগন্তুক লোকটিকে আদালতী ভাষায় একটি কড়া নোটিস লিখে পাঠান। তার শেষ লাইনটি (ঠিক মনে নেই) এইরকম।—বারদিগর এমত করিলে তোমাকে ফৌজদারি সোপর্দ করা হইবে। সেই ডেপুটির সঙ্গে বক্রেশ্বরের স্বভাবের কিছু মিল আছে। দরিদ্রের কন্যা অল্পশিক্ষিতা ভালমানুষ মনোলোভা তাঁর স্বামীকে চেনেন এবং সাবধানে চলেন।

জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে। বিকেল বেলা মনোলোভা বললেন, চল চম্পীদিদির সঙ্গে দেখা করে আসি।

তিনি ওই তিরসিংগা পাহাড়ের কাছে লছমনপুরায় আছেন, চিঠিতে লিখেছেন আমাদের এই বাসা থেকে বড় জোর সওয়া মাইল।

বক্রেশ্বর বললেন, আমার ফুরসত নেই। একটা স্কীম মাথায় এসেছে, গভরমেণ্ট যদি সেটা নেয় তবে দেশের সমস্ত বদমাশ শায়েস্তা হয়ে যাবে। এই ছুটির মধ্যেই স্কীমটা লিখে ফেলব। তুমি যেতে চাও যাও, কিন্তু বৈকুণ্ঠকে সঙ্গে নিও।

—বৈকুণ্ঠর ঢের কাজ। বাজার করবে, দুধের ব্যবস্থা করবে, রান্নার যোগাড় করবে। আর ও তো অথর্ব বুড়ো, ওকে সঙ্গে নেওয়া মিথ্যে। আমি একাই যেতে পারব, ওই তো তিরসিংগা পাহাড় সোজা দেখা যাচ্ছে।

—ফিরতে দেরি ক'রো না, সন্ধ্যের আগেই আসা চাই।

লছমনপুরায় পৌঁছে মনোলোভা তাঁর চম্পীদিদির সঙ্গে অফুরন্ত গল্প করলেন। বেলা পড়ে এলে চম্পীদিদি ব্যস্ত হয়ে বললেন, যা যা শিগ্‌গির ফিরে যা, নয় তো অন্ধকার হয়ে যাবে, তোর বর ভেবে সারা হবে। আমাদের দুটো চাকরই বেরিয়েছে, নইলে একটাকে তোর সঙ্গে দিতুম। কাল সকালে আমরা তোর কাছে যাব।

মনোলোভা তাড়াতাড়ি চলতে লাগলেন। মাঝপথে একটা সরু নদী পড়ে, তার খাত গভীর, কিন্তু এখন জল কম। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর আছে, তাতে পা ফেলে অনায়াসে পার হওয়া যায়। নদীর কাছাকাছি এসে মনোলোভা দেখতে পেলেন, বাঁ দিকে কিছু দূরে চার-পাঁচটা মোষ চরছে, তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শিংওয়ালা জানোয়ার কুটিল ভঙ্গীতে তাঁর দিকে

তাকাচ্ছে। মোষের রাখাল একটি ন-দশ বছরের ছেলে। সে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে কি বলল বোঝা গেল না। মনোলোভা ভয় পেয়ে দৌড়ে নদীর ধারে এলেন এবং কোনও রকমে পার হলেন, কিন্তু ওপারে উঠেই একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না, পায়ের চেটোয় অত্যন্ত বেদনা।

চারিদিক জনশূন্য, সেই রাখাল ছেলেটাও অদৃশ্য হয়েছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আতঙ্কে মনোলোভার বুদ্ধিলোপ হল। হঠাৎ তাঁর কানে এল—

—একি, পড়ে গেলেন নাকি?

লম্বা লম্বা পা ফেলে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি একজন ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ পুরুষ, পরনে ইজার, হাঁটু পর্যন্ত আচকান, তার উপর একটা নকশাদার শালের ফতুয়া, মাথায় লোমশ ভেড়ার চামড়ার আস্ত্রাকান টুপি।

মনোলোভার দুই হাত ধরে টানতে টানতে আগন্তুক বললেন, হেঁইও, উঠে পড়ুন। পারছেন না? খুব লেগেছে, দেখি কোথায় লাগল।

হাত পা গুটিয়ে নিয়ে মনোলোভা বললেন, ও আর দেখবেন কি, পা মচকে গেছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই। আপনি দয়া করে যদি একটা পালকি টালকি যোগাড় করে দেন তো বড়ই উপকার হয়।

—খেপেছেন, এখানে পালকি তাঞ্জাম চতুর্দোলা কিছুই মিলবে না, ষ্ট্রেচারও নয়। আপনি কোথায় থাকেন? গনেশ—মুণ্ডায় লালকুঠিতে? আপনারাই বুঝি আজ সকালে পৌঁছেছেন? আমি আপনার পায়ে একটু মাসাজ করে দিচ্ছি, তাতে ব্যথা কমবে। তার পর আমার হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারবেন। যদি মচকে গিয়ে থাকে, চুনে-হলুদ লাগালেই চট করে সেরে যাবে।

বিব্রত হয়ে মনোলোভা বললেন, না না আপনাকে মাসাজ করতে হবে না। হেঁটে যাবার শক্তি আমার নেই। আপনি দয়া করে আমাদের বাসায় গিয়ে মিস্টার বি দাসকে খবর দিন তিনি নিয়ে যাবার যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

—পাগল হয়েছেন? এখান থেকে গিয়ে খবর দেব, তার পর দাস মশাই চেয়ারে বাঁশ বেঁধে লোকজন নিয়ে আসবেন তার মানে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ততক্ষণ আপনি অন্ধকারে এই শীতে একা পড়ে থাকবেন তা হতেই পারে না। বিপদের সময় সংকোচ করবেন না, আপনাকে আমি পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছি।

—কি যা তা বলছেন!

—কেন আমি পারব না ভেবেছেন? আমি কে তা জানেন? গগনচাঁদ চক্কর, গ্রেট মারাঠা সার্কসের ষ্ট্রং ম্যান। না না, আমি মারাঠী নই, বাঙালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তী পদবীটা ছেঁটে চক্কর করেছি। সম্প্রতি টাকার অভাবে সার্কস বন্ধ ছিল, তাই এখানে আসবার ফুরসত পেয়েছি। আজ সকালে আমাদের ম্যানেজার সাপুরজীর চিঠি পেয়েছি—সব ঠিক হয়ে গেছে, দু হপ্তার মধ্যে তোমরা পুনায় চলে এস। জানেন, আমার বুকের ওপর দিয়ে হাতি চলে যায়, দু হন্দর বারবেল আমি বনবন করে ঘোরাতে পারি। আপনার এই শিঙি মাছের মতন একরত্তি শরীর আমি বইতে পারব না?

—খবরদার, ও সব হবে না!

—কেন বলুন তো? আপনি কি ভেবেছেন আমি রাবণ আর আপনি সীতা, আপনাকে হরণ করতে এসেছি? আপনাকে আমি বয়ে নিয়ে গেলে আপনার কলঙ্ক হবে, লোকে ছি ছি করবে?

—আমার স্বামী পছন্দ করবেন না।

—কি অদ্ভুত কথা! অমন রামচন্দ্রী স্বামী জোটালেন কোথা থেকে? বিপদের সময় নাচার হয়ে আপনাকে যদি বয়ে নিয়ে যাই তাতে আপত্তির কি আছে? আপনার কর্তা বুঝি মনে করবেন আমার ওপর আপনার অনুরাগ জন্মেছে, আমার স্পর্শে আপনি পুলকিত হয়েছেন, এই তো? একবার ভাল করে আমার মুখখানা দেখুন তো, আকর্ষণের কিছু আছে কি?

পকেট থেকে প্রকাণ্ড টর্চ বার করে গগনচাঁদ নিজের শ্রীহীন মুখের ওপর আলো ফেললেন, তার পর বললেন, দেখুন, লোকে আমার মুখ দেখতে সার্কসে আসে না, শুধু গায়ের জোরই দেখে। আমার এই চাঁদবদন দেখলে আপনার স্বামীর মনে কোনও সন্দেহই হবে না।

মনোলোভা বললেন, কেন তর্ক করে সময় নষ্ট করছেন। আপনার চেহারা সুশ্রী না হলেও লোকে দোষ ধরতে পারে।

—ও, বুঝেছি। আপনার চিত্তবিকার না হলেও আমার তো আপনার ওপর লোভ হতে পারে—এই না? নিশ্চয় আপনি নিজেকে খুব সুন্দরী মনে করেন। একদম ভুল ধারণা, মিস চমৎকুমারী ঘার্পাদের কাছে আপনি দাঁড়াতেই পারেন না।

—তিনি আবার কে?

গগনচাঁদ চক্কর তাঁর ফতুয়ার বোতাম খুললেন, আচ-কানেরও খুললেন, তার নীচে যে জামা ছিল, তাও খুললেন। তার পর মুখে একটি বিহ্বল ভাব এনে নিজের উন্মুক্ত লোমশ বুকে তিনবার চাপড় মারলেন।

মনোলোভা প্রশ্ন করলেন, আপনার প্রণয়িনী নাকি?

—শুধু প্রণয়িনী নয় মশাই, দস্তুরমত সহধর্মিণী। তিন মাস হল দুজনে বিবাহবন্ধনে জড়িত হয়ে দম্পতি হয়ে গেছি।

—তবে মিস চমৎকুমারী বললেন কেন? এখন তো তিনি শ্রীমতী চক্কর।

—আঃ, আপনি কিছুই বোঝেন না। মিস চমৎকুমারী ঘার্পাদে হল তাঁর স্টেজ নেম, আমেরিকান ফিল্ম অ্যাকট্রেসরা যেমন পঞ্চাশবার বিয়ে করেও নিজের কুমারী নামটাই বজায় রাখে, সেইরকম আর কি। চমৎকুমারী হচ্ছেন গ্রেট মারাঠা সার্কসের লীডিং লেডি, বলবতী ললনা। যেমন রূপ, তেমনি বাহুবল, তেমনি গলার জোর। একটা প্রমাণ সাইজ গরু কিংবা গাধাকে টপ করে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে পারেন। আবার ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে একটা হাত কানে চেপে অন্য হাতে তম্বুরা নিয়ে ধ্রুপদ খেয়াল গাইতে পারেন। মহারাষ্ট্রী মহিলা, কিন্তু অনেক কাল কলকাতায় ছিলেন, চমৎকার বাঙলা বলেন। আপনার স্বামীর সঙ্গে তাঁর মোলাকাত করিয়ে দেব। চমৎকুমারীকে দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে আমার হৃদয় শক্ত খুঁটিতে বাঁধা আছে, তার আর নড়ন চড়ন নেই।

—আপনি আর দেরি করবেন না, দয়া করে মিস্টার দাসকে খবর দিন।

—কি কথাই বললেন। আমি চলে যাই, আপনি একলা পড়ে থাকুন, আর বাঘ কি হুড়ার কি লক্কড় এসে আপনাকে ভক্ষণ করুক। শুনতে পাচ্ছেন? ওই শেয়াল ডাকছে। আপনার হিতাহিত জ্ঞান এখন লোপ পেয়েছে, কোনও আপত্তিই আমি শুনবো না। চুপ, আর কথাটি নয়।

নিমেষের মধ্যে মনোলোভাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গগনচাঁদ সবেগে চললেন। মনোলোভা ছটফট করতে লাগলেন। গগনচাঁদ বললেন, খবরদার হাত পা ছুড়বেন না, তা হলে পড়ে যাবেন, কোমর ভাঙবে, পাঁজরা ভাঙবে। এত আপত্তি কিসের? আমাকে কি অচ্ছুত হরিজন ভেবেছেন না সেকেলে বটঠাকুর ঠাউরেছেন যে

ছুঁলেই আপনার ধর্মনাশ হবে? মনে মনে ধ্যান করুন—আপনি একটা দুরন্ত খুকী, রাস্তায় খেলতে খেলতে আছাড় খেয়েছেন, আর আমি আপনার স্নেহময়ী দিদিমা, কোলে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

আপত্তি নিষ্ফল জেনে মনোলোভা চুপ করে আড়ষ্ট হয়ে রইলেন। গগনচাঁদ হাতের মুঠোয় টর্চ টিপে পথে আলো ফেলতে ফেলতে চললেন।

বক্রেশ্বর দাস দুজনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, একি ব্যাপার? গগনচাঁদ বললেন, শোবার ঘর কোথায়? আগে আপনার স্ত্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিই, তার পর সব বলছি। এই বুঝি আপনার চাকর? ওহে বাপু, শিগ্‌গির মালসা করে আগুন নিয়ে এস, তোমার মায়ের পায়ে সেক দিতে হবে।

মনোলোভাকে শুইয়ে গগনচাঁদ বললেন, মিস্টার দাস, আপনার স্ত্রী পড়ে গিয়েছিলেন, ডান পায়ের চেটো মচকে গেছে। চলবার শক্তি নেই, অথচ কিছুতেই আমার কথা শুনবেন না, কেবলই বলেন, লে আও পালকি, বোলাও দাস সাহেবকো। আমি জোর করে এঁকে তুলে নিয়ে এসেছি। অতি অবুঝ বদরাগী মহিলা, সমস্ত পথটা আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে দিতে এসেছেন।

মনোলোভা অস্ফুট স্বরে বললেন, বাঃ, কই আবার দিলুম!

বক্রেশ্বর একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এখন গরম হয়ে বললেন, তুমি লোকটা কে হে? ভদ্রনারীর ওপর জুলুম কর এতদূর আস্পর্ধা?

—কেন, তাতে দোষ কি, বিপদের সময় সবই করতে হয়। ভাবছেন আমি অবলা নারী, পারব না? জানেন, আমি একটা পুরুষ্টু গাধাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়তে পারি?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বক্রেশ্বর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। চমৎকুমারী খপ করে তাঁকে তুলে নিয়ে বললেন, ওকি, অমন কুঁকড়ে গেলেন কেন, লজ্জা কিসের? মনে করুন আমি আপনার মেশোমশাই, আপনি একটা পাজী ছোট ছেলে, আপনার চাইতেও পাজী আর একটা ছেলে লাথি মেরে আপনাকে ফেলে দিয়েছে, মেশোমশাই দেখতে পেয়ে কোলে তুলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন।

চমৎকুমারী তাঁর বোঝা নিয়ে হনহন করে হেঁটে তিন মিনিটের মধ্যে লালকুঠিতে পৌঁছলেন এবং বিছানায় মনোলোভার পাশে ধপাস করে ফেলে বক্রেশ্বরকে শুইয়ে দিলেন। বক্রেশ্বর করুণ স্বরে বললেন, উহুহু বড্ড ব্যথা। জান মনু, আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম, ইনই আমাকে বাঁচিয়েছেন, গ্রেট মারাঠা সার্কসের স্ট্রং লেডি মিস চমৎকুমারী ঘাপার্দে।

মনোলোভা অবাক হয়ে দু হাত তুলে নমস্কার করলেন।

নির্মল ডাক্তার তাঁর কম্পাউণ্ডারকে নিয়ে এসে পড়লেন। স্বামী-স্ত্রীকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, ও কিছু নয়, দুজনেরই পায়ে একটু স্প্রেন হয়েছে। একটা লোশন দিচ্ছি, তাতেই সেরে যাবে। তিন-চার দিন চলা ফেরা করবেন না, মাঝে মাঝে নুনের পুঁটলির সেক দেবেন। মিস্টার দাসের কাঁধে একটা ওষুধ লাগিয়ে ড্রেস করে দিচ্ছি।

যথাকর্তব্য করে ডাক্তার আর কম্পাউণ্ডার চলে গেলেন। চমৎকুমারী বললেন, আপনাদের চাকর একা সামলাতে পারবে না, আমি আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে তার পর যাব।

বক্রেশ্বর করজোড়ে বললেন আপনি করুণাময়ী, যে উপকার করলেন তা জীবনে ভুলব না।

মনোলোভা মনে মনে বললেন, তা ভুলবে কেন, ওই গোদা হাতের জাপটানি যে প্রাণে সুড়সুড়ি দিয়েছে। যত দোষ বেচারা গগনচাঁদের।

বক্রেশ্বর বললেন, ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলাম, আপনার স্বামী মিস্টার চক্করও এখানে আছেন। কাল বিকেলে আপনারা দুজনে দয়া করে এখানে যদি চা খান তো কৃতার্থ হব। আমার এক শালী কাছেই থাকেন, তাঁকে কাল আনাব, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। আমার তো চলবার শক্তি নেই, নয়তো নিজে গিয়ে আপনাদের আসবার জন্যে বলতুম।

চমৎকুমারী বললেন, কাল যে আমরা তিন দিনের জন্যে রাঁচি যাচ্ছি। শনিবারে ফিরব। রবিবার বিকালে আমাদের বাসায় একটা সামান্য টি-পার্টির ব্যবস্থা করেছি। চক্করের বন্ধু হোম মিনিস্টার শ্রীমহাবীর প্রসাদ, ডুমকার ম্যাজিস্ট্রেট খাস্তগির সাহেব, গিরিডির মার্চেন্ট সর্দার গুরমুখ সিং এঁরা সবাই আসবেন। আপনারা দুজনে দয়া করে এলে খুব খুশী হব। কোনোও কষ্ট হবে না, একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আসবেন তো?

বক্রেশ্বর বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মনোলোভা মনে মনে বললেন, হেই মা কালী, রক্ষা কর।

১৮৮০

কর্দম মেখলা

পুষ্কর সরোবরের তীরে বিশ্বামিত্র আর মেনকা কাছাকাছি বসে আছেন। মেনকা তাঁর কেশপাশ আলুলায়িত করে কাঁকুই দিয়ে আঁচড়াচ্ছেন, বিশ্বামিত্র মুখ ফিরিয়ে আত্মচিন্তা করছেন।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বিশ্বামিত্র কপাল কুঁচকে নাক ফুলিয়ে বললেন, মেনকা, তুমি সরে যাও, তোমার চুলের তেলচিটে গন্ধ আমি সইতে পারছি না।

ভ্রূভঙ্গী করে মেনকা বললেন, তা এখন পারবে কেন। অথচ এই সেদিন পর্যন্ত আমার চুলের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতে। চুলে কি মাখি জান? মলয়গিরিজাত নারিকেল তৈলে পঞ্চাশ রকম গন্ধদ্রব্য ভিজিয়ে ধন্বন্তরী আমার জন্যে এই কেশ তৈল প্রস্তুত করেছেন। এর সৌরভে দেব দানব গন্ধর্ব মানব মুগ্ধ হয়, আর তোমার তা সহ্য হচ্ছে না! মুখ হাঁড়ি করে রয়েছ কেন, মনের কথা খুলেই বল না।

বিশ্বামিত্র বললেন, তুমি মূর্খ অপ্সরা, দ্রব্যগুণ কিছুই জান না। উত্তম গন্ধতৈলও আর্দ্রবায়ুর সংস্পর্শে বিকৃত হয়। স্ত্রী-জাতির নাকের সাড় নেই, কিন্তু অন্য লোকে দুর্গন্ধ পায়।

—এতদিন তুমি দুর্গন্ধ পাও নি কেন?

—আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, লুব্ধ কুক্কুরের ন্যায় পূতি-গন্ধকে দিব্য সৌরভ মনে করতাম, তোমার কুটিল কালসর্পসম বেণী কুসুমদাম বলে ভ্রম হত, তোমার ক্লিন্ন অশুচি দেহের স্পর্শে আমার আপাদমস্তক হর্ষিত হত। সেই কদর্য মোহ এখন অপসৃত হয়েছে। মেনকা, তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই, তুমি চলে যাও।

মেনকা বললেন, ছ মাসেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল? আমি যখন প্রথমে তোমার এই আশ্রমে এসেছিলাম তখন আমাকে দেখেই

তুমি সংযম হারিয়ে তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়ে লোলুপ হয়েছিলে। আমি কিন্তু নিষ্কামভাবে নির্বিকার চিত্তে অপ্সরার কর্তব্য পালন করেছি, তোমার কুৎসিত জটাশ্মশ্রু আর লোমশ বক্ষের স্পর্শ, তোমার দেহের উৎকট শার্দূলগন্ধ সবই ঘৃণা দমন করে সয়েছি। ওহে ভূতপূর্ব কান্যকুব্জরাজ মহাবল বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের গরু চুরি করতে গিয়ে তুমি সসৈন্যে মার খেয়েছিলে। তখন তুমি বিলাপ করেছিলে—ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্। তার পর তুমি ব্রহ্মর্ষি হবার জন্যে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলে। কিন্তু ইন্দ্রের আদেশে যেমনি আমি তোমার কাছে এলাম তখনই তোমার মুণ্ড ঘুরে গেল, তপস্যা চুলোয় গেল, একটা অবলা অপ্সরার কাছেও আত্মরক্ষা করতে পারলে না। এখন হয়তো বুঝেছ যে, ব্রহ্মতেজের বলও অপ্সরার বলের কাছে তুচ্ছ, অনেক রাজর্ষি মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি আমাদের পদানত হয়েছেন। যা বলি শোন—ব্রহ্মর্ষি হবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে অপ্সরা হবার জন্যে তপস্যা কর।

বিশ্বামিত্র বললেন, কটুভাষিণী, তুমি দূর হও

—তা হচ্ছি। আমার গর্ভে তোমার যে সন্তান আছে তার ব্যবস্থা কি করবে?

—স্বর্গবেশ্যার সন্তানের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। যা করবার তুমি করবে।

—তুমি তো মহা বেদজ্ঞ আর পুরাণজ্ঞ। এ কথা কি জান না যে অপ্সরা কদাপি সন্তান পালন করে না? আমরা প্রসব করেই সরে পড়ি, এই হল সনাতন রীতি। অপত্যপালন জন্মদাতারই কর্তব্য গর্ভধারিণী অপ্সরার নয়।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র বললেন, তুমি আমার তপস্যা পণ্ড করেছ, বুদ্ধি মোহগ্রস্ত করেছ, চরিত্র কলুষিত করেছ। পাপিষ্ঠা, দূর হও এখান থেকে, তোমার গর্ভস্থ পাপও তোমার সঙ্গে দুর হয়ে যাক।

পুষ্কর সরোবরের ধার থেকে খানিকটা কাদা তুলে নিয়ে মেনকা দুই হাতে তাল পাকাতে লাগলেন।

বিশ্বামিত্র প্রশ্ন করলেন, ও আবার কি হচ্ছে ?

কাদার পিণ্ড পাকিয়ে সাপের মতন লম্বা করে মেনকা বললেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, তোমার সন্তান আমি চার মাস গর্ভে বহন করেছি, আরও প্রায় পাঁচ মাস বইতে হবে। তোমার কৃতকর্মের ফল শুধু আমিই বয়ে বেড়াব আর তুমি লঘুদেহে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবে তা হতে পারে না। তোমাকেও ভার সইতে হবে। এই নাও।

মেনকা তাঁর হাতের লম্বা কাদার পিণ্ড সবেগে নিক্ষেপ করলেন। বিশ্বামিত্রের কটিদেশে তা মেখলার ন্যায় জড়িয়ে গেল।

চমকে উঠে মুখ বিকৃত করে বিশ্বামিত্র বললেন, আঃ! সেই কর্দম মেখলা টেনে খুলে ফেলবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন পুষ্করের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুয়ে ফেলবার জন্যে দুই হাত দিয়ে ঘষতে লাগলেন, কিন্তু সেই কালসর্প তুল্য মেখলার ক্ষয় হল না, নাগপাশের ন্যায় বেষ্টন করে রইল।

হতাশ হয়ে বিশ্বামিত্র জল থেকে তীরে উঠে এলেন। মেনকাকে আর দেখতে পেলেন না।

বিশ্বামিত্র পুনর্বার তপস্যায় নিরত হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মনোনিবেশ করতে পারলেন না, কর্দম মেখলার নিরন্তর সংস্পর্শে তাঁর ধৈর্য নষ্ট হল, চিত্ত বিক্ষোভিত হল। তিনি আশ্রম ত্যাগ করে আকুল হয়ে পর্যটন করতে লাগলেন, হিমাচল থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন, নানা তীর্থ-সলিলে অবগাহন করলেন, কিন্তু মেখলা বিগলিত হল না। এই ভাবে সাড়ে পাঁচ বৎসর কেটে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি মালিনী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। নদীর কাকচক্ষু তুল্য নির্মল জল দেখে তাঁর মনে একটু আশার উদয় হল। উত্তরীয় তীরে রেখে বিশ্বামিত্র জলে নামলেন এবং অনেকক্ষণ প্রক্ষালন করলেন, কিন্তু তাঁর মেখলা পূর্ববৎ অক্ষয় হয়ে রইল। অবশেষে তিনি বিষন্ন মনে জল থেকে তীরে উঠতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না, পাঁকের মধ্যে তাঁর দুই পা প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে গেল।

প্রাণভয়ে বিশ্বামিত্র চিৎকার করলেন। মালিনীর তটবর্তী বনভূমিতে তিনটি মেয়ে খেলা করছিল, একটির বয়স পাঁচ, আর দুটির সাত-আট। বিশ্বমিত্রের আর্তনাদ শুনে তারা ছুটে এল এবং নিজেরাও চিৎকার করে ডাকতে লাগল—ও পিসীমা দৌড়ে এস, কে একজন ডুবে যাচ্ছে।

পিসীমা অর্থাৎ গৌতমী লম্বা আঁকশি দিয়ে একটি প্রকাণ্ড অম্রাতক বৃক্ষ থেকে পাকা আমড়া পাড়ছিলেন। মেয়েদের ডাক শুনে ছুটে এলেন। নদীর ধারে এসে বিশ্বামিত্রকে বললেন, নড়বেন না, তা হলে আরও ডুবে যাবেন। এই আঁকশিটা বেশ শক্ত, পাঁকের তলা পর্যন্ত পুঁতে দিচ্ছি, এইটেতে ভর দিয়ে স্থির হয়ে থাকুন। এই অনু আর প্রিয়, তোরা দুজনে দৌড়ে যা, আমি যে চাঁচাড়ির চাটাইএ শুই সেইটে নিয়ে আয়।

অনু আর প্রিয় অল্পক্ষণের মধ্যে ধরাধরি করে একটা চাটাই নিয়ে এল। গৌতমী সেটা পাঁকের উপর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, এইবারে আস্তে আস্তে পা তুলে চাটাইএর উপর দিন, তাড়াতাড়ি করবেন না। আঁকশিটা পাঁক থেকে টেনে নিচ্ছি। এই এগিয়ে দিলাম, দু হাত দিয়ে ধরুন।

আঁকশির এক দিক বিশ্বামিত্র ধরলেন, অন্য দিকে গৌতমী ধরে টানতে লাগলেন, মেয়েরা তাঁর কোমর ধরে রইল। বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে তীরে উঠে এসে বললেন, ভদ্রে, আপনি আমার প্রাণরক্ষা

করেছেন। কে আপনি দয়াময়ী? এই দেবকন্যার ন্যায় বালিকারা কারা?

গৌতমী বললেন, আমি মহর্ষি কণ্বের ভগিনী গৌতমী। এই অনু আর প্রিয়—অনুসূয়া আর প্রিয়ংবদা, এরা এই আশ্রমবাসী পিপ্পল আর শাল্মল ঋষির কন্যা। আর এই ছোটটি শকু—মহর্ষি কণ্বের পালিতা দুহিতা শকুন্তলা। আমার ভ্রাতার আশ্রম এই মালিনী নদীর তীরেই। সৌম্য, আপনি কে?

—আমি হতভাগ্য বিশ্বামিত্র।

—বলেন কি, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র! আপনার এমন দুর্দশা হল কেন?

অনু আর প্রিয় নাচতে নাচতে বলল, ওরে বিশ্বামিত্র মুনি এসেছে, শকুর বাবা এসেছে রে, এক্ষুনি শকুকে নিয়ে যাবে রে!

শকুন্তলা ভ্যাঁ করে কেঁদে গৌতমীকে জড়িয়ে ধরল।

অনুসূয়া আর প্রিয়ংবদাকে ধমক দিয়ে গৌতমী বললেন, চুপ কর দুষ্টু মেয়েরা, কেন ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছিস!

বিশ্বামিত্র বললেন, খুকী, তোমার বাবা কে তা জান?

শকুন্তলা বলল, আমার বাবা কণ্ব মুনি, আর মা এই পিসীমা।

অনুসূয়া আর প্রিয়ংবদা আবার নাচতে নাচতে বলল, দূর বোকা, সব্বাই জানে তুই কিচ্ছু জানিস না। তোর বাবা এই বিশ্বামিত্র মুনি, আর মা—

গৌতমী দুই মেয়ের পিঠে কিল মেরে বললেন, দূর হ এখান থেকে। এই রাজর্ষির পরিধেয় ভিজে গেছে, তোদের বাবার কাছ থেকে শুখনো কাপড় চেয়ে নিয়ে আয়। আর তোদের মাকে বল, অতিথি এসেছেন, আমাদের আশ্রমেই আহার করবেন।

বিশ্বামিত্র বললেন, বস্ত্রের প্রয়োজন নেই, আমার অধোবাস আপনিই শুখিয়ে যাবে, আর আমার উত্তরীয় শুষ্কই আছে। আপনি আহারের আয়োজন করবেন না, আমার ক্ষুধা নেই। দেবী গৌতমী, এই বালিকাকে কোথায় পেলেন?

গৌতমী নিম্নকণ্ঠে জনান্তিকে বললেন, মেনকা প্রসব করেই মালিনী নদীর তটে একে ফেলে চলে যায়। মহর্ষি কন্ব স্নান করতে গিয়ে দেখেন, এক ঝাঁক হংস সারস চক্রবাকাদি শকুন্ত পক্ষ বিস্তার করে চারিদিকে ঘিরে সদ্যোজাত এই বালিকাকে রক্ষা করছে। দয়ার্দ্র হয়ে তিনি একে আশ্রমে নিয়ে আসেন। শকুন্ত কর্তৃক আরক্ষিতা, সেজন্য আমরা নাম দিয়েছি শকুন্তলা।

বিশ্বামিত্র বললেন, কন্যা একবারটি আমার কোলে এস।

শকুন্তলা আবার কেঁদে উঠে বলল, না, যাব না, তুমি আমার বাবা নও, কন্ব মুনি আমার বাবা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বামিত্র বললেন, ঠিক কথা। আমি তোমার পিতা নই, মেনকাও তোমার মাতা নয়, যারা তোমাকে ত্যাগ করেছিল তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই। যাঁরা তোমাকে আজন্ম পালন করেছেন তাঁদেরই তুমি কন্যা। খুকী, তুমি কি খেলনা চাও বল, রুপোর রাজহাঁস, সোনার হরিণ, পান্না-নীলার ময়ূর—

অনসূয়া ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ভারী তো। আমাদের আসল হাঁস হরিণ ময়ূর আছে।

প্রিয়ংবদা বলল, আমাদের হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে, হরিণ লাফায়, ময়ূর নাচে। তোমার হাঁস হরিণ ময়ূর তা পারে?

বিশ্বামিত্র বললেন, না, শুধু ঝকমক করে। শকুন্তলা, তুমি আমার সঙ্গে চল। শত রাজকন্যা তোমার সখী হবে, সহস্র দাসী তোমার সেবা করবে, স্বর্ণমণ্ডিত গজদন্তের পর্যঙ্কে তুমি শোবে, দেবদুর্লভ অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন পায়স তুমি খাবে, মণিময় চত্বরে সখীদের সঙ্গে খেলা করবে। তোমাকে আমি সুবিশাল রাজ্যের অধিশ্বরী করে দেব।

গৌতমী বললেন, কি করে করবেন? আপনার কান্যকুব্জ রাজ্য তো পুত্রদের দান করে তপস্বী হয়েছেন।

—তুচ্ছ কান্যকুব্জ রাজ্য আমার পুত্ররাই ভোগ করুক, তা কেড়ে নিতে চাই না। বাহুবলে আর তপোবলে আমি সসাগরা ধরা জয় করে আমার কন্যাকে রাজরাজেশ্বরী করব। যত দিন কুমারী থাকে তত দিন আমিই এর প্রতিভূ হয়ে রাজ্যশাসন করব। তার পর অতুলনীয় রূপবান গুণবান বলবান বিদ্যাবান কোনও রাজা বা রাজপুত্রের হস্তে একে সম্প্রদান করে পুনর্বার তপস্যায় নিরত হব।

গৌতমী বললেন, কি বলিস শকু, যাবি এই রাজর্ষির সঙ্গে।

শকুন্তলা আবার কেঁদে উঠে বলল, না না যাব না।

গৌতমী বললেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, জন্মের পূর্বেই যাকে বর্জন করেছিলেন তার প্রতি আবার আসক্তি কেন? আপনার সংযম কিছুমাত্র নেই। বশিষ্ঠের কামধেনুর লোভে আপনার ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছিল, মেনকাকে দেখে আপনি উন্মত্ত হয়েছিলেন, এখন আবার তার কন্যাকে দেখে স্নেহে অভিভূত হয়েছেন। এই বালিকার কল্যাণই যদি আপনার অভীষ্ট হয় তবে একে আর উদ্বিগ্ন করছেন কেন, অব্যাহতি দিন, এর মায়া ত্যাগ করে প্রস্থান করুন।

বিশ্বামিত্র বললেন, শকুন্তলা, তোমার এই পিসীমাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যাই তা হলে তুমি যাবে তো?

গৌতমী বললেন, কি যা তা বলছেন, আমি কেন আপনার সঙ্গে যাব?

—দেবী গৌতমী, আমি আপনার পাণিপ্রার্থী। আমাকে বিবাহ করে আপনি আমার কন্যার জননীর স্থান অধিকার করুন।

অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা আবার নাচতে নাচতে বলল, পিসীমার বর এসেছে রে!

গৌতমী সরোষে বললেন, বিশ্বামিত্র, আপনি উন্মাদ হয়েছেন, আপনার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। আর প্রলাপ বকবেন না, চলে যান এখান থেকে।

বিশ্বামিত্র কাতর স্বরে বললেন, শকুন্তলা, একবার আমার কোলে এস, তার পরেই আমি চলে যাব।

গৌতমী বললেন, যা না শকু, একবারটি ওঁর কোলে গিয়ে ব'স। ভয় কি, দেখছিস তো, তোকে কত ভালবাসেন।

শকুন্তলা ভয়ে ভয়ে বিশ্বামিত্রের কোলে বসল। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, কন্যা, সুরাসুর যক্ষ রক্ষ তোমাকে রক্ষা করুন, বসুগণ তোমাকে বসুমতীর ন্যায় বিত্তবতী করুন, ধী শ্রী কীর্তি ধৃতি ক্ষমা তোমাতে অধিষ্ঠান করুন—

হঠাৎ শকুন্তলা লাফিয়ে উঠে বলল, ওরে পিসীমা রে!

ব্যাকুল হয়ে গৌতমী বলল, কি হল রে?

বিশ্বামিত্র উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কর্দম মেখলা খসে গিয়ে মাটিতে পড়ে কিলবিল করতে লাগল।

প্রিয়ংবদা চিৎকার করে বলল, সাপ সাপ!

অনুসূয়া বলল, ঢোঁড়া সাপ!

গৌতমী বললেন, জয়ডুণ্ডুভ। ওই দেখ, সড়সড় করে নদীতে নেমে যাচ্ছে।

বিশ্বামিত্র বললেন সাপ নয়, মেনকার অভিশাপ, এতকাল পরে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। কন্যা, তোমার পবিত্র স্পর্শে আমি শাপমুক্ত পাপমুক্ত সন্তাপমুক্ত হয়েছি। আশীর্বাদ করি, রাজেন্দ্রের রাজ্ঞী হও, রাজচক্রবর্তী সম্রাটের জননী হও। দেবী গৌতমী আমি যাচ্ছি, আপনাদের মঙ্গল হক, আমার আগমনের স্মৃতি আপনাদের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যাক।

১৮৮০

মাৎস্য ন্যায়

বাজারের সামনে দিবাকরের সঙ্গে তার এককালের সহপাঠী গণপতির দেখা হল। গণপতি বলল, কি খবর দিবু, আজকাল কি করছ? চেহারাটা খারাপ দেখছি কেন, কোনও অসুখ করেছে নাকি?

দিবাকর বলল, সিকি-পেটা খেলে চেহারা ভাল হতে পারে না। তিনটে ছেলেকে পড়িয়ে পঞ্চান্ন টাকা পাচ্ছি আর চাকরির খোঁজে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছি। নেহাত একটা বউ আছে, তিন বছরের একটা মেয়েও আছে, নয়তো সোজা পরলোকে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম।

দিবাকরের বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে গণপতি বলল, ভাল রোজগার চাও? ভাল ভাল জিনিস খেতে চাও? শৌখিন জামা কাপড় চাও?

—কে না চায়।

—দেদার ফুর্তি চাও? নারীমাংস চাও?

—নারী একটা আছে, কিন্তু মাংস নেই, শুধুই হাড়।

—কোনও চিন্তা নেই, সব ব্যবস্থা হবে। সাহস আছে? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা জান তো? রিস্ক নিতে পারবে?

—টাকার যদি আশা থাকে তবে সাহসের অভাব হবে না, রিস্কও নিতে পারব। হেঁয়ালি ছেড়ে খোলসা করেই বল না। আমাকে করতে হবে কি? জুয়ো খেলতে বল নাকি?

—না। জুয়ো হল অকর্মণ্য বড়লোকের খেলা, তোমার মতন নিঃস্বের কর্ম নয়। বেশ ভেবে চিন্তে বল—বিবেকের উপদ্রব আছে? নরকের ভয়? মিছে কথা বলতে বাধে? এসব থাকলে কিছুই হবে না বাপু।

একটু ভেবে দিবাকর বলল, স্বর্গ নরক মানি না, তবে ধর্মভয় একটু আছে, চিরকালের সংস্কার কিনা। দরকার হলে অল্প স্বল্প মিছে কথাও বলি, প্র্যাকটিস করলে হয়তো অনর্গল বলতে পারব। দারিদ্র্য আর সইতে পারি না, এখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। বাঁচতে চাই, তার জন্যে শয়তানের গোলাম হতেও রাজী আছি।

দিবাকরের হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গণপতি বলল, ঠিক আছে। বাঁচলে চলবে না, জীবনটা পুরেপুরি ভোগ করতে হবে। আর একবার বল—বুকের পাটা আছে? বিপদকে অগ্রাহ্য করতে পারবে? ধর্মরূপী জুজুর ভয় ছাড়তে পারবে?

—সব পারব। কিন্তু তুমি তো শাস্ত্রচর্চা করে থাক, গীতাও আওড়াও, তোমার মুখে এসব কথা কেন?

—কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিল, সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণ নাও, যুদ্ধে লেগে যাও। যদি জয়ী হও তো পৃথিবী ভোগ করবে, যদি মর তো স্বর্গলাভ করবে। আমিও তোমাকে সেই রকম উপদেশ দিচ্ছি—সব ছেড়ে দিয়ে আমার বশে চল। যদি জীবনযুদ্ধে জয়ী হও তবে সর্ব সুখ ভোগ করবে। আর যদি দৈবদুর্বিপাকে নিতান্তই হেরে গিয়ে জেলে যাও তবে বীরোচিত গতি লাভ করবে, তোমার দলের সবাই বাহবা দেবে। জেল থেকে ফিরে এসে পুনর্জন্ম পাবে আবার উঠে পড়ে লাগবে। আজ সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় এসো, পাঁচ নম্বর শেওড়াতলা লেন। আমি তোমাকে দীক্ষা দেব, সকল অভাব দূর করব, সর্বপাপেভ্যো রক্ষা করব।

দিবাকর বলল, বেশ, আজ সন্ধ্যায় দেখা করব।

সন্ধ্যাবেলা দিবাকর পাঁচ নম্বর শেওড়াতলা লেনে উপস্থিত হল। গণপতি অবিবাহিত, একটা চাকর নিয়ে একাই আছে। কি খবরের কাগজে কাজ করে, জমি বাড়ি আর পুরনো মোটরের

দালালিও করে। তার বসবার ঘরে একটা তক্তপোশের উপর শতরঞ্জি পাতা, দুটো তাকিয়া আর কতকগুলো পত্রপত্রিকা ছড়ানো। দেওয়ালে একটা র‍্যাকে কিছু বই আছে।

চাকরকে দু পেয়ালা চায়ের ফরমাশ দিয়ে পণপতি বলল, মাৎস্য সমাজের নাম শুনেছ? তোমাকে তার মেম্বার হতে হবে। ভয় নেই প্রথম এক বৎসর চাঁদা দিতে হবে না।

দিবাকর বলল, মাৎস্য সমাজের কাজটা কি? ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে হয় নাকি? মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে—এই কি তোমার উপদেশ?

—সত্যিকারের মৎস্য নয়, মনুষ্যরূপী মৎস্যকে খাবলে খেতে হবে। মাৎস্য ন্যায় শুনেছ? মহাভারতে আছে—

নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ।
মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্॥

অর্থাৎ অরাজক জনপদে কারও নিজস্ব কিছু নেই, লোকে মৎস্যের ন্যায় সর্বদা পরস্পরকে ভক্ষণ করে। এদেশে অবশ্য ঠিক অরাজক অবস্থা এখনও হয় নি, তবে মাৎস্য ন্যায়ের সূত্রপাত্র হয়েছে, পরস্পর ভক্ষণের সুযোগ দিন দিন বাড়ছে। এখানে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা হারুন অল রসিদের নির্মম দণ্ডবিধি নেই, কমিউনিস্টদের দুর্দান্ত শাসনও নেই পাঁচ ভূতের লীল-খেলা চলছে। এরই সুযোগ আমরা মাৎস্য সমাজীরা নিয়ে থাকি।

—মাৎস্য সমাজের তুমি একজন কর্তা ব্যক্তি নাকি?

—আমি একজন কর্মী, হাঁপানির বেয়ারাম আছে তাই হাতে কলমে কাজ করতে পারি না, মুখের কথায় যতটুকু সম্ভব করি। বড় বড় মাতব্বর লোক হচ্ছেন এর নির্বাহ সমিতির সভ্য, সভাপতি, সচিব আর উপসচিব। তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেন না, আড়ালে থাকেন। আমি হচ্ছি মাৎস্য সংস্কৃতির একজন ব্যাখ্যাতা আর

প্রচারক। যারা আমাদের সমাজে ঢুকতে চায় তাদের আমি যাচাই করি, বাজিয়ে দেখি। যদি দীক্ষার উপযুক্ত মনে হয় তবে মাৎস্য সমাজের ফিলসফিও তাদের বুঝিয়ে দিই।

—ফিলসফিটা কি রকম?

—গোটা কতক মূল সূত্র বলছি শোন।—জোর যার মুলুক তার। উদ্যোগী পুরুষসিংহ অর্থাৎ যোগাড়ে গুণ্ডাকে লক্ষ্মী বরণ করেন—দু-চার জন রোগা-পটকা গুণ্ডা হাজার বলবান সজ্জনকে কাবু করতে পারে না, তারা কাপুরুষ, তাদের নীতি হচ্ছে, চাচা আপনা বাঁচা। মাৎস্য সমাজী জনসাধারণের উদ্দেশে বলে—মানতে হবে, মানতে হবে, কিন্তু নিজের বেলায় বলে—মানব না, মানব না। পাপ পুণ্য সব মিথ্যে, শুধু দেখতে হবে পুলিসে না ধরে, আর আত্মীয় বন্ধুরা বেশী না চটে।

—আমাকে নাস্তিক হতে হবে নাকি?

—তবে দরকার নেই। ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে যত খুশি গুরুভজন করতে পার। ভক্তিচর্চার সঙ্গে মাৎস্য ন্যায়ের বা চুরি ডাকাতি মাতলামি ব্যভিচার ইত্যাদির কোনও বিরোধ নেই।

—তোমার মাৎস্য ফিলসফিতে নতুন কিছুতো দেখছি না।

আরও বলছি শোন। কলেজে তোমার তো অঙ্কে বেশ মাথা ছিল। সম্ভাবনা-গণিত অর্থাৎ প্রবাবিলিটি মনে আছে।

—কিছু কিছু আছে।

—কলকাতার রাস্তায় যত লোক চলে তাদের মধ্যে জন কতক প্রতি বৎসরে অপঘাতে মারা যায়। সেজন্যে পথে হাঁটা ছেড়ে দিয়েছ কি?

—তা কেন ছাড়ব। বেশীর ভাগ লোকেই তো নিরাপদে যাতায়াত করে, অতি অল্প লোকেই মরে। আমার মরবার সম্ভাবনা খুবই কম।

—ঠিক কথা। যারা হাঁটে তাদের তুলনায় যারা মোটর,

রেলগাড়ি বা এয়ারোপ্লেনে চড়ে তাদের অপঘাতের হার ঢের বেশী। প্রাণের ভয়ে এই সব বর্জন করতে বল কি ?

—কেন বলব। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হয়তো দু-চার জন মারা যায়, কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলে না।

—উত্তম কথা। বিনা টিকিটে যারা রেলে যাতায়াত করে তাদের কত জনের সাজা হয় জান ?

—হয়তো লাখে এক জন ধরা পড়ে, দণ্ড যা দিতে হয় তাও খুব বেশী নয়। কাগজে পড়েছি, গত বৎসরে সাড়ে চার হাজার বার অকারণে শিকল টেনে ট্রেন থামানো হয়েছিল, কিন্তু খুব অল্প লোকেরই বোধ হয় সাজা হয়েছে।

—অতি সত্য কথা। বিনা টিকিটে রেলে চড়া, শিকল টেনে গাড়ি থামানো, গার্ড আর স্টেশন মাষ্টারকে ঠেঙানো খুব নিরাপদ কাজ, রিস্ক নগণ্য। পরীক্ষার প্রশ্ন পছন্দ না হলে ছাত্ররা দাঙ্গা করে, চেয়ার টেবিল ভাঙ্গে। ফেল হলে মাষ্টারকে ঠেঙায়। কত জনের সাজা হয় !

—বোধ হয় কারও হয় না।

—অর্থাৎ দাঙ্গা করা অতি নিরাপদ। ছেলেরা জানে তাদের পিছনে মা বাবা আছে, ঠাকুমা আছেন, হরেক রকম দেশনেতাও আছেন। মন্ত্রীরাও কিছু করতে ভয় পান। ছেলেরা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণকথিত বটুক ভৈরব, কার সাধ্য তাদের শাসন করে ?

—কিন্তু এসব কাজে লাভ কতটুকু হয় ?

—বিনা টিকিটে রেলে চড়লে কিছু পয়সা বাঁচে। চেন টানলে, গার্ডকে মারলে বা স্কুল কলেজে দাঙ্গা করলে আর্থিক লাভ হয় না, কিন্তু বাহাদুরি দেখানো হয়, সেটাই মস্ত লাভ। আইন লঙ্ঘনে একটা অনির্বাচনীয় আত্মতৃপ্তি আছে। আর্থিক লাভের হিসেব যদি চাও তবে পকেটমারদের খতিয়ান দেখ।

হাজার বার পকেট মারলে হয়তো এক বার ধরা পড়ে। এক-জনের না হয় সাজা হল, কিন্তু বাকী ন শ নিরেনব্বই জন তো বেঁচে গেল, তারা ভয় পেয়ে তাদের পেশা ছাড়ে না।

—আমাকে পকেটমার হতে বলছ নাকি?

—না। এ কাজে রোজগার অবশ্য ভালই, কিন্তু ঝাঁকা মুটে রিকশওয়ালা কিংবা পকেটমারের কাজ তোমার মতন ভদ্রলোকের উপযুক্ত নয়। দৈবাৎ যদি ধরা পড় তবে আত্মীয় স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না, তোমার পক্ষে তা মৃত্যুর বেশী। যারা খাবার জিনিসে বা ওষুধে ভেজাল দেয়, কালোবাজার চালায়, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, ঘুষ নেয়, মদ চোলাই করে, নোট বা পাসপোর্ট জাল করে, তবিল তসরুপ করে, তাদের অপরাধ গুরুতর, কিন্তু পকেটমারের চাইতে তারা ঢের বেশী রেস্পেক্‌টেব্‌ল গণ্য হয়।

—আমাকে কি করতে হবে তাই স্পষ্ট করে বল।

—মাৎস্য ফিলসফিটা আর একটু বুঝে নাও। নিরাপত্তার বিপরীত অনুপাতে লাভের সম্ভাবনা। ধরা পড়া আর শাস্তির সম্ভাবনা যত কম, লাভও তত কম। রিস্ক যত বেশী, লাভও তত বেশী। যে কাজে লাখে এক জন ধরা পড়ে তা প্রায় নিরাপদ, যেমন বিনা টিকিটে রেলে চড়া। সরকারী বিজ্ঞাপনে আছে, দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের প্রতি বৎসরে ষাট লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। তার মানে, এই টাকাটা যাত্রীদের পকেটে যায়। তবে মাথা পিছু লাভ অতি অল্প। যাতে দশ হাজারে এক জন ধরা পড়ে তাতেও রিস্ক বেশী নয়, লাভও মন্দ নয়, যেমন ঘুষ, ভেজাল, ট্যাক্স ফাঁকি। যাতে হাজারে এক জন ধরা পড়ে তাতে লাভ বেশ মোটা, যেমন মদ চোলাই, নোট জাল, ডাকাতি। আর যাতে শতকরা এক জন ধরা পড়ে তাতে প্রচুর লাভ, রিস্কও খুব, যেমন দলিল জাল, তবিল তসরুপ।

অনেক ধুরন্ধর ব্যবসাদার এই কাজ করে ফেঁপে উঠেছেন, আবার কেউ কেউ ফাঁদেও পড়েছেন।

—সব তো বুঝলুম। এখন আমাকে করতে বল কি ?

একটু একটু করে ধাপে ধাপে সাধনা করতে হবে, ভয় ভাঙতে হবে। মুরুব্বী অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষকও সংগ্রহ করা দরকার, যাঁরা বিপদে রক্ষা করবেন। তুমি দিন কতক বিনা টিকিটে রেলে যাতায়াত কর, মনে সাহস আসবে। সুবিধে পেলেই গার্ড আর স্টেশন মাস্টারকে ঠেঙাবে, অতি নিরাপদ কাজ। সরকার করুণ ভাষায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন—ভাই সব, ভাড়া না দিলে রেলগাড়ি চলবে কি করে ? ও তো তোমাদেরই জিনিস। রেল-কর্মচারীরা নির্দোষ, তাদের মেরো না। এই মিনতিতে কেউ কর্ণপাত করে না। আরও শোন—বিক্ষোভ দেখাবার জন্যে যত সব প্রসেশন বেরয় তাতে যোগ দিয়ে স্লোগান আওড়াবে, সুবিধা হলে দাঙ্গা বাধাবে, ইট ছুড়বে। এর ফলে তুমি এক জন লোকসেবক কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠবে, গুণোচিত আত্মপ্রত্যয় লাভ করবে, প্রভাবশালী মুরুব্বীদের সুনজরে পড়বে।

—তাঁরা আমার কোন্ উপকারটা করবেন ?

—কি না করবেন ? যদি ইলেকশনে সাহায্য কর, তোমার চেষ্টার ফলে যদি তাঁরা কৃতকার্য হন তবে কেনা গোলাম হয়ে থাকবেন, পুলিসও তোমাকে খাতির করবে।

—সংসার চলবে কি করে ?

—আপাতত তোমাকে একটা খয়রাতী কাজ জুটিয়ে দেব, দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করতে হবে। বরাদ্দ টাকার সিকি ভাগ দান করবে, সিকি ভাগ আত্মসাৎ করবে আর বাকী টাকা মাৎস্য সমাজের ফণ্ডে জমা দেবে। এ কাজে রিস্ক কিছুই নেই। কালোবাজার আর ঘুষের দালালিও উত্তম কাজ,

তোমাকে তাও জুটিয়ে দেব। তার পর ভেজালওয়ালা আর চোলাইওয়ালাদের সঙ্গেও ভিড়িয়ে দেব। মনে বেশ সাহস এলে একটু আধটু দোকান লুট আর রাহাজানিও অভ্যাস করবে। তার পর তোমাকে আর শেখাবার দরকার হবে না, মাথা খুলে যাবে, বড় বড় অ্যাডভেঞ্চারে নামতে পারবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিবাকর বলল, রাজী আছি, আমাকে মাৎস্য সমাজের মেম্বার করে নাও।

গণপতি বলল, তোমার সুমতি হয়েছে জেনে সুখী হলুম। খয়রাতী কাজটা দিন তিনেকের মধ্যে পেয়ে যাবে। আপাতত এই এক শ টাকা হাওলাত নাও, মাস দুই পরে শোধ দিলেই চলবে। কালীধন মণ্ডলের সঙ্গে তোমার আলাপ হওয়া দরকার, চৌকশ লোক, অনেক রকম মতলব আর সাহায্য তার কাছে পাবে! কাল সন্ধ্যাবেলা আবার এখানে এসো, কালীধনও আসবে।

দিবাকরের নূতন জীবন আরম্ভ হল, বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হতে লাগল। প্রথম প্রথম একটু বুক ধড়ফড় করত, কিন্তু তার পর সয়ে গেল। বছর দুই ভালই চলল, তার পর কালীধন একদিন তাকে বলল, এ কিছুই হচ্ছে না দিবু-দা, যা বলি শোন। সমাজের সব চাইতে বড় শত্রু হল ধনীদের মেয়েরা, তাদের গহনা যোগাবার জন্যেই বড়লোকরা গরিবদের শোষণ করে। সেকরার দোকান হচ্ছে প্রলোভনের আড়ত, মেয়েদের মাথা খাবার আস্তানা। তাই আমাদের ধ্বংস করতে হবে।

দুদিন পরে সন্ধ্যার সময় খিদিরপুরে একটা গহনার দোকান লুট হল। লুটের মাল নিয়ে কালীধন পালাল, কিন্তু দিবাকর ধরা পড়ল। সাজা হল দু বছর জেল। তার মুরুব্বী বললেন,

এহেহে, বড়ই কাঁচা কাজ করে ফেলেছ হে দিবাকর, এ বুদ্ধি তোমার কেন হল! ভেবো না, দু বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তার পর বেরিয়ে এসে নামটা বদলে ফেলবে আর খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলবে।

দু বছর পরে দিবাকর যখন খালাস হয়ে ফিরে এল তখন তার বউ আর মেয়ে বেঁচে নেই, সে বন্ধনহীন দায়িত্বহীন মুক্তপুরুষ। নিজের নামটা বদলে সে রজনীকান্ত হল এবং অতিসতর্ক কঠোর সাধনার ফলে অল্প কালের মধ্যে মাৎস্য সমাজের শীর্ষে উঠল। এখন সে একজন রাঘব বোয়াল, সামান্য লোকের মত তাকে 'সে' বলা চলবে না, 'তিনি' বলতে হবে।

শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী এখন স্বহস্তে কোনও তুচ্ছ কর্ম করেন না, চুরি ডাকাতি তবিল ভাঙা ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ নেই। গুণ্ডা বললে তাঁকে ছোট করা হয়। রাজার উপরে যেমন অধিরাজ, কর্তার উপরে যেমন অধিকর্তা, রজনীকান্ত তেমনি অধিগুণ্ডা, অর্থাৎ গুণ্ডাদের উপদেষ্টা নিয়ন্তা প্রতিপালক ও রক্ষক। ভূতপূর্ব গুরু গণপতি এখন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। এক কালে যাঁরা মুরব্বী ছিলেন তারাই এখন রজনীকান্তের সাহায্যের ভিখারী। তাঁর কৃপা না হলে ইলেকশনে জয়লাভ হয় না, উঁচুদরের দুষ্কর্ম নির্বিঘ্নে করা যায় না, আইনের জাল কেটে বেরিয়ে আসা যায় না। মিথ্যা প্রচারে কোন জননেতাই তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারেন না। রাম যদি শ্যামকে খুন করে তবে শ্রীরজনীকান্ত অম্লান বদনে ঘোষণা করেন যে শ্যামই রামকে খুন করেছে। তিনি একটু অন্তরালে থাকলেও তাঁর মতন ক্ষমতাশালী লোক আর কেউ নেই। দেশনেতারা সকলেই নিজের নিজের দলে টানবার জন্যে তাঁকে সাধাসাধি করছেন।

১৮৮০

উৎকোচ তত্ত্ব

লোকনাথ পাল জেলা জজ, অতি ধর্মভীরু খুঁতখুতে লোক। তিনি সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকেন পাছে ধূর্ত লোকে তাঁকে দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়। ছ মাস পরেই তাঁকে অবসর নিতে হবে. জজিয়তির শেষ পর্যন্ত যাতে দুর্নীতির লেশমাত্র তাঁকে স্পর্শ না করে সে সম্বন্ধে তিনি খুব সতর্ক। উৎকোচ তত্ত্ব বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা তাঁর আছে, সময় পেলেই তার জন্যে তিনি একটি খাতায় নোট লিখে রাখেন। আজ রবিবার, অবসর আছে। সকালবেলা একতলায় তাঁর অফিসঘরে বসে লোকনাথ নোট লিখেছন।—

কৌটিল্য বলেছেন, মাছ কখন জল খায় আর রাজপুরুষ কখন ঘুষ নেয়, জানা যায় না। কিন্তু একটি কথা তিনি বলেন নি—ঘুষগ্রাহী অনেক ক্ষেত্রে নিজেই বুঝতে পারে না যে সে ঘুষ নিচ্ছে। পাপ সব সময় স্থূলরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, অনেক সময় সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে দেখা দেয়, তখন তার স্বরূপ চেনা বড়ই কঠিন। স্পষ্ট ঘুষ, প্রচ্ছন্ন ঘুষ আর নিষ্কাম উপহার—এদের প্রভেদ নির্ণয় সকল ক্ষেত্রে করা যায় না। মনে করুন, রামবাবু একজন উচ্চপদস্থ লোক, তাঁর অফিসে একটি ভাল চাকরি খালি আছে। যোগ্যতম প্রার্থীকেই মনোনীত করা কর্তব্য। শ্যামবাবুর জামাই একজন প্রার্থী, যথানিয়মে দরখাস্ত করেছে। শ্যামবাবু রামবাবুকে বললেন, আপনার হাতেই তো সব, দয়া করে আমার জামাইকেই সিলেক্ট করবেন, হাজার টাকা দিচ্ছি, বাহাল হয়ে গেলে আরও হাজার দেব। এ হল অতি স্থূল ঘুষ, নির্লজ্জ পাকা ঘুষখোর কিংবা দুর্বলচিত্ত লোভী ভিন্ন কেউ নিতে রাজী হয় না। অথবা মনে করুন,

রামবাবুর সঙ্গে শ্যামবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এক হাঁড়ি সন্দেশ এনে শ্যামবাবু বললেন, কাশী থেকে আমার মা এনেছেন, খেয়ো। আমার জামাইকে তো তুমি দেখেছ, অতি ভাল ছোকরা। তার দরখাস্তটা একটু বিবেচনা করে দেখো ভাই, তোমাকে আর বেশী কি বলব। এও স্থূল ঘুষ, যদিও পরিমাণে তুচ্ছ। কিন্তু ধরুন, কোনও অনুরোধ না করে শ্যামবাবু এক গোছা গোলাপফুল দিয়ে বললেন, আমাদের মধুপুরের বাগানে হয়েছে। সূক্ষ্ম ঘুষ, এর ফল নিতান্ত অনিশ্চিত, তবে নিরাপদ জেনেই শ্যামবাবু দিতে সাহস করেছেন। আশা করেন এতেই রামবাবুর মন ভিজবে। আবার মনে করুন, রামবাবুর মেয়ের অসুখ, শ্যামবাবুর স্ত্রী এসে দিন রাত সেবা করলেন, অসুখও সারল। এক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর অনুচ্চারিত অনুরোধ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ঘুষ হতে পারে, অথবা নিঃস্বার্থ পরোপকারও হতে পারে, স্থির করা সোজা নয়। রামবাবু যদি দৃঢ়চিত্ত সাধুপুরুষ হন তবে শ্যামের জামাইএর প্রতি কিছুমাত্র পক্ষপাত করবেন না, তবে অন্যভাবে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাবেন। কিন্তু রামবাবু যদি বন্ধুবৎসল কোমলপ্রকৃতির লোক হন তবে শ্যাম-গৃহিণীর সেবা হয়তো জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁকে প্রভাবিত করবে। এ ছাড়া বাঙ্ময় ঘুষ আছে যার আর্থিক মূল্য নেই, অর্থাৎ খোশামোদ বা প্রশংসা। নিপুণভাবে প্রয়োগ করলে বুদ্ধিমান সাধুলোকও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়—

লোকনাথের নোট লেখায় বাধা পড়ল। দরজা ঠেলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে এসে বললেন, কেমন আছ লোকনাথ বাবাজী, অনেক কাল তোমাদের দেখি নি। সেকি, চিনতে পারছ না? আরে আমি হলুম তোমাদের মোহিত পিশেমশাই, বেহালার মোহিত সমজদার। কই রে, পারুল কোথা আছিস, এদিকে আয় না মা।

হাঁকডাক শুনে লোকনাথ-গৃহিণী পারুলবালা এলেন। আগন্তুক লোকটিকে চিনতে তাঁরও কিছু দেরি হল। তার পর মনে পড়লে প্রণাম করে বললেন, মোহিত পিশেমশাই এসেছেন! উঃ কি ভাগ্যি!

অগত্যা লোকনাথও একটা নমস্কার করলেন।

মোহিত সমজদার হাঁক দিলেন রামবচন, জিনিসগুলো এখানে নিয়ে আয় বাবা। মোহিতবাবুর অনুচর বাইরে অপেক্ষা করছিল, এখন ঘরে এসে মনিবের সামনে চারটে বাণ্ডিল রাখল।

একটা কার্ডবোর্ড বাক্স পারুলবালার হাতে দিয়ে মোহিত বাবু বললেন, আসল কাশ্মীরী শাল, তোর জন্যে এনেছি, দেখ তোর পছন্দ হয় কিনা।

শাল দেখে পারুলবালা আহ্লাদে গদগদ হয়ে বললেন, চমৎকার, অতি সুন্দর।

মোহিতবাবু বললেন, লোকনাথ বাবাজী, তোমার তো কোনও শখই নেই, শুধু বই আর বই। তাই একটা ওআলনট কাঠের কিতাব-দান মানে বুক র‍্যাক এনেছি। এই বাক্সটায় কয়েক গজ কাশ্মীরী তাফতা আছে, একটা শাড়ি আর গোটা দুই ব্লাউজ হতে পারবে। আর এই চুবড়িটায় কিছু মেওয়া আছে, পেস্তা বাদাম আখরোট কিশমিশ মনাক্কা এই সব।

কুণ্ঠিত হয়ে লোকনাথ বললেন, আহা কেন এত সব এনেছেন, এ যে বিস্তর টাকার জিনিস। না না, এসব দেবেন না।

মোহিতবাবু বললেন, আরে খরচ করলেই তো টাকা সার্থক হয়। তোমার আমার স্নেহপাত্র, তোমাদের দিয়ে যদি আমার তৃপ্তি হয় তবে দেব না কেন, তোমরাই বা নেবে না কেন?

পারুলবালা বললেন, নেব বই কি পিসেমশাই, আপনার স্নেহের দান মাথায় করে নেব। তার পর, এখন কোথা থেকে

আসা হল? দিল্লি থেকে? পিসিমাকে আনলেন না কেন? তিনি আর ছেলেমেয়েরা সব ভাল আছেন তো?

—সব ভাল। তাদের একদিন নিশ্চয় আনব। অনেক কাল পরে কলকাতায় এলুম, বেহালার বাড়িখানি যাচ্ছেতাই নোঙরা করে রেখেছে। একটু গোছানো হয়ে যাক তার পর তোর পিসীকে নিয়ে একদিন আসব। নানানানানা, চা-টা কিচ্ছু নয়, আমার এখন মরবার ফুরসত নেই, নানা জায়গায় ঘুরতে হবে। আজ চললুম। ঝড়ের মতন এলুম আর গেলুম, তাই না? কিছু মনে ক'রো না তোমরা, সুবিধে মতন আবার একদিন আসব।

পারুলবালাকে প্রশ্ন করে লোকনাথ জানলেন, মোহিতবাবু তাঁর আসল পিসে নয়, পিসের ভাই। ছেলে বেলায় তাঁর বাপের বাড়িতে আসল পিসের সঙ্গে তাঁর এই ভাইও মাঝে মাঝে আসতেন, সেই সূত্রে পরিচয়। তার পর কালে ভদ্রে তাঁর দেখা পাওয়া যেত। মোহিতবাবু নানা রকম কারবার ফেঁদেছিলেন। কোনওটারই এখন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু সেজন্যে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মনে হয় না। তাঁর অবস্থা ভালই, বড় বড় লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। এখন তিনি কি করেন জানা নেই।

লোকনাথ তাঁর অফিসঘরে বসে ভাবতে লাগলেন। মামার শালা পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। মোহিতবাবুর স্নেহ হঠাৎ উথলে উঠল কেন? বহুকাল আগে লোকনাথ তাঁর শ্বশুর-বাড়িতে এই কৃত্রিম পিসেমশাইটিকে দেখে থাকবেন, কিন্তু এখন মনে পড়ে না। আপাতত মোহিতবাবুর কোনও দোষও ধরা যায় না, তিনি বহুমূল্য উপহার দিয়েছেন কিন্তু কিছুই চান নি। হয়তো দিন দুই পরেই একটা অন্যায় অনুরোধ করে বসবেন।

লোকনাথ তাঁর পত্নীকে বললেন, দেখ. তোমার পিসেমশাইএর জিনিসগুলো এখন তুলে রাখ, হয়তো ফেরত দিতে হবে। ওই সব দামী দামী উপহারের জন্যে অস্বস্তি বোধ করছি, তাঁর মতলব বুঝতে পারছি না।

পারুলবালা বললেন, মতলব আবার কি, আমাদের ভালবাসেন তাই দিয়েছেন।

—উনি তোমার আত্মীয় নন, ওঁর নিজের ছেলেমেয়েও আছে, তবে হঠাৎ আমাদের ওপর এত স্নেহ হল কেন?

—খুঁত ধরা তোমার স্বভাব। থাকলেই বা নিজের ছেলেমেয়ে, পরের ওপর কি টান হতে নেই? পিসেমশাই বড়হোক, উঁচু নজর, তিনি দামী জিনিস উপহার দেবেন তাতে ভাববার কি আছে? তোমাকে তো ঘুষ দেন নি।

—যাই হক, তুমি এখন ওগুলো ব্যবহার ক'রো না।

পারুলবালা গরম হয়ে বললেন, কেন করব না? এমন জিনিস তুমি কোনও দিন আমাকে দিয়েছ, না তুমি তার কদর জান? পিসেমশাই যদি ভালবেসে দিয়ে থাকেন তবে তুমি বাদ সাধবে কেন? আর, দামী জিনিস তোমাকে তো দেন নি, আমাকে দিয়েছেন। তুমি যে কাঠের র‍্যাকটা পেয়েছ সেটা না হয় ফেরত দিও।

লোকনাথ চুপ করে গেলেন।

দু দিন পরে মোহিতবাবু আবার এলেন। সঙ্গে তাঁর পত্নী আসেন নি, একজন অচেনা ভদ্রলোক এসেছেন।

মোহিতবাবু বললেন, বাড়ীর সব ভাল তো লোকনাথ? ইনি হচ্ছেন শ্রীগিরধারীলাল পাচাড়ী, মস্ত কারবারী লোক, আমার বিশিষ্ট বন্ধু। ইনি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।

লোকনাথ ভাবলেন, এইবারে পিসের গোপন কথাটি প্রকাশ পাবে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি প্রস্তাব ?

—আচ্ছা বাবাজী, তোমার সার্ভিস শেষ হতে আর কত দেরি ?

—এখন এক্সটেনশনে আছি, ছ মাস পরেই শেষ হবে।

—তার পর কি করবে স্থির করেছ ?

—কিছুই করব না, লেখাপড়া নিয়ে থাকব।

হাত নেড়ে মোহিতবাবু বললেন, নানানানানা বসে থাকা ঠিক নয়। তোমার শরীর ভালই আছে, মোটেই বুড়ো হও নি, তবে রোজগার করবে না কেন ? শাস্ত্রে বলে অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। তুমি হচ্ছ প্রাজ্ঞ লোক, অর্থ উপার্জনের সঙ্গেই বিদ্যাচর্চা করবে। যা বলছি বেশ করে বিবেচনা করে দেখ বাবাজী।

মোহিতবাবু তাঁর মাথাটি এগিয়ে দিয়ে বিশ্বস্তভাবে নিম্ন কণ্ঠে বললেন, এই গিরধারীলাল পাচাড়ীজী হচ্ছেন সিকিম স্টেটের মস্ত বড় কনট্রাক্টার! পশম কম্বল কাঠ মৃগনাভি বড়এলাচ চিরেতা মাখন ঘি এই সব জিনিস ওখান থেকে এদিকে চালান দেন, আবার সুতী কাপড় চাল গম তেল চিনি নুন কেরোসিন প্রভৃতি ওখানে সাপ্লাই করেন। সিকিমের আমদানি রপ্তানি এঁরই হাতে, মহারাজও এঁকে খুব খাতির করেন, নানা বিষয়ে পরামর্শ নেন। মহারাজ এঁকে বলেছেন,—বলুন না গিরধারীবাবু, নিজেই বলুন না।

গিরধারী বললেন, শুনুন হুজুর। মহারাজ তার বড় আদালতের জন্যে একজন চীফ জজ চান। ওখানকার লোকদের ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই, মনে করেন সবাই ঘুষখোর। ভাল লোকের খোঁজ নেবার ভার আমাকেই দিয়েছেন, তাই আমি মোহিতবাবুকে ধরেছিলাম। এঁর কাছে শুনেছি আপনিই উপযুক্ত লোক, যেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান তেমনি ইমানদার সাধুপুরুষ।

লোকনাথ বললেন, জজের দরকার থাকে তো সিকিম সরকার ভারত সরকারকে লিখলেন না কেন।

মোহিতবাবু বললেন, লিখবেন। মহারাজ নিজে লোক স্থির করবেন তার পর ইণ্ডিয়া গভরমেণ্টকে লিখবেন, অমুককে আমার পছন্দ, তাঁকেই পাঠানো হক। কোনও বাজে লোক দিল্লি থেকে আসে তা তিনি চান না। খুব ভাল পোস্ট, দশ বছরের জন্যে পাকা। এখানকার হাইকোর্ট, জজের চাইতে বেশী মাইনে, চমৎকার ফ্রী কোআর্টর্স, ফ্রী মোটরকার, আরও নানা সুবিধে। তুমি যদি রাজী হও তবে গিরধারীজী নিয়ে গিয়ে মহারাজকে বলবেন।

লোকনাথ বললেন, আমি না ভেবে বলতে পারি না।

—ঠিক কথা, ভাববে বই কি। বেশ করে বিবেচনা করে দেখ, পারুলের সঙ্গেও পরামর্শ কর, অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিন্তু বেশী দেরি ক'রো না, মহারাজ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সেট্‌ল করতে চান, ইনি আবার চায়না জাপান বেড়াতে যাবেন কিনা। দিন কতক পরে আবার দেখা করব।

লোকনাথের অস্বস্তি বেড়ে উঠল, তিনি আবার ভাবতে লাগলেন। এই পিসেমশাইটি অদ্ভুত লোক, কেবল অনুগ্রহই করছেন, এখন পর্যন্ত প্রতিদান কিছুই চাইলেন না। দেখা যাক, আবার যেদিন আসবেন সেদিন তাঁর ঝুলি থেকে বেরাল বার হয় কিনা।

দু সপ্তাহ পরে মোহিতবাবু একাই এলেন। এসেই ম্লান মুখে বললেন, গিরধারীলালজী আসতে পারলেন না, তাঁর মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে।

—কি হয়েছে?

আর বল কেন, ভদ্রলোক মহা ফেসাদে পড়েছেন। তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে, রামশরণ পোদ্দারের ছেলে শিবশরণের সঙ্গে। কিন্তু শিবশরণের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, এখন বেলে খালাস আছে। ছোকরা এদিকে ভালই, তবে বড়লোকের ছেলে, কুসঙ্গে পড়ে একটু চরিত্রদোষ ঘটেছিল। ব্যাপারটা কাগজে পড়ে থাকবে, প্রায় আট মাস আগেকার ঘটনা। তবলাওয়ালা লেনে তিতলীবাঈ নাচওআলী থাকত, তার কাছে শিবশরণ যেত, তার দুচারজন বন্ধুও যেত। দুপুর রাতে তিতলী যখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিল তখন কোনও লোক তার পিঠে ছোরা মেরে পালিয়ে যায়। তিতলী বেঁচে আছে, কিন্তু খুবই জখম হয়েছে। পুলিস শিবশরণকেই সন্দেহ করে চালান দেয়। আমাদের সকলেরই আশা ছিল যে শিবশরণ খালাস পাবে, কিন্তু সম্প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে দায়রা সোপর্দ করেছেন। ভাবী জামাইএর এই বিপদে গিরধারীলাল পাচাড়ী অত্যন্ত দমে গেছেন, তাঁর মেয়েও কান্নাকাটি করছে। তবে আমি বেশ ভালই জানি যে ছোকরা একবারে নির্দোষ, তার কোনও বন্ধুই এই কাজ করে সরে পড়েছে।

লোকনাথের মুখ লাল হল। বললেন, দেখুন, এ সম্বন্ধে আমাকে আর কোনও কথা বলবেন না। সেসন্সে আমার কোর্টেই কেসটা আসবে।

প্রকাণ্ড জীব কেটে মোহিতবাবু বললেন, আঁ, তাই নাকি? নানানানানা, তা হলে তোমাকে আর কিছুই বলা চলবে না। তবে গিরধারীর জন্যে আমারও মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। আচ্ছা, মকদ্দমাটা ভালয় ভালয় চুকে যাক, শিবশরণ খালাস পেলেই গিরধারীবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে সিকিম রওনা হবেন। ব'সো বাবাজী চললুম।

পাঁচ দিন পরে লোকনাথ তাঁর অফিস ঘরে বসে কাগজ পড়ছেন, হঠাৎ গিরধারীলাল পাচাড়ী স্মিতমুখে এসে বললেন, নমস্কার হুজুর।

লোকনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখুন পাচাড়ীজী, সেদিন মোহিতবাবুর কাছে যা শুনেছি তার পর আপনার সঙ্গে আমি আর কোনও কথা বলতে চাই না। আপনি এখন যান।

গিরধারীলাল হাত নেড়ে বললেন, আরে রাম রাম, সেসব কথা আপনি একদম ভুলে যান। রামশরণ আমার কেউ নয়, তার বেটা শিবশরণও কেউ নয়। সে খালাস পাবে কি না পাবে, তাতে আমার কি।

—কেন, সে তো আপনার ভাবী জামাই।

—থুঃ। আমার বেটী বলেছে, ওইলুচ্চা খুনী আসামীকে সে কিছুতেই বিয়া করবে না। এখন হুজুর যদি তাকে ফাঁসিতে লটকে দেন তাতে আমার কোনও ওজর নেই।

লোকনাথ বললেন, ওই কেস আমার কোর্টে আসবে না, অন্য জজের এজলাসে যাবে। আপনাদের প্রস্তাবের পর আমি আর এই মামলার বিচার করতে পারি না।

—বড় আফসোসের কথা। বদমাশটাকে হুজুর যদি কড়া সাজা দিতেন তো বড় ভাল হত। আচ্ছা, ভগবান সব কুছ মঙ্গলের জন্যেই করেন। তবে আমার বড়ই নুকসান হল, শিউশরণকে সোনার ঘড়ি, হীরা বসানো কোটের বোতাম, আঙটি এইসব দিয়েছিলাম, তা আর ফেরত দেবে না বলেছে। হুজুর যদি ওকে দশ বছর কয়েদ দিতেন তো ঠিক সাজা হত। ওই মোহিতবাবুর মারফত আরও কিছু খরচ হয়ে গেল।

—আমাকে যে সব উপহার দিয়েছিলেন তারই জন্যে তো?

—হেঁ হেঁ, যেতে দিন।

—বলুন না, আপনার কত খরচ পড়েছিল?

গিরধারীলাল তাঁর নোটবুক দেখে বললেন, দুটো শাল এগার শ টাকা, তাফতা দেড় শ টাকা, কিতাবদান পঁয়তাল্লিশ টাকা, মেওয়া ছত্রিশ টাকা ট্যাক্সি ওগয়রহ ষোল টাকা, মোট তেরো শ সাতচল্লিশ টাকা।

আশ্চর্য হয়ে লোকনাথ বললেন, শাল তো একখানা ছিল।

—বলেন কি! একটা আপনার আর একটা শ্রীমতীজীর জন্যে কিনবার কথা। ওই শালা মোহিতবাবু একটা শালের দাম চুরি করেছে। দেখে নেবেন, আমি ওর গলায় পা দিয়ে সাড়ে পাঁচ শ টাকা আদায় করব।

—তা করবেন। বাকী সাত শ সাতানব্বই টাকার একটা চেক আমি আপনাকে দিচ্ছি, আমার জন্যে আপনার লোকসান হবে না। একটা রসিদ লিখে দিন।

গিরধারীলাল যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, ও হোহোহো, হুজুর একদম সাচ্চা সাধু মহাৎমা আছেন, খুদ ভগবান আছেন, আপনার দয়া ভুলব না।

—সিকিমের চাকরিটাও চাই না।

গিরধারীলাল পাচাড়ী সলজ্জ প্রসন্ন মুখে দন্তবিকাশ করে বললেন, হেঁহে হেঁ।

চেক নিয়ে পাচাড়ীজী প্রস্থান করলেন। লোকনাথের গ্লানি দূর হল, তিনি সোৎসাহে উৎকোচ তত্ত্ব রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

১৮৮০

প্রাচীন কথা

[এই সব ঘটনা ৭০-৮০% সত্য, ২০-৩০% মিথ্যা, অর্থাৎ স্মৃতিকথায় যতটা ভেজাল দেওয়া দস্তুর তার চাইতে বেশী নেই। নাম সবই কাল্পনিক]

১। বনোয়ারী বাবু

স্থান—উত্তর বিহারের একটি ছোট শহর। কাল—প্রায় সত্তর বৎসর আগে। বেলা তিনটে, আমাদের মিড্‌ল ইংলিশ অর্থাৎ মাইনর স্কুলের থার্ড ক্লাসে পাটীগণিত পড়ানো হচ্ছে। ক্লাসের ছেলেরা উসখুস ফিসফিস করছে দেখে বিধু মাষ্টার বললেন, কি হয়েছে রে?

তখন শিক্ষককে সার বলা রীতি ছিল না, মাষ্টার মশাই বলা হত। আমাদের মুখপাত্র কেষ্ট বলল, এইবার ছুটি দিন মাষ্টার মশাই, সবাই চাদরাবাগ যাব।

—সেখানে কিজন্যে যাবি?

—কলকাতা থেকে একজন বাবু এসেছেন, তাঁর দাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। তাই আমরা দেখতে যাব। হেঁই মাষ্টার মশাই ছুটি দিন।

—চারটের সময় ছুটি হলে তার পরে তো যেতে পারিস।

—অনেক দূর যেতে হবে, বেলা হয়ে যাবে। শুনেছি রোজ বিকেলে তিনি রায়সাহেবদের বাড়ি দাবা খেলতে যান। দেরি করে গেলে দেখা হবে না।

বিধু মাষ্টার বললেন, বেশ, সাড়ে তিনটেয় ছুটি দেব। আমিও তোদের সঙ্গে যাব। দাড়িবাবুর কথা শুনেছি বটে।

চাদরাবাগ অনেক দূর, আমরা প্রায় সাড়ে চারটের সময় বিভূতিবাবুর বাড়ি পৌঁছুলাম, দাড়িবাবু সেখানেই উঠেছেন।

আপনার প্রবলেম? চিন্তার কারণ নেই মাষ্টার মশাই। তিনি প্রসন্ন মনেই মেনে নিয়েছেন, মিউচুয়াল টলারেশন, বুঝলেন কিনা। তাঁরও তো ফুট তিনেক আছে।

বিধু মাষ্টার আঁতকে উঠে বললেন, কি সর্বনাশ!

--তাঁরটা দাড়ি নয় মশাই, মাথার চুল, যাকে বলে কেশপাশ, কুন্তলভার, চিকুরদাম।

আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। তার পর বনোয়ারী বাবু বাঙালী ময়রার দোকান থেকে জিলিপি আনিয়ে আমাদের সবাইকে খাওয়ালেন। আমরা খুশী হয়ে বিদায় নিলুম।

২। সত্যবতী ভৈরবী

তখন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ, পলিটিক্স নিয়ে বেশী লোক মাথা ঘামাত না। সুরেন বাঁড়ুজ্যের চাইতে মাদাম ব্লাভাৎস্কি শশধর তর্কচূড়ামণি আর পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বেশী জনপ্রিয় ছিলেন।

আমাদের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে হরনাথ মুখুজ্যের আশ্রয়। বিস্তর জমি, অনেক আম কাঁঠাল লিচুর গাছ, একতলা পাকা বাড়ি, তা থেকে কিছু দূরে একটি কালীমন্দির। হরনাথ বাবু কলকাতা থেকে কালীমাতার একটি প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং আনিয়ে খুব ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভেটকু তেওয়ারী নামক এক ভোজপুরী ব্রাহ্মণ সেই চিত্রমূর্তির নিত্য সেবা করত। বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে হরনাথ বাবু নিজেই পূজা করতেন।

শাস্ত্রে পটপূজার বিধান থাকিলেও সাধারণ লোকে মাটি-পাথরের বিগ্রহেই অভ্যস্ত। হরনাথ বাবুর এই টু-ডাইমেনশন-ধারিণী পটরূপা দেবীর উপর প্রথম প্রথম লোকের তেমন শ্রদ্ধা হয় নি। একদিন শোনা গেল, তেওয়ারীর হাত থেকে মা-কালী খাঁড়া

কেড়ে নিয়েছেন, হরনাথ বাবু স্বচক্ষে তা দেখেছেন। এর পরে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে দেবী পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত এবং সক্রিয়।

হরনাথ বাবুর আশ্রমে সদাব্রত লেগেই আছে, সব রকম সাধুবাবাই এখানে দিন কতক বাস করতে পারেন। মন্দিরের গায়ে দুটি ছোট কুঠুরি আছে, সেখানে শুধু গৈরিকধারী কানঢাকা-টুপিপরা এক নম্বর সন্ন্যাসী মহারাজদের থাকবার অধিকার আছে। মন্দিরের পিছনে কিছু দূরে একটা চালা ঘর আছে, সেখানে জটা-কৌপীন-লোটা-চিমটা-ধারী দু নম্বর সাধুবাবারা আশ্রয় পান। দুই শ্রেণীর সাধুদের মধ্যে সদভাব নেই। জটাধারীরা সন্ন্যাসী মহারাজদের বলেন, বিলকুল ভ্রষ্ট্ ভণ্ড্। অপর পক্ষ বলেন, গঁজেড়ী ভাংখোর মূর্খ্।

আশ্রমে কোনও নামজাদা বা নতুন ধরনের সাধু এলে অনেকে দেখতে যেত। আমি, কেষ্ট, আর তার ভাগনে জিতুও মাঝে মাঝে যেতুম, অনেক রকম মজাও দেখতুম। একবার তর্ক করতে করতে এক বাঙালী তান্ত্রিক একজন হিন্দুস্থানী বেদান্তীর কাঁধে চড়ে বসলেন, কিছুতেই নামবেন না। দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হল। অবশেষে হরনাথ বাবু অতি কষ্টে সবাইকে শান্ত করলেন। আর একবার কামরূপ থেকে এক সিদ্ধপুরুষ এসেছিলেন, সন্ধ্যার পর তিনি এক আশ্চর্য ইন্দ্রজাল দেখালেন। সামনে একটা আঙটি রেখে তার কিছু দূরে একটা টাকা রাখলেন, তার পর মন্ত্রপাঠ করে মাথা নাড়তে লাগলেন। আঙটিটা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল এবং টাকাকে গ্রেপতার করে নিয়ে ফিরে এল। ওভারসিয়র নীরদবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি ম্যাজিক জানতেন, তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। খপ করে সিদ্ধবাবার কান ধরে তিনি একটা সূক্ষ্ম কালো সুতো টেনে বার করলেন। সুতোটা কানে আটকানো ছিল, আঙটি আর টাকার সঙ্গেও তার যোগ ছিল।

একদিন খবর এল, কাশী থেকে এক বাঙালিনী ভৈরবী এসেছেন, বয়স হলেও তাঁর রূপ নাকি ফেটে পড়ছে। হিন্দুস্থানীরা তাঁকে বলে মাতাজী সত্যবতী, বাঙালীরা বলে তপস্বিনী ভৈরবী। কেষ্ট জিতু আর আমি দেখতে গেলুম। মন্দিরের সামনের বারন্দায় একটা বাঘছালের উপর ভৈরবী বসে আছেন আর দু হাতের মুঠোয় একটা কলকে ধরে হুশ হুশ করে তামাক টানছেন। রঙ ফরসা, মাথায় এক রাশ কালো রুক্ষ ফাঁপানো চুল, অল্প পাক ধরেছে, কপালে ভস্মের তিলক। সামনে একটা চকচকে ত্রিশূল পড়ে আছে।

ক্রমে ক্রমে অনেক দর্শক এল। কেউ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল, কেউ খাড়া হয়েই নমস্কার করল। নানা লোক ভৈরবীকে প্রার্থনা জানাল, তিনিও সকলকে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় মুনশী রামভকত এসে করজোড়ে বললেন, মাতাজী, আজ মেরা কোঠিমে যানে কি বাত থি, এক্কা লায়া।

ভৈরবী বললেন, হাঁ বাবা, আমার ইয়াদ আছে, একটু পরেই উঠছি। মুনশীজী, এই দেখ তোমার জন্যে আমি জয়রাম ধূপ বানিয়েছি, হপ্তা খানিক এর ধোঁয়া দিলে তোমার বাড়ির সব আলাই বালাই ভূত প্রেত দূর হবে, তোমার জরুর উপর যে চুড়ৈল (পেতনী) ভর করেছে সেও ভেগে যাবে।

রামভকত কৃতার্থ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

এমন সময় ভিড় ঠেলে প্রাণকান্ত বাবু এলেন। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত বড় অফিসার, শহরের সকলেই একে খাতির করে। প্রাণকান্ত বাবু এগিয়ে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে মৃদুস্বরে বললেন, ভৈরবী মাতাজী আমার প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টিতে তাকান, বড়ই সংকটে পড়েছি, আপনি ছাড়া কে উদ্ধার করবে?

ভৈরবী কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ

একটু কুঁচকে গেল, মুখে সকৌতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন, আরে প্রাণকান্ত যে! হরে রাম, হরে রাম! চিনতে পেরেছ তো? ওকি, অমন হতভম্ব হয়ে গেলে কেন, ভূত দেখলে নাকি?

প্রাণকান্ত বাবু নির্বাক বিমূঢ় হয়ে মিটমিট করে চাইতে লাগলেন। ভৈরবী বললেন, সেকি প্রাণকান্ত, এর মধ্যেই ভুলে গেলে? লজ্জা কেন, এখন তুমিও সাধু আমিও সাধ্বী, দুজনেই পোড়খাওয়া খাঁটি সোনা। ওকি, পালাচ্ছ কেন, দাঁড়াও দাঁড়াও।

প্রাণকান্ত বাবু দাঁড়ালেন না, ভিড় ঠেলে সবেগে প্রস্থান করলেন। ভৈরবী স্মিতমুখে বললেন, একটা পুরনো ভূত ভেগে গেল। চল মুনশী রামভকত, এইবার তোমার কুঠিতে যাব।

ভৈরবী চলে গেলে দর্শকদের মধ্যে কলরব উঠল। এক দল বলল, ভৈরবী না আরও কিছু। ছিছি, এত লোকের সামনে কেলেঙ্কারি ফাঁস করতে মাগীর লজ্জাও হল না। সেই যে বলে, অঙ্গারঃ শতধৌতেন। আর এক দল বলল, অমন কথা মুখে আনতে নেই, উনি এখন পূর্ণমাত্রায় তপঃসিদ্ধা, গৌতমপত্নী অহল্যার মতন পাপশূন্যা, লজ্জা ভয় নিন্দা প্রশংসার বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন, আগের কথাও লুকুতে চান না। সেই জন্যেই তো সত্যবতী নাম।

ব্যাপার বুঝতে না পেরে আমি কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে ভাই, প্রাণকান্ত বাবু পালিয়ে গেল কেন?

কেষ্ট বলল, বুঝতে পারলি না বোকা, এই ভৈরবীর সঙ্গে প্রাণকান্ত বাবুর লভ হয়েছিল।

মাথায় কাপড় না থাকারই মধ্যে। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে নাক সিঁটকে একবার চারিদিকে উঁকি মারলেন, যেন আরসোলা কি নেংটি ইঁদুর খুঁজছেন। তার পর আমাদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, মোধো মাষ্টার কোন্‌টে রে?

একালের চাইতে তখন ছেলেদের মধ্যে শিভালরি ঢের বেশী ছিল। আমরা সকলেই সসম্ভ্রমে আঙুল বাড়িয়ে মধু মাষ্টারকে শনাক্ত করলুম।

কুঞ্জর মা সোজা তাঁর কাছে গিয়ে কান ধরে বললেন, ইষ্টুপিট মুখপোড়া বাঁদর! তোর বেতগাছটা কোথা রে?

আমরা বললুম, ওই যে, চেয়ারে ওঁর পাশেই রয়েছে। কুঞ্জর মা কিন্তু আমাদের নিরাশ করলেন। বেতটা বাঁ হাতে নিলেন বটে, কিন্তু লাগালেন না, শুধু ডান হাত দিয়ে মধু মাষ্টারের দাড়ি-ভরা গালে গোটা চারেক থাবড়া লাগালেন। তার পর বেতটা নিয়ে কুঞ্জর হাত ধরে গটগট করে চলে গেলেন।

গোলমাল শুনে মাষ্টাররা সবাই আমাদের ক্লাসে এলেন। হেডমাষ্টার মশাই বললেন, বাড়ি যা তোরা।

পরদিন থেকে মধু মাষ্টার গোবেচারার মতন বিনা বেতেই পড়াতে লাগলেন।

ছ মাস পরেই কুঞ্জর সঙ্গে মধু মাষ্টারের একটা পাকা রকম মিটমাট হয়ে গেল। রেল স্টেশনের মালবাবু যামিনী ঘোষাল ছিলেন কুঞ্জর দূর সম্পর্কের ভাই, তাঁর সঙ্গে মধু মাষ্টারের বৈমাত্র বোন ভুতির বিয়ে স্থির হল। মধু মাষ্টার যথাসাধ্য আয়োজন করলেন, অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে গেল। বিবাহসভায় সবাই বরের জন্যে অপেক্ষা করছে, এমন সময় বরপক্ষের একজন খবর আনল—যামিনী বলেছে, মধু চামারের বোনকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। কেষ্ট আমাদের চুপিচুপি বলল, কুঞ্জই ভাঙচি দিয়েছে।

বিয়েবাড়িতে প্রচণ্ড হইচই উঠল। মধু মাষ্টারের বিমাতা কুঞ্জর মায়ের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, রক্ষা কর দিদি, এখন বর কোথায় পাব, তোমার ছেলে কুঞ্জকে আদেশ কর।

কুঞ্জর মা বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, বামুনের জাতধর্ম বাঁচাতে হবে বইকি। এই কুঞ্জ, তোর ময়লা কাপড়টা ছেড়ে এই চেলিটা পর।

কুঞ্জ বলল, ভুতি যে বিচ্ছিরি !

তার মা বললেন, আহা, কি আমার কাত্তিক ছেলে রে ! ওঠ বলচি, নয়তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

কুঞ্জর বাবা বললেন, ছেলেটার যখন আপত্তি তখন জোর করে বিয়ে দেবার দরকার কি ?

কুঞ্জর মা বললেন, যাও যাও, তুমি আবার এর মধ্যে নাক গলাতে এলে কেন ?

কুঞ্জ তবু ইতস্তত করছে দেখে কেষ্ট তাকে চুপিচুপি বলল, বিয়েটা করে ফেল কুঞ্জ, অনেক সুবিধে। সোনার আঙটি পাবি, রুপোর ঘড়ি আর ঘড়ির চেন পাবি, ক্লাসে প্রমোশনও পেয়ে যাবি। আর মধু মাষ্টার মশাই তোর কে হবেন জানিস তো ? শালা।

কুঞ্জ আর আপত্তি করে নি।

১৮৮০

উৎকণ্ঠা স্তম্ভ

বিলিতী খবরের কাগজে যাকে অ্যাগনি কলম বলা হয় তাতে এক শ্রেণীর ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বহুকাল থেকে ছাপা হয়ে আসছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগে বাঙলা কাগজে সে রকম বিজ্ঞাপন কদাচিৎ দেখা যেত, কিন্তু আজকাল ক্রমেই বাড়ছে। 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' শীর্ষক স্তম্ভে তার অনেক উদাহরণ পাবেন। ইংরেজীতে যা অ্যাগনি কলম, বাঙলায় তারই নাম উৎকণ্ঠা স্তম্ভ।

কয়েক মাস আগে দৈনিক যুগানন্দ পত্রের উৎকণ্ঠা স্তম্ভে উপরি উপরি দু দিন এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গিয়েছিল—

বাবা পানু, যেখানেই থাক এখনই চলে এস, টাকার দরকার হয় তো জানিও। তোমার মা নেই, বুড়ো বাপ আর পিসীমাকে এমন কষ্ট দেওয়া কি উচিত? তুমি যাকে চাও তার সঙ্গেই যাতে তোমার বিয়ে হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। কিছু ভেবো না, শীঘ্র ফিরে এস।—তোমার পিসীমা।

চার দিন পরে উক্ত কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল—

এই পেনো, পাজী হতভাগা শুওর, যদি ফিরে আসিস তবে জুতিয়ে লাট করে দেব। আমার দেরাজ থেকে তুই সাত শ টাকা চুরি করে পালিয়েছিস, শুনতে পাই বিপিন নন্দীর ধিঙ্গী মেয়ে লেত্তি তোর সঙ্গে গেছে। তুই ভেবেছিস কি? তোকে ফেরাবার জন্যে সাধাসাধি করব? তেমন বাপই আমি নই। তোকে ত্যাজ্যপুত্র করলুম, তোর চাইতে ঢের ভাল ভাল ছেলের আমি জন্ম দেব, তার জন্যে ঘটক লাগিয়েছি।—তোর আগেকার বাপ।

সাত দিন পরে এই বিজ্ঞাপন দেখা গেল—

পান্নু-দা, চিঠিতে লিখে গেছ তিন দিন পরেই ফিরবে, কিন্তু আজও দেখা নেই। গেছ বেশ করেছ, কিন্তু আমার মফ চেন আর ব্রোচ নিয়ে গেছ কেন? তুমি যে চোর তা ভাবতেই পারি নি। এখন তোমাকে চিনেছি, চেহারাটাই চটকদার, তা ছাড়া অন্য গুণ কিছুই নেই। অল্প দিনের মধ্যে বিদায় হয়েছ ভালই, কিন্তু আর ফিরে এসো না! ভেবেছ আমার বুক ভেঙে যাবে, তোমাকে ফেরাবার জন্য সাধাসাধি করব? সে রকম ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে আমি নই, নিজের পথ বেছে নিতে পারব। —লেত্তি।

উৎকণ্ঠা স্তম্ভের এই সব বিজ্ঞাপন পড়ে পাঠকবর্গ বিশেষত যাদের ফুরসত আছে, মহা উৎকণ্ঠায় পড়ল। অনেকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে গবেষণা করতে লাগল, ব্যাপারটা কি। একজন বিচক্ষণ সিনেমার ঘুণ বললেন, বুঝছ না, এ হচ্ছে একটা ফিল্মের বিজ্ঞাপন, প্রথমটা শুধু পবলিকের মনে সুড় সুড়ি দিচ্ছে, তার পর খোলসা করে জানাবে আর বড় বড় পোস্টার সাঁটবে। আর একজন প্রবীণ সিনেমা রসিক বললেন, ছকু চৌধুরী যে নতুন ছবিটা বানাচ্ছে—মুটো মুঠো প্রেম, নিশ্চয় তারই বিজ্ঞাপন। আর একজন বললেন, তোমরা কিছুই বোঝ না, এ হচ্ছে চা-এর বিজ্ঞাপন, দু দিন পরেই লিখবে—আমার নাম চা, আমাকে নিয়মিত পালন করুন, তা হলেই সংসারে শান্তি বিরাজ করবে। আর একজন বললেন, চা নয়, এ হচ্ছে বনস্পতির বিজ্ঞাপন। বুড়োর দল কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত মানলেন না। তাঁদের মতে এ হচ্ছে মামুলা পারিবারিক কেলেঙ্কারির ব্যাপার, সিনেমা দেখে আর উপন্যাস পড়ে সমাজের যে অধঃপতন হয়েছে তারই লক্ষণ।

কয়েক দিন পরেই উৎকণ্ঠা স্তম্ভে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল—

লেত্তি দেবী, আপনার মনের বল দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

আপনার ভাল নাম লতিকা কি ললিতা তা জানি না, আমাকেও আপনি চিনবেন না, তবু সাহস করে অনুরোধ করছি, আপনার ব্যর্থ অতীতকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করুন, প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ান, আমরা দুজনে স্বর্ণময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতে অগ্রসর হব। আমি আপনার অযোগ্য সাথী নই, এই গ্যারাণ্টি দিতে পারি। আরও অনেক কিছু লিখতুম, কিন্তু কাগজওয়ালারা ডাকাত, এক লাইনের রেট পাঁচ সিকে নেয়, সেজন্যে এখানেই থামতে হল। উত্তরের আশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলুম, আপনার ঠিকানা পেলে মনের কথা সবিস্তারে লিখব—কৃষ্ণধন কুণ্ডু (বয়স ২৬) এঞ্জিনিয়ার, গণেশ কটন মিল, পারেল, বম্বে।

দু দিন পরে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল—

শ্রীমান পানুর পিতা মহাশয়, আপনার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানিলাম আপনি আবার বিবাহ করিবেন, সে কারণে ঘটক লাগাইয়াছেন। যদি ইতিমধ্যে অন্য কাহারও সঙ্গে পাকা কথা না হইয়া থাকে তবে আমার প্রস্তাবটি বিবেচনা করিবেন। আমি এখানকার ফিমেল জেলের সুপারইনটেনডেণ্ট, বয়স চল্লিশের কম, হাজার দশেক টাকা পুঁজি আছে। চাকরি আর ভাল লাগে না, বড়ই অপ্রীতিকর, সেজন্য সংসার ধর্ম করিতে চাই। যদি আমার পাণিগ্রহণে সম্মত থাকেন তবে সত্বর জানাইবেন, কারণ আরও দুই ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা চলিতেছে।—ডকটর মিস সত্যভামা ব্যানার্জি, পি-এইচ-ডি, ফিমেল জেল, চুন্দ্রিগড়।

এর পর উৎকণ্ঠা স্তম্ভে আর কোনও বিজ্ঞাপন দেখা গেল না, কিন্তু ব্যাপারটি অনেক দূর গড়িয়েছিল। বিশ্বস্ত সূত্রে যা জানা গেছে তাই সংক্ষেপে বলছি।

বিপিন নন্দীর মেয়ে লেত্তি (ভাল নাম লজ্জাবতী) কৃষ্ণধন কুণ্ডুকে বিয়ে করেছে। পানু অর্থাৎ প্রাণতোষের বুড়ো বাপ মনোতোষ ভটচাজ ডকটর সত্যভামাকে বিয়ে করেছেন। অগত্যা পানুর পিসীমা কাশী চলে গেছেন।

বোম্বাই থেকে পানু তার বাপকে চিঠি লিখেছে—

পূজনীয় বাবা, তোমার টাকার জন্যে ভেবো না, যা নিয়েছিলুম সুদ সুদ্ধ ফেরত দেব। আমি মোটেই কুপুত্তুর নই, ফেলনা বংশধর নই, তোমার বংশ আমি উজ্জ্বল করেছি। আমার নাম এখন প্রাণতোষ নয়, সুন্দরকুমার। নয়নসুখ ফিল্ম কম্পানিতে জয়েন করেছি, বেশ ভাল রোজগার। এখানে আমার খুব নাম, সবাই বলে সুন্দরকুমারের মতন খুব সুরত অ্যাক্টর দেখা যায় না। শুনলে অবাক হবে, বিখ্যাত স্টার মিস গুলাবা ভেরেন্দী আমাকে বিবাহ করেছেন। তাঁর কত টাকা আছে জান? পাঁচ লাখ বাহান্ন হাজার, তা ছাড়া তিনটে মোটর কার। আগামী রবিবার বম্বে মেলে আমি সস্ত্রীক কলকাতায় পৌঁছুব। আমাদের জন্যে দোতালার বড় ঘরটা সাহেবী স্টাইলে সাজিয়ে রেখো, ফুলদানিতে এক গোছা রজনীগন্ধা যেন থাকে। ভয় নেই, বেশী দিন থাকব না, হপ্তা খানেক পরেই বোম্বাইএ ফিরে আসব।

মনোতোষ ভটচাজের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডকটর সত্যভামা বলেন, তা ছেলেটা আসছে আসুক না, তুমি গালাগাল মন্দ দিও না বাপু। পানু আমাদের বাহাদুর ছেলে।

কৃষ্ণধন কুণ্ডু ছুটি নিয়ে তার বউ লেত্তির সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল। পানু সস্ত্রীক বাড়ি আসছে শুনে লেত্তি চুপ করে থাকতে পারল না, মনোতোষ ভটচাজের বাড়িতে উপস্থিত হল। পাড়ার আরও অনেকে এল, সিনেমা স্টার গুলাবাকে দেখবার জন্যে। কিন্তু পানুকে একলা দেখে সবাই নিরাশ হয়ে গেল।

মনোতোষ বললেন, একা এলি যে? তোর বউ কোন্ চুলোয় গেল?

মাথা চুলকে পান্নু বলল, সে আসতে পারল না বাবা। হঠাৎ মস্কো থেকে একটা তার এল, তাই এক মাসের জন্যে সোবিএত রাষ্ট্রে কলচরাল টুর করতে গেছে।

লেত্তি বলল, সব মিছে কথা। আমরা সদ্য বোম্বাই থেকে এসেছি, সেখানকার সব খবর জানি। গুলাবা ভেরেন্দী তোমাকে বিয়ে করবে কোন্ দুঃখে? দু বছর আগে নবাবজাদা সোভানুল্লার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। তাঁকে তালাক দিয়ে গুলাবা সম্প্রতি লগনচাঁদ বজাজকে বিয়ে করেছে। তুমি তো গ্রাণ্ট রোডে একটা ইরানী হোটেলে বয়-এর কাজ করতে, চুরি করেছিলে তাই তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মনোতোষ গর্জন করে বললেন, দূর হ জোচ্চোর ভ্যাগাবণ্ড, নয়তো জুতিয়ে লাট করে দেব।

সত্যভামা বললেন, আহা, ছেলেটাকে এখনি তাড়াচ্ছ কেন, আগে একটু জিরুক। বাবা পান্নু, ভেবো না, তোমার একটা হিল্লে আমিই লাগিয়ে দিচ্ছি। আমার ফ্রেণ্ড মিষ্টার হায়দর মুস্তাফা কলকাতায় এসেছেন। দক্ষিণ বর্মায় মৌলমিন শহরে তাঁর বিরাট পোলট্রি ফার্ম আছে, আমি তাঁকে বললেই তোমাকে তার ম্যানেজার করে দেবেন। তুমি তৈরী হয়ে নাও, পরশু তিনি রওনা হবেন, তাঁর সঙ্গেই তুমি যাবে। টাকার জন্যে ভেবো না, আমি তোমার জাহাজ ভাড়া আর কিছু হাত খরচ দেব।

অতঃপর সকলের উৎকণ্ঠার অবসান হল। তবে পান্নুর হিল্লে এখনও পাকাপাকি লাগে নি। সাত দিন পরেই সে মুস্তাফা সাহেবের কিছু টাকা চুরি করে সিংগাপুরে পালিয়ে গেল। সেখানে পিপল্‌স চায়না হোটেলে একটা কাজ যোগাড় করেছে,

খদ্দেরদের খাবার পরিবেশন করতে হয়। হোটেলের মালিক মিস ফুক-সান তাকে সুনজরে দেখেন। পানুর আশা আছে, ভাল করে খোশামোদ করতে পারলে মিস ফুক-সান তাকে পোষ্য পতির পদে প্রমোশন দেবেন।

১৮৮০

দীনেশের ভাগ্য

জয়গোপাল সেন, জীবনকৃষ্ণ দত্ত, আর গোলোকবিহারী হালদার কাছাকাছি বাস করেন। জয়গোপাল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, ভক্তি-শাস্ত্রের চর্চা করেন, আত্মা ভগবান আর পরকাল সম্বন্ধে তাঁর বাঁধাধরা মত আছে। জীবনকৃষ্ণ গোঁড়া পাষণ্ড নাস্তিক, বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, আত্মা ভগবান পরকাল মানেন না। তাঁর মতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে দেশকালের একটি গাণিতিক জগাখিচুড়ি, তাতে নিরন্তর ছোট বড় তরঙ্গ উঠছে আর ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন পজিট্রন প্রভৃতি হরেক রকম অতীন্দ্রিয় কণিকা আধসিদ্ধ খুদের মতন বিজবিজ করছে, মানুষের চেতনা সেই খিচুড়িরই একটু ধোঁয়া অর্থাৎ তুচ্ছ বাই-প্রডক্ট। গোলোকবিহারী হচ্ছেন আধা-আস্তিক আধা-পাষণ্ড, তিনি কি মানেন বা মানেন না তা খোলসা করে বলেন না। তিন জনেরই বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, সুতরাং মতিগতি বদলাবার সম্ভাবনা কম। মতের বিরোধ থাকলেও এঁরা পরম বন্ধু, রোজ সন্ধ্যাবেলা জয়গোপালের বাড়িতে আড্ডা দেন। সম্প্রতি দশ দিন আড্ডা বন্ধ ছিল, কারণ জয়গোপাল কাশী গিয়েছিলেন। আজ সকালে তিনি ফিরেছেন, সন্ধ্যার সময় পূর্ববৎ আড্ডা বসেছে।

গোলোক হালদার প্রশ্ন করলেন, তোমার শালা দীনেশের খবর কি জয়গোপাল, এখন একটু সামলে উঠেছে? আহা, অমন চমৎকার মানুষ, কি শোকটাই পেল! এক মাসের মধ্যে স্ত্রী আর বড় বড় দুটি ছেলে কলেরায় মারা গেল, আবার কুবের ব্যাংক ফেল হওয়ায় দীনুর গচ্ছিত টাকাটাও উবে গেল। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জয়গোপাল বললেন, সবই শ্রীহরির ইচ্ছা,

কেন কি করেন তা আমাদের বোঝবার শক্তি নেই, মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। এখান থেকে দীনেশের নড়বার ইচ্ছে ছিল না, প্রায় জোর করে তাকে কাশীতে তার খুড়তুতো ভাই শিবনাথের কাছে রেখে এলুম। শিবনাথ অতি ভাল লোক, দীনুকে গয়া প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বার ঘুরিয়ে আনবে। তীর্থভ্রমণই হচ্ছে শোকের সব চাইতে ভাল চিকিৎসা। দীনুর মেয়ে আর ছোট ছেলেটিকে আমাদের কাছেই রেখেছি।

অন্যান্য দিন তিন বন্ধু সমাগত হবামাত্র আড্ডাটি জমে ওঠে, অর্থাৎ তুমুল তর্ক আরম্ভ হয়। জয়গোপালের শালা দীনেশের বিপদের জন্যে আজ সকলেই একটু সংযত হয়ে আছেন, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ বেশীক্ষণ সামলাতে পারলেন না। বললেন, ওহে জয়গোপাল, তোমার দয়াময় হরির আক্কেলটা দেখলে তো? দীনেশের মতন গোবেচারা ভালমানুষ নিষ্পাপ লোককে এমন থেঁতলে দিলেন কেন? কর্মফল বললে শুনব না। পূর্বজন্মে দীনু যদি কিছু দুষ্কর্ম করেই থাকে তার জন্যে তো তোমার ভগবানই দায়ী, তিনিই তো সব করান।

গোলোক হালদার চোখ টিপে বললেন, ব্যাখ্যা অতি সোজা। ভগবানের সাধ্য নেই যে মানুষের ফ্রী উইলে হস্তক্ষেপ করেন। দীনেশ তার স্বাধীন ইচ্ছাতেই পূর্বজন্মে দুষ্কর্ম করেছিল, তারই ফল এজন্মে পেয়েছে। কি বল জয়গোপাল?

জীবনকৃষ্ণ বললেন, ও সব গোঁজামিল চলবে না। হিন্দু মতে পুনর্জন্ম আর কর্মফল মানবে, আবার খ্রীষ্টানী মতে ফ্রী উইল মানবে, এ হতে পারে না। তোমার গীতাতেই তো আছে—ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে থাকেন আর যন্ত্রারূঢ়বৎ চালনা করেন। অর্থাৎ ঈশ্বর হচ্ছেন কুমোর আর মানুষ হচ্ছে কুমোরের চাকে মাটির ডেলা। মানুষের পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ সমস্তের জন্যে ঈশ্বরই দায়ী। তাঁকে দয়াময় বলা মোটেই চলবে না।

জয়গোপাল বললেন, তর্ক করলে শ্রীকৃষ্ণ বহু দূরে সরে যান, বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি কৃপাসিন্ধু মঙ্গলময়। আমরা জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র প্রাণী, তাঁর উদ্দেশ্য বোঝা আমাদের অসাধ্য। শুধু এইটুকুই জানি, তিনি যা করেন তা জগতের মঙ্গলের জন্যেই করেন। কান্তকবি তাই গেয়েছেন—জানি তুমি মঙ্গলময়, সুখে রাখ দুঃখে রাখ যাহা ভাল হয়।

অট্টহাস্য করে জীবনকৃষ্ণ বললেন, বাহবা, চমৎকার যুক্তি। একেই বলে বেগিং দি কোয়েশ্চন। কোনও প্রমাণ নেই অথচ গোড়াতেই মেনে নিয়েছ যে ভগবান আছেন এবং তিনি পরম দয়ালু। যদি সুখ পাও তবে বলবে, এই দেখ ভগবানের কত দয়া। যদি দুঃখ পাও তবে কুযুক্তি দিয়ে তা ঢাকবার চেষ্টা করবে। হিন্দু বলবে কর্মফল, খ্রীষ্টান বলবে ফ্রী উইল আর অরিজিনাল সিন। কুকুর বেরাল ছাগল বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে দেখলে বলবে, আহা ভগবানের কত দয়া, সন্তানের জন্য মাতৃবক্ষে অমৃতরসের ভাণ্ড সৃষ্টি করছেন। কিন্তু দীনেশের মতন সাধুলোক যখন শোক পায় আর সর্বস্বান্ত হয়, হাজার হাজার মানুষ যখন দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বা যুদ্ধে মরে, তখন তো মুখ ফুটে বলতে পার না—উঃ, ভগবান কি নিষ্ঠুর! তোমরা ভক্তরা হচ্ছ খোশামুদে একচোখো, যুক্তির বালাই নেই, শুধু অন্ধ বিশ্বাস। আচ্ছা জয়গোপাল, কবি ঈশ্বর গুপ্ত তোমার মাতৃকুলের একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন না? তিনি ভগবানকে অনেকটা চিনতে পেরেছিলেন, তাই লিখেছেন—

হায় হায় কব কায় কি হইল জ্বালা,
জগতের পিতা হয়ে তুমি হলে কালা,
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম,
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।

গোলোক হালদার বললেন, ওহে জীবনকেষ্ট, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। তোমার মুশকিল হয়েছে এই যে তুমি জগতের

সমস্ত ব্যাপারের আর মানুষের সমস্ত চিন্তার সামঞ্জস্য করতে চাও। তোমাদের বিজ্ঞান অচেতন জড় প্রকৃতির মধ্যেই পুরো সামঞ্জস্য খুঁজে পায় নি, সচেতন মানুষের চিত্ত তো দূরের কথা। যুক্তিবাদী চার্বাকরা বড় বেশী দাম্ভিক হয়। তোমরা মনে কর, অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রন থেকে অতি বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যন্ত সবই আমরা মোটামুটি বুঝি, সবই যুক্তি খাটিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করি। তবে মানুষের চিত্তের অবুদ্ধি আর অযুক্তি সইব কেন?

জীবন। চিত্ত মানে কি?

গোলোক। চিত্তের অনেক রকম মানে হয়। আমাদের মনের যে অংশ সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ দয়া ঘৃণা ইত্যাদি অনুভব করে তাকেই চিত্ত বলছি। চিত্তের ব্যাপারে যুক্তি আর বুদ্ধি খাটে না।

জীবন। মনোবিজ্ঞানীরা সেখানেও নিয়ম আবিষ্কার করেছেন।

গোলোক। বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি, মানুষের চিত্ত এখনও দুর্গম রহস্য। আচ্ছা, বল তো, দাশরথি চন্দরের শ্রাদ্ধ সভায় তুমি তার গুণকীর্তন করেছিলে কেন?

জীবন। কেন করব না। দাশরথিবাবু বিস্তর দান করেছেন, আমাদের পাড়ার কত উন্নতি করেছেন, রাস্তা টারম্যাক করিয়েছেন, ইলেকট্রিক ল্যাম্প বসিয়েছেন, আমাদের অ্যাসেসমেণ্ট কমিয়েছেন, পাড়ায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গোলোক। লোকটি প্রচণ্ড মাতাল আর লম্পট ছিল, গুণ্ডা পুষত, দুর্বলের ওপর অত্যাচার করত—এ সব ভুলে গেলে কেন?

জীবন। কিছুই ভুলি নি। মৃত লোকের শ্রাদ্ধসভায় শুধু শ্রদ্ধা জানানোই দস্তুর, দোষের ফর্দ দেওয়া অসভ্যতা।

গোলোক। তার মানে তুমিও সময় বিশেষে একচোখো হও। জয়গোপাল যদি তার ইষ্টদেবতার শুধু সদ্‌গুণই দেখে আর তাতেই আনন্দ পায় তবে তুমি দোষ ধরবে কেন?

তার মেয়ে তো কেঁদেই অস্থির। বলেছে, সৎমায়ের কাছে থাকব না, এখনই আমার বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও। ছোট ছেলেটা বলেছে, ব্যাট দিয়ে নতুন মায়ের মাথা ফাটিয়ে দেব। তাদের পিসী আমার স্ত্রী বলেছেন, সৎমায়ের কাছে যেতে হবে না, তোরা আমার কাছেই থাকবি। আমি গুজবে বিশ্বাস করি নি, কিন্তু দীনেশ এই চিঠিতে খোলসা করে লিখেছে।

গোলোক। একটু শোনাও না কি লিখেছে।

জয়গোপাল। চার পাতায় বিস্তর লিখেছে। তার বক্তব্যের যা সার তাই পড়ছি শোন।—শিবনাথের ছোট শালী চামেলীর গুণের তুলনা হয় না। আমার ইনফ্লুএঞ্জার সময় যে সেবাটা করেছে তা বলবার নয়। সকলের মুখে এক কথা—চামেলীই আমাকে বাঁচিয়েছে। শিবনাথ নাছোড়বান্দা হয়ে আমাকে ধরে বসল, চামেলীকে নাও, সে তো তোমারই। সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু কুশ্রীও বলা চলে না। তার বয়স চব্বিশের মধ্যে, একটু বেশী তোতলা, তাই এ পর্যন্ত বিয়ে হয় নি। আমার বিশ্বাস ডাক্তার অনিল মিত্র তাকে সারাতে পারবেন। তার বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন, তাঁর উইল অনুসারে চামেলী প্রায় দশ হাজার টাকার সম্পত্তি পেয়েছে। আমার নিজের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, চুলে একটু পাকও ধরেছে, কিন্তু এখানে সবাই বলছে, আমাকে নাকি চল্লিশের কম দেখায়। অগত্যা রাজী হলুম। দেখি, ভগবানের দয়ায় আবার সংসার পেতে যদি একটু শান্তি পাই।···এই রকম অনেক কথা দীনেশ লিখেছে। বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে লজ্জাও হল না! ছি ছি ছি।

গোলোক। ছি ছি করবার কি আছে, বিয়ে করেছে তো হয়েছে কি?

জয়গোপাল। শাস্ত্রে আছে, পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্যা। আরে তোর দুটো ছেলে না হয় গেছে, কিন্তু একটা তো বেঁচে আছে,

মেয়েও একটা আছে, তবে কোন্ হিসেবে আবার বিয়ে করলি? তোর বয়স হয়েছে, দেবার্চনা ধ্যান-ধারণা পরমার্থচিন্তা এই সব করেই তো শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতিস। বুড়ো বয়সে একি মতিচ্ছন্ন হল!

গোলোক। ওহে জয়গোপাল, তুমি নিজের কথার খেলাপ করছ। তোমার শ্রীভগবান যে মঙ্গলময় তা তো দেখতেই পেলে। শেষ পর্যন্ত দীনেশের ভালই করলেন, তরুণী ভার্যা দিলেন, আবার দশ হাজার টাকাও দিলেন। আর, তোতলা স্ত্রী ছেলেমেয়ে সব মারা গেল, হরগোবিন্দর দুটো পা কাটা গেল। লোকটি অতি সজ্জন, বিস্তর টাকা, কিন্তু বেচারা অনেক চেষ্টা করেও আর একটা বউ যোগাড় করতে পারে নি, একটা বোবা কালা কানা খোঁড়াও জোটে নি।

গোলোক। হরগোবিন্দকে চিনি না, তার জন্যে ভাববার দরকার নেই। আমাদের দীনেশ কিন্তু ভাগ্যবান। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—সে গোঁফ কামিয়ে তরুণ হয়েছে, চুলে কলপ লাগিয়েছে, জরি পাড় ধুতি আর সোনালী গরদের পঞ্জাবি পরেছে, জগদানন্দ মোদক খাচ্ছে, তার ঠোঁটে একটু বোকা বোকা হাসি ফুটেছে।

১৮৮০

ভূষণ পাল

ভূষণ পাল তার এককালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রতিবেশী নবীন সাঁতরাকে খুন করেছিল, সেসন্‌স জজ তার ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। আসামীকে যারা চেনে তারা সকলেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাদের আশা ছিল বড় জোর আট-দশ বছর জেল হবে। কিন্তু ভূষণের উকিলের কোনও যুক্তি হাকিম শুনলেন না। বললেন, আসামী ঝোঁকের মাথায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে খুন করে নি, অনেকদিন থেকে মতলব এঁটে মারবার চেষ্টায় ছিল, অবশেষে সুযোগ পেয়ে ছোরা বসিয়েছে। আসামীর আক্রোশের যতই কারণ থাক তাতে তার অপরাধের গুরুত্ব কমে না। জুরি একমত হয়ে ভূষণকে দোষী সাব্যস্ত করলেও একটু দয়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু হাকিম দয়া করলেন না, চরম দণ্ডই দিলেন।

ভূষণ পাল হিন্দুস্থান মোটর ওআর্ক্‌স-এ মিস্ত্রীর কাজ করত। ফাটা তোবড়া মাডগার্ড বেমালুম মেরামত করতে তার জুড়ী ছিল না, সেজন্য মাইনে ভালই পেত। সেখানে তার গুরুস্থানীয় হেডমিস্ত্রী ছিল সাগর সামন্ত। কারখানার লোকে তাকে সামন্ত মশাই বলে ডাকে, কিন্তু একটা দূর সম্পর্ক থাকায় ভূষণ তাকে সাগর কাকা বলে।

রায় বেরুবার পরদিন বিকাল বেলা সাগর সামন্ত আলীপুর জেলে তার প্রিয় শাগরেদ ভূষণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দু হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে সাগর বলল, কি করে তোকে বাঁচাব রে ভূষণ।

ভূষণ বলল, অমন করে তুমি কেঁদো না সাগর কাকা, তা হলে আমার মাথা বিগড়ে যাবে।

চোখ মুছতে মুছতে সাগর বলল, উকিল বাবু এখনও আশা ছাড়েন নি, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন। বললেন, আপীল করবেন।

—আপীল আবার কেন। যা হবার হয়ে গেছে, আর কিছুই করবার দরকার নেই, মিথ্যে টাকা বরবাদ হবে।

—বরবাদ নয় রে, তোকে বাঁচাবার জন্যে খরচ হবে। পোষ্টাপিসে তোর যে পঁয়ত্রিশ শ টাকা ছিল তোর কথামত তার সবটাই তুলে নিয়ে আমার কাছে রেখেছি। তা থেকে দু শ আন্দাজ খরচ হয়েছে, বাকী সবই তো রয়েছে। তাতে না কুলয় তো আমরা সবাই চাঁদা তুলে আপীলের খরচ যোগাব।

—উকিল আদিত্যবাবু কত টাকা নিয়েছেন?

—নিজের জন্য একপয়সাও নেন নি, শুধু আদালতের খরচ বাবদ কিছু নিয়েছেন। বলেছেন, ভূষণকে যদি বাঁচাতে পারতুম তবেই ফী নিতুম। তিনি আর তাঁর বন্ধু উকিলরা সবাই বলেছেন, আপীল করলে নিশ্চয় রায় পালটে যাবে—লম্বা জেল হলেও তোর প্রাণটা তো রক্ষা পাবে।

—খবরদার আপীল করবে না। দশ-বিশ বছর জেলে থাকার চাইতে চটপট মরা ঢের ভাল।

—নবীনকে ছোরা মেরে খুন করলি কেন রে হতভাগা? তার চাইতে যদি পাঁচসেরী হম্বর দিয়ে হাঁটুতে এক ঘা লাগাতিস তা হলে নব্নে মরত না, চিরটা কাল খোঁড়া হয়ে বেঁচে থাকত আর ভাবত—হাঁ, ভূষণ পাল সাজা দিতে জানে বটে। তোরও বড় জোর দু-চার বছর জেল হত।

—নব্নেকে একবারে সাবড়ে দিয়েছি বেশ করেছি! তার ভূতটা যদি আমার কাছে আসে তাকেও গলা টিপে মারব।

—রাম রাম, এসব কথা মুখে আনিস নি ভূষণ, যা হয়ে গেছে একদম ভুলে যা। শুধু হরিনাম কর, মা-কালীকে ডাক, যাতে পরকালে কষ্ট না পাস। এখন বল তোর টাকার বিলি ব্যবস্থা

—তোমার চাইতে সৎপাত্র পাব কোথা। আমার বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই, শুধু তুমিই আছ। আচ্ছা সাগর কাকা, মরবার পরে যমদূত আমাকে সোজা নরকে নিয়ে যাবে তো?

—তা আমার মনে হয় না। আমাদের হাকিমদের চাইতে যমরাজ ঢের বেশী বোঝেন। অন্যায় সইতে না পেরে রাগের মাথায় একটা পাপ করে ফেলেছিস, তার সাজাও মাথা পেতে নিচ্ছিস, আপীল পর্যন্ত করতে চাস না। তোর পাপ বোধ হয় এখানেই খণ্ডে গেল। আদিত্য উকিল বাবু কি বলেছে জানিস? ইংরেজ বিদেয় হয়েছে, কিন্তু নিজেদের ফৌজদারী আইন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে। ওদের দেশে নব্নের অপরাধটা কিছুই নয়, তার জন্যে কেউ খেপে গিয়ে মানুষ খুন করে না, বড় জোর খেসারত দাবি করে আর তালাকের দরখাস্ত করে। ওদের বিচারে নব্নের চাইতে তোর অপরাধ ঢের বেশী। কিন্তু যদি সেকালের হিঁদু রাজা কি মুসলমান বাদশার আমল হত তবে তুই বেকসুর খালাস পেতিস। দেখ ভূষণ, আমার মনে হয় তোর স্বর্গে ঠাঁই হবে না বটে, কিন্তু নরক ভোগ থেকে তুই রেহাই পাবি।

—স্বর্গেও নয় নরকেও নয়, তবে ঠাঁই হবে কোথায়?

—তুই আবার জন্মাবি।

—সে তো খুব ভালই হবে। সাগরকাকা, কাকীকে বলো আমার জন্যে যেন খান কতক কাঁথা সেলাই করে রাখে।

—কাঁথা কি হবে রে?

—শুনেছি মরবার সময় মানুষের যে মনোবাঞ্ছা থাকে পরের জন্মে তাই ফলে। ফাঁসির সময় আমি কেবল তোমার আর কাকীর কথা ভাবব। দেখো, ঠিক তোমাদের ছেলে হয়ে জন্মাব। এমন বাপ মা পাব কোথায়? দাগী ছেলেকে ঘেন্না করে ফেলে দেবে না তো সাগর কাকা?

জেলের ওআর্ডার এসে জানাল, সময় হয়ে গেছে, ভিজিটারকে এখন চলে যেতে হবে।

সাগর সামন্ত ভূষণকে একবার জড়িয়ে ধরল, তার পর ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলে গেল!

১৮৮০

দাঁড়কাগ

কাঞ্চন মজুমদার অনেক কাল পরে তার বন্ধু যতীশ মিত্রের আড্ডায় এসেছে। তাকে দেখে সকলে উৎসুক হয়ে নানারকম সম্ভাষণ করতে লাগল।—আরে এস এস, এত দিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে? বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলে নাকি? ব্যারিষ্টারিতে খুব রোজগার হচ্ছে বুঝি, তাই গরিবদের আর মনে পড়ে না?

প্রবীণ পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, বে-থা করলে, না এখনও আইবুড় কার্তিক হয়ে আছ?

কাঞ্চন বলল, কই আর বিয়ে হল সর্বজ্ঞ মশাই, পাত্রীই জুটছে না।

উপেন দত্ত বলল, আমাদের মতন চুনো পুঁঠি সকলেরই কোন্ কালে জুটে গেছে, শুধু তোমারই জোটে না কেন? অমন মদনমোহন চেহারা, উদীয়মান ব্যারিষ্টার, দেদার পৈতৃক টাকা, তবু বিয়ে হয় না? ধনুকভাঙা পণ কিছু আছে বুঝি? এদিকে বয়স তো হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, চুল উঠে গিয়ে ডিউক অভ এডিনবরোর মতন প্রশস্ত ললাট দেখা দিচ্ছে, খুঁজলে দু-চারটে পাকা চুলও বেরুবে। পাত্রীরা তোমাকে বয়কট করেছে নাকি?

—বয়কট করলে তো বেঁচে যেতুম। ষোল থেকে বত্রিশ যেখানে যিনি আছেন সবাই ছেকে ধরেছেন। গণ্ডা গণ্ডা রূপসী যদি আমার প্রেমে পড়তে চান্ তবে বেছে নেব কাকে!

উপেন বলল, উঃ, দেমাকের ঘটাখানা দেখ। তুমি কি বলতে চাও গণ্ডা গণ্ডা রূপসীর মধ্যে তোমার উপযুক্ত কেউ নেই? আসল

কথা, তুমি ভীষণ খুঁতখুঁতে মানুষ। নিশ্চয় তোমার মনের মধ্যে কোনও গণ্ডগোল আছে, নিজেকে অদ্বিতীয় রূপবান গুণনিধি মনে কর তাই পছন্দ মত মেয়ে কিছুতেই খুঁজে পাও না। হয়তো মেয়েরাই তোমার কথা শুনে ভড়কে যায়।

—মিছিমিছি আমার দোষ দিও না উপেন। বিয়ের জন্যে আমি সত্যিই চেষ্টা করছি, কিন্তু যাকে তাকে তো চিরকালের সঙ্গিনী করতে পারি না। হঠাৎ প্রেমে পড়ার লোক আমি নই, আমার একটা আদর্শ একটা মিনিমম স্ট্যাণ্ডার্ড আছে। রূপ অবশ্যই চাই, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি কলচারও বাদ দিতে পারি না। সুশিক্ষিত অথচ শান্ত নম্র মেয়ে হবে, বিলাসিনী উড়নচণ্ডী বা উগ্রচণ্ডা খাণ্ডারনী হলে চলবে না। একটু আধটু নাচুক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু হরদম নাচিয়ে মেয়ে আমার পছন্দ নয়। মনের মতন স্ত্রী আবিষ্কার করা কি সোজা কথা? এ পর্যন্ত তো খুঁজে পাই নি।

—পাবার কোনও আশা আছে কি?

—তা আছে, সেই জন্যেই তো যতীশের কাছে এসেছি। আচ্ছা যতীশ, গণেশমুণ্ডা জায়গাটা কেমন? তুমি তো মাঝে মাঝে সেখানে যেতে। শুনেছি এখন আর নিতান্ত দেহাতী পল্লী নয়, অনেকটা শহরের মতন হয়েছে।

যতীশ বলল, তোমার নির্বাচিতা প্রিয়া ওখানেই আছেন নাকি?

—নির্বাচন এখনও করি নি। শম্পা সেন ওখানকার নতুন গার্ল স্কুলের নতুন হেডমিস্ট্রেস। মাস চার-পাঁচ আগে নিউ আলীপুরে আমার ভাগনীর বিয়ের প্রীতিভোজে একটু পরিচয় হয়েছিল। খুব লাইকলি পার্টি মনে হয়, তাই আলাপ করে বাজিয়ে দেখতে চাই।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, শম্পা সেনও তো তোমাকে বাজিয়ে

দেখবেন। তিনি তোমাকে পছন্দ করবেন এমন আশা আছে?

কি বলছেন সর্বজ্ঞ মশাই! আমি প্রোপোজ করলে রাজী হবে না এমন মেয়ে এদেশে নেই।

উপেন বলল, তবে অবিলম্বে যাত্রা কর বন্ধু, তোমার পদার্পণে তুচ্ছ গণেশমুণ্ডা ধন্য হবে। গিয়ে হয়তো দেখবে তোমাকে পাবার জন্যে শম্পা দেবী পার্বতীর মতন কৃচ্ছ্র সাধনা করছেন।

—ঠাট্টা রাখ, কাজের কথা হক। ওখানে শুনেছি হোটেল নেই, ডাকবাঙলাও নেই। যতীশ, তুমি নিশ্চয় ওখানকার খবর রাখ। একটা বাসা যোগাড় করে দিতে পার?

যতীশ বলল, তা বোধ হয় পারি, তবে তোমার পছন্দ হবে কিনা জানি না। আমার দূর সম্পর্কের এক খুড়শাশুড়ী তাঁর মেয়েকে নিয়ে ওখানে থাকেন, মেয়ে কি একটা সরকারী নারী-উদ্যোগশালা না সর্বাত্মক শিল্পাশ্রমের ইন্ চার্জ। নিজের বাড়ি আছে, মা আর মেয়ে দোতলায় থাকেন, একতলাটা যদি খালি থাকে তো তোমাকে ভাড়া দিতে পারেন।

—তবে আজই একটা প্রিপেড টেলিগ্রাম কর, আমি তিন-চার দিনের মধ্যেই যেতে চাই। একটা চাকর সঙ্গে নেব, সেই রান্না আর সব কাজ করবে। উত্তর এলেই আমাকে টলিফোনে জানিও। আচ্ছা, সর্বজ্ঞ মশাই, আজ উঠলুম, যাবার আগে আবার দেখা করব।

উপেন বলল, তার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না, তবে ফিরে এসে অবশ্যই ফলাফল জানিও, আমরা উদগ্রীব হয়ে রইলুম। কিন্তু শুধু হাতে যদি এস তো দুও দেব।

কাঞ্চন মজুমদার চলে যাবার পর পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, ওর মতন দাম্ভিক লোকের বিয়ে কোনও কালে হবে না, হলেও ভেঙে যাবে। কাঞ্চনের জোড়া ভুরু সুলক্ষণ নয়। বিষবৃক্ষের হীরা, চোখের বালির বিনোদ বোঠান, ঘরে বাইরের সন্দীপ, গৃহদাহর সুরেশ, সব জোড়া ভুরু। তারা কেউ সংসারী হতে পারে নি।

উপেন বলল, সন্দীপ আর সুরেশের জোড়া ভুরু কোথায় পেলেন?

—বই খুঁজলেই পাবে, না যদি পাও তো ধরে নিতে হবে। শম্পা সেনের যদি বুদ্ধি থাকে তবে নিশ্চয় কাঞ্চনকে হাঁকিয়ে দেবে।

যতীন বলল, শম্পা সেনকে চিনি না, সে কি করবে তাও জানি না। তবে অনুমান করছি, গণেশমুণ্ডায় দাঁড়কাগের ঠোকর খেয়ে কাঞ্চন নাজেহাল হবে।

উপেন প্রশ্ন করল, দাঁড়কাগটি কে?

সম্পর্কে আমার শালী, যে খুড়শাশুড়ীর বাড়িতে কাঞ্চন উঠতে চায় তাঁরই কন্যা। তারও জোড়া ভুরু। আগে নাম ছিল শ্যামা, ম্যাট্রিক দেবার সময় নিজেই নাম বদলে তমিস্রা করে। কালো আর শ্রীহীন সেজন্যে লোকে আড়ালে তাকে দাঁড়কাগ বলে।

উপেন বলল, তা হলে কাঞ্চন নাজেহাল হবে কেন? কোনও সুন্দরী মেয়েই এপর্যন্ত তাকে বাঁধতে পারে নি, তোমার কুৎসিত শালীকে সে গ্রাহ্যই করবে না। এই দাঁড়কাগ তমিস্রার হিস্টরি একটু শুনতে পাই না? অবশ্য তোমার যদি বলতে আপত্তি না থাকে।

—আপত্তি কিছুই নেই। ছেলেবেলায় বাপ মারা যান। অবস্থা ভাল, বীডন স্ট্রীটে একটা বাড়ি আছে। মায়ের সঙ্গে সেখানে থাকত আর স্কটিশ চার্চে পড়ত। স্কুল কলেজের আর পাড়ার

বজ্জাত ছোকরারা তাকে দাঁড়কাগ বলে খেপাত, কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষায় বলত, দণ্ডবায়স হুশ। এখানে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, আই-এস-সি পাস করেই মায়ের সঙ্গে মাদ্রাজে চলে যায়। সেখানে ওর চেহারা কেউ লক্ষ্য করত না, খেপাতও না। মাদ্রাজ থেকে বি-এস-সি আর এম-এস-সি পাস করে, তার পর তার পিতৃবন্ধু এক বিহারী মন্ত্রীর অনুগ্রহে গণেশমুণ্ডায় নারী-উদ্যোগশালায় চাকরি পায়। খুব কাজের মেয়ে, তমিস্রা নাগের বেশ খ্যাতি হয়েছে। মিঠি গলা, চমৎকার গান গায়, সুন্দর বক্তৃতা দেয়, কথাবার্তায় অতি ব্রিলিয়াণ্ট। ওর দাঁড়কাগ উপাধিটা ওখানেও পৌঁছেছে, হিন্দীতে হয়েছে কৌআদিদি। গুণগ্রাহী অ্যাডমায়ারারও দু-চারজন আছে, কিন্তু কেউ বেশী দূর এগুতে পারে নি। নিজের রূপ নেই বলে পুরুষ জাতটার ওপর ওর একটা আক্রোশ আছে, খোঁচা দিতে ভালবাসে।

কাঞ্চনকে স্বাগত জানিয়ে তমিস্রা বলল, কোনও ভাল জায়গায় না গিয়ে এই তুচ্ছ গণেশমুণ্ডায় হাওয়া বদলাতে এলেন কেন? আমাদের এই বাড়ি অতি ছোট, আসবাবও সামান্য, অনেক অসুবিধা আপনাকে সইতে হবে।

কাঞ্চন বলল, ঠিক হাওয়া বদলাতে নয়, একটু কাজে এসেছি। আমার অসুবিধা কিছুই হবে না একটা রান্নার জায়গা আমার চাকরকে দেখিয়ে দেবেন, আর দয়া করে কিছু বাসন দেবেন। যতীশকে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন তাতে তো ভাড়ার রেট জানান নি।

—যতীশবাবু আমাদের কুটুম্ব, আপনি তাঁর বন্ধু, অতএব আপনিও কুটুম্ব। ভাড়া নেব কেন? রান্নার ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে না, আমাদের হেঁসেলেই খাবেন। অবশ্য বিলাতের রিৎসকার্লটন বা দিল্লির অশোকা হোটেলের মতন সার্ভিস পাবেন না, সামান্য

ভাত ডাল তরকারিতেই তুষ্ট হতে হবে। মাছ এখানে দুর্লভ, তবে চিকেন পাওয়া যায়।

না-না, এ বড়ই অন্যায় হবে মিস নাগ। বাড়ি ভাড়া নেবেন না, আবার বিনা খরচে খাওয়াবেন, এ হতেই পারে না।

তমিস্রা স্মিতমুখে বলল, ও, বিনামূল্যে অতিথি হলে আপনার মর্যাদার হানি হবে? বেশ তো, থাকা আর খাওয়ার জন্যে রোজ তিন টাকা দেবেন।

—তিন টাকায় থাকা আর খাওয়ার খরচ কুলোয় না, আমার চাকরও তো আছে।

—আচ্ছা আচ্ছা, পাঁচ সাত দশ যাতে আপনার সংকোচ দূর হয় তাই দেবেন। টাকা খরচ করে যদি তৃপ্তি পান তাতে আমি বাধা দেব কেন। দেখুন, আমার মায়ের কোমরের ব্যথাটা বেড়েছে, নীচে নামতে পারবেন না। আপনি চা খেয়ে বিশ্রাম করে একবার ওপরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন, কেমন?

—অবশ্যই করব। আচ্ছা, আপনাদের এই গনেশমুণ্ডায় দেখবার জিনিস কি কি আছে?

—লাল কেল্লা নেই, তাজমহল নেই, কাঞ্চনজঙ্ঘাও নেই। মাইল দেড়েক দূরে একটা ঝরনা আছে, ঝম্পাঝোরা। কাছাকাছি একটা পাহাড় আছে, পঞ্চাশ বছর আগে বিপ্লবীরা সেখানে বোমার ট্রায়াল দিত। তাদের দলের একটি ছেলে তাতেই মারা যায়, তার কঙ্কাল নাকি এখনও একটা গভীর খাদের নীচে দেখা যায়। ওই যে মাঠ দেখছেন ওখানে প্রতি সোমবারে একটা হাট বসে, তাতে ময়ূর হরিণ ভালুকের বাচ্চা থেকে মধু মোম ধামা চুবড়ি পর্যন্ত কিনতে পাবেন।

—আর আপনার নিজের কীর্তি, মহিলা-উদ্যোগশালা না কি, তাও তো দেখতে হবে। গাড়িটা আনতে পারি নি, হেঁটেই সব দেখব। আপনি সঙ্গে থেকে দেখাবেন তো?

—দেখাব বইকি। আপনার মতন সম্ভ্রান্ত পর্যটক এখানে ক' জন আসে। বিকাল বেলায় আমার সুবিধে, সকালে দুপুরে কাজ থাকে। যেদিন বলবেন সঙ্গে যাব।

তিন রকম লোক ডায়ারি লেখে—কর্মবীর, ভাবুক আর হামবড়া। কাঞ্চনেরও সে অভ্যাস আছে। রাত্রে শোবার আগে সে ডায়ারিতে লিখল—পুওর তমিস্রা নাগ, তোমার জন্য আমি রিয়ালি সরি। যেরকম সতৃষ্ণ নয়নে আমাকে দেখছিলে তাতে বুঝেছি তুমি শরাহত হয়েছ। কথা-বার্তায় মনে হয় তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। দেখতে বিশ্রী হলেও তোমার একটা চার্ম আছে তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমার কাছে তোমার কোনও চান্সই নেই, এই সোজা কথাটা তোমার অবিলম্বে বোঝা দরকার, নয়তো বৃথা কষ্ট পাবে। কালই আমি তোমাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেব।

পরদিন সকালে কাঞ্চন বলল, আপনাকে এখনই বুঝি কাজে যেতে হবে? যদি সুবিধা হয় তো বিকেলে আমার সঙ্গে বেরুবেন। এখন আমি একটু একাই ঘুরে আসি। আচ্ছা, শম্পা সেনকে চেনেন, গার্ল স্কুলের হেডমিস্ট্রেস?

তমিস্রা বলল, খুব চিনি, চমৎকার মেয়ে। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—কিছু আছে। যখন এসেছি তখন একবার দেখা করে আসা যাক। বেশ সুন্দরী, নয়? আর চার্মিং। শুনেছি এখনও হার্টহোল আছে, জড়িয়ে পড়ে নি।

হাঁ, রূপে গুণে খাসা মেয়ে। ভাল করে আলাপ করে ফেলুন, ঠকবেন না।

স্কুলের কাছেই একটা ছোট বাড়িতে শম্পা বাস করে। কাঞ্চন

সেখানে গিয়ে তাকে বলল, গুডমর্নিং মিস সেন, চিনতে পারেন? আমি কাঞ্চন মজুমদার, সেই যে নিউ আলীপুরে আমার ভগিনীপতি রাঘব দত্তের বাড়িতে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মনে আছে তো?

শম্পা বলল, মনে আছে বইকি। আপনি হঠাৎ এদেশে এলেন যে? এখন তো চেঞ্জের সময় নয়।

—এখানে একটু দরকারে এসেছি। ভাবলুম, যখন এসে পড়েছি তখন আপনার সঙ্গে দেখা না করাটা অন্যায় হবে। মনে আছে, সেদিন আমাদের তর্ক হচ্ছিল, গেটে বড় না রবীন্দ্রনাথ বড়? আমি বলেছিলুম, গেটের কাছে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়াতে পারেন না, আপনি তা মানেন নি। ডিনারের ঘণ্টা পড়ায় আমাদর তক সেদিন শেষ হয় নি।

—এখানে তার জের টানতে চান নাকি? তর্ক আমি ভালবাসি না, আপনার বিশ্বাস আপনার থাকুক, আমারটা আমার থাকুক, তাতে গেটে কি রবীন্দ্রনাথের ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।

—আচ্ছা, তর্ক থাকুক। আমি এখানে নতুন এসেছি, দ্রষ্টব্য যা আছে সব দেখতে চাই। আপনি আমার গাইড হবেন?

—এখানে দেখবাব বিশেষ কিছু নেই। আপনি উঠেছেন কোথায়?

—তমিস্রা নাগকে চেনেন? তাঁদেরই বাড়িতে আছি।

—তমিস্রাকে খুব চিনি। সেই তো আপনাকে দেখাতে পারবে, আমার চাইতে ঢের বেশী দিন এখানে বাস করছে, সব খবরও রাখে। আমার সময়ও কম, বেলা দশটার সময় স্কুলে যেতে হয়।

—সকালে ঘণ্টা খানিক সময় হবে না?

—আচ্ছা, চেষ্টা করব, কিন্তু সব দিন আপনার সঙ্গে যেতে পারব না। কাল সকালে আসতে পারেন।

আরও কিছুক্ষণ থেকে কাঞ্চন চলে গেল। দুপুর বেলা

ডায়ারিতে লিখল—মিস শম্পা সেন,তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানে আসবার আগে ভাল করেই খোঁজ নিয়েছিলুম, সবাই বলেছে এখনও তুমি কারও সঙ্গে প্রেমে পড় নি। আমি এখানে এসে দেরি না করে তোমার কাছে গিয়েছি, এতে তোমার খুব ফ্ল্যাটার্ড আর রীতিমত উৎফুল্ল হবার কথা। তুমি সুন্দরী, বিদুষীও বটে, কিন্তু আমার চাইতে তোমার মূল্য ঢের কম। রূপে গুণে বিত্তে আমার মতন পাত্র তুমি কটা পাবে? মনে হচ্চে তুমি একটু অহংকেরে, মানুষ চেনবার শক্তিও তোমার কম।

কাঞ্চন প্রায় প্রতিদিন সকালে শম্পার সঙ্গে আর বিকালে তমিস্রার সঙ্গে বেড়াতে লাগল। গণেশমুণ্ডায় একটি মাত্র বড় রাস্তা, তারই ওপর তমিস্রাদের বাড়ি। একটু এগিয়ে গেলেই গোটাকতক দোকান পড়ে, তার মধ্যে বড় হচ্ছে রামসেবক পাঁড়ের মুদীখানা আর কহেলিরাম বজাজের কাপড়ের দোকান। এইসব দোকানের সামনে দিয়েই কাঞ্চন আর তার সঙ্গিনী শম্পা বা তমিস্রার যাতায়াতের পথ। দোকানদাররা খুব নিরীক্ষণ করে ওদের দেখে।

একদিন বেড়িয়ে ফেরবার সময় তমিস্রা রামসেবকের দোকানে এসে বলল পাঁড়েজী, এই ফর্দটা নাও, সব জিনিস কাল পাঠিয়ে দিও। চিনিতে যেন পিঁপড়ে না থাকে।

রামসেবক বলল, আপনি কিছু ভাববেন না দিদিমণি, সব খাঁটী মাল দিব। এই বাবুসাহেবকে তো চিনছি না, আপনাদের মেহমান (অতিথি)?

—হাঁ, ইনি এখানে বেড়াতে এসেছেন।

—রাম রাম বাবুজী। আমার কাছে সব ভাল ভাল জিনিস পাবেন, মহীন বাসমতী চাউল, খাঁটী ঘিউ, পোলাও-এর সব মসলা,

কাশ্মীরী জাফরাণ, পিস্তা বাদাম কিশমিশ। আসে-টিলীন বাত্তি ভি আমি রাখি।

কাঞ্চন বলল, ও সবের দরকার আমার নেই।

—না হুজুর, ভোজের দরকার তো হতে পারে, তখন আমার বাত ইয়াদ রাখবেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন বলল, লোকটা আমাকে ভোজন বিলাসী ঠাউরেছে।

তমিস্রা হেসে বলল, তা নয়। ডিকেন্স-এর সারা গ্যাম্পা-কে মনে আছে? তার পেশা ধাইগিরি আর রোগী আগলানো। সদ্য বিবাহিত বর-কনে গির্জা থেকে বেরুচ্ছে দেখলেই সারা গ্যাম্প তাদের হাতে নিজের একটা কার্ড দিত। তার মানে, প্রসবের সময় আমাকে খবর দেবেন। গণেশমুণ্ডার দোকানদাররাও সেই রকম। কুমারী মেয়ে কোনও জোয়ান পুরুষের সঙ্গে বেড়াচ্ছে দেখলেই মনে করে বিবাহ আসন্ন, তাই নিজেই আর্জি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখে।

—এদের আক্কেল কিছুমাত্র নেই। আমার সঙ্গে আপনাকে দেখে—

—অমন ভুল বোঝা ওদের উচিত হয় নি, তাই না? কি জানেন, এরা হচ্ছে ব্যবসাদার, সুরূপ কুরূপ গ্রাহ্য করে না, শুধু লাভ-লোকসান বোঝে। আপনি যে মস্ত ধনী লোক তা এরা জানে না। ভেবেছে, আমার মায়ের বাড়ি আছে, অন্য সম্পত্তিও আছে, আমি একমাত্র সন্তান, রোজগারও করি, অতএব বিশ্রী হলেও আমি সুপাত্রী।

—এরা অতি অসভ্য, এদের ভুল ভেঙে দেওয়া দরকার।

—আপনি শম্পাকে নিয়ে ওদের দোকানে গেলেই ভুল ভাঙবে।

পরদিন সকালে শম্পার সঙ্গে যেতে যেতে কাঞ্চন বলল, আমার এক জোড়া সক্স দরকার।

শম্পা বলল, চলুন কহেলিরামের দোকানে।

কহেলিরাম সসম্ভ্রমে বলল, নমস্তে বাবুসাহেব, আসেন সেন-মিসিবাবা। মোজা চাহি? নাইলন, সিল্ক, পশমী, সুতী—

কাঞ্চন বলল, দশ ইঞ্চ গ্রে উল্‌ন একজোড়া দাও।

মোজা দিয়ে কহেলিরাম বলল, যা দরকার হবে সব এখানে পাবেন হুজুর। হাওআই বুশশার্ট আছে, লিবার্টি আছে, ট্রাউজার ভি আছে। জর্জেট ভয়েল নাইলন শাড়ি আছে, বনারসী ভি আমি রাখি, ভেলভেট সাটিন কিংখাব ভি। ভাল ভাল বিলাতী এসেন্স ভি রাখি। দেখবেন হুজুর?

দোকান থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন সহাস্যে বলল, বর-কনের পোশাক সবই আছে, এরা একবারে স্থির করে ফেলেছে দেখছি।

বিকালে কাঞ্চনের সঙ্গে তমিস্রা রামসেবকের দোকানে এক বাণ্ডিল বাতি কিনল। রামসেবক বলল, দিদিমণি, একঠো ছোকরা চাকর রাখবেন? খুব কাজের লোক, আপনার বাজার করবে, চা বানাবে, বিছানা করবে, বাবুসাহেবের জুতি ভি বুরুশ করবে। দরমাহা বহুত কম, দশ টাকা দিবেন। আমি ওর জামিন থাকব। এ মুন্নালাল, ইধর আ।

তমিস্রার একটা চাকরের দরকার ছিল, মুন্নালালকে পেয়ে খুশী হল। বয়স আন্দাজ ষোল, খুব চালাক আর কাজের লোক।

রাত্রে কাঞ্চন তার ডায়ারিতে লিখল, শম্পা, তোমার কি উচ্চাশা নেই, নিজের ভাল মন্দ বোঝবার শক্তি নেই? আমাকে তো কদিন ধরে দেখলে, কিন্তু তোমার তরফ থেকে কোনও সাড়া পাচ্ছি না কেন? তমিস্রা তো আমাকে খুশী করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। যাই হক, আর দুদিন দেখে তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করব।

তিন দিন পরে বিকালে তমিস্রা চায়ের ট্রে আনল দেখে কাঞ্চন বলল, আপনি আনলেন কেন, মুন্নালাল কোথায়?

তমিস্রা সহাস্যে বলল, সে শম্পার বাড়ি বদলী হয়েছে।

—আপনিই তাকে পাঠিয়েছেন ?

আমি নয়, তার আসল মনিব রামসেবক পাঁড়ে, সেই মুন্নাকে ট্রান্সফার করেছে, এখানে তাকে রেখে আর লাভ নেই।

—কিছু বুঝলুম না।

—আপনি একবারে চক্ষুকর্ণহীন। শম্পা, আমি, আর আপনি —এই তিনজনকে নিয়ে গনেশমুণ্ডার বাজারে কি তুমুল কাণ্ড হচ্ছে তার কোনও খবরই রাখেন না। শুনুন।—মুন্নালাল হচ্ছে রামসেবকের স্পাই, গুপ্তচর। ওর ডিউটি ছিল আপনার আর আমার প্রেম কতটা অগ্রসর হচ্ছে তার দৈনিক রিপোর্ট দেওয়া। যখন সে জানাল যে কুছ ভি নহি, নাথিং ডুইং, তখন তার মনিব তাকে শম্পার বাড়ি পাঠাল, শম্পা আর আপনার ওপর নজর রাখবার জন্যে।

—কিন্তু তাতে ওদের লাভ কি ?

—আপনি হচ্ছেন রেসের গোল-পোস্ট, শম্পা আর আমি দুই ঘোড়া। কে আপনাকে দখল করে তাই নিয়ে বাজি চলছে। রামসেবক বুক-মেকার হয়েছে। প্রথম কদিন আমারই দর বেশী ছিল, থ্রী-টু-ওআন কৌআ-দিদি। কিন্তু কাল থেকে শম্পা এগিয়ে চলছে, ফাইভ-টু-ওআন সেন-মিসিবাবা। আমার এখন কোনও দরই নেই।

—উঃ, এখানকার লোকেরা একবারে হার্টলেস, মানুষের হৃদয় নিয়ে জুয়া খেলে! নাঃ, চটপট এর প্রতিকার করা দরকার।

—সে তো আপনারই হাতে, কালই শম্পার কাছে আপনার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করুন আর তাকে নিয়ে কলকতায় চলে যান।

পরদিন সকাল বেলা শম্পা বলল, আজ আর বেড়াতে পারব না, শুধু কহেলিরামের দোকানে একবার যাব।

কাঞ্চন বলল, বেশ তো, চলুন না, সেখানেই যাওয়া যাক।

শম্পার ওপর কহেলিরাম অনেক টাকার বাজি ধরেছিল।

দুজনকে দেখে মহা সমাদরে বলল, আসেন আসেন বাবুসাহেব, আসেন সেন মিসিবাবা। হুকুম করুন কি দিব।

শম্পা বলল, একটা তাঞ্জোর শাড়ি চাই, কিন্তু দাম বেশী হলে চলবে না, কুড়ি টাকার মধ্যে।

—আরে দামের কথা ছোড়িয়ে দিন, আপনার কছে আবার দাম! এই দেখুন, আচ্ছা জরিপাড়, পঁয়ত্রিশ টাকা। আর এই দেখুন, নয়া আমদানি চিদম্বরম সিল্ক শাড়ি, আসমানী রঙ, নকশাদার জরিপাড়, চওড়া আঁচল, বহুত উমদা। এর অসলী দাম তো দো শও রুপেয়া, লেকিন আপনার কাছে দেড় শও লিব।

শম্পা মাথা নেড়ে বলল, কোনওটাই চলবে না, অত টাকা খরচ করতে পারব না। থাক, এখন শাড়ি চাই না, আসছে মাসে দেখা যাবে।

কাঞ্চন বলল, এই চিদম্বরম শাড়িটা কেমন মনে করেন?

শম্পা বলল, ভালই, তবে দাম বেশী বলছে।

—আচ্ছা, আপনি যখন কিনলেন না তখন আমিই নিই।

কহেলিরাম দন্তবিকাশ করে শাড়িটা সযত্নে প্যাক করে দিল।

শম্পা বলল, কাকেও উপহার দেবেন বুঝি? তা কলকাতায় কিনলেন না কেন?

শম্পার বাসায় এসে কাঞ্চন বলল, শম্পা, এই শাড়িটা তোমার জন্যেই কিনেছি, তুমি পরলে আমি কৃতার্থ হব।

ভ্রূ কুঁচকে শম্পা বলল, আপনার দেওয়া শাড়ি আমি নেব কেন, আপনার সঙ্গে তো কোনও আত্মীয় সম্পর্ক নেই।

—শম্পা, তুমি মত দিলেই চূড়ান্ত সম্পর্ক হবে, আমার সর্বস্ব নেবার অধিকার তুমি পাবে। বল, আমাকে বিবাহ করবে? আমি ফেলনা পাত্র নই, আমার রূপ আছে, বিদ্যা আছে, বাড়ি গাড়ি টাকাও আছে। তোমাকে সুখে রাখতে পারব।

—থামুন, ওসব কথা বলবেন না।

—কেন, অন্যায় তো কিছু বলছি না। আমার প্রস্তাবটা বেশ করে ভেবে উত্তর দাও।

—ভাববার কিছু নেই, উত্তর যা দেবার দিয়েছি। ক্ষমা করবেন, আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে পারব না।

অত্যন্ত রেগে গিয়ে কাঞ্চন বলল, একবারে সরাসরি প্রত্যাখান? মিস সেন, আপনি ঠকলেন, কি হারালেন তা এর পর বুঝতে পারবেন।

সমস্ত পথ আপন মনে গজ গজ করতে করতে কাঞ্চন ফিরে এল। ডায়ারিতে লেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার সোনালী শার্পার কলম থেকে এক লাইনও বেরুল না। সমস্ত দুপুর সে অস্থির হয়ে ভাবতে লাগল।

বিকাল বেলা তমিস্রা তার কর্মস্থান থেকে ফিরে এসে কাঞ্চনকে দেখে বলল, একি মিস্টার মজুমদার, চুল উস্কখুস্ক, চোখ লাল, মুখ শুখনো, অসুখ করেছে নাকি?

কাঞ্চন বলল, না, অসুখ করেনি। তমিস্রা, এই শাড়িটা তুমি নাও, আর বল যে আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছ।

তমিস্রা খিল খিল করে হাসল, যেন শূন্য বালতির ওপর কেউ কল খুলে দিল। তার পর বলল, এই ফিকে নীল শাড়িটা নিশ্চয় আমার জন্যে কেনেন নি, শম্পাকে দিতে গিয়েছিলেন, সে হাঁকিয়ে দিয়েছে তাই আমাকে দিচ্ছেন। মাথা ঠাণ্ডা করুন, রাগের মাথায় বোকামি করবেন না।

—তমিস্রা, আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে, বন্ধুদের কি বলব? তারা যে সবাই দুও দেবে। তুমি আমাকে বাঁচাও, বিয়েতে মত দাও। আমি যেন সবাইকে বলতে পারি, রূপ আমি গ্রাহ্য করি না, শুধু গুণ দেখেই বিয়ে করেছি।

—আপনি যদি অন্ধ হতেন তা হলে না হয় রাজী হতুম। কিন্তু চোখ থাকতে কত দিন দাঁড়কাগকে সইতে পারবেন? শম্পা আর আমি ছাড়া কি মেয়ে নেই? যা বলছি শুনুন।—কাল সকালের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যান। আপনি হিসেবী লোক, প্রেমে পড়ে বিয়ে করা আপনার কাজ নয়, সেকেলে পদ্ধতিই আপনার পক্ষে ভাল। ঘটক লাগিয়ে পাত্রী স্থির করুন। বেশী যাচাই করবেন না, তবে একটু বোকা-সোকা মেয়ে হলেই ভাল হয়, অন্তত আপনার চাইতে একটু বেশী বোকা, তবেই আপনাকে বরদাস্ত করা তার পক্ষে সহজ হবে।

১৮৮১

গনৎকার

লোকটির নাম হয়তো আপনাদের মনে আছে। কয়েক বৎসর আগে খবরের কাগজে তাঁর বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপা হত—ডক্টর মিনাণ্ডার দ মাইটি, জগদ্‌বিখ্যাত গ্রীক অ্যাস্ট্রোপামিস্ট, ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিশারদ, ললাটলিপিপাঠক, গ্রহরত্নবিধায়ক, হিপনটিস্ট, টেলিপ্যাথিস্ট, ক্লোয়ারভয়াণ্ট ইত্যাদি। ইনি ইজিপ্টে বহু দিন গবেষণা করে হার্মেটিক গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ত করেছেন, দামস্কসে কালডীয় জ্যোতিষের রহস্য ভেদ করেছেন, কামরূপ-কামাখ্যায় তন্ত্রমন্ত্র শিখেছেন, কাশীতে ভৃগুসংহিতার হাড়হদ্দ জেনে নিয়েছেন। কিছুই জানতে এঁর বাকী নেই।

আমার ভাগনে বঙ্কার মুখে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলুম। —ওঃ, এমন মহাপুরুষ দেখা যায় না, কলকাতার সমস্ত রাজজ্যোতিষীর অন্ন মেরে দিয়েছেন। বড় বড় ব্যারিস্টার উকিল ডাক্তার মন্ত্রী দেশনেতা প্রফেসর সাহিত্যিক সবাই দলে দলে তাঁর কাছে যাচ্ছেন আর থ হয়ে ফিরে আসছেন। মামা, তোমার তো সময়টা ভাল যাচ্ছে না, একবার এই গ্রীক গনৎকার ডক্টর মিনাণ্ডারের কাছে যাও না। ফী মোটে কুড়ি টাকা। আট নম্বর পিটারকিন লেন, দেখা করবার সময় সকাল আটটা থেকে দশটা, বিকেলে তিনটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা।

গনৎকারের কাছে যাবার কিছুমাত্র আগ্রহ আমার ছিল না। একদিন কাগজে মিনাণ্ডার দ মাইটির ছবি দেখলুম। মাথায় মুকুটের মতন টুপি, উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দু ইঞ্চি ঝোলা গোঁফ, ছ ইঞ্চি লম্বা দাড়ি, গায়ে একটা নকশাদার উত্তরীয়, সেকালের গ্রীকদের মতন ডান হাতের নীচ দিয়ে কাঁধের উপরে পড়েছে। গলায় কোমর পর্যন্ত ঝোলা রাশীচক্র মার্কা হার। মুখখানা যেন

চেনা চেনা মনে হল। টুপি আর গোঁফদাড়ি চাপা দিয়ে খুব ঠাউরে দেখলুম। আরে! এ যে আমাদের ওল্ড ফ্রেণ্ড মীনেন্দ্র মাইতি, ভোল ফিরিয়ে মিনাণ্ডার দ মাইটি হয়েছেন। তিন বছর আগেও আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত, তার কিছু উপকারও আমি করেছিলুম। কিন্তু তার পরেই সে গা ঢাকা দিল। আমাকে এড়িয়ে চলত, চিঠি লিখলে উত্তর দিত না। স্থির করলুম, এনগেজমেণ্ট না করেই দেখা করব।

ভাগ্যজিজ্ঞাসুদের ভিড় এড়াবার জন্যে আটটার দু-চার মিনিট আগেই গেলুম। চৌরঙ্গী রোড থেকে একটি গলি বেরিয়েছে পিটারকিন লেন। আট নম্বরের দরজায় একটি বড় নেমপ্লেট আঁটা —ডক্টর মিনাণ্ডার দ মাইটি, নীচে ইংরেজী বাঙলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় লেখা আছে—সোজা দোতালায় চলে আসুন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলুম। সামনের দরজায় নোটিস আছে—ওয়েলকম, ভিতরে এসে বসুন।

ঘরটিতে আলো কম। একটা টেবিলের চার দিকে কতকগুলো চেয়ার আছে, আর কেউ সেখানে নেই। পাশের ঘরের পর্দা ভেদ করে মৃদু কণ্ঠস্বর আসছে। বুঝলুম, আমার আগেই অন্য মক্কেল এসে গেছে। হঠাৎ দেওয়ালে একটা ফ্রেমের ভিতর আলোকিত অক্ষর ফুটে উঠল—ওয়েট প্লীজ, একটু পরেই আপনার পালা আসবে। টেবিলে গোটাকতক পুরনো সচিত্র মার্কিন পত্রিকা ছিল, তারই পাতা ওলটাতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ পরে আরও দুজন এসে আমার পাশের চেয়ারে বসলেন। একজনের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, অন্য জনের পঁচিশছাব্বিশ। প্রথম লোকটি আমাকে প্রশ্ন করলেন, অনেকক্ষণ বসে আছেন নাকি মশাই?

উত্তর দিলুম, তা প্রায় দশ মিনিট হবে।

—তবেই সেরেছে, আমাকে হয়তো ঘণ্টা খানিক ওয়েট

করতে হবে। এই রতন, তুই শুধু শুধু এখানে থেকে কি করবি, বাড়ি যা।

রতন বলল, কেন, আমি তো বাগড়া দিচ্ছি না গোষ্ঠ-দা। গনৎকার সায়েব তোমাকে কি বলে না জেনে আমি নড়ছি না।

গোষ্ঠ-দা আমার দিকে চেয়ে বললেন, দেখুন তো মশাই রতনার আক্কেল। আমি এসেছি নিজের ভাগ্যি জানতে, তুই কি করতে থাকবি ?

আমি বললুম, আপনার ভাগ্যফল উনিও জানতে চান। আপনার আত্মীয় তো ?

—আত্মীয় না হাতি। এ শালা আমার জেঁাক, কেবল চুষে খাবার মতলব।

রতন বলল, আগে থাকতে শালা শালা ব'লো না মাইরি। আগে বিজির সঙ্গে তোমার বে হয়ে যাক তার পর যতখুশি ব'লো।

—আরে গেল যা। বিজিকেই যে বে করব তার ঠিক কি ? গুলুরাণীও তো নিন্দের সম্বন্ধ নয়। কি বলেন সার ?

আমি বললুম, আপনাদের তর্কের বিষয়টা আমি তো কিছুই জানি না।

—তা হলে ব্যাপারটা খুলে বলি শুনুন। আমি হলুম শ্রীগোষ্ঠবিহারী সাঁতরা, শ্যামবাজারের মোড়ে সেই যে ইম্পিরিয়াল টি-শপ আছে তারই সোল প্রোপ্রাইটর। তা আপনার আশীর্বাদে দোকানটি ভালই চলছে। এখন আমার বয়স হল গে ত্রিশ পেরিয়ে একত্রিশ, এখনো যদি সংসার ধর্ম না করি তবে কবে করব ? বুড়ো বয়সে বে করে লাভ কি ? কি বলেন আপনি, অ্যাঁ ? এখন সমিস্তে হয়েছে পাত্রী নিয়ে, দুটি আমার হাতে আছে। এক নম্বর হল, নফর দাসের মেয়ে গুলুরানী, ভাল নাম গোলাপসুন্দরী। দেখতে তেমন সুবিধের নয়, একটু কুঁদুলীও বটে। কিন্তু বাপের টাকা আছে, বিয়ে করলে কিছু পাওয়া যাবে। তার পর ধরুন, যদি

কারবারটি বাড়াতে চাই তবে শ্বশুরের কাছ থেকে কোন না আরও হাজার খানিক টাকা বাগাতে পারব। দু নম্বর পাত্রী হচ্ছে বিজনবালা, ডাক নাম বিজি, এই রতন শালার বোন। বাপ নেই, শুধু বুড়ী মা আর এই ভাগাবণ্ড ভাইটা আছে, অবস্থা খারাপ, বরপণ নবডঙ্কা। কিন্তু মেয়েটা দেখতে অতি খাসা, নানা রকম রান্না জানে, এক পো মাংসের সঙ্গে দেদার মোচা এঁচড় ডুমুরের কিমা মিশিয়ে শ-খানিক এমন চপ বানাবে যে আপনি ধরতেই পারবেন না তার চোদ্দ আনা নিরিমিষ। বিজিকে বে করলে সে আমার সত্যিকার পার্টনার হবে। শ্বশুরের টাকা নাই বা পেলুম, আপনার আশীর্বাদে আমার পুঁজি নেহাত মন্দ নেই। ইচ্ছে আছে টি-শপটির বোম্বাই প্যাটার্ন নাম দেব, নিখিল ভারত বিশ্রান্তি গৃহ। চপ কাটলেট ডেভিল মামলেট এই সব তৈরি করব, খদ্দেরের অভাব হবে না মশাই। আমার খুব ঝোঁক বিজির ওপর, কিন্তু মুশকিল হয়েছে তার মা আর বাউণ্ডুলে ভাইটা আমার ঘাড়ে পড়বে। পুষতে আপত্তি নেই, কিন্তু এই রতনা আমার কাঁধে চাপবে আর বোনের কাছ থেকে হরদম টাকা আদায় করবে তা-আমি চাই না।

রতন বলল, আমি কথা দিচ্ছি তোমার কাঁধে চাপব না। আমার ভাবনা কি, ইলেক্ট্রিকের সব কাজ জানি, আর্মেচারের তার পর্যন্ত জড়াতে পারি। একটা ভাল চাকরি যোগাড় করতে পারি না মনে কর?

—যোগাড় করতে পারিস তো করিস না কেন রে হতভাগা? এ পর্যন্ত অনেক কাজ তো পেয়েছিলি, একটাতেও লেগে থাকতে পারলি নি কেন? ওই কিরণ চক্কোত্তি তোর মাথা খেয়েছে, দিনরাত তার তরুণ অপেরা পার্টিতে আড্ডা দিস, হয়তো নেশা-ভাঙও করিস।

—মাইরি বলছি, গোষ্ঠ-দা, খারাপ নেশা আমি করি না। মাঝে মাঝে একটু সিদ্ধির শরবত খাই বটে, কিন্তু খুব মাইল্ড।

আমি বললুম, গোষ্ঠবাবু, আপনার সমস্যাটি তো তেমন কঠিন নয়। যখন শ্রীমতী বিজনবালাকে মনে ধরেছে তখন তাঁকে বিয়ে করাই তো ভাল। একটু রিস্ক না হয় নিলেন।

—আপনি জানেন না মশাই, এই রতনা সোজা রিস্ক নয়। সেই জন্যেই তো এই সায়েব জ্যোতিষীর কাছে এসেছি, আমার ঠিকুজিটাও এনেছি। ইনি সব কথা শুনে আমার হাত দেখে আর আঁক কষে যার নাম বলবেন, বিজনবালা কি গোলাপসুন্দরী, তাকেই প্রজাপতির নির্বন্ধ মনে করে বে করব। কুড়ি টাকা লাগে লাগুক, একটা তো হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, এই রতন যদি কলকাতার বাইরে একটা ভাল কাজ পায়, তা হলে তো আপনার সুরাহা হতে পারে?

—সুরাহা নিশ্চয় হয়, আমি তা হলে নিশ্চিন্দি হয়ে বিজিকে বে করতে পারি। কিন্তু তেমন চাকরি ওকে দিচ্ছে কে?

রতনবাবু, তোমার লাইসেন্স আছে?

রতন বলল, আছে বইকি, ভাল ভাল সার্টিফিকিটও আছে। দয়া করে একটি কাজ যোগাড় করে দিন সার, গোষ্ঠ-দার গঞ্জনা আর সইতে পারি না।

আমি বললুম, শোন রতন। একটি এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের সঙ্গে আমার যোগ আছে, শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চের জন্যে একজন ফিটার মিস্ত্রী দরকার। তোমাকে কাজটি দিতে পারি, প্রথমে এক শ টাকা মাইনে পাবে, তিন মাস প্রোবেশনের পর দেড় শ। কিন্তু শর্ত এই, একটি বৎসর শিলিগুড়ি থেকে নড়বে না, তবে বোনের বিয়ের সময় চার-পাঁচ দিন ছুটি পেতে পার। রাজী আছ?

—এক্ষুনি। দিন, পায়ের ধুলো দিন সার। আপেরা পার্টি ছেড়ে দেব, কিরণ চক্কোত্তির সঙ্গে আমার বনছে না, আজ পর্যন্ত আমাকে একটি টাকাও দেয় নি।

—তা হলে তুমি আজই বেলা তিনটের সময় আমাদের অফিসে গিয়ে দেখা ক'রো। ঠিকানাটা লিখে নাও।

ঠিকানা লিখে নিয়ে রতন বলল, গোষ্ঠ-দা, তোমার সমিস্যে তো মিটে গেল, মিছিমিছি গনৎকার সায়েবকে কুড়ি টাকা দেবে কেন। চল, বাড়ি ফেরা যাক।

গোষ্ঠ সাঁতরা বললেন, কোথাকার নিমকহারাম তুই! এই ভদ্রলোকের হাত দেখে জ্যোতিষী কি বলেন তা না জেনেই যাবি?

লজ্জায় জিব কেটে রতন নিজের কান মলল। এমন সময় জ্যোতিষীর খাস কামরার পর্দা ঠেলে দুজন গুজরাটী ভদ্র-লোক হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন, নিশ্চয় সুফল পেয়েছেন। এঁরা চলে গেলে জ্যোতিষীর কামরায় একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। একটু পরে একজন মহিলা এলেন, কালো শাড়ি, নীল ব্লাউজ, কাঁধে রাশিচক্র মার্কা লাল ব্যাজ! ইনি বোধ হয় ডক্টর মিনাওারের সেক্রেটারি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আগে এসেছেন?

উত্তর দিলুম, আজ্ঞে হাঁ।

—আপনার নাম আর ঠিকানা? জন্মস্থান আর জন্মদিন?

সব বললুম, উনি নোট করে নিলেন।

—কুড়ি টাকা ফী দিতে হবে জানেন তো?

—জানি, টাকা সঙ্গে এনেছি।

—কি জানবার জন্যে এসেছেন?

—আসন্ন ভবিষ্যতে আমার অর্থপ্রাপ্তি-যোগ আছে কিনা।

—বুঝলুম না, সোজা বাঙলায় বলুন।

—জানতে চাই, ইমিডিয়েট ফিউচারে কিছু টাকা পাওয়া যাবে কিনা।

সেক্রেটারি নোট করে নিলেন। তার পর গোষ্ঠ সাঁতরাকে বললেন, আপনার কি প্রশ্ন?

গোষ্ঠবাবু সহাস্যে বললেন, কিছু না, আমি আর রতন এই এনার সঙ্গে এসেছি।

তিন মিনিট পরেই সেক্রেটারি ফিরে এসে আমাকে বললেন, ডক্টর মিনাঙার আপনাকে জানাচ্ছেন, এখন আপনার বরাতে টাকার ঘরে শূন্য। বছর খানিক পরে আর একবার আসতে পারেন।

গোষ্ঠবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, বা রে, এ কি রকম গোনা হল? আপনাকে না দেখেই ভাগ্যফল বললেন!

আমি বললুম, বুঝলেন না গোষ্ঠবাবু, এই মিনাঙার সায়েবের দিব্যদৃষ্টি আছে, না দেখেই ভাগ্য বলে দিতে পারেন। চলুন, ফেরা যাক।

নেমে এসে গোষ্ঠবাবু বললেন, ব্যাপারটা কি মশাই? জ্যোতিষী আপনার সঙ্গে দেখা করলেন না, ফীও নিলেন না, এ তো ভারি তাজ্জব!

বললুম, ব্যাপার অতি সোজা। এই জ্যোতিষীটি হচ্ছেন আমার পুরনো বন্ধু মীনেন্দ্র মাইতি, ভোল ফিরিয়ে মিনাঙার দ মাইটি হয়েছেন। তিন বছর আগে আমার কাছ থেকে কিছু মোটা রকম ধার নিয়েছিলেন, বার বার তাগিদ দিয়েও আদায় করতে পারি নি। অনেক দিন নিখোঁজ ছিলেন, এখন গ্রীক গনৎকার সেজে আসরে নেমেছেন। তাই আমার পাওনা টাকাটা সম্বন্ধে ওঁকে প্রশ্ন করেছিলুম।

রতন বলল, আপনি ভাববেন না সার, জোচ্চোরটাকে নির্ঘাত শায়েস্তা করে দেব। দয়া করে আমাকে তিনটি দিন ছুটি দিন, আমি দলবল নিয়ে এর দরজার সামনে পিকেটিং করব, আর গরম গরম স্লোগান আওড়াব। বাছাধন টাকা শোধ না করে রেহাই পাবেন না।

রতনের পিকেটিংএ সুফল হয়েছিল। ডক্টর মিনাঙার দ মাইটি

আমার প্রাপ্য টাকার অর্ধেক দিয়ে জানালেন, পশার একটু বাড়লে বাকীটা শোধ করবেন। কিন্তু কলকাতায় তিনি টিকতে পারলেন না, এখানকার পাট তুলে দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে দিল্লি চলে গেলেন।

১৮৮১

সাড়ে সাত লাখ

হেমন্ত পাল চৌধুরীর বয়স ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু সে একজন পাকা ব্যবসাদার, পৈতৃক কাঠের কারবার ভাল করেই চালাচ্ছে। রাত প্রায় নটা, বাড়ির একতলার অফিস ঘরে বসে হেমন্ত হিসাবের খাতাপত্র দেখছে। তার জ্ঞাতি-ভাই নীতীশ হঠাৎ ঘরে এসে বলল, তোমার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী কথা আছে। বড় ব্যস্ত নাকি ?

হেমন্ত বলল, না, আমার কাজ কাল সকালে করলেও চলবে। ব্যাপার কি, এমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছ কেন ? তোমাদের তো এই সময় জোর তাসের আড্ডা বসে। কোনও মন্দ খবর নাকি ?

নীতীশ বলল, ভাল কি মন্দ জানি না, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। যা বলছি স্থির হয়ে শোন।

নীতীশের কথার আগে তার সঙ্গে হেমন্তর সম্পর্কটা জানা দরকার। এদের দুজনেরই প্রপিতামহ ছিলেন মদনমোহন পাল চৌধুরী, প্রবলপ্রতাপ জমিদার। তাঁর দুই পুত্র অনঙ্গ আর কন্দর্প বৈমাত্র ভাই, বাপের মৃত্যুর পর বিষয় ভাগ করে করে পৃথক হন। অনঙ্গ অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন, অনেক সম্পত্তি বন্ধক রেখে কন্দর্পের কাছ থেকে বিস্তর টাকা ধার নিয়েছিলেন। অল্পবয়স্ক পুত্র বসন্তকে রেখে অনঙ্গ অকালে মারা যান। কন্দর্প তাঁর ভাইপোর সঙ্গে আজীবন মকদ্দমা চালান। অবশেষে তিনি জয়ী হন এবং বসন্ত প্রায় সর্বস্বান্ত হন। পরে বসন্ত কাঠের কারবার আরম্ভ করেন। তিনি গত হলে তাঁর পুত্র হেমন্ত সেই কারবারের খুব উন্নতি করেছে।

কন্দর্প আর তাঁর পুত্র যতীশও গত হয়েছেন। যতীশের পুত্র নীতীশ এখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী। জমিদারি আর

নেই, আগেকার ঐশ্বর্যও কমে গেছে, কিন্তু পৈতৃক সঞ্চয় যা আছে তা থেকে নীতীশের আয় ভালই হয়। রোজগারের জন্যে তাকে খাটতে হয় না, বদখেয়ালও তার নেই, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আর সাহিত্য সিনেমা ফুটবল ক্রিকেট রাজনীতি চর্চা করে সময় কাটায়। হেমন্ত তার সমবয়স্ক, দুজনে একসঙ্গে কলেজে পড়েছিল! এদের বাপদের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না, কিন্তু হেমন্ত আর নীতীশের মধ্যে পৈতৃক মনোমালিন্য মোটেই নেই, অন্তরঙ্গতাও বেশী নেই।

মাথায় দু হাত দিয়ে নীতীশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, ভাই হেমন্ত, মহাপাপ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

হেমন্ত বলল, পাপটা কি শুনি। খুন না ডাকাতি না নারীহরণ? কি করেছ তুমি?

—আমি কিছুই করি নি, করেছেন আমার ঠাকুরদা।

—কন্দর্পমোহন পাল চৌধুরী? তিনি তো বহুকাল গত হয়েছেন, তাঁর পাপের জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন? উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও বেয়াড়া ব্যাধি পেয়েছ নাকি?

—না, আমার শরীরে কোনও রোগ নেই। আজ সকালে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটছিলুম। জমিদারি তো গেছে, বাজে দলিল আর কাগজপত্র রেখে লাভ নেই, তাই জঞ্জাল সাফ করছিলুম। ঠাকুরদার আমলের একটা কাঠের বাক্সে হঠাৎ কতকগুলো পুরানো চিঠিপত্র আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, আমার মাথায় যেন বজ্রঘাত হয়েছে। ওঃ, মহাপাপ মহাপাপ!

—ব্যাপারটা কি?

—আমার ঠাকুরদা কন্দর্প তোমার ঠাকুরদা অনঙ্গের নায়েব-গোমস্তাদের ঘুষ দিয়ে কতকগুলো দলিল জাল করেছিলেন আর মিথ্যে সাক্ষী খাড়া করেছিলেন। তারই ফলে তোমার বাবা মকদ্দমায় হেরে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

—বল কি! না না, তা' হতে পারে না, নিশ্চয় তোমার ভুল হয়েছে।

—ভুল মোটেই হয় নি। আমার ভগিনীপতি ফণীবাবুকে জান তো? মস্ত উকিল। তাঁকে সব কাগজপত্র দেখিয়েছি। তিনিও বলেছেন, আমার ঠাকুরদার জাল-জোচ্চুরির ফলেই তোমার বাবা বসন্ত পাল চৌধুরী সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

—তা এখন করতে চাও কি? ফণীবাবু কি বলেন?

—বললেন, চুপ মেরে যাও। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মন খারাপ ক'রো না, পুরানো কাপজপত্র সব পুড়িয়ে ফেল, ঘুণাক্ষরে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।

—তাই বুঝি তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে জানাতে এসেছ? ফণীবাবু বিচক্ষণ ঝানু লোক, পাকা কথা বলেছেন, গতস্য অনুশোচনা নাস্তি। পুরনো কাসন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। আর, ও তো তামাদি হয়ে গেছে।

উত্তেজিত হয়ে নীতীশ বলল, কি যা তা বলছ, পাপ কখনও তামাদি হয় না। আমার ঠাকুরদা জোচ্চুরি করে যা আদায় করেছেন তা আমি ভোগ করতে চাই না। খতিয়ে দেখেছি, সুদে আসলে প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা তোমার পাওনা। সে টাকা তোমাকে না দিলে আমার স্বস্তি নেই।

—ওই টাকা দিলে তোমার অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে?

—খুব মন্দ হবে। কষ্টে সংসার চলবে, রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে। কিন্তু তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।

—আচ্ছা, তোমার বাবা এসব জানতেন?

—বোধ হয় না। তিনি নিজে জমিদারি দেখতেন না, নায়েবের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। নায়েব নতুন লোক, তারও কিছু জানবার কথা নয়।

—তোমার বউকে জানিয়েছ?

—না। জানলে কান্নাকাটি করবে, শ্বশুর মশাইকে বলে মহা হাঙ্গামা বাধাবে। আগে তোমার পাওনা শোধ করব তার পর জানাব।

—বাহবা! দেখ নীতীশ, ভাগ্যক্রমে আমি নিঃস্ব নই, রোজগার ভালই করি, বেশী বড়লোক হবার লোভও নেই। ফাঁকতালে তুমি যা পেয়ে গেছ তা তোমারই থাকুক, নিশ্চিন্ত হয়ে ভোগ কর। আমি খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে বলছি, ওই টাকার ওপর আমার কিছুমাত্র দাবি নেই। চাও তো একটা না-দাবি পত্র লিখে দিতে পারি। আরও শোন—সাড়ে সাত লাখ টাকা না পেলেও আমার পরিবারবর্গের স্বচ্ছন্দে চলবে, কিন্তু ওই টাকার অভাবে তোমার স্ত্রী ছেলে মেয়ের অবস্থা কি রকম হবে তা ভেবেছ? তুমি না হয় একজন প্রচণ্ড সাধুপুরুষ, সাক্ষাৎ রাজা হরিশ্চন্দ্র, কিছুই গ্রাহ্য কর না, কিন্তু তোমার স্ত্রী আর সন্তানরা যে রকম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে কষ্ট দেবে কেন? তোমার ঠাকুরদার কুকর্ম আমাকে জানিয়েছ তাতেই আমি সন্তুষ্ট, তোমারও দায়িত্ব খণ্ডে গেছে। আর কিছু করবার দরকার নেই।

সজোরে মাথা নেড়ে নীতীশ বলল, ওই পাপের টাকা ভোগ করলে আমি মরে যাব। যা তোমার হক পাওনা তা নেবে না কেন?

একটু ভেবে হেমন্ত বলল, শোন নীতীশ, আজ তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছ, তোমার মাথার ঠিক নেই। কাল সন্ধ্যের সময় এখানে এসো, দুজনে পরামর্শ করে একটা মীমাংসা করা যাবে, যাতে তোমার মনে শান্তি আসে। তোমার ভগিনীপতি ফণীবাবুর সঙ্গেও আর একবার পরামর্শ ক'রো।

পরদিন সন্ধ্যায় নীতীশ আবার এল। হেমন্ত প্রশ্ন করল, ফণীবাবুকে তোমার মতলব জানিয়েছ?

—হুঁ। তিনি রফা করতে বললেন।

—রফা কি রকম?

—বিবেকের সঙ্গে রফা। বললেন, ওহে নীতীশ, তুমি আর হেমন্ত দুজনেই সমান বোকা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। টাকাটা আধাআধি ভাগ করে নাও, তা হলে দুজনেরই কনশেন্স ঠাণ্ডা হবে।

—হেমন্ত হেসে বলল, চমৎকার। তুমি কি বল নীতীশ?

—ড্যাম ননসেন্স। চুরির টাকা চোরেরা ভাগ করে নেয়, কিন্তু তুমি আর আমি চোর নই। পরের ধনের এক কড়াও আমি নিতে পারি না। তোমার যা হক পাওনা তা পুরোপুরি তোমাকে নিতে হবে।

—আমার হক পাওনা কি করে হল? জমিদারি পত্তন করেন তোমার-আমার প্রপিতামহ মহামহিম দোর্দণ্ডপ্রতাপ ৺মদনমোহন পাল চৌধুরী। তিনি রামচন্দ্র বা বুদ্ধদেব ছিলেন না। অনেক দুর্দান্ত লোক যেমন করে জমিদার পত্তন করত তিনিও তেমনি করেছিলেন। ডাকাতি লাঠিবাজি জালিয়াতি জোচ্চুরি ঘুষ—এই ছিল তাঁর অস্ত্র। তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে?

—ওই রকম শুনেছি বটে।

—তা হলে বুঝতে পারছ, ওই জমিদারিতে কারও ধর্ম-সংগত অধিকার থাকতে পারে না। পূর্বপুরুষের সম্পত্তি আমার হাতছাড়া হয়েছে তা ভালই হয়েছে।

—কিন্তু আমার তো হাতছাড়া হয় নি, প্রপিতামহ আর পিতামহ দুজনেরই পাপের ধন সবটা আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। তুমি যদি নিতান্তই না নিতে চাও তবে মদনমোহন যাদের বঞ্চিত করেছিলেন তাদের উত্তরাধিকারীদের দিতে হবে।

তাদের খুঁজে পাবে কোথায়, সে তো এক-শ সওয়া-শ বছর

আগেকার ব্যাপার। তুমি সম্পত্তি দান করবে এই কথা রটে গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে জোচ্চোর এসে তোমাকে ছেঁকে ধরবে।

—তবে জনহিতার্থে টাকাটা দান করা যাক। কি বল?

—সে তো খুব ভাল কথা।

—দেখ হেমন্ত, ওই টাকাটা সদুদ্দেশ্যে খরচ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে, আমি এ কাজে পটু নই।

—রক্ষে কর। আমি নিজের ব্যবসা নিয়েই অস্থির, তোমার দানসত্রের বোঝা নেবার সময় নেই। আর একটা কথা। সদুদ্দেশ্যে দান, শুনতে বেশ, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? মন্দির মঠ সেবাশ্রম হাসপাতাল আতুরাশ্রম ইস্কুল-কলেজ, না আর কিছু?

—তা জানি না। তুমিই বল।

—আমিও জানি না। তুমিই বল।

—আমিও জানি না। আমাদের সঙ্গে ফেলু মহান্তি পড়ত মনে আছে? তার শালা ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী সম্প্রতি ইওরোপ আমেরিকা ফার-ইস্ট টুর করে এসেছেন। শুনেছি তিনি মহাপণ্ডিত লোক, প্লেটো কৌটিল্য থেকে শুরু করে বেন্থাম মিল মার্কস লেনিন সবাইকে গুলে খেয়েছেন। চীন সরকার নাকি কনসল্টেশনের জন্যে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তুমি যদি রাজী হও তবে ডক্টর প্রেমসিন্ধুর মত নেওয়া যাবে, তোমার টাকার সার্থক খরচ কিসে হবে তা তিনিই বাতলে দেবেন।

—বেশ তো। তাঁর সঙ্গে চটপট এনগেজমেন্ট করে ফেল।

পরদিন বিকালবেলা হেমন্ত আর নীতীশ প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারীর বাড়ি উপস্থিত হল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে প্রেমসিন্ধু বললেন, নীতীশবাবুর সংকল্প খুবই ভাল, কিন্তু সাড়ে সাত লাখ টাকা কিছুই নয়, তাতে বিশেষ কিছু করা যাবে না।

হেমন্ত বলল, যতটুকু হতে পারে তারই ব্যবস্থা করে দিন।

একটু চিন্তা করে ডক্টর খাওয়ারী বললেন, সর্বাধিক লোকের যাতে সর্বাধিক মঙ্গল হয় তাই দেখতে হবে, কিন্তু অযোগ্য লোকের জন্যে এক পয়সা খরচ করা চলবে না। সমাজের ক্ষণস্থায়ী উপকার করাও বৃথা, এমন কাজে টাকাটা লাগাতে হবে যাতে চিরস্থায়ী মঙ্গল হয়। আচ্ছা নীতীশবাবু আপনার ইচ্ছেটা আগে শুনি, কি রকম সৎকার্য আপনার পছন্দ ?

একটু ইতস্তত করে নীতীশ বলল, আমার মা খুব ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁর নামে টাকাটা কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর মঠে দিলে কেমন হয় ? ধর্মের প্রচার হলে লোকচরিত্রের উন্নতি হবে, তাতে সমাজেরও মঙ্গল হবে।

প্রেমসিন্ধু হেসে বললেন, অত্যন্ত সেকেলে আইডিয়া। টাকাটা পেলে সাধু মহারাজদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হবে, তাঁরা লুচি মণ্ডা দই ক্ষীর খেয়ে পুষ্টিলাভ করবেন, কিন্তু সমাজের মঙ্গল কিছুই হবে না। তা ছাড়া আপনার মায়ের নামে টাকা দিলে তো নিঃস্বার্থ দান হবে না, টাকার বদলে আপনি চাচ্ছেন মায়ের স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা।

লজ্জিত হয়ে নীতীশ বলল, আচ্ছা মায়ের নামে না-ই দিলাম। যদি কোনও ভাল সেবাশ্রমে—

—সব ভাল সেবাশ্রমেই প্রচুর অর্থবল আছে। তেলা মাথায় তেল দিয়ে কি হবে ? আর, আপনার সাড়ে সাত লাখ তো ছিটেফোঁটা মাত্র।

—যদি উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্যে দেওয়া যায় ?

—খেপেছেন ! উদ্বাস্তুদের হাতে পৌঁছুবার আগেই বাস্তুঘুঘুরা টাকাটা খেয়ে ফেলবে। কাগজে যে সব কেলেঙ্কারি ছাপা হয় তা পড়েন না ?

—একটা কলেজ বা গোটাকতক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে কেমন হয় ?

রাজী আছি। জান তো, ভক্ত বৈষ্ণব তাঁর সর্ব কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন। তুমিও নিষ্কামভাবে লোকহিতে লেগে যাও, কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণের বদলে আমাকেই অর্পণ ক'রো। পিতৃপুরুষদের দেনা শোধ করে তুমি তৃপ্তিলাভ করবে, স্বহস্তে দান করে ধন্য হবে। আর, তোমার দানের পুণ্যফল আমি ভোগ করব। ফণীবাবুর ব্যবস্থার চাইতে এই রকম ভাগাভাগি ভাল নয় কি ?

১৮৮১

যশোমতী

মেজর পুরঞ্জয় ভঞ্জ এম, ডি, আই, এম, এস অনেক কাল হল অবসর নিয়েছেন, রোগী দেখাও এখন ছেড়ে দিয়েছেন। বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে। কলকাতায় নিজের বাড়ি আছে, কিন্তু স্থির হয়ে সেখানে থাকতে পারেন না, বছরের মধ্যে আট-ন মাস বাইরে ঘুরে বেড়ান।

শীত কাল। পুরঞ্জয় দেরাদুনে এসেছেন, আট-দশ দিন এখানে থাকবেন। রাজপুর রোডে শিবালিক হোটেলে উঠেছেন, সঙ্গে আছে তাঁর পুরনো চাকর বৃন্দাবন। রাত প্রায় আটটা, পুরঞ্জয় তাঁর ঘরে ইজি চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছেন। বৃন্দাবন এসে জানাল, এক বুড়ী গিন্নী-মা দেখা করতে চান। পুরঞ্জয় বললেন, আসতে বল তাঁকে।

যিনি এলেন তিনি খুব ফরসা, একটু মোটা, গাল আর থুতনিতে বলি পড়েছে। মাথায় প্রচুর চুল, কিন্তু প্রায় সবই পেকে গেছে। পরনে সাদা গরদ, সাদা ফ্লানেলের জামা, তার উপর সাদা আলোয়ান। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে পুরঞ্জয়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

পুরঞ্জয় বললেন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে? চিনতে পারছি না তো।

আগন্তুকা বললেন, আমি যশো, আলীপুরের যশোমতী।

—সেকি! তুমি যশো, যশোমতী গাঙ্গুলী, কি আশ্চর্য!

—গাঙ্গুলী আগে ছিলুম, এখন মুখুজ্যে।

—ও, তোমার স্বামী মুখুজ্যে। তোমাকে দেখে চমকে গেছি, পঞ্চান্ন বছর পরে আবার দেখা হল, চিনব কি করে? তোমার এক মাথা কালো চুল ছিল, সাদা হয়ে গেছে। ছিপছিপে গড়ন

ছিল, এখন মোটা হয়ে পড়েছ। মুখের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে, গাল কুঁচকে গেছে। তুমি অতি সুন্দরী তন্বী কিশোরী ছিলে, হাসলে গালে টোল পড়ত, দাঁত ঝিকমিক করে উঠত।

যশোমতী ম্লান মুখে হাসলেন।

—ওই ওই! এখনও গালে টোল পড়েছে, দাঁত ঝিকমিক করেছে।

—বাঁধানো, দাঁত।

—তা হক, আগের মতনই সুন্দর ঝিকমিক। আমাদের শারীর শাস্ত্রে বলে, দাঁত নখ চুল আর শিঙ জীবন্ত অঙ্গ নয়, এদের সাড় নেই। আসল আর নকলে প্রায় সমানই কাজ চলে।

—সব কাজ চলে না। ছোলা ভাজা চিবুতে পারি না।

—ভাল ডেন্টিস্টকে দিয়ে বাঁধালে পারবে। যশো, তুমি এখনও কোকিলকণ্ঠী, তবে গলার স্বর একটু মোটা হয়েছে। আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছ?

—তা না পারব কেন। তোমার চুল পেকেছে, টাক পড়েছে, কিন্তু মুখের ছাঁদ বদলায় নি, গালও বেশী তোবড়ায় নি, গলার স্বরও আগের মতন আছে।

—দেরাদুনে কবে এলে? আমার সন্ধান পেলে কি করে?

—পরশু এখানে পৌঁছেছি। আমার নাতি ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার হয়ে এসেছে, তার কাছেই আছি। আজ সকালে এই দূর সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। অতিথিদের লিস্টে তোমার নাম দেখলুম।

—নাতিকে নিয়ে এলে না কেন?

—আজ এত কাল পরে তোমার সন্ধান পেলুম, তাই একাই দেখা করতে ইচ্ছে হল। নাতি নাতবউকে কাল দেখো। এখন তোমার পরিবারের কথা বল। সঙ্গে আন নি?

—পরিবার কোথা, বিয়েই করি নি। অবাক হলে কেন,

অবিবাহিত বুড়ো তো কত শত আছে। তোমার খবর বল। স্বামী আর শ্বশুরবাড়ি ভাল পেয়েছিলে তো ?

মাথা নত করে যশোমতী বললেন, স্বামী শুধু সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। আমি তোমার সঙ্গে মিশতুম এই অপরাধে শ্বশুরবাড়ির সকলে আমাকে কলঙ্কিনী মনে করতেন। আমি বাবার একমাত্র সন্তান, ভবিষ্যতে তাঁর সম্পত্তি পাব, শুধু এই কারণেই তাঁরা আমাকে পুত্রবধূ করেছিলেন। বিয়ের দু বছর পরেই স্বামী মারা যান। একটি ছেলে ছিল, আমার সব দুঃখ দূর করেছিল, সেও জোয়ান বয়সে চলে গেল। পুত্রবধূও প্রসবের পরে মারা গেল। এখন একমাত্র সম্বল নাতি ধ্রুব, আর তার বউ রাকা।

—উঃ অনেক শোক পেয়েছ। ললাটের লিখন আমি মানি না, তবু কি মনে হচ্ছে জান? তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি অব্রাহ্মণ। তোমার বাপ মা মনে করতেন আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হবে। তাঁরা যদি গোঁড়া না হতেন, আমাদের বিয়েতে যদি মত দিতেন, তবে তুমি এখনও সধবা থাকতে, দু'চারটে ছেলেমেয়েও হয়তো বেঁচে থাকত। কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিছু মনে ক'রো না।

—মনে করব কেন। ছোট বেলায় তুমি রেখে ঢেকে কথা বলতে না, এখনও দেখছি তোমার মনের আর মুখের তফাত নেই। তুমি কেন বিয়ে কর নি তা বল।

—করি নি তার কারণ, তোমাকে প্রচণ্ড ভালবেসেছিলুম, সহজে ভুলতে পারি নি। আমাকে বিয়ে দেবার জন্যে বাপ-মা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমার মন তোমাকেই আঁকড়ে ছিল। তোমার বিয়ে যখন অন্যের সঙ্গে হল তখন অত্যন্ত ঘা খেয়েছিলুম, দেহ মন প্রাণ যেন কেউ পিষে ফেলেছিল। পরে অবশ্য একটু একটু করে সামলে উঠেছিলুম, তোমাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু বিয়ের ইচ্ছে আর হয় নি।

—কোনও মেয়ের সঙ্গে মেলা মেশা কর নি?

—তোমার কাছে মিথ্যা বলব না। আমি শুকদেব বা রামকৃষ্ণ পরমহংস নই, পতন হয়েছিল, কিন্তু অল্প কালের জন্যে। একদিন স্বপ্ন দেখলুম, তোমার মৃতদেহ যেন আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে চলছি। আর্তনাদ করে জেগে উঠলুম, ধিক্‌কারে মন ভরে গেল। হিন্দুর মেয়ে ছেলেবেলা থেকে সতীত্বের সংস্কার পায়, তাই তারা সহজেই শুচি থাকে। কিন্তু পুরুষেরা কোনও শিক্ষা পায় না। মেয়েদের বলা হয় সীতা সাবিত্রী হৈমবতীর মতন সতী হও, কিন্তু পুরুষদের কেউ বলে না—রামচন্দ্রের মতন একনিষ্ঠ হও।

—কি নিয়ে এত কাল কাটালে?

—চাকরি, রোগীর চিকিৎসা, অজস্র বই পড়া, আর ঘুরে বেড়ানো। তোমার স্মৃতি ক্রমশ মুছে গেলেও যেন মনে ছেঁকা দিয়ে স্টেরাইল করে দিয়েছিল, সেখানে আর কেউ স্থান পায় নি। ওকি, কাঁদছ নাকি? বড় বড় দুঃখের ভোগ তো তোমার চুকে গেছে, এখন আমার তুচ্ছ কথায় কাতর হচ্ছ কেন? শোন যশো, তোমাকে অনিচ্ছায় বিয়ে করতে হয়েছিল, আর আমি এখনও কুমার আছি, এর জন্যে নিজেকে ছোট ভেবো না। তোমার বয়স ছিল মোটে পনেরো, এখনকার হিসেবে প্রায় খুকী। তুমি আমাকে খুব ভাল বাসতে তা ঠিক, কিন্তু বাল্যকালের সে ভালবাসা হচ্ছে কাফ লভ, ছেলেমানুষী ব্যাপার, তা চিরস্থায়ী হতে পারে না।

—তুমি কিছুই বোঝ না।

কিছু কিছু বুঝি। তুমি ছিলে সেকেলে গোবেচারী শান্ত মেয়ে, বাপ-মা যখন বিয়ে দিলেন তখন আপত্তি জানাবার শক্তিই তোমার ছিল না, আমাকে ছাড়া আর কাকেও বিয়ে করবে না এ কথা মুখ ফুটে বলা তোমার অসাধ্য ছিল। আর আমি ছিলুম তোমার চাইতে পাঁচ বছরের বড়, প্রায় সাবালক, বাপ-মা আমাকে নিজের মতে চলতে দিতেন। তুমি ছিলে নিতান্তই পরাধীন, আর আমি

ছিলুম প্রায় স্বাধীন। আইবুড়ো থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, কিন্তু আমার পক্ষে ছিল না। যশো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, দোষ নিও না। মনে কর সেই পঞ্চান্ন বছর আগে তুমি যেন ছিলে একালের মেয়ে, বালিকা নয়, কিশোরী নয়, একুশ-বাইশ বছরের সাবালিকা। যদি আমি তোমাকে বলতুম, যশো, তোমার বাপ-মা নাই বা মত দিলেন, তাঁদের অমতেই আমাদের বিয়ে হক, তোমার ভার নেবার সামর্থ্য আমার আছে, তা হলে তুমি রাজী হতে?

—নিশ্চয় হতুম।

—যাঁরা তোমাকে আজন্ম পালন করেছেন সেই বাপ-মার মনে নিদারুণ কষ্ট দিয়ে তাঁদের ত্যাগ করতে পারতে? যার সঙ্গে তোমার পরিচয় খুব বেশী নয়, যে তোমার আপন শ্রেণীর নয়, সেই আমাকেই বরণ করতে?

—নিশ্চয় করতুম।

—থ্যাংক ইউ যশো, তোমার উত্তর শুনে আমি ধন্য হয়েছি। স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ একটা প্রাকৃতিক বিধান, কিন্তু তার সময় আছে, তখন বাপ মা ভাই বোনের চাইতে প্রেমাস্পদ বড় হয়ে ওঠে। তবে বিবাহের পর স্বামীরও প্রতিদ্বন্দ্বী আসে—সন্তান। কিশোর বয়সে তোমার যা অসাধ্য ছিল, সমাজের দৃষ্টিতে যা অন্যায়ও গণ্য হত, যৌবনকালে বিনা দ্বিধায় তা তুমি পারতে, তোমার এই কথা শুনে আমি কৃতার্থ হয়েছি।

—কি যে বল তার ঠিক নেই। পনেরো বছরের সুশ্রী যশো যে-কথা বলতে পারে নি বলে তোমার মন ভেঙে গিয়েছিল, সেই কথা সত্তর বছরের বুড়ী বিশ্রী যশো তোমাকে আজ মুখ ফুটে বলতে পেরেছে এতে তোমার লাভটা কি হল, তুমি কৃতার্থই বা হবে কেন? যা ঘটেছিল তার বদলে যদি অন্য রকম ঘটত—এ রকম চিন্তা তো আকাশকুসুম রচনা, বুড়োবুড়ীর পক্ষে নিছক পাগলামি।

—পাগলামি নয়, মনের পটে ছবি আঁকা। যে অতীত কাল চলে গেছে তার ধ্বংস হয় নি, তাকে আবার কল্পনার জগতে ফিরিয়ে আনা যায়, তাতে নতুন করে রঙ দেওয়া চলে।

—যাক গে ওসব বাজে কথা। শোন, কাল তুমি আমার ওখানে খাবে। টপকেশ্বর রোড, জিম-কর্বেট লজ। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এসো। আসবে তো? নাতিকে পাঠাতে পারি, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

—না না, পাঠাতে হবে না, আমি একাই যেতে পারব, ওদিকটা আমার জানা আছে। কিন্তু রাত্রে আমি দুধ-মুড়ি কি চিঁড়ে-দই খাই।

—বেশ তো, ফলারেরই ব্যবস্থা করব।

যশোমতী চলে গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা পুরঞ্জয় ভঞ্জ জিম-কর্বেট লজে উপস্থিত হলেন। যশোমতী স্মিতমুখে নমস্কার করলেন, তাঁর নাতি ধ্রুব আর নাতবউ রাকা দুদিক থেকে পুরঞ্জয়ের দুই পা জড়িয়ে ধরে কলধ্বনি করে উঠল।

পুরঞ্জয় বললেন, যশোমতী, এরা তো আমাকে চেনে না, তুমি ইনট্রোডিউস করে দাও।

যশোমতী বললেন, পঞ্চান্ন বছর পরে কাল তোমাকে দেখেছি। আমি তোমার কতটুকু জানি? তুমিই নিজের পরিচয় দাও না।

পুরঞ্জয় বললেন, বেশ। শোন দাদাভাই ধ্রুব, আর কি নাম তোমার রাকা। আমি হচ্ছি ডাক্তার পুরঞ্জয় ভঞ্জ, মেজর, আই, এম এস, রিটায়ার্ড। চিকিৎসা বিদ্যা এখন প্রায় ভুলে গেছি। বহু কাল আগে তোমাদের এই ঠাকুমার ছেলেবেলার সঙ্গী ছিলুম, আলীপুরে আমাদের বাড়ি পাশাপাশি ছিল। ওঁকে খেপাবার জন্যে

আমি বলতুম, যশোটা থসথসোটা। উনি আমাকে বলতেন, পুরোটা ঘুরঘুরোটা আমরা যেন ভাই বোন ছিলুম।

ধ্রুব বলল, শুধুই ভাই বোন ?

—তার চাইতে বরং বেশী! একদিন দেখা না হলে অস্থির হতুম।

হিহি করে হেসে রাকা বলল, দাদু, শুনেছি আপনি স্পষ্টবক্তা লোক, রেখে ঢেকে কিছু বলতে পারেন না। কেন কষ্ট করে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলবেন ? মন খোলসা করে বলে ফেলুন। আমরা সব জানি, আমাদের জেরার চোটে ঠাকুমা সব কবুল করেছেন।

পুরঞ্জয় বললেন, যশো, তুমি দিব্যি একজোড়া শুক-সারী টিয়াপাখি পুষেছ। এরা আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে না তো ?

হাত নেড়ে রাকা বলল, না না, আপনার কোনও চিন্তা নেই, নির্ভয়ে সত্যি কথা বলুন। ঠাকুমা আর আমরা সবাই খুব উদার আমাদের কোনও সেকেলে অন্ধ সংস্কার নেই।

—বেশ বেশ। তা হলে নিশ্চয় শুনেছ যে যশোর সঙ্গে আমার প্রচণ্ড প্রেম হয়েছিল। তার পর ওঁর বিয়ে হয়ে যেতেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হল, মনের দুঃখে আমি বোম্বাইএ গিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলুম, তার পর বিলাত গেলুম। কাল পঞ্চান্ন বছর পরে আবার ওঁর সঙ্গে দেখা হল। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, কিন্তু দেখে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা তোলপাড় উঠল, যাকে বলে আলোড়ন, বিক্ষোভ, আকুলিবিকুলি।

ধ্রুব বলল, অবাক করলেন দাদু। বুড়ীকে হঠাৎ দেখে বুড়োর ওল্ড ফ্লেম দম করে জ্বলে উঠল, আগেকার প্রেম উথলে উঠল ?

—ঠিক আগেকার প্রেম নয়, অন্য রকম আশ্চর্য অনুভূতি। তোমাদের তা উপলব্ধি করবার বয়স হয় নি। যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। নিশ্চয়ই জান, তোমাদের এই ঠাকুমা অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন।

রাকা বলল, আমার চাইতেও?

—মাই ডিয়ার ইয়ং লেডি, তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু তোমার সেকালের দিদিশাশুড়ীর তুলনায় তুমি একটি পেঁচী। যদি দৈবক্রমে ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হত তা হলে গত পঞ্চান্ন বছরে আমার চোখের সামনেই উনি ক্রমশ বুড়ী হতেন। ধাপে ধাপে নয়, একটানা ক্রমিক পরিবর্তন, কিশোরী থেকে যুবতী, তার পর মধ্যবয়স্কা প্রৌঢ়া, তার পর বৃদ্ধা। সবই সইয়ে সইয়ে তিল তিল করে ঘটত, আমার আশ্চর্য হবার কোনও কারণ থাকত না। কবে উনি মোটাতে শুরু করলেন, কবে চশমা নিলেন, কবে দাঁত পড়ল, কবে চুলে পাক ধরল, প্রেমালাপ ঘুচে গিয়ে কবে সাংসারিক নীরস বিষয় একমাত্র আলোচ্য হয়ে উঠল, এ সব আমি লক্ষ্যই করতুম না। বৃক্ষলতার যৌবন বার বার ফিরে আসে, কিন্তু মানুষের ভাগ্যে তেমন হয় না, বাল্য যৌবন জরা আমাদের অবশ্যম্ভাবী, তার জন্যে আমরা প্রস্তুত থাকি। কিন্তু সেকালের সেই পরমা সুন্দরী কিশোরী যশো, আর পঞ্চান্ন বৎসর পরে যাকে দেখলুম সেই বৃদ্ধা যশো,—এই দুইএর আকাশপাতাল প্রভেদ, তাই হঠাৎ একটা প্রবল ধাক্কা খেয়েছিলুম।

রাকা বলল, হায় রে পুরুষের মন, রূপ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না! আমি এখনই তো পেঁচী, বুড়ো হলে কি যে গতি হবে জানি না।

—ভয় নেই দিদি। তোমার ক্রমিক রূপান্তর ধ্রুবর চোখের সামনে একটু একটু করে হবে, ও টেরই পাবে না, ডায়ারিতেও নোট করবে না। শেষ বয়সে যদি হাড়গিলে কি শকুনি গৃধিনী হয়ে পড় তাতেও ধ্রুব শক্‌ড হবে না। প্রেমের দুই অঙ্গ, একটা দেহাশ্রিত, আর একটা দেহাতীত। তোমাদের মনে এখন এক সঙ্গে দুটো মিশে আছে। কিন্তু যতই বয়স বাড়বে ততই প্রথমটা লোপ পাবে, শুধু দ্বিতীয়টাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।

রাকা বলল, পঞ্চান্ন বছর পরে ঠাকুমাকে হঠাৎ দেখে আপনার মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল তা বুঝলুম, কিন্তু তার ফলে আপনার হৃদয়ের অবস্থা অর্থাৎ.ঠাকুমার প্রতি আপনার মনোভাব কি রকম দাঁড়াল ?

—পর পর দুটো অনুভূতি হল, যশোমতীর দুই রূপ দেখলুম। ওঁকে ভুলেই গিয়েছিলুম, কিন্তু ওঁর হাসি দেখে আর গলার স্বর শুনে পঞ্চান্ন বছর আগেকার সেই তন্বী কিশোরী মূর্তি মনের মধ্যে ফুটে উঠল। তার কিছুমাত্র বিকার হয় নি, একবারে যথাযথ অক্ষয় হয়ে আছে। তার যে পরিবর্তন পরে ঘটেছে তা তো আমি দেখি নি সেজন্যে তার কোনও প্রভাবই আমার চিত্তস্থিত মূর্তির ওপর পড়ে নি। তার পরেই যশোর অন্য এক রূপ দেখলুম, দেহের নয়, আত্মার। আমার বুদ্ধিতে মন আর আত্মা একই বস্তু, বয়সের সঙ্গে তার পরিবর্তন হয়, কিন্তু ধারা বজায় থাকে সেজন্য চিনতে পারা যায়। যেমন, নদীর জলপ্রবাহ নিত্য নূতন, কিন্তু প্রবাহিণী একই। যশোমতীর কথায় বুঝলুম, উনি সেই আগের মতন সংস্কারের দাসী গুরুজনের আজ্ঞাপালিকা ভীরু মেয়ে নন, ওঁর স্বাধীন বিচারের শক্তি হয়েছে, মনের কথা বলবার সাহস হয়েছে। উনি যদি সেকালের কিশোরী না হয়ে একুশ-বাইশ বছরের আধুনিকী হতেন তবে সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে আমাকেই বরণ করতেন।

যশোমতী বললেন, এই, তোরা চুপ কর, কেন ওঁকে অত বকাচ্ছিস, খেতে দিবি না ?

রাকা বলল, বা রে, উনি নিজেই তো বকবক করছেন, আমরা শুধু একটু উসকে দিচ্ছি। আসুন দাদু, এইবার খেতে বসুন।

যশোমতী বললেন, টেবিলে খাবার দেব কি, না আসন পেতে দেব ?

পুরঞ্জয় বললেন, খাওয়াবে তো ফলার। টেবিলে তা মানায় না. আসনই ভাল। মেজেতেই বসব।

খাদ্যের আয়োজন দেখে পুরঞ্জয় বললেন, বাঃ কি সুন্দর! সাত্ত্বিক ভোজন একেই বলে। সাদা কম্বলের আসন, সাদা পাথরের থালায় ধপধপে সাদা চিঁড়ে, সাদা কলা, সাদা সন্দেশ, সাদা দই। আবার, সামনে একটি সাদা বেরাল বসে আছে। যশো তোমার রুচির তুলনা নেই।

রাকা বলল, আসল জিনিসেরই তো বর্ণনা করলেন না। এই পবিত্র শুভ্র খাদ্যসম্ভার পরিবেশন করেছেন কে? একজন শুভ্রবসনা শুভ্রকেশী শুভ্রকান্তি শুচিস্মিতা সুন্দরী, যাঁর দুটো মূর্তি আপনার চিত্তপটে পার্মানেন্ট হয়ে আছে।

পুরঞ্জয় বললেন, সাধু সাধু চমৎকার, বহুত আচ্ছা, ওআহ্ খুব একসেলেন্ট!

রাকা বলল, দাদু একটি কথা নিবেদন করি। আমাদের দুজনকে তো আপনি শুক-শারী বলেছেন। আমি বলি কি, আপনিও আমাদের এই নীড়ে ঢুকে পড়ুন, ঠাঁই আছে। যশোমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করুন। দুটিতে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর মতন আমাদের কাছে থাকবেন, সবাই মিলে পরমানন্দে দিন যাপন করব।

যশোমতী বললেন, যা যাঃ, বেশী জেঠামি করিস নি।

পুরঞ্জয় বললেন, শোন রাকা দিদি। বুড়ো বুড়ীর বিয়ে বিলাতে খুব চলে, ভবিষ্যতে হয়তো এদেশেও চলবে, যেমন স্মোক্‌ড হ্যাম আর সার্ডিন চলছে। কিন্তু আপাতত এদেশের রুচিতে তা বিকট। তার দরকারও কিছু নেই। যশোমতীর পূর্বরূপের ছাপ আমার মনে পাকা হয়ে আছে, ওঁর আত্মার স্বরূপও আমি উপলব্ধি করেছি, উনিও আমাকে ভাল করেই বুঝেছেন। এর চাইতে বেশী উনিও চান না, আমি চাই না।

১৮৮১

জয়রাম-জয়ন্তী

জয়রাম নন্দী কোনও অসাধারণ মহাপুরুষ নন, তিনি শুধু অসাধারণ দীর্ঘজীবী। আজ তাঁর শততম জন্মদিন, তাই তাঁর আত্মীয়রা একটু জয়ন্তীর আয়োজন করেছেন। পোলাও আর মাংস রান্না হচ্ছে, কিন্তু এ বাড়িতে নয়, একটু দূরে অন্য বাড়িতে, নয়তো বুড়ো গন্ধ পেয়ে খাবার জন্যে আবদার করবে।

সকালে কমলানেবুর রস আর দুধ-সন্দেশ খাইয়ে বাইরের ঘরে একটা তক্তপোশে অনেকগুলো বালিশে ঠেস দিয়ে জয়রামকে বসানো হয়েছে। আজ রবিবার, সকলেরই ফুরসত আছে। স্বজনবর্গ একে একে এসে প্রণাম করছে, উপহার দিচ্ছে, দু-চারটে কথা বলে অনেকে চলে যাচ্ছে, কেউ বা অল্পক্ষণের জন্যে বসছে।

বয়সের তুলনায় জয়রামের শরীর ভালই আছে। ব্লাডপ্রেশার বেশী নেই, ডায়াবিটিস নেই, বাত নেই। চোখে ছানি পড়ে নি, তবে দৃষ্টি কমে গেছে। খাবার লোভ খুব আছে, কিন্তু পেটরোগা। কানে কখনও ভাল শোনেন, কখনও খুব কম শোনেন। দোষের মধ্যে মাঝে মাঝে স্মৃতির ওলটপালট হয়, অতীত আর বর্তমান গুলিয়ে ফেলেন, কেউ প্রতিবাদ করলে চটে ওঠেন। মেজাজ সাধারণত ভালই থাকে, গল্প করতে ভালবাসেন, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকেন, আবার বুদ্ধিমানের মতন কথাও বলেন। খবর জানবার আগ্রহ খুব আছে, কাগজে কি লিখেছে তা তাঁর নাতির কাছ থেকে প্রত্যহ শোনেন। বেশী তামাক খাওয়া বারণ, কিন্তু জয়রাম হাত থেকে গড়গড়ার নল নামাতে চান না, কলকে নিবে গেলেও টের পান না।

সিমসন স্মিথ অ্যাণ্ড কম্পানির অফিসে জয়রাম চল্লিশ বছর

চাকরি করেছেন, শেষ বিশ বছর বড়বাবুর পদে ছিলেন। মনিবরা উদার, জয়রামকে মোটা পেনশন দেন। তিনি অবসর নিলে তাঁর ছেলে হরেরাম ওই পদ পান। চার বছর হল হরেরামও অবসর নিয়েছেন, এখন তিনি নবদ্বীপে বাস করছেন। তাঁর ছেলে, অর্থাৎ জয়রামের নাতি শিবরাম ওই ফার্মেই কাজ করে, তারও ভবিষ্যতে বড়বাবু হবার আশা আছে।

জয়রাম তিনবার বিবাহ করেছিলেন, এখন তিনি বিপত্নীক। স্নান, কাপড় বদলানো, খাওয়া, মুখ ধোয়া ইত্যাদি নানা কাজে তাঁকে পরের সাহায্য নিতে হয়। রাত্রে অনেক বার তাঁর জন্যে প্রস্রাবের পাত্র এগিয়ে দিতে হয়, সকালে এনিমাও দিতে হয়। একজন দক্ষ চাকর এইসব কাজ করত, কিন্তু জয়রামের গালাগালি সইতে না পেরে সে চলে গেছে। অগত্যা সম্প্রতি একজন নর্স বাহাল করা হয়েছে, লতিকা খাস্তগির। পাস করা নর্স নয়, সেজন্যে তার চার্জ কম। সে সন্ধ্যায় আসে, বেলা আটটায় চলে যায়। তার সেবায় জয়রাম এখন পর্যন্ত তুষ্ট আছেন।

আগন্তুক আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে জয়রাম প্রসন্ন মনে গল্প করছেন আর মাঝে মাঝে গড়গড়ার নির্ধূম নল টানছেন, এমন সময় তাঁর নাতি শিবরাম এসে বলল, দাদু, মস্ত খবর, আমাদের বড়সায়েব মিস্টার সিমসন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

জয়রাম বললেন, বলিস কি রে, সার চার্লস সিমসন?

—আঃ, তোমার কিছুই মনে থাকে না। সার চার্লস তো তোমার চাইতেও বড় ছিলেন, সেই কবে মান্ধাতার আমলে মারা গেছেন। তাঁর নাতি হ্যারি সিমসন এখন সিনিয়র পার্টনার, তিনিই গুড উইশ জানাতে আসছেন। তোমার সঙ্গে ফার্মের কত কালের সম্পর্ক তা জানেন কিনা।

—জানবেই তো, কত বড় বংশের সায়েব। কিন্তু বসতে দিবি কিসে? বাড়িতে একটাও ভাল চেয়ার নেই।

—ভেবো না, তার ব্যবস্থা আমি করেছি।

জয়রাম চঞ্চল হয়ে বললেন, ওরে শিবু, চট করে আমার সেই জীনের পাতলুন আর মুগার চাপকানটা বের করে আমাকে পরিয়ে দে। তোর বউএর কাছ থেকে একটু খোসবায় এনে ভাল করে মাখিয়ে দিস, যাতে ন্যাফথালিনের গন্ধ চাপা পড়ে। আর, একটা উড়ুনি বেশ করে কুঁচিয়ে পাকিয়ে দে, গলায় দেব। আর, আমার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, সার চার্লস সিমসন যা দিয়েছিলেন।

—কেন শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছ দাদু, তুমি যা পরে আছ সেই সাজেই সায়েবের সঙ্গে দেখা করবে। খাতির জানাবার জন্যে কাগতাড়ুয়া সাজবার কোনও দরকার নেই।

উপস্থিত স্বজনবর্গের দিকে সগর্বে দৃষ্টিপাত করে জয়রাম বললেন, উঃ, মস্ত লোক ছিলেন সার চার্লস সিমসন। আমাকে কি রকম স্নেহ করতেন, হরদম ডাকতেন, জ্যাণ্ডি ব্যাবু, জ্যাণ্ডি ব্যাবু। ওরে শিবু, জন্মদিনের উপহার কি সব এল তা তো দেখালি নি।

—তা ভালই এসেছে। ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, গরদের জোড়, নামাবলী, দুধখাবার রুপোর গেলাস, গড়গড়ার রুপোর মুখনল, বাক্স বাক্স সন্দেশ আর চন্দ্রপুলি, ল্যাংড়া আম, মিহি পেশোয়ারী চাল, গাওয়া ঘি, আরও কত কি।

—পাকা রুই মাছ দিয়েছে?

—না, তা তো কেউ দেয় নি।

—তবে কি ছাই দিয়েছে। তোর বউকে শিগ্‌গির ডাক।

নাতবউ শিবানী আধঘোমটা দিয়ে ঘরে এল। জয়রাম বললেন, এই শিবি, আজ পেশোয়ারী চালের চাট্টি পোলাও করবি, শুধু আমার জন্যে, বুঝলি? পাঁচ ভূতকে খাওয়ালে ওই টুকু চাল কদিন টিকবে। নতুন বাজার থেকে ভাল পোনা মাছ আনিয়ে দই আদা লংকা গরম মসলা দিয়ে গদগদে করে কালিয়া রাঁধবি—

ডাক্তার উমেশ গুহ বললেন, পোলাও কালিয়া এখন থাকুক সার। আপনার এ বয়সে লঘু পথ্যই ভাল।

—হুঁ। বয়সটা কত ঠাওর করেছ ডাক্তার?

—সে কি, জানেন না? আজ যে আপনি এক শ বছরে পা দিয়েছেন, তাই তো আমরা জয়ন্তী করছি। এমন দীর্ঘ আয়ু কত লোকের ভাগ্যে হয়!

—এক শ বছর না তোমার মুণ্ডু। মোটে সত্তর, এই সবে সেদিন পঁয়ষট্টি বছর বয়সে রিটায়ার করলুম। এই শিবে শালা আর ওর বাপ হরে ব্যাটা মিছিমিছি বয়স বাড়িয়ে আমাকে ভয় দেখায়, না খাইয়ে মেরে ফেলতে চায়, আমার সম্পত্তির ওপর ওদের দারুণ টান। শাস্ত্রে লিখেছে না—পুত্রদপি ধনভাজাং ভীতিঃ। উমেশ ডাক্তারকেও ওরা হাত করেছে।

শিবানী বলল, কারও কথা শুনবেন না দাদু, আপনার জন্যে পোলাও কালিয়াই রাঁধব। তার পর ডাক্তারের দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলল, শিউলি-বোঁটার রঙ দেওয়া গলা ভাত আর শিঙিমাছের ঝোল।

জয়রাম বললেন, শিবি তোর দেখছি একটু দয়ামায়া আছে। দুটো ল্যাংড়া আম ছাড়িয়ে দে তো দিদি, আর খান দুই চন্দ্রপুলি, দেখি কেমন উপহার দিয়েছে। চট করে দে, বড়সায়েব আসবার আগেই খেয়ে নি।

—সেকি দাদু, একটু আগেই তো দুধ-সন্দেশ খেলেন! বিকেল বেলা একটু আম আর চন্দ্রপুলি খাবেন এখন।

—সব বেটা বেটী শালা শালী সমান, আমাকে উপোস করিয়ে মেরে ফেলতে চায়। দাঁড়া, সবাইকে কলা দেখাচ্ছি। আমি ফের বিয়ে করব, নতুন বউকে সব সম্পত্তি দেব।

শিবরাম বলল, এমন থুথ থুড়ে যুবো বরকে বিয়ে করবে কে?

—লট্‌কী নর্স বিয়ে করবে। এই লট্‌কী, তোকে পঞ্চাশ

ভরি গোট দেব, দুহাতে দশ-দশ গাছা চুড়ি দেব, এই বাড়িখানা তোকে দেব, বিয়ে করতে রাজী আছিস?

নর্স লতিকা বলল, আহা আগে বলেন নি কেন কত্তাবাবু, আর একজনকে যে কথা দিয়ে ফেলেছি। আপনি দেখুন না, যদি বুঝিয়ে সুজিয়ে কি ভয় দেখিয়ে লোকটাকে ভাগাতে পারেন।

নর্স চলে গেলে শিবরাম বলল, দাদু, বেশ তো, লতিকা খাস্তগিরকে বিয়ে কর, মজা টের পাবে। যেমন তুমি চোখ বুজবে অমনি তোমার পেয়ারের লট্‌কী একটা জোয়ান বর বিয়ে করবে আর মনের সাধে দুজনে তোমার সম্পত্তি ওড়াবে।

শিবরামের বড়সাহেব হ্যারি সিমসন এসে পড়লেন। যারা ঘরে ছিলেন তাঁরা সকলেই উঠে গেলেন। মহা খাতির করে শিবরাম সাহেবকে জয়রামের কাছে নিয়ে এল।

জয়রামের শীর্ণ হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে সিমসন বললেন, হাডুডু, এ গ্রেট ডে নন্দী বাবু। আপনার জন্মদিন আরও বহুবার আসুক এই কামনা করি। ইউ লুক ভেরি ওয়েল।

হাত জোড় করে গদ্‌গদ স্বরে জয়রাম বললেন, অ্যাজ ইউ হ্যাভ কেপ্ট মি সার, যেমন আমাকে রেখেছেন। উইশ ইউ লঙ লাইফ, ইউ, ইওর মিসিস অ্যাণ্ড চিলড্রেন। লঙ লিভ মেসার্স সিমসন স্মিথ অ্যাণ্ড কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, লঙ লিভ কুইন ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড ব্রিটিশ এম্পায়ার—

শিবরাম বলল, কি বলছ দাদু, কুইন ভিক্টোরিয়া তো ষাট বছর হল মরেছেন।

—বেগ ইওর পার্ডন। লঙ লিভ কুইন এলিজাবেথ নম্বর টু, আই অ্যাম হার মোস্ট অম্ব্‌ল সবজেক্ট সার।

সিমসন সহাস্যে বললেন, নন্দী বাবু, আপনাদের দেশ বারো বৎসর হল ইনডিপেণ্ডেন্ট হয়েছে, তার খবর রাখেন না ?

হাত নেড়ে জয়রাম বললেন, নো ইনডিপেণ্ডেন্স সার। অ্যাশ, ওনলি অ্যাশ, শুধু ছাই। চাল পঁয়ত্রিশ টাকা, পোনা মাছ পাঁচ টাকা, নো পিওর ঘি।

—যুদ্ধের পর যেমন সব দেশে তেমনি আপনাদের দেশেও দাম চড়ে গেছে। কিন্তু লোকের আয়ও তো বেশ বেড়েছে। দেদার নতুন নতুন বিল্ডিং উঠছে, পথে অসংখ্য মোটর কার চলছে—

—থীভ্‌স সার, অল থীভ্‌স। ব্রিটিশ আমলে আমাদের ছেলে ভাইপো শালা জামাইএর চাকরি জোটানো সহজ ছিল, কারণ আপনাদের আত্মীয়রা কেউ তুচ্ছ কেরানীর কাজ চাইতেন না। কিন্তু এখন একটা সামান্য পোস্টের জন্যে বড় বড় কর্তারা সুপারিশ পাঠান, তাঁদেরও এক পাল বেকার আত্মীয় আছে কিনা ?

—তা হলেও তো আপনাদের এই ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের লোকে মোটের ওপর সুখে আছে।

—নো সার, মোস্ট অনহ্যাপি। ইউনিয়ন অভ রিচ রাসকেল্‌স, ফল্‌স লীডার্স, অ্যাণ্ড প্রোটেকটেড গুণ্ডাজ। পুওর নেহরু ইজ হেল্পলেস।

জয়রাম ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছেন দেখে সিমসন বললেন, পলিটিক্স থাকুক, আপনার নিজের কথা বলুন নন্দী বাবু।

স্মিতমুখে জয়রাম বললেন, সার, ইউ উইল বি হ্যাপি টু হিয়ার, আমি আবার বিবাহ করছি। একটি ভাল ইয়ং লেডি, আমার অবর্তমানেও যে ফেথফুল থাকবে।

—রিয়ালি ? নন্দীবাবু, তার চাইতে একটি গুড ওল্ড লেডি বিয়ে করাই তো ভাল, আপনার যত্ন নেবে।

জয়রাম ঠোঁট উলটে বললেন, ওল্ড লেডি নো গুড।

—আপনি নিজে কি রকম ?

—আই ভেরি গুড। আপনাদের তেরোটা ডিপার্টমেণ্ট আমি একাই ম্যানেজ করতে পারি। সার, আমার কথা থাকুক, হোমের কথা বলুন। বড়ই মন্দ খবর শুনছি।

—কি রকম ?

—শুনছি ব্রিটেন নাকি ফার্স্ট পাওয়ার থেকে থার্ড পাওয়ারে নেমে গেছে, চায়না আর একটু উঠলেই ব্রিটেন ফোর্থ হয়ে যাবে।

—চিরকাল সমান যায় না নন্দীবাবু। ইণ্ডিয়া যদি মিলিটারি মাইণ্ডেড হয় তবে ব্রিটেন হয়তো ফিফ্থ পাওয়ার হয়ে যাবে।

—গড ফরবিড। আরও সব বিশ্রী কথা শুনছি।

—কি শুনছেন ?

ছোট ছেলের মতন হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে জয়রাম বললেন, ওই আমেরিকানরা সার। সিটিং অন দাই ব্রেস্ট অ্যাণ্ড পুলিং আউট দাই বিয়ার্ড বাই দি হ্যাণ্ডফুল, বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে। বিউটিফুল গার্লস ধরে ধরে নিজের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আর, আমাদের হোলি গীতায় যা আছে—জায়তে বর্ণসংকরঃ। অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা চালাচালি করছে। বেশী মদ খেয়ে পাইলট যদি বেসামাল হয় তবে তো আপনাদের দেশের ওপরেই বোমা ফাটবে। তা হলে কি সর্বনাশ হবে সার!

—যত সব ননসেন্স। ডোণ্ট ওঅরি নন্দীবাবু, আমরা নিরাপদে আছি।

—নো সার, ভেরি গ্রেভ সিচুয়েশন। আপনারা এখানে চলে আসুন, অল ব্রিটিশ পিপ্ল, নেহরুজী আপনাদের আশ্রয় দেবেন, যেমন তিব্বতীদের দিয়েছেন। হিমালয় অঞ্চলে প্রচুর ঠাণ্ডা জায়গা আছে, সেখানে আরামে থাকবেন। আমেরিকা আর রাশিয়া ঝগড়া করে মরুক, লেট ইওরোপ গো টু হেল্।

—নন্দীবাবু, এই দেশ কি আমাদের পক্ষে খুব নিরাপদ ? শুনেছি আপনাদের এক পাওআরফুল গড আছেন, কল্কি অবতার,

মিস্টার নেহরু কোনও রকমে তাঁকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। নেহরু যখন থাকবেন না তখন ওই কল্কি অবতার এদেশে অবতীর্ণ হবেন, প্রকাণ্ড তলোয়ার দিয়ে সমস্ত ননহিন্দুকে কেটে ফেলবেন। তার চাইতে পাকিস্তানই তো ভাল, ওরা চিরকালই ফেথফুল, আমাদের তাড়াতে চায় নি।

—পাকিস্তানে জায়গা পাবেন না সার, আমেরিকানরা আপনাদের থাকতে দেবে না। গুড ওল্ড ইণ্ডিয়াই আপনাদের পক্ষে ভাল। কোনও ভয় নেই, শুধু একটা ডিক্লারেশন সই করবেন যে আপনারা স্পিরিচুয়াল হিন্দু। আপনাদের পৈতৃক খ্রীষ্টধর্ম, বীফ, পোর্ক, হুইস্কি কিছুই ছাড়বার দরকার নেই, তবে একখানি গীতা সর্বদা সঙ্গে রাখবেন।

সিমসন বললেন, গুড আইডিয়া, ভেবে দেখব। গুড বাই নন্দীবাবু, আপনি বিশ্রাম করুন। এই এক বাক্স চকোলেট আপনার জন্যে এনেছি, খাবেন।

১৮৮১

গুপী সাহেব

এই লোকটির নাম আপনাদের হয়তো জানা নেই। আমিও তাকে ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু সেদিন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তার যে ইতিহাস নয়নচাঁদ পাইন আর দাশু মল্লিককে বলেছিলুম তাই আজ আপনাদের বলছি। নয়নচাঁদ আর দাশু তা মন দিয়ে শোনেন নি, কারণ তাঁদের তখন অন্য ভাবনা ছিল। আমার বিশ্বাস, গুপী সায়েব অখ্যাত হলেও একজন অসাধারণ গুণী লোক। আশা করি আপনারা যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে তার এই ইতিহাস শুনবেন।

নয়নচাঁদ পাইনের ঘড়ির ব্যবসা আছে। দাশু মল্লিক তাঁর দূর সম্পর্কের শালা, নেশাখোর, কিন্তু খুব সরল লোক। নয়নচাঁদের ছেলের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কনের ঠাকুরদা হৃদয় দাসের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, সেজন্যে নয়নচাঁদ আমাকে অনুরোধ করেছেন তাঁর দাবি সম্বন্ধে আমিই যেন হৃদয় দাসের সঙ্গে কথা বলি। দাবির দুটি আইটেমের ওপর আমাকে বেশী জোর দিতে হবে। এক নম্বর—পাত্রের পিতার জন্যে একটি মোটর গাড়ি অগ্রিম চাই, উত্তম সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হলেও চলবে। দু নম্বর—যেহেতু এদেশে পাত্রের তেমন লেখাপড়া হল না, সেকারণে দাদাশ্বশুরের খরচে তাকে জেনিভা পাঠাতে হবে, ঘড়ি তৈরি শেখবার জন্যে।

আমার দৌত্যের ফল কি হল তা জানবার জন্যে দাশু মল্লিক আমার কাছে এসেছেন, নয়নচাঁদও একটু পরে আসবেন। আমি বললুম, দাশুবাবু, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, পাইন মশাই এলেই সব খবর বলব। ততক্ষণ একটা বর্মা চুরুট টানুন।

দাশু মল্লিক ধূমপান করতে করতে চুপিচুপি বললেন, দেখ হে,

তুমি এই দেনাপাওনার ব্যাপারে বেশী জড়িয়ে প'ড়ো না, পরে হয়তো লজ্জায় পড়বে। আমার ভাগনে, মানে নয়নচাঁদের ছেলে একটি পাঁঠা।

এমন সময় নয়নচাঁদ এলেন, এসেই একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি প্রশ্ন করলুম, কি হল পাইন মশাই, শরীরটা খারাপ নাকি?

নয়নচাঁদ আঙুল নেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি তোমাদের এই বলে রাখলুম, দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে, সর্বনাশের আর দেরি নেই।

দাশু মল্লিক আর আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম। নয়নচাঁদ বলতে লাগলেন, গেল হপ্তায় মানিকতলা বাজারে পকেট থেকে সাড়ে চোদ্দ টাকা উধাও হল। আবার আজ সকালে কলেজষ্ট্রীট মার্কেটে উনিশ টাকা তেত্রিশ নয়াপয়সা মেরে নিয়েছে। তোমাদের মিনমিনে গণতন্ত্রী সরকারকে দিয়ে কিছুই হবে না, জবরদস্ত আয়ুবশাহী গভরমেণ্ট দরকার, পকেটমার চোর আর ভেজালওয়ালাদের সরাসরি ফাঁসিতে লটকাতে হবে।

দাশু মল্লিক বললেন, যা বলেছ দাদা। তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, তেরো-চোদ্দ বছর আগে লীগ মন্ত্রীদের আমলে পুরো একটি বছর পিকপকেটিং একেবারে বন্ধ ছিল, নট এ সিংগল কেস। তার পর যেমন স্বাধীনতা এল, আবার যে কে সেই।

আমি বললুম, আপনারা প্রকৃত খবর জানেন না। লীগ মন্ত্রীদের বা পুলিসের কিছুমাত্র কেরামতি ছিল না, পকেটমারদের ঠাণ্ডা করেছিল আমাদের গুপী সায়েব।

নয়নচাঁদ বললেন, তিনি আবার কে?

—আমার এখানে দেখে থাকবেন, এখন ভুলে গেছেন। তেরো-চোদ্দ বছর আগে প্রায়ই এখানে আসত, অতি অদ্ভুত লোক।

—ফিরিঙ্গী নাকি ?

—না, খাঁটী বাঙালী। গুপী সায়েবের আসল নাম বোধ হয় গোপীবল্লভ ঘোষ, গোপীনাথ গোপেশ্বর কিংবা গোপেন্দ্রও হতে পারে, ঠিক জানি না। একটা বিস্কুটের কারখানায় কাজ করত। এখনকার ছোকরারা যেমন প্যাণ্ট-শার্ট প'রে গলায় লম্বা টাই উড়িয়ে খালি মাথায় রোদে ঘুরে বেড়ায়, স্বাধীনতার আগের যুগে তেমন ফ্যাশন ছিল না। রামানন্দ চাটুজ্যে মশাই একবার লিখেছিলেন, রোদে বেরুতে হলে মাথার হ্যাট দেওয়া ভাল, দেশী সমাজের সঙ্গেও তা চলতে পারে। গুপী এই উপদেশটি শিরোধার্য করেছিল, ধুতি পাঞ্জাবি প'রে মাথায় শোলা হ্যাট দিয়ে বাইসিকল চড়ে ঘুরে বেড়াত। একবার অর্ধোদয় যোগের সময় তাকে দেখেছিলুম, একটা গামছা প'রে আর একটা গামছা গায়ে জড়িয়ে মাথায় হ্যাট দিয়ে হাতে কমণ্ডলু ঝুলিয়ে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে। এই হ্যাটের জন্যেই সবাই তাকে গুপী সায়েব বলত।

নয়নচাঁদ বললেন, তোমার ভণিতা রেখে দাও, পকেট-মারা কিসে বন্ধ হল তাই চটপট বলে ফেল। আমাদের এখন অনেক কাজ আছে। একটা বিয়ের যোগাড় কি সোজা কথা !

একটু চটে গিয়ে আমি বললুম, গুপী সায়েব হেঁজিপেঁজি লোক নয়, তার ইতিহাস বলতে সময় লাগে, আর ধীরে-সুস্থে তা শুনতে হয়। আপনাদের যখন ফুরসত নেই তখন থাক।

নয়নচাঁদ বললেন, আরে না না, রাগ কর কেন। কি জান, মনটা একটু খিঁচড়ে আছে, তাই ব্যস্ত হয়েছিলুম। হাঁ, ভাল কথা, শুনলুম হৃদয় দাস নাকি একটা ভাল রোভার গাড়ির জন্যে বায়না করেছে। তা হলে কঞ্জুস বুড়োর সুবুদ্ধি হয়েছে ?

—তা হয়েছে।

—বেশ বেশ, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। যাক, এখন তুমি গুপী সায়েবের ইতিহাস বল।

গুপী সায়েব লেখাপড়া বেশী শেখে নি, কিন্তু ছোকরা খুব পরোপকারী ছিল আর হরেক রকম জানোয়ার সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। তার মক্কেলও ছিল বিস্তর। পয়সার জন্যে নয়, শখের জন্যেই সে ফরমাশ খাটত, তবে কেউ কিছু দিলে খুশী হয়ে নিত। মনে করুন আপনি একটা ভাল কাবুলী বেরাল চান। গুপী সায়েব ঠিক যোগাড় করে দেবে, এমন বেরাল যার ন্যাজ খ্যাকশেয়ালকে হাঁরিয়ে দেয়। আমাদের পাড়ার রাধাশ্যাম গোসাঁইএর নাতির শখ হল একটা বুলডগ পুষবে। কিন্তু বাড়িতে মাংস আনা বারণ। গুপী সায়েব এমন একটা কুত্তা এনে দিল যে ভাত ডাল ডাঁটাচচ্ছড়িতেই তুষ্ট, আর হাড়ের বদলে এক টুকরো কঞ্চি বা একটি পুরনো টুথব্রশ পেলেও তার চলে। কালীচরণ তন্ত্রবাগীশকে মনে আছে? লোকটা গোঁড়া শাক্ত, রাধাকৃষ্ণ কি সীতারাম শুনলে কানে আঙুল দিতেন। তাঁর শখ হল একটি ময়না পুষবেন, কিন্তু বৈষ্ণবী বুলি কপচালে চলবে না। গুপী সায়েব তারাপীঠ না চন্দ্রনাথ কোথা থেকে একটা পাখি নিয়ে এল, সে গাঁজাখোরের মতন হেঁড়ে গলায় শুধু বলত, তারা তারা বল্ শালারা।

সেই সময় হ্যারিসন রোডে বিখ্যাত সিনেমা হাউস ছিল ঝমক মহল। করুগেট লোহার ছাত, তার নীচে কাঠের সীলিং। বহুকালের পুরনো বাড়ি, সীলিংএ অনেক ফাঁক ছিল, তাই দিয়ে বিস্তর পায়রা ঢুকে ভেতরের কার্নিসে রাত্রি-যাপন করত। অডিটোরিয়ম এত নোংরা হত যে দর্শকরা হল্লা করতে শুরু করল। ম্যানেজার হরমুসজী ছিপিওয়ালা পায়রা তাড়াবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই হল না। মেরে ফেলবার উপায় নেই, কারণ হিন্দুর চোখে গরু যেমন ভগবতী, তেমনি হিন্দু মুসলমান আর পারসীর চোখে পায়রা লক্ষ্মীর প্রজা। ছিপিওয়ালা সায়েব লোক পরম্পরায় শুনলেন, পায়রা তাড়াতে পারে একমাত্র গুপী সায়েব।

তাকে কল দেওয়া হল। সে বলল, খুব সোজা কাজ। রাত বারোটার পর যখন শো বন্ধ হবে আর পায়রার দল বেহুঁস হয়ে ঘুমুবে তখন দু-তিন জন লোক লাগিয়ে দেবেন। তারা মই দিয়ে উঠবে আর প্রত্যেকটি পায়রার পেট টিপে ছেড়ে দেবে। পায়রার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ নয়, সেজন্যে দিন কতক নিয়মিত ভাবে পেট টেপা দরকার। ক্রমশ তাদের হৃদয়ংগম হবে যে এই ঝমক মহল সিনেমা ভবন পায়রার পক্ষে মোটেই নিরাপদ আশ্রয় নয়। গুপী সায়েবের ব্যবস্থা অনুসারে হরমুসজী ছিপিওয়ালা প্রাত্যহিক পেট টেপার অর্ডার দিলেন, দিন কতক পরেই পায়রার দল বিদায় হল। গুপী পঁচিশ টাকা দক্ষিণা পেল। তার কয়েক মাস পরে সিনেমা হাউসের ভাড়া নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় ছিপিওয়ালা সাহেব নাগপুরে চলে গেলেন, ঝমক মহলের মালিক পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন হাউস বানালেন।

একদিন গুপী সায়েব আমার এখানে এসেছে, তার ডান হাতে রবারের দস্তানা, বাঁ হাতে একটা দেশলাইএর বাক্স। আমরা প্রশ্ন করলুম, ব্যাপার কি। গুপী সায়েব জবাব দিল না, ফরাসের উপর দুখানা খবরের কাগজ বিছিয়ে দেশলাইএর বাক্স খুলে তার উপর ঢালল। ছোট ছোট জুঁই ফুলের কুঁড়ির মতন সাদা পদার্থ। গুপী বলল, ডেয়ো পিঁপড়ের ডিম, বারো টাকা ভরি, দু আনা দিয়ে এক রতি কিনেছি, খুব পোষ্টাই। তারপর দস্তানা পরা ডান হাত পকেটে পুরে আবার বের করল, কাঁকড়াবিছেতে হাত ছেয়ে গেছে। আমরা ত্রস্ত হয়ে তক্তপোশ থেকে নেমে গেলুম। কাঁকড়াবিছের দল গুপীর হাত থেকে কাগজের ওপর পড়ল আর টুপ টুপ করে সমস্ত পিঁপড়ের ডিম খেয়ে ফেলল। তার পর গুপী সায়েব তার পোষা জানোয়ারদের আবার পকেটে পুরল।

আমরা সবাই বললুম, তোমার এ কিরকম ভয়ংকর শখ? কোন দিন বিছের কামড়ে মারা যাবে দেখছি।

গুপী সায়েব বলল, আপনারা জানেন না, কাঁকড়াবিছে অতি উপকারী প্রাণী। বিছানায় ছারপোকা হয়েছে? কীটিংস পাউডারে কিছু হচ্ছে না? (তখন ডিডিটি ইত্যাদি বেরোয় নি)। গুটি-কয়েক কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দিন, তিন-চার দিন অন্য ঘরে রাত্রিযাপন করুন, তার পর দেখবেন ছারপোকা নির্বংশ, আণ্ডা বাচ্চা ধাড়ী সমস্ত সাবাড়। আলমারি কি দরজা-জানালায় উই লেগেছে? ভাঁড়ার ঘরে পিঁপড়ে? তারও দাবাই কাঁকড়াবিছে।

জিতেন বোসের নাম শুনে থাকবেন। ভদ্রলোকের পুরনো বই সংগ্রহের বাতিক আছে। একদিন এখানে আড্ডা দিতে এসেছেন। কথায় কথায় বললেন, আর তো পারা যায় না, কলকাতার যত রিসার্চ স্কলার আর পি-এচ. ডি. আছেন সবাই আমার ওপর হামলা করছেন। কেবলই বলেন, এই বইটা দু দিনের জন্যে দাও, ও বইখানা সাত দিনের জন্যে দাও। বই দিলে কিন্তু ফেরত আসে না। ওমর খাইয়ামের স্বহস্তে লেখা একটি মহামূল্য পুঁথি আমার আছে। ডকটর সীতারাম নশকর সেই পুঁথিটি বাগাতে চান, একজন জর্মন প্রোফেসরকে দেখাবেন। নশকর মশাইকে হাঁকিয়ে দিতে পারি না, এককালে তাঁর কাছে পড়েছিলুম। তানানানা করে এতদিন কাটিয়েছি, কিন্তু আসছে রবিবারে তিনি আবার আসবেন, কি ছুতো করব তাই ভাবছি।

দৈবক্রমে গুপী সায়েব উপস্থিত ছিল। সে বলল, আপনি ভাববেন না জিতেনবাবু। আপনার প্রত্যেক আলমারিতে আমি পাঁচটি করে কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দেব আর গুটিদশেক ডিম। কেউ বই চাইলে বলবেন, আলমারি বিছেয় ভরতি, বই নিতে পারেন অ্যাট ইওর রিস্ক।

জিতেনবাবু রাজী হলেন, গুপী সায়েব যথোচিত ব্যবস্থা করল। তার পর ডকটর নশকর এসে ওমর খাইয়াম চাইলেন। জিতেনবাবু বললেন, মহা মুসকিল সার, সব আলমারি বিছেয় ভরে গেছে।

এই সেদিন আমার ভাগনেকে কামড়েছে, বেচারা হাসপাতালে আছে। আমার তো হাত দেবার সাহস নেই। আপনি যদি নিরাপদ মনে করেন তবে বইটা খুঁজে বের করে নিতে পারেন। ডকটর নশকর সন্দিগ্ধ মনে আলমারিতে উঁকি মেরে দেখলেন, কাঁকড়াবিছে সঙিন খাড়া করে পাহারা দিচ্ছে। তিনি তখনই ওব্বাবা বলে প্রস্থান করলেন।

এইবার গুপী সায়েবের মহত্তম অবদানের কথা শুনুন। কিছুকাল তার দেখা পাই নি, হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা টেলিফোন বেজে উঠল। কে আপনি? উত্তর এল, আমি গুপী, আপনাদের গুপী সায়েব, মুচীপাড়া থানা থেকে বলছি। আমাকে গ্রেপতার করেছে, শিগ্‌গির আসুন, বেল দিতে হবে।

থানায় গিয়ে দেখলুম, একটা সরু কাঠের বেঞ্চে ব'সে গুপী সায়েব পা দোলাচ্ছে, দারোগা গুলজার হোসেন তাঁর চেয়ারে বসে কটমট করে তার দিকে চেয়ে আছেন। গুপীর পাশেই বেঞ্চে আর একটি লোক বসে আছে, রোগা, বেঁটে, অল্প দাড়ি আছে, পরনে ময়লা ইজার ফরসা জামা, মাথায় টুপি। লোকটি কাতর স্বরে মাঝে মাঝে 'বাপ রে বাপ' বলছে আর একটা গামলায় বরফ দেওয়া জলে হাত ডোবাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি ইনস্পেকটার সাহেব?

গুলজার হোসেন বললেন, এই গোপী ঘোষ আপনার ফ্রেণ্ড? অতি ভয়ানক লোক, এই বেচারা চোট্টু মিঞার জান লিয়েছেন।

ব্যাপার যা শুনলুম তা এই।—গুপী সায়েব বউবাজারে কি কিনতে গিয়েছিল। চোট্টু মিঞা পকেট মারবাব জন্যে গুপীর পকেটে হাত পোরে, সঙ্গে সঙ্গে দুটো কাঁকড়াবিছে তাকে কামড়ে দেয়। যন্ত্রণায় চোট্টু অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন দুজন পাহারাওয়ালা তাকে আর গুপী সায়েবকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে।

আমি নিবেদন করলুম, চোট্টু মিঞা পকেট মারবার চেষ্টা

করেছিল, তাকে আপনারা অবশ্যই প্রসিকিউট করবেন। কিন্তু গুপী সায়েবের কসুর কি? ওঁকে তো আটকাতে পারেন না।

দারোগা সায়েব গর্জন করে বললেন, আমাকে আইন শিখলাবেন না মশয়। এই গুপী একজন খুনী, ডেঞ্জার টু দি পবলিক। গরিব বেচারা চোট্টু মিঞা একটু আধটু পাকিট মারে, কিন্তু তার জন্যে আমরা আছি, সোরাবর্দি সাহেব আছেন, লাট সাহেব ভি আছেন। চোট্টুর জান নেবার কোনও ইখতিয়ার আপনার এই ফ্রেণ্ডের নেই।

আমার কথায় কোনও ফল হল না। এক শ টাকার বেল দিয়ে গুপীকে খালাস করে নিয়ে এলুম। পাঁচ দিন পরে ব্যাংকশল ষ্ট্রীটের কোর্টে মকদ্দমা উঠল, শুধু গুপীর কেস। পকেটমার চোট্টুর বিচার পরে হবে, সে তখনও হাসপাতালে।

সরকারী উকিল বললেন, ইওর অনার, এই আসামী গোপী ঘোষকে কড়া সাজা দেওয়া দরকার। পিকপকেটকে বাধা দেবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তাকে খুন বা নিমখুন করা মারাত্মক অপরাধ। হুজুর সেই বহুকালের পুরনো কেস ক্রাউন ভার্সস ভিখন পাসীর নজিরটি দেখুন। ভিখন পাসী তাড়ি তৈরি করত, তালগাছে ঝোলানো তার ভাঁড় থেকে রোজই তাড়ি চুরি যেত। চোরকে জব্দ করার মতলবে ভিখন ধুতরো ফলের রস ভাঁড়ের মধ্যে রাখল। পরদিন একটা তাড়িচোর মারা পড়ল, আর একটা কোনও গতিকে বেঁচে গেল। হাকিম রায় দিলেন, চোরের বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক উপায় অবলম্বন করা গুরুতর অপরাধ। ভিখন পাসীর এক বছর জেল আর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়েছিল।

গুপী সায়েবের উকিল বললেন, ইওর অনার, আমার মক্কেলের কেস একেবারে আলাদা। কোনও লোককে জব্দ করবার মতলব বা ম্যালিস প্রিপেন্স এঁর ছিল না, পিকপকেটদের প্রতিও ইনি শত্রুভাবাপন্ন নন। ইনি শখ করে কাঁকড়াবিছে পোষেন, তাদের ট্রেনিং দেন, আদর করেন, ভালবাসেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে রাখেন।

কি করে ইনি জানবেন যে পুওর ফেলো চোট্টুর মতিচ্ছন্ন হবে? ইনি তার অনিষ্টচেষ্টা করেন নি, এঁর পালিত অবোধ প্রাণীরাই আত্মরক্ষার জন্যে চোট্টুকে কামড়ে দিয়েছিল। চোট্টুমিঞার প্রতি আমার ক্লায়েন্টের খুব সিমপাথি আছে, কিন্তু এঁর দায়িত্ব কিছুই নেই।

হাকিম ব্রজবিহারী অধিকারী ভুক্তভোগী লোক, বার দুই তাঁরও পকেট মারা গিয়েছিল। হাসি চেপে বললেন, পকেটে কাঁকড়াবিছে নিয়ে বাজারে যাওয়া অন্যায় কাজ। আসামী অপরাধী। ওঁকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আর যেন এমন না করেন। আচ্ছা গোপীবাবু, আপনি যেতে পারেন।

গুপী সায়েব নমস্কার করে করজোড়ে বলল, হুজুর, একটা কোশ্চেন করতে পারি কি?

হাকিম বললেন, কি কোশ্চেন?

—আজ্ঞে, পঞ্জাবির পকেটে কাঁকড়াবিছে রাখা আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু যদি কোট পরি, তার পকেটের ওপর যদি বোতাম দেওয়া ফ্ল্যাপ থাকে, আর তার গায়ে যদি একটি নোটিস সেঁটে দিই—পাকিট মে বিচ্ছু হৈ, হাথ ঘূসানা খতরনাক হৈ—তা হলে কি বেআইনী হবে?

হাকিম ব্রজবিহারী অধিকারী একটু চিন্তা করে বললেন, না, তা হলে বেআইনী হবে না। কিন্তু মাইণ্ড ইউ, আমি হাকিম হিসেবে মত প্রকাশ করছি না, একজন সাধারণ লোক হিসেবেই বলছি।

গুপী সায়েব খালাস হল, তার কিছু আক্কেলও হল। কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি তার কিছুমাত্র ছিল না। আমি বললুম, তোমার শ্বশুরবাড়ি কেষ্টনগরে না? কালই সেখানে যাও, হাজার খানিক মাটির কাঁকড়াবিছে অর্ডার দিয়ে এস, দাড়ার নীচে যেন ফাউণ্টেন পেনের মতন ক্লিপ থাকে। বিজ্ঞাপন দেওয়া চলবে না,

আমরা পাঁচজন মুখে মুখেই জিনিসটা চালু করে দেব। গুপী সায়েব হাজারটা নকল বিছে আনাল, বিশ দিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেল। খুব ডিমাণ্ড, আরও আনাতে হল। চোট্টু মিঞার দুর্ভোগের খবর পিকপকেট সমাজে রটে গিয়েছিল, পথচারী ভদ্রলোকদের পকেট থেকে দুটি দাড়া উঁকি মারছে দেখে তারা আতঙ্কে কাঁপতে লাগল, তাদের পেশা একদম বন্ধ হয়ে গেল। তার পর ক্রমশ জানাজানি হল যে আসল বিচ্ছু নয়, মাটির তৈরী। পকেটমারদের ভয় ভেঙে গেল, তারা আবার ব্যবসা শুরু করল।

ইতিহাস শুনে নয়নচাঁদ বললেন, হুঁ, দিব্যি আষাঢ়ে গল্প বানিয়েছ। এখন কাজের কথা বল। হৃদয় দাস মোটর কিনছে ভাল কথা। আমার ছেলেকে বিলেত পাঠাতে রাজী আছে তো?

বিষণ্ণ মুখে আমি বললুম, আজ্ঞে না। মোটর কিনছেন নিজের জন্যে। নাতজামাইকে বিলেত পাঠাতে পারবেন না।

—বটে! আমার ছেলেকে জলের দরে পেতে চান?

—আজ্ঞে না, অন্য জায়গায় নাতনীর সম্বন্ধ স্থির করেছেন। কি জানেন পাইন মশাই, আপনি ধনী মানী লোক, কাজেই অনেকের চোখ টাটায়। হিংসুটে লোকে ছেলের নামে ভাংচি দিয়েছে।

—কি বলেছে?

—বলেছে, ষাঁড়ের গোবর।

১৮৮১

গুলবুলিস্তান

(আরব্য উপন্যাসের উপসংহার)

সম্প্রতি আরব্য উপন্যাসের একটি প্রাচীন পুঁথি উজবেকীস্তানে পাওয়া গেছে। তাতে যে আখ্যান আছে তা প্রচলিত গ্রন্থেরই অনুরূপ, কেবল শেষ অংশ একেবারে অন্যরকম। বিচক্ষণ পণ্ডিতরা বলেন, এই নবাবিষ্কৃত পুঁথির কাহিনীই অধিকতর প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য, নীতিসংগতও বটে। আপনাদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্যে সেই উজবেকী উপসংহার বিবৃত করছি। কিন্তু তা পড়বার আগে প্রচলিত আখ্যানের আরম্ভ আর শেষ অংশ জানা দরকার। যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তাই সংক্ষেপে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

শাহরিয়ার ছিলেন পারস্য দেশের বাদশাহ, আর তাঁর ছোট ভাই শাহজমান তাতার দেশের শাহ। দৈবযোগে তাঁরা প্রায় একই সময়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁদের বেগমরা মায় সখী আর বাঁদীর দল সকলেই ভ্রষ্টা। তখন দুই ভাই নিজ নিজ অন্তঃপুরে সমস্ত মুণ্ডচ্ছেদ করলেন এবং সংসারে বীতরাগ হয়ে একসঙ্গে পর্যটনে নির্গত হলেন।

স্ত্রীচরিত্রে আর একটি নিদর্শন তাঁরা পথে যেতে যেতেই পেলেন। এক ভীষণ দৈত্য তার সুন্দরী প্রণয়িনীকে সিন্দুকে পুরে সাতটা তালা লাগিয়ে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মাঝে মাঝে সে সুন্দরীকে হাওয়া খাওয়াবার জন্যে সিন্দুক থেকে বার করত এবং তার কোলে মাথা রেখে ঘুমুত। সেই অবসরে সুন্দরী নব নব প্রেমিক সংগ্রহ করত। দুই ভ্রাতাও তার প্রেম থেকে নিষ্কৃতি পান নি।

শাহরিয়ার তাঁর কনিষ্ঠকে বললেন, ভাই, এই ভীষণ দৈত্য তার প্রণয়িনীকে সিন্দুকে বন্ধ করে সাতটা তালা লাগিয়েও তাকে আটকাতে পারে নি, আমরা তো কোন ছার। বিবাগী দরবেশ হয়ে লাভ নেই, আমরা আবার বিবাহ করব। কিন্তু স্ত্রীজাতিকে আর বিশ্বাস নেই, এক রাত্রি যাপনের পরেই পত্নীর মুণ্ডচ্ছেদ করে পরদিন আবার একটা বিবাহ করব, তা হলে অসতী-সংসর্গের ভয় থাকবে না। দুই ভ্রাতা একমত হয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন এবং প্রাত্যহিক বিবাহ আর নিশান্তে মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করে অনাবিল দাম্পত্য সুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

শাহরিয়ারের উজিরের দুই কন্যা, শহরজাদী ও দিনারজাদী। শহরজাদীর সনির্বন্ধ অনুরোধে উজির তাঁকে বাদশাহের হস্তে সমর্পণ করলেন। রাত্রিকালে শহরজাদী স্বামীকে জানালেন, ভগিনীর জন্যে তাঁর মন কেমন করছে। দিনারজাদীকে তখনই রাজপ্রাসাদে আনা হল। শাহরিয়ার আর শহরজাদীর শয়নগৃহেই দিনারজাদী রাত্রিযাপন করলেন। শেষ রাত্রে তিনি বললেন দিদি, আর তো দেখা হবে না, বাদশাহ যদি অনুমতি দেন তো একটা গল্প বলতে পার।

শহরজাদীর গল্প শুনে বাদশাহ মুগ্ধ হলেন, কিন্তু গল্প শেষ হল না। বাদশাহ বললেন, আচ্ছা, কাল রাত্রিতে বাকীটা শুনব, একদিনের জন্য তোমার মুণ্ডচ্ছেদ মুলতবী থাকুক। পরের রাত্রিতে শহরজাদী গল্প শেষ করলেন এবং আর একটি আরম্ভ করলেন। তারও শেষ অংশ শোনবার জন্যে বাদশাহের কৌতূহল হল, সুতরাং শহরজাদীর জীবনের মেয়াদ আর একদিন বেড়ে গেল। এইভাবে শহরজাদী এক হাজার একরাত্রি যাবৎ গল্প চালালেন এবং বেঁচেও রইলেন। পরিশেষে শাহরিয়ার খুশী হয়ে বললেন, শহরজাদী তোমাকে কতল করব না, তুমি আমার মহিষী হয়েই বেঁচে থাক। তোমার ভগিনী দিনারজাদীর সঙ্গে আমার ভাই শাহজমানের বিবাহ

বিবাহ দেব। অতঃপর শহরজাদীর সঙ্গে শাহরিয়ার এবং দিনারজাদী সঙ্গে শাহজমান পরম সুখে নিজ নিজ রাজ্যে কালযাপন করতে লাগলেন।

এখন আরব্যরজনীর উজবেকী উপসংহার শুনুন।

হাজার-এক রাত্রি শেষ হলে শাহরিয়ার প্রসন্নমনে বললেন, শহরজাদী, তুমি যেসব অত্যাশ্চর্য গল্প বলেছ তা শুনে আমি অতিশয় তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে মরতে হবে না।

শহরজাদী যথোচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

দিনারজাদী বললেন, জাহাঁপনা, এতদিন আপনি শুধু দিদির গল্পই শুনলেন, পুরস্কার স্বরূপ জীবনদানও করলেন। কিন্তু আমার কথা তো কিছুই শুনলেন না।

শাহরিয়ার বললেন, তুমিও গল্প জান নাকি? বেশ, শোনাও তোমার গল্প।

দিনারজাদী বললেন, আমি যা বলছি তা গল্প নয়, একেবারে খাঁটি সত্য। জাহাঁপনা আপনি তো বিস্তর স্ত্রীর সংসর্গে এসেছেন, এমন কাকেও জানেন কি যার তুলনা জগতে নেই?

—কেন, তোমার এই দিদি আর তুমি।

—আমাদের চাইতে শতগুণ শ্রেষ্ঠ নারী আছে, তার বৃত্তান্ত আমার প্রিয়সখী গুলবদনের কাছে শুনেছি। তার দেশ বহু দূরে। ছ মাস আগে একদল হুন দস্যু তাকে হরণ করে ইস্পাহানের হাটে নিয়ে এসেছিল, তখন আমার বাবা এক শ দিনার দাম দিয়ে তাকে কেনেন। গুলবদনের সঙ্গে একটু আলাপ করেই আমি বুঝলাম, সে সামান্যা ক্রীতদাসী নয়, উচ্চ বংশের মেয়ে, গুলবুলিস্তানের শাহজাদীদের আত্মীয়া।

—গুলবুলিস্তান কোন্ মুলুক? তার নাম তো শুনি নি।

—যে দেশে প্রচুর গোলাপ তার নাম গুলিস্তান। আর যে

দেশে যত গোলাপ তত বুলবুল, তার নাম গুলবুলিস্তান। এই দেশ হচ্ছে হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে বল্‌খ উপত্যকায়। জানেন বোধ হয়, অনেক কাল আগে মহাবীর সেকন্দর শাহ এই পারস্থ সাম্রাজ্য আর পূর্বদিকের অনেক দেশ জয় করেছিলেন। দিনকতক তিনি সসৈন্যে গুলবুলিস্তানে বিশ্রাম করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি নিজে তাঁর দু'শ সেনাপতি ওখানকার অনেক মেয়েকে বিবাহ করেন। বর্তমান গুলবুলিস্তানীরা তাঁদেরই বংশধর। ওদেশের পুরুষেরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, আর মেয়েরা অত্যন্ত রূপবতী। তাদের গায়ের রঙ গোলাপী, গাল যেন পাকা আপেল, চোখের তারা নীল, চিবুকের গড়ন গ্রীক দেবীমূর্তির মতন সুগোল। স্বয়ং সেকন্দর শাহ ওদেশের রাজার পূর্বপুরুষ। এখন রাজা জীবিত নেই, দুই শাহজাদী রাজ্য চালাচ্ছেন, উৎফুলুন্নেসা আর লুৎফুলুন্নেসা।

—ও আবার কিরকম নাম!

—আজ্ঞে, গ্রীক ভাষার প্রভাবে অমন হয়েছে। নিকটেই হিন্দ্‌ মুলুক, তার জন্যেও কিছু বিগড়েছে। গুলবুলিস্তান অতি দুর্গম স্থান, অনেক পর্বত নদী মরুভূমি পার হয়ে যেতে হয়। পথে একটি গিরিসংকট আছে, বাব-এল-মৈমুন, অর্থাৎ বানর-তোরণ। দুই খাড়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতি সরু পথ, এক লক্ষ সুশিক্ষিত বানর সেখানে পাহারা দেয়, কেউ এলে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলে। শোনা যায় বহুকাল আগে ওদেশের এক রাজা বংগাল মুলুক থেকে এই সব বানর আমদানি করেছিলেন। জাহাঁপনা, আমি বলি কি, আপনি আর আপনার ভাই শাহজমান সেই গুলবুলিস্তান রাজ্যে অভিযান করুন, শাহজাদী উৎফুল আর লুৎফুলকে বিবাহ করুন। আমার সখী গুলবদন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আপনাদের সঙ্গে গেলে সেও নিরাপদে নিজের দেশে ফিরতে পারবে।

শাহরিয়ার বললেন, আমরা যাকে-তাকে বিবাহ করতে পারি না। সেই দুই শাহজাদী দেখতে কেমন? তাদের চরিত্র কেমন?

—জাহাঁপনা, তাঁদের মতন রূপবতী দুনিয়ায় নেই, তেমন ভীষণ সতীও পাবেন না। তাঁদের যেমন রূপ তেমনি ঐশ্বর্য। আপনারা দুই ভাই যদি সেই শাহজাদীকে বিবাহ করেন তবে স্বর্গের হুরীর মতন স্ত্রীর সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন পাবেন।

—তোমার দিদি কি বলেন?

শহরজাদী বললেন, জাহাঁপনা, আমার জন্য ভাববেন না. আপনাকে সুখী করবার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি।

একটু চিন্তা করে শাহরিয়ার বললেন, বেশ আমি আর শাহজমান শীঘ্রই গুলবুলিস্তান যাত্রা করব। সঙ্গে দশ হাজার তীরন্দাজ, দশ হাজার বর্শাধারী ঘোড়সওয়ার আর ত্রিশ হাজার টাঙ্গিধারী পাইক সৈন্য নেব।

দিনারজাদী বললেন, অমন কাজ করবেন না জাহাঁপনা, তা হলে গুলবুলিস্তানে পৌঁছবার আগেই সসৈন্যে মারা যাবেন। বাব-এল-মৈমুন গিরিসংকটে যে এক লক্ষ বানর আছে তারা পাথর ছুড়ে সবাইকে সাবাড় করবে। তা ছাড়া শাহজাদীদের পাঁচ হাজার হাতি আছে, আপনাদের সৈন্যদের তারা ছত্রভঙ্গ করে দেবে। আমি যা বলি শুনুন। সঙ্গে শুধু পঞ্চাশজন দেহরক্ষী নেবেন, আপনার পঁচিশ আর ছোট জাহাঁপনার পঁচিশ। আপনার যে দুজন জোয়ান সেনাপতি আছেন, শমশের জঙ্গ আর নওশের জঙ্গ, তাদেরও নেবেন।

—কিন্তু সেই বাঁদরদের ঠেকাব কি করে?

—শুনুন। এখন রমজান চলছে, কিছুদিন পরেই ঈদ-অল-ফিতর। এই সময় দেশের আমির ফকির সকলেই জালা জালা শরবৎ খায়, তার জন্যে হিন্দুস্তান থেকে রাশি রাশি তখ্‌তই-খণ্ডেসরি অর্থাৎ খাঁড় গুড়ের পাটালি বসরা বন্দরে আমদানি হয়। আপনি সেই পাটালি হাজার বস্তা বাজেয়াপ্ত করুন, সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাব-এল-মৈমুনের কাছে এসে পথের দুই ধারে সেই পাটালি ছড়িয়ে দেবেন। বাঁদরের

দল হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর কাড়াকাড়ি করবে তখন আপনারা অনায়াসে পার হয়ে যাবেন।

শাহরিয়ার বললেন, বাঃ তোমার খুব বুদ্ধি, যদি পুরুষ হতে তো উজির করে দিতাম। যেমন বললে সেই রকমই ব্যবস্থা করব। শাহজমানের কাছে আজই দূত পাঠাচ্ছি। তোমরা দুই বোন আর তোমাদের সখী গুলবদন যাবার জন্য তৈরী হও।

দিনারজাদীর পরামর্শ অনুসারে যাত্রার আয়োজন করা হল। কিছুদিন পরে শাহরিয়ার শাহজমান শহরজাদী দিনারজাদী, দুই সেনাপতি আর পঞ্চাশ জন অনুচর গুলবদনের প্রদর্শিত পথে নিরাপদে গুলবুলিস্তানে পৌঁছুলেন।

চার জন রক্ষীর সঙ্গে গুলবদন এগিয়ে গিয়ে শাহরিয়ার ইত্যাদির আগমন-সংবাদ দুই শাহজাদীকে জানালেন। তাঁরা মহা সমাদরে অতিথিদের সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রাম ও আহারাদির পর বড় শাহজাদী উৎফুল্লেসা বললেন, মহামহিম পারস্যরাজ ও তাতাররাজ কি উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে এসেছেন তা প্রকাশ করে আমাদের কৃতার্থ করুন।

শাহরিয়ার উত্তর দিলেন, হে গুলবুলিস্তানের শ্রেষ্ঠ গোলাপী বুলবুল দুই শাহজাদী, যা শুনেছিলাম তার চাইতে তোমরা ঢের বেশী সুন্দরী। আমরা একেবারে বিমোহিত হয়ে গেছি, তোমরা দুই ভগিনী আমাদের দুজনের বেগম হও।

শাহজাদী উৎফুল বললেন, তা বেশ তো, আমাদের আপত্তি নেই, বিবাহে আমরা সর্বদা প্রস্তুত। আপনাদের দলে এই যে দুজন সুন্দরী দেখছি এঁরা কে?

শাহরিয়ার বললেন, ইনি হচ্ছেন আমার এখনকার বেগম শহরজাদী, আর উনি আমার শালী দিনারজাদী, আমার

ভাইএর বাগ্‌দত্তা। সপত্নীর সঙ্গে থাকতে এঁদের কোনও আপত্তি নেই।

মাথা নেড়ে উৎফুল বললেন, তবে তো আমাদের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে না। আমাদের নীতিশাস্ত্র কলীলা-ওঅ-দিমনা অনুসারে পুরুষের এককালে একাধিক স্ত্রী আর স্ত্রীর একাধিক স্বামী নিষিদ্ধ।

—তুমি যে ধর্মবিরুদ্ধ খ্রীষ্টানী কথা বলছ শাহজাদী। স্ত্রীর পক্ষেই একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ, পুরুষের পক্ষে নয়।

—আপনাদের রীতি এখানে চলবে না। আমাদের শরিয়ত অন্য রকম, তা যদি না মানেন তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিবাহ হবে না।

শাহরিয়ার তাঁর ভাই শাহজমানের সঙ্গে কিছুক্ষণ চুপি চুপি পরামর্শ করলেন। তার পর বললেন, বেশ, তোমাদের রীতিই মেনে নিচ্ছি। শহরজাদী, তোমাকে তালাক দিলাম, তুমি আর আমার বেগম নও। তোমার জন্যে সত্যই আমি দুঃখিত। কি করা যায় বল, সবই আল্লার মর্জি। তোমার জন্যে আমি অন্য একটি ভাল স্বামী যোগাড় করে দেব।

শাহজমান বললেন, দিনারজাদী, আমিও তোমাকে চাই না। তুমি অন্য কাকেও বিবাহ ক'রো।

অনন্তর সানাই ভেঁপু কাড়া-নাকাড়া আর দামামা বেজে উঠল, সখীর দল নাচতে লাগল, গুলবুলিস্তানের মোল্লারা শাহরিয়ারের সঙ্গে উৎফুলের আর শাহজমানের সঙ্গে লুৎফুলের বিবাহ যথারীতি সম্পাদন করলেন।

বিকাল বেলা প্রাসাদ-সংলগ্ন মনোরম উদ্যানে ফোয়ারার কাছে বসে শাহরিয়ার বললেন, প্রেয়সী উৎফুল, তোমাদের সখীরা অতি খাসা, অনেকে তোমাদের দুই বোনের চাইতেও খুবসুরত। আমরা দুই ভাই ওদের ভাগাভাগি করে আমাদের হারেমে রাখব।

উৎফুল বললেন, খবরদার প্রাণনাথ, আমাদের সখী বাঁদী

ঝাড়ুদারনী বা অন্য কোনও স্ত্রীলোকের দিকে যদি কুদৃষ্টি দাও তো তোমার গরদান যাবে।

অত্যন্ত রেগে গিয়ে শাহরিয়ার বললেন, ইন্‌শাল্লাহ্! মুখ সামলে কথা বল প্রিয়ে, গরদান নেওয়া আমারও ভাল রকম অভ্যাস আছে।

উৎফুল বললেন, এস আমার সঙ্গে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই বাঁদী, এখনই চারজন মশালচী আর দশজন রক্ষীকে গরদানী মহলে যেতে বল।

দুই শাহজাদী স্বামীদের নিয়ে সুবিশাল গরদানি মহলে প্রবেশ করলেন। মশালের আলোকে দুই ভ্রাতা সন্ত্রস্ত হয়ে দেখলেন, দেওয়ালের গায়ে বিস্তর গোঁজ পোঁতা আছে, তা থেকে সারি সারি নরমুণ্ড ঝুলছে। তাদের দাড়ি হরেক রকম, কাঁচা, কাঁচা-পাকা, গালপাট্টা, ছাগল দাড়ি, লম্বা দাড়ি, গোঁফহীন দাড়ি ইত্যাদি।

উৎফুলন্নেসা বললেন, শোন বড় জাহাঁপনা আর ছোট জাহাঁপনা, এইসব মুণ্ড হচ্ছে আমাদের ভূতপূর্ব স্বামীদের। উত্তরদিকের দেওয়ালে আমার স্বামীদের, আর দক্ষিণের দেওয়ালে লুৎফুলের। বিবাহের পর এরা প্রত্যেকেই আমাদের সখীদের প্রতি, লোলুপ নয়নে চেয়েছিল, সেজন্যে আমাদের নিয়ম অনুসারে এদের কতল করা হয়েছে। তোমরা যেমন কুলটা স্ত্রীকে দণ্ড দাও, আমরা তেমনি লম্পট স্বামীকে দিই। ওহে শাহরিয়ার আর শাহজমান, যদি হুঁশিয়ার না হও তবে তোমাদেরও এই দশা হবে। খবরদার, তলোয়ারে হাত দিও না তা হলে আমাদের এই রক্ষীরা এখনই তোমার গরদান নেবে।

শাহরিয়ার বললেন, পিশাচী রাক্ষসী ঘূলী ইবলিস-নন্দিনী, তোমাদের মনে কি দয়া মায়া নেই?

—তোমাদের চাইতে ঢের বেশী আছে। তোমরা প্রতিদিন নব নব বধূ ঘরে এনেছ, এক রাত্রির পরেই প্রত্যেককে হত্যা করেছ।

তাদের চরিত্র ভাল কি মন্দ তা না জেনেই মেরে ফেলেছ। আমরা অত নির্দয় নই, বিনা দোষে পতিহত্যা করি না। যদি দেখি লোকটা অন্য নারীর উপর নজর দিচ্ছে তবেই তার গরদান নিই।

শাহজমান চুপি চুপি বললেন, দাদা মুণ্ডুগুলো মাটির কি প্লাস্টিকের নয় তো?

শাহরিয়ার বললেন, না, তা হলে মাছি বসত না। অবশ্য একটু গুড় লাগালেও মাছি বসে। যাই হক, এই শয়তানীদের কবল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমাদের সঙ্গে যদি প্রচুর সৈন্য থাকত তবে সখীর দল সমেত এদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতাম।

তার পর শাহরিয়ার গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, শাহজাদী, তোমাদের আমরা তালাক দিলাম, এখনই দেশে ফিরে যাব।

উংফুল বললেন, তোমাদের তালাক-বাক্য গ্রাহ্য নয়, এখানকার আইন আলাদা। আমরা ছেড়ে না দিলে তোমাদের এখান থেকে মুক্তি নেই।

—তবে এই সখীদের সরিয়ে দাও, ওরা চোখের সামনে থাকলে আমাদের লোভ হবে।

—ওরা এখানেই থাকবে, নইলে তোমাদের চরিত্রের পরীক্ষা হবে কি করে।

মাথা চাপড়ে শাহরিয়ার বললেন, হা, আমাদের পারস্য আর তাতার রাজ্যের কি হবে?

উংফুল বললেন, তার জন্যে ভেবো না। তোমার সেনাপতি শমশের জঙ্গ্ শহরজাদীকে বেগম করে পারস্যের সিংহাসনে আর নওশের জঙ্গ্ দিনারজাদীকে বেগম করে তাতার রাজ্যের মালিক হবে। তুমি আর শাহজমান এখনই ফরমান আর রাজীনামায় পাঞ্জার ছাপ লাগাও। দেরি ক'রো না, তা হলে বিপদে পড়বে।

নিরুপায় হয়ে শাহরিয়ার আর শাহজমান দলিলে পাঞ্জার ছাপ দিলেন। তার পর শাহরিয়ার করজোড়ে বললেন, শাহজাদী, দয়া

কর। এখানে তোমাদের সখীদের দেখলে আমরা প্রলোভনে পড়ব, প্রাণ হারাব। আমাদের অন্য কোথাও থাকতে দাও।

—তা থাকতে পার। এই গুলবুলিস্তানের উত্তরে পাহাড়ের গায়ে অনেক গুহা আছে, সেখানে তোমরা সুখে থাকতে পারবে। সাত দিন অন্তর এখান থেকে রসদ পাবে। দুজন মোল্লাও মাঝে মাঝে গিয়ে ধর্মোপদেশ দেবেন। ওখানে তোমরা পাপমোচনের জন্যে নিরন্তর তসবি জপ করবে এবং হরদম আল্লার নাম নেবে।

পাঁচ বৎসর পরে মোল্লারা জানালেন যে আল্লার কৃপায় দুই ভ্রাতার চরিত্র কিঞ্চিত দূরস্ত হয়েছে। তখন দুই শাহজাদী নিজ নিজ স্বামীকে মুক্তি দিলেন, তালাকও দিলেন।

শাহরিয়ার ও শাহজমান দেশে ফিরে গিয়ে দেখলেন, প্রজা সৈন্য আর রাজকোষ সব বেহাত হয়ে গেছে, শমশের আর নওশের সিংহাসনে জেঁকে বসেছেন, রাজ্য ফিরে পাবার কোনও আশা নেই। অগত্যা তাঁরা বাগদাদে গেলেন এবং কাফিখানায় জনতাকে আরব্য রজনীর বিচিত্র কাহিনী শুনিয়ে কোনও রকমে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন।

১৮৮১

চলচ্চিন্তা

আমাদের পরিচ্ছদ

সম্প্রতি জওহরলাল নেহরু এক বক্তৃতায় বলেছেন, ইওরোপীয় পোশাকের উপর এ দেশের লোকের অত্যন্ত ঝোঁক তিনি পছন্দ করেন না। কি রকম সাজ ভারতবাসীর উপযুক্ত তা তিনি খোলসা করে বলেন নি। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন তিনি ইংলাণ্ডে গিয়েছিলেন তখন কাগজে তাঁর হ্যাট কোট টাই ট্রাউজার পরা ছবি বেরিয়েছিল। সম্প্রতি আমেরিকা ভ্রমণের ছবিতে তাঁর পরনে লংকোট টাই আর গান্ধীটুপি দেখা গেছে। ভারতবর্ষে তিনি চুড়িদার পাজামা আচকান আর গান্ধীটুপি পরে থাকেন। অতএব ধরে নিতে পারি সর্বাবস্থায় সাহেব সেজে থাকাই তাঁর অপছন্দ ; ক্ষেত্র বিশেষে বিলাতী বা দেশী-বিলাতীর মিশ্র পোশাকে তাঁর সম্মতি আছে।

হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে যার মানে—নিজের রুচিতে খাবে আর পরের রুচিতে পরবে। নিজের রুচিতে সাজতে গেলে বাধা পাওয়া যায় তা আমি দেখেছি। একবার দরজীকে ফরমাশ করে-ছিলাম—আমার যে পঞ্জাবী করবে তার বুকের উপর বাঁ দিকে একটা মামুলী পকেট হবে, আর ভিতরে ডান দিকে আর একটা পকেট হবে ; বাঁ দিকের পকেট বাইরে, আর ডান দিকেরটা ভিতরে। বুঝেছ ? দরজী বলল, আজ্ঞে ঠিক বুঝেছি। যখন জামা তৈরী হয়ে এল তখন দেখলাম দুটো পকেটই বাঁ দিকে, একটা বাইরে আর একটা ঠিক তার পিছনে ভিতর দিকে। বললাম, এ কি করেছ মিয়া ? মিয়া উত্তর দিল, দুটো দু দিকে থাকলে যে বেপ্যাটান হবে বাবু, তা তো দস্তুর নয়। দরদী নিষ্ঠাবান লোক, দস্তুর ভঙ্গের পাতক থেকে আমাকে রক্ষার জন্য নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল। আর একবার পঞ্জাবির ফরমাশ দিয়েছিলাম যার বুক কোটের মতন সবটা

খোলা যায়। দরজী এবারে আমার অনুরোধ রেখেছিল। কিন্তু শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা বলল, এ কি রকম বেয়াড়া জামা। এ যে কোটজাবি, না কোট না পঞ্জাবি, ফেলে দাও এটা। আমি ফেলি নি, দু-তিন জন আমার দেখাদেখি কোটজাবি বানিয়েছিল।

·

সমস্ত ভারতের স্ত্রীপুরুষের পরিচ্ছদের আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কেবল বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথাই বলব, প্রথমে পুরুষের, শেষে মেয়ের। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের রুচি তিন কারণে প্রভাবিত হয়—(১) গতানুগতিক রীতি, (২) সাময়িক ফ্যাশন হুজুগ বা বিখ্যাত লোকের আদর্শ এবং (৩) স্বাস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধার জ্ঞান। তা ছাড়া আর্থিক কারণ বা সুলভতা দুর্লভতা তো আছেই।

গতানুগতিক রীতি কালক্রমে বদলায়। আমার শৈশবে অর্থাৎ প্রায় সত্তর বৎসর আগে সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পরিচ্ছদ ছিল ধুতি পিরান চাদর আর বিলাতী গড়নের জুতো (শু বা পম্প)। পিরানের আকার আধুনিক পঞ্জাবির মতন, কিন্তু ঝুল কম। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা পরতেন ধুতি, কোরতা বা খাটো আঙরাখা, চাদর আর চটি, অনেক সময় শুধু ধুতি চাদর চটি। কোরতার বোতামের বদলে ফিতা থাকত, ঝুল কোমর পর্যন্ত। খাটো আঙরাখার গড়ন চাপকানের মতন কিন্তু ঝুল নিতম্ব পর্যন্ত। কীর্তন-গায়করা এখনও কোরতা পরে থাকেন। গেঞ্জির চলন ৬০।৭০ বৎসর আগে হয়। সেকালে নাম ছিল গেঞ্জিফ্রক। ইংলাণ্ড আর ফ্রান্সের মাঝে যে সব দ্বীপ আছে তার একটার নাম Guernsey আর একটার Jersey। তা থেকেই জামার নাম গেঞ্জি আর জার্সি হয়েছে।

বিলাত-ফেরতরা তখন সর্বদা সাহেবী পোশাক পরতেন, সুরেন বাঁড়ুজ্যে এবং আরও দু-চার জন ছাড়া। উকিল ডেপুটি সবজজ

আর বড় কর্মচারীরা ইজার চাপকানের উপর চোগা বা পাকানো চাদর পরতেন, মাথায় শামলা বা পিরালী পাগড়ি দিতেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে আছে, মহেন্দ্র চাপকান পরে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে যেত। শীতকালে অবশ্য সকলেরই পোশাকের পরিবর্তন হত, মধ্যবিত্তরা ধুতির উপর গরম কোট এবং র‍্যাপার বা শাল পরতেন। অল্প কয়েক জন অতি সেকেলে লোক পারসী কোট (ঝুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত) আর চায়না কোট (গলায় কলার নেই, ঢিলা গড়ন) পরতেন।

প্রায় ষাট বৎসর আগে অল্পবয়স্কদের মধ্যে পিরানের বদলে শার্টের প্রচলন হল। শার্টের উপর চাদর বা উড়ুনি ইচ্ছাধীন, কিন্তু কলকাতার যুবসমাজে কোটের উপর চাদর পরা বাঙাল বা খোট্টা-বাঙালীর লক্ষণ গণ্য হত। ক্রমশ শিক্ষিত লোকের অনেকের হুঁশ হল, শার্ট হচ্ছে সাহেবদের অন্তরীয়, কোটের নীচে পরবার। তখন তার বদলে এল পঞ্জাবি, অর্থাৎ বেশী ঝুলওয়ালা পিরান। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাজ নিরূপিত হয়ে গেল—ধুতি আর পঞ্জাবি, তার উপর চাদর ইচ্ছাধীন। ধুতি-চাদর আমাদের বহু প্রাচীন পরিধেয়, কিন্তু 'পঞ্জাবি' নামেই বোঝা যায় এটি খাঁটী বাঙলা দেশের জিনিস নয়। পিরান শার্ট আর পঞ্জাব অঞ্চলের আজানুলম্বিত 'কমীজ'-এর মিশ্রণে পঞ্জাবি নামক জামার উৎপত্তি হয়েছে। ১৯২০-৩০ নাগাদ চাপকান চোগা শামলা পাগড়ি লোপ পেতে লাগল এবং সাহেবী সাজই সম্ভ্রান্ত পোশাক গণ্য হল, কিন্তু হ্যাট বহুপ্রচলিত হয় নি।

কাপড়ের দাম ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার ফলে বালক আর কিশোরদের মধ্যে হাফপ্যান্টের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। ধুতি পরা ছোট ছেলে এখন আর প্রায় দেখা যায় না, মেয়েরাও কিশোর বয়স পর্যন্ত ফ্রক পরে। যুবা আর প্রৌঢ়দের মধ্যে ধুতির বদলে পাজামা ইজার বা প্যান্টের প্রচলন ক্রমশ বাড়ছে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বদেশী রুচি লুপ্তপ্রায় হয়েছে, এখন হরেক রকম ইজার

প্যান্ট শার্ট কোট আর শার্ট-কোটের খিচুড়ি চলছে, অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর জাতীয় পরিচ্ছদ কি দাঁড়াবে বলা অসম্ভব।

গত সত্তর বৎসরে আমাদের পরিচ্ছদের যে ক্রমিক পরিবর্তন হয়েছে তার একটি কারণ নকল, ফ্যাশন বা হুজুগ, অন্য কারণ ধুতির মূল্যবৃদ্ধি। কি রকম পরিচ্ছদ আমাদের উপযুক্ত তা নূতন করে বিচারের পূর্বে কতকগুলি বিষয় মেনে নেওয়া যেতে পারে। যথা—

(১) সর্বাবস্থায় একই রকম পরিচ্ছদ চলতে পারে না, কর্মভেদে এবং ঋতুভেদে বেশের পরিবর্তন হবেই।

(২) ভারতের সকল প্রদেশের আবহাওয়া সমান নয়, সে কারণে পরিচ্ছদও সমান হতে পারে না। তথাপি সর্বভারতীয় মিলনের ক্ষেত্রে কিছু সাম্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৩) ইওরোপ আমেরিকার বিভিন্ন জাতির পরিচ্ছদে খুব মিল আছে। ইংরেজী যেমন বিশ্বরাজনীতির ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইওরোপীয় পোশাকও তেমনি সর্বজাতির ভব্য পরিচ্ছদ হয়ে পড়েছে। ভারতবাসী যদি ইওরোপীয় পোশাক অল্পাধিক গ্রহণ করে তবে আপত্তির কারণ নেই। অবশ্য ইওরোপীয় পোশাকের সবটাই স্বাস্থ্যের অনুকূল আর সুবিধাজনক নয়, অনাবশ্যক উপকরণও তাতে আছে (যেমন নেকটাই), সে কারণে কিছু কিছু সংস্কার হওয়া উচিত।

ফ্যাশন অগ্রাহ্য করে শুধু স্বাস্থ্য আর সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি বাঙালীর পরিধেয় নির্ধারণ করা যায় তবে তা কি রকম হবে? অনেক কাল আগে একজন মান্যগণ্য ইংরেজ (নাম মনে নেই) কয়েক বৎসর বাঙলা দেশে বাস করে বিলাতে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন—We are baked for four months, boiled for four months and allowed to cool for four months। এই বিবরণে অত্যুক্তি আছে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে আমাদের মাতৃভূমি গ্রীষ্মকালে সর্বদা মলয়জশীতলা থাকে না, গুমট আর

ভেপসা গরম দুইই আমাদের ভোগ করতে হয়। এ দেশের বাতাস পশ্চিম ভারতের মতন শুকনো নয়, সেজন্য তাপ প্রবল না হলেও ঘাম বেশী হয়। এখানে বসন্ত থেকে শরৎ পর্য্যন্ত প্রায় সাত মাস অল্পাধিক গরম, শীত ঋতুও মৃদু ও অল্পস্থায়ী। অতএব আমাদের পরিধেয় প্রধানত আর্দ্রোষ্ণ (humid and hot) বায়ুর উপযুক্ত হওয়া উচিত। অবশ্য শীতকালে পরিবর্তন করতে হবে।

আরব দেশের লোক গ্রীষ্মের তাপ রোধের জন্য সাদা কাপড়ের চোগা পরে, পুরুষরাও সাদা ঘোমটা দিয়ে মাথা আর মুখের দু পাশ ঢাকে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মের দু-এক মাস খালি গায়ে আর খালি মাথায় বাইরে গেলে তাতের জন্য কষ্ট হয়, ছাতা বা আর কিছু দিয়ে মাথা ঢাকতে হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত সাত মাসের বাকী সময় বাতাস আর্দ্রোষ্ণ থাকে, তখন অল্প পরিচ্ছদই স্বাস্থ্যকর। ইওরোপীয় পুরুষ খালি গায়ে মোটরে চলেছে এই দৃশ্য এখন কলকাতায় বিরল নয়। আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনেকে সেকালে যা পরতেন এবং এখনও যা পরেন—ধুতি চাদর আর চটি—এই হলেই যথেষ্ট। তাত অথবা অল্প ঠাণ্ডার সময় চাদর দিয়ে গা ঢাকা যেতে পারে, ভেপসা গরমে চাদর কাঁধে রেখে গায়ে হাওয়া লাগানো যেতে পারে। কিন্তু মানুষের রুচি সকল ক্ষেত্রে যুক্তির বশে চলে না। ভারত সরকার আমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, আমাদের ভব্যতার ধারণাও বদলাচ্ছে, আগে যা বিলাস গণ্য হত এখন তা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। শুধু ধুতি চাদর চটি এখন অচল, আমাদের গলা থেকে পা পর্যন্ত সবই ঢাকতে হবে।

ধুতির অনেক গুণ। সেলাই করতে হয় না, সহজে পরা যায়, সহজে খোলা যায়, গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে না, হাওয়া লাগতে দেয়, নিত্য কাচা যায়, ইস্তিরি না করলেও চলে। ধুতি শব্দের মূল রূপ ধৌতি, অর্থাৎ যা নিত্য ধৌত করতে হয়। আধুনিক ভদ্র বাঙালী যেভাবে ধুতি পরে তা নির্দোষ নয়। সামনে এক গোছা কোঁচা

নিরর্থক, তাকে শুধু বোঝা বাড়ায় আর হাওয়া আটকায়। প্রমাণ ধুতি যদি দশ হাতের বদলে আট হাত করা হয় তবে লজ্জা নিবারণে কিছুমাত্র বাধা হয় না, শরীরে বেশী হাওয়া লাগে, কাপড়ের ওজন ১/৫ ভাগ কমে, দামও কমে।

বাঙালীর কোঁচা একটা সমস্যা, পথ চলবার সময় অনেকেই বাঁ হাতে কোঁচার নিম্নভাগ ধরে থাকে। সেকালের ভারতীয় সুন্দরীদের হাতে লীলাকমল থাকত, মধ্যযুগের রাজাবাদশাদের হাতে গোলাপ ফুল বা শিকারী বাজপাখি থাকত, ভিকটোরীয় যুগের বিলাসিনীদের হাতে flirting fan থাকত। মানবজাতির কাণ্ডজ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় ওসব অনাবশ্যক প্রথা লোপ পেয়েছে। বর্তমান কর্মময় যুগে পথচারী বাঙালী কোঁচার দায়ে এক হাত পঙ্গু করেছে এই দৃশ্য অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। কোঁচার নীচের অংশটা কোমরে গুঁজলে ক্ষতি কি?

শৌখিন ধনী বাঙালী যাঁরা সাধারণতঃ ইওরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণ করেন তাঁরাও বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদির সভায় ধুতি পরে আসেন। অনেকের পরনে আভিজাত্যসূচক ৫২ ইঞ্চি বা আরও বেশী বহরের সূক্ষ্ম ধুতি থাকে, হাঁটবার সময় কোঁচার স্তবকতুল্য নিম্নভাগ মাটিতে লুটয়। চণ্ডীদাসের নায়িকা যেমন নীল শাড়ি নিঙাড়ি চলত, শৌখিন বাঙালী নাগরিক তেমনি কোঁচাটি লুটিয়ে ঝেঁটিয়ে ঝেঁটিয়ে চলে। একজন সুপরিচিত ভদ্রলোককে বলেছিলাম—মাটিতে যত ময়লা আছে সবই যে কোঁচায় লাগছে! উত্তর দিলেন, লাগুক গে, কালই তো লনড্রিতে যাবে।

আজকাল অনেকের পরনে যে পাতলা কাপড়ের পায়জামা বা ইজার দেখা যায় তা নানা বিষয়ে ধুতির চাইতে শ্রেষ্ঠ। ওজন কম, দামও ধুতির কাছাকাছি, কোঁচার বালাই নেই। যাদের দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়—যেমন ডাক্তার বিজ্ঞানী যন্ত্রী ইত্যাদি—তাদের পক্ষে ধুতির চাইতে পাজামা বা ইজার সুবিধাজনক।

সম্প্রতি মোটা কাপড়ের প্যাণ্ট বা ট্রাউজারের খুব চলন হয়েছে। শুনতে পাই, স্মার্টনেসের লক্ষণ হচ্ছে ঘোর রঙের প্যাণ্টের উপর সাদা বা ফিকা রঙের শার্ট। শার্ট পুরো হাতা হওয়া চাই, কিন্তু কনুই পর্যন্ত আস্তিন গোটানো থাকবে। গরিব গৃহস্থকেও ছেলের শখ মেটাবার জন্য দামী কাপড়ের প্যাণ্ট-শার্ট যোগাতে হয়।

অনেককে বলতে শুনেছি—ড্রিল কর্ডুরয় প্রভৃতি মোটা রঙিন কাপড়ের প্যাণ্ট মোটের উপর ধুতির চাইতে সস্তা। কারণ, ময়লা হলে সহজে ধরা যায় না; কাচতে হয় না, বার বার ধোবার বাড়ি দিতে হয় না, সহজে ছেঁড়ে না, বহু কাল পরা চলে। এই যুক্তিতে ফাঁকি আছে। ধুতি যদি সাদা না হয়ে বাদামী খাকী বা ছাই রঙের হত, এবং রোজ কাচা না হত তবে তাও দীর্ঘস্থায়ী হত। দোষ আমাদের প্রথার বা ফ্যাশনের, ধুতির নয়। ধুতি সাদা হওয়া চাই, রোজ কেচে শুদ্ধ করা চাই, কিন্তু মোটা রঙিন প্যাণ্ট কাচা হয় না, যত দিন তার মলিনতা চোখে দেখা না যায় তত দিন তার বাহ্যাভ্যন্তর শুচি।

পরিধেয় বস্ত্রে দু রকম ময়লা লাগে—দেহের ক্লেদ (ঘাম, তেল ইত্যাদি), এবং বাহিরের বিশেষত বাতাসের ধুলো আর ধোঁয়া। শুকনো কাপড়ের চাইতে ভিজে কাপড়ে বাতাসের ময়লা বেশী লাগে। কাচা কাপড় যখন ভিজে অবস্থায় শুখোতে দেওয়া হয় তখন বাতাসের ধুলো আর ধোঁয়া তাতে আটকে যায়। এই কারণে প্রতিবার কাচার পর কাপড়ের মলিনতা বাড়ে, গাত্রজ মল দূর হলেও বায়ুস্থিত মল ক্রমশ জমা হতে থাকে। শহরের বাইরে কাপড় শীঘ্র ময়লা হয় না, কারণ সেখানে ধুলো-ধোঁয়া কম। আমাদের চিরাগত প্রথা—ধুতি শাড়ি প্রত্যহ কেচে শুদ্ধ করে নিতে হবে। বার বার কাচার ফলে কাপড় জীর্ণ হয়, ধুলো-ধোঁয়ায় ময়লা হয়—এই অসুবিধা আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু মোটা প্যাণ্টের বেলায় আমাদের ধারণা অন্য রকম। দেহের ময়লা প্যাণ্টেও লাগে, প্রতিবার

প্রস্রাবের পর তাও দু-চার ফোঁটা লাগে, কিন্তু এ সব গ্রাহ্য করা হয় না।

অতএব দেহজ মল আর বায়ুজ মল দুয়ের মধ্যে একটাকে আমাদের মেনে নিতে হবে কিংবা রফা করতে হবে। মোটা প্যাণ্ট নিত্য কাচা অসম্ভব, কিন্তু পাতলা পাজামা বা ইজার যদি মাঝে মাঝে কাচা হয় তবে কতকটা ধুতির তুল্য শুদ্ধ হতে পারে। মোটা প্যাণ্ট পরা ফ্যাশন-সম্মত হলেও যুক্তিসংগত নয়, অন্তত গরমের সময় নয়। সব দিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের নিত্য পরিধানের জন্য পাতলা কাপড়ের পাজামা বা ইজার বা আট-হাতী ধুতি প্রশস্ত।

ধুতি আর পাজামার যে গুণ, পঞ্জাবিরও তা আছে, গায়ে লেপটে থাকে না, হাওয়া লাগতে দেয়। ভিতরে গেঞ্জি বা ফতুয়া পরলে পঞ্জাবি নিত্য কাচতে হয় না, ভিতরের জামা কাচলেই চলে। পঞ্জাবির ঝুল নিতম্ব পর্যন্ত হওয়াই ভাল, বেশী হলে অনর্থক বায়ুরোধ আর তাপ বৃদ্ধি করে। পাতলা কাপড়ের কোট (বা কোট তুল্য পঞ্জাবি) আরও ভাল, কারণ সহজেই পরা আর খোলা যায়, বেশী ঢিলা করবার দরকার হয় না।

ব্রিটিশ রাজত্বে আমাদের দরবারী পোশাক ছিল ইজার চাপকান চোগা আর শামলা বা পাগড়ি, সাহেব আর ইঙ্গ-বঙ্গের পক্ষে ড্রেস স্যুট। বর্তমান ভারত সরকার কর্তৃক বিহিত দরবারী পোশাক সাদা চুড়িদার পাজামা আর আচকান। দুটোই আপত্তিজনক। চুড়িদার পাজামা পায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে, পরতে আর খুলতে মেহনত হয়। আজানুলম্বিত আচকান পরলে অনর্থক কাপড়ের বোঝা বইতে হয়। ঠাণ্ডায় অসুবিধা না হতে পারে, কিন্তু গরমের সময় বায়ুরোধ করে। শ্রীরাজগোপালচারীর মতন ধুতি পঞ্জাবি অথবা বিভিন্ন প্রদেশে যে ভব্য পরিচ্ছদ প্রচলিত আছে তাই দরবারী পোশাক গণ্য হবে না কেন?

কনভোকেশনের সময় গ্রাজুয়েটদের যে পোশাক পরতে বাধ্য

করা হয়—কালো বা রঙিন কাপড়ের জোব্বা আর মাথায় থোপনা দেওয়া স্লেট—তা সার্বজাতিক হতে পারে, কিন্তু যেমন বিশ্রী তেমনি জবড়জঙ্গ। কয়েক বৎসর আগে শান্তিনিকেতনে উৎসবাদি উপলক্ষ্যে অধ্যাপকদের বিহিত পরিচ্ছদ ছিল ধুতি-পঞ্জাবির উপর বাসন্তী রঙের উত্তরীয়। এখনও সেই প্রথা আছে কিনা জানি না। সেই রকম সুলভ শোভন পরিচ্ছদ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তন করতে পারেন।

সাধারণত বাঙালী মাথা ঢাকে না। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে কলকাতার একটি বিলাতী কোম্পানি বাঙালীর জন্য বিশেষ এক রকম টুপি চালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একটাও বেচতে পারে নি। মহাত্মা গান্ধী যেসব বস্তু উদ্‌ভাবন করেছেন তার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বস্তু গান্ধীটুপি। সস্তা, হালকা, সহজে কাচা যায়, ঠাণ্ডা আর রোদ থেকে কতকটা মাথা বাঁচায়, টাক ঢাকে। গৈরিকধারীকে দেখলে যেমন মনে হয় লোকটি সাধু ধর্মাত্মা তেমনি গান্ধীটুপিধারীকে মনে হয় কংগ্রেস কর্মী বা দেশসেবক। যেসব রাজনীতিক সভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক একত্র হয় সেখানে বাঙালী গান্ধীটুপির প্রভাবে সহজেই দলে মিশে যেতে পারে, তাকে হংস মধ্যে বক মনে হয় না। কিন্তু যেখানে রোদ থেকে মাথা বাঁচানোই উদ্দেশ্য সেখানে হ্যাটই শ্রেষ্ঠ শিরস্ত্রাণ। বহুকাল পূর্বে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রবাসী'তে লিখেছিলেন, রোদের সময় ধুতির সঙ্গে হ্যাট পরা যেতে পারে। পুলিসের শিরস্ত্রাণ যদি লাল পাগড়ির বদলে সোলা-হ্যাট করা হয় তবে ওজন কমবে,, দামও বাড়বে না, মাথা গরম হবে না, অন্তত বাঙালী কনস্টেবলরা খুশী হবে। এ দেশের সোলা-হ্যাট-শিল্প লোপ পেতে বসেছে, কারণ বিলাতে এখন তার আদর নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি পুলিসের জন্য সোলা-হ্যাটের প্রবর্তন করেন তবে অনেকের উপকার হবে।

কালিদাস নারীর অশিক্ষিতপটুত্বের উল্লেখ করেছেন। তার

উৎকৃষ্ট নিদর্শন বঙ্গনারীর পরিচ্ছদ। বাঙালী পুরুষ অনুকরণে পটু, এককালে মোগলাই সাজের নকল করেছিল, তার পর ইওরোপীয় পোশাকও নিয়েছে। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে তার স্বাতন্ত্র্য হারায় নি। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর যুগে সে কাছা দিয়ে শাড়ি পরত, কবি হেমচন্দ্রের আমলে 'লাজে অবনতমুখী তনুখানি আবরি' জুজুবুড়ী সেজে থাকত। কিন্তু আধুনিকা নারীরা সুপর্ণা বিহঙ্গীর ন্যায় শোভনচ্ছদা হয়েছে, চিরন্তন পরিচ্ছদ রেখেও স্বাস্থ্যের অনুকূল সুরুচিসম্মত সুদৃশ্য সজ্জা গ্রহণ করেছে। দেশে বিদেশে শাড়ি অজস্র প্রশংসা পেয়েছে। যেমন ভারতললনা আঠারো হাতী শাড়ি কাছা দিয়ে পরে এবং যারা সালোআর-কমীজ-দোপাট্টায় অভ্যস্ত তারাও ক্রমশ বাঙালীর অনুসরণ করছে।

কিন্তু একটি কথা ভাববার আছে। শাড়ি-ব্লাউজ ঘরে বাইরে সুশোভন পরিচ্ছদ, কিন্তু আজকাল অনেক মেয়ে শিক্ষা বা জীবিকার জন্য যে ধরনের কাজ করে তার পক্ষে শাড়ি সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত নাও হতে পারে। যান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক আর চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে শাড়ির আঁচল একটা বাঁধা, বিপদের কারণও হতে পারে। সুবিধে আর নিরাপত্তার জন্য বোধ হয় ক্ষেত্র বিশেষে শাড়ির বদলে স্কার্ট বা স্ল্যাক্স জাতীয় পরিধেয়ই বেশী উপযুক্ত।

১৮৭৮

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*আজ যাঁকে আমা স্মরণ করছি, সাধারণে তাঁকে জানে—তিনি চিত্রকলায় নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন, নূতন ধরনের রূপকথা আর রূপনাট্য লিখেছেন। কেউ কেউ আরও জানে—তিনি গাছের আঁকাবাঁকা ডাল কেটে কাটুম কুটুম নাম দিয়ে অদ্ভুত মূর্তি গড়তেন এবং চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রধানত নূতন চিত্রকলা আর নূতন সাহিত্যের স্রষ্টা, সুতরাং আজকের এই সভায় কোনও বিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ বা সাহিত্যিককে সভাপতি করাই উচিত ছিল। চিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই, সাহিত্যের জ্ঞানও নগণ্য। সভার আহ্বায়করা হয়তো স্থবির বলেই আমাকে ধরে এনেছেন। অতএব একজন সাধারণ অতিবৃদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্বল করেই কিছু বলছি।

আমার ছেলেবেলায় অর্থাৎ প্রায় ষাট বৎসর আগে যখন অবনীন্দ্রনাথ খ্যাত হন নি তখন শিক্ষিত লোকদের বলতে শুনেছি—এদেশের আর্ট অতি কাঁচা, ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তিতে বিস্তর গলদ। আমাদের উচিত ইটালি থেকে ভাল sculptor আনিয়ে শিব দুর্গা রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্তি গড়ানো এবং তার আদর্শে এদেশের মূতিকার আর চিত্রকারদের শিক্ষিত করা। সে সময়ে বউবাজারের আর্ট স্টুডিওর ছবি ঘরে ঘরে দেখা যেত, কিছুকাল পরে রবি বর্মার ছবি আরও জনপ্রিয় হল। সাধারণে মনে করত, যে ছবি বা বিগ্রহ ফটোগ্রাফের মতন যথাযথ বা ইওরোপীয় পদ্ধতির অনুযায়ী তাই উৎকৃষ্ট। সেই প্রচলিত ধারণা অগ্রাহ্য করে অবনীন্দ্রনাথ চিত্ররচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এদেশের প্রাচীন

* রবীন্দ্রভারতী-ভবনে জন্মোৎসব সভায় পঠিত। ১৩ই ভাদ্র ১৩৬৩।

কলাশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, ভারত পারস্য চীন জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের চিরাগত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন, এবং নিজের উদ্‌ভাবিত নূতন পদ্ধতিতে আঁকতে লাগলেন। অসাধারণ কিছু করতে গেলেই গঞ্জনা সইতে হয়। অবনীন্দ্রনাথও নিন্দিত হলেন, তার আগে রবীন্দ্রনাথ যেমন হয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে কয়েকজন প্রভাবশালী গুণজ্ঞ ছিলেন, যেমন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের চেষ্টায় অবনীন্দ্র-চিত্রাবলী ক্রমশ বহুপ্রচারিত হল। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেবের গ্রন্থ পড়েও শিক্ষিত সমাজ নবদৃষ্টি লাভ করলেন।

এখন আমাদের শিক্ষিত জন বুঝেছেন যে আর্টের সীমা সংকীর্ণ নয়, চিত্র আর বিগ্রহ বাস্তবের অনুযায়ী না হলেও সার্থক হতে পারে। মানুষ শুধু প্রকৃতিসৃষ্ট বাস্তব রূপে তৃপ্ত হয় না, নিজেও রূপ সৃষ্টি করতে চায়, গুণী, শিল্পী প্রাকৃতিক রীতি লঙ্ঘন করেও নব নব মনোজ্ঞ রূপ উদ্‌ভাবন করতে পারেন। দেবমূর্তির অনেক হাত অনেক মাথা, কান পর্যন্ত টানা চোখ, ঝোলা কান, লতানে আঙুল প্রভৃতি অসভ্যতার লক্ষণ নাও হতে পারে। অশোকস্তম্ভের সিংহ, দক্ষিণ-ভারতের গজবিড়াল মূর্তি প্রভৃতি অস্বাভাবিক হলেও সার্থক সৃষ্টি; যেমন মিসর দেশের স্ফিংক্‌স আর বিলাতের ইউনিকর্ণ কল্পিত প্রাণী হলেও চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উদার বুদ্ধি এখন আমাদের হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যভাগ্য অসাধারণ। নন্দলাল প্রমুখ প্রতিভাবান শিল্পিবৃন্দের চেষ্টার ফলে ভারতীয় নবচিত্রকলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করেছে। যেমন পাশ্চাত্ত্য দেশের তেমনি এদেশের শিল্পীরাও নব নব পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করছেন। অবনীন্দ্রনাথ যে মার্গের সূচনা করেছিলেন তা ক্রমশ বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করছে।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা সম্বন্ধে কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। যেমন তাঁর চিত্রপদ্ধতি তেমনি তাঁর রূপকথা আর

রূপনাট্য বা যাত্রা-পালার রচনা-পদ্ধতি একবারে নূতন। সম্প্রতি বিখ্যাত লেখক Gerald Bullet-এর একটি প্রবন্ধ পড়েছি—Facts and Fairy-Tales। তাতে তিনি বাইবেল-পাঠক সম্বন্ধে লিখেছেন —He need not believe that the stories really happened : He is free to regard them as allegories, fables or fairy-tales, items in a sublime mythology, ...just as very young children accept and enjoy fairy-tales without either believing or disbelieving them to be fact। বাইবেল-পাঠক আর very young children সম্বন্ধে বুলেট যা বলেছেন, ছোট বড় নির্বিশেষে রূপকথার সকল পাঠক সম্বন্ধেই তা খাটে। ছেলেমানুষ না হলেও রূপকথা উপভোগ করা যায়। সত্যাসত্য বিচারের দরকার হয় না, আমাদের স্বভাব-নিহিত কোনও গূঢ় কারণে সুরচিত রূপকথা তথা পুরাণকথা শুনে আমরা মুগ্ধ হই। এই মোহিনী শক্তির প্রধান সহায় বিশেষ প্রকার বর্ণনাভঙ্গী। আমাদের দেশের গল্প বলার গ্রাম্য পদ্ধতিতে সেই ভঙ্গী পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রূপকথার জন্য নূতনতর বর্ণনাভঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল'; 'বুড়ো আঙলা', মাসী-পিসীর গল্প, স্টীমার ভ্রমণ কথা, যাত্রার পালা প্রভৃতি অসামান্য মনোহারিতা পেয়েছে। তাঁর মৌখিক আলাপেও এই মনোহারিতার পরিচয় পাওয়া যেত। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্তা রানী চন্দ সেই আলাপ লিপিবদ্ধ করে স্থায়ী করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলার জন্য যেমন অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন, তেমনি তাঁর সাহিত্যরচনায় নিজের চারিত্রিক স্পর্শ এমন করে রেখে গেছেন যে পড়লেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করা যায়।

১৮৭৮

গল্পের বাজার

অন্য জন্তুর সঙ্গে মানুষের অনেক তফাত আছে। আমরা খাড়া হয়ে হাঁটি, আঙুল দিয়ে কলম ধরি, দাড়ি কামাই, নেশা করি। নেশা মানে শুধু মদ গাঁজা আফিম নয়, পান তামাক চা-ও নয়, জীবনধারণের জন্যে যা অনাবশ্যক অথচ অভ্যাস করলে যাতে সহজেই প্রবল আসক্তি আসে, তারই নাম নেশা। ব্যসন শব্দেরও এই অর্থ। মৃগয়া দ্যূত দিবানিদ্রা পরনিন্দা নৃত্য গীত ক্রীড়া বৃথা-ভ্রমণ বেশ্যা মদ, এই দশটি শাস্ত্রোক্ত কামজ ব্যসন। সদর্থেও ব্যসন শব্দের প্রয়োগ আছে। মহাত্মাদের একটি লক্ষণ বলা হয়েছে—ব্যসনং শ্রুতৌ, অর্থাৎ বেদবিদ্যায় আসক্তি। শখ আসক্তি ব্যসন আর নেশা, নির্দোষ বা সদোষ যাই হক, মোটামুটি একই শ্রেণীতে পড়ে।

আগের তুলনায় এখন আমাদের নেশার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সেকালের তর্জা, কবিগান, মেড়ার লড়াই, বাচখেলা, বাইনাচ ইত্যাদির চাইতে এখনকার রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার, জলসা, ফুটবল-ক্রিকেট ম্যাচ ইত্যাদির বৈচিত্র্য আর আকর্ষণ বেশী। এ সবের চাইতেও ব্যাপক নেশার জিনিস গল্পের বই। আজকাল সাহিত্য বললে অধিকাংশ লোক কথাসাহিত্যই বোঝে। অনেক লোক আছে যারা কোনও রকম নেশা না করে অর্থাৎ পান তামাক সিগারেট চা পর্যন্ত না খেয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করে। তেমনি এমন লোকও আছে যাদের গল্প পড়বার আগ্রহ কিছুমাত্র নেই। তবু বলা যেতে পারে, শিক্ষিত আর অল্পশিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতা অসংখ্য লোকে গল্পের বই পড়ে এবং অনেকের পক্ষে তা প্রবল আসক্তি বা নেশার বস্তু

বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের উপদেশ দিয়েছেন—টাকার জন্য লিখিবে না। কিন্তু ছাপাখানার মালিককে তিনি বলেন নি—টাকার জন্য ছাপিবে না। তাঁর আমলে লেখক আর পাঠক দুইই কম ছিল, সুতরাং লেখককে নিঃস্বার্থ জনশিক্ষক মনে করা চলত। কিন্তু একালে চা আর সিগারেটের মতন গল্পের বই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, পাঠকরাও দাম দিতে প্রস্তুত, সুতরাং মুদ্রাকর দপ্তরী আর প্রকাশকের দাবি মেনে নিয়ে শুধু লেখককে বঞ্চিত করার কারণ নেই। জনসাধারণের গল্পপ্রীতি বেড়ে যাওয়ার ফলে বাঙালী একটি সম্মানিত নূতন জীবিকার সন্ধান পেয়েছে। গল্পকার শুধু লেখক নন, কবি আর চিত্রকরের তুল্য কলাবিৎ, ইন্দ্রজালিকের সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য আছে। কাল্পনিক ঘটনার বিবৃতির দ্বারা তিনি পাঠককে সম্মোহিত ও রসাবিষ্ট করেন। গল্পগ্রন্থের আদর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের চাইতে ঢের বেশী, টেক্স্‌ট্‌বুকের নীচেই তার কাটতি।

ষাট-সত্তর বৎসর আগে যখন বাঙলা গল্পের খুব অভাব ছিল, তখন লোকে অবসরকালে কি পড়ত, তাদের রুচি কিরকম ছিল, এই সব খবর আধুনিক লেখক আর পাঠকদের অনেকেই জানেন না। বাঙলা বা ইংরেজী গল্পগ্রন্থের জ্ঞান আমার অতি অল্প, সেকালের সাহিত্যসেবীদের সঙ্গেও আমার যোগ ছিল না। তথাপি তখনকার পাঠকদের অবস্থা সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানা আছে তা বলছি।

তখন গল্পখোর বাঙালীর প্রধান সম্বল ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এগারোটি উপন্যাস, রমেশচন্দ্রের ছটি, তারকনাথের স্বর্ণলতা, স্বর্ণকুমারী দেবীর কয়েকটি গল্প, রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি আর বউঠাকুরানীর হাট, এবং আরব্য উপন্যাস। আরও কতকগুলি ভাল মাঝারি মন্দ গল্পের বই প্রচলিত ছিল, কিন্তু তার অধিকাংশই এখন লোপ পেয়েছে, নাম পর্যন্ত লোকে ভুলে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন সবে ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু অল্প পাঠকই তার খবর রাখত। শরৎচন্দ্র আর প্রভাতকুমার তখনও কলম ধরেন নি। সেই গল্পাল্পতার যুগে

পাঠকের স্পৃহা কি করে মিটত? তখন কৃত্তিবাস কাশীরাম আর ভারতচন্দ্রের রচনা লোকে সাগ্রহে পড়ত, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র আর রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক খুব জনপ্রিয় ছিল, মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এবং অনেক নিকৃষ্ট কবির রচনাও লোকে পড়ত, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য বহুপ্রচারিত হয় নি, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা একটু দুরূহ ছিল। এখনকার মতন তখনও অধিকাংশ পাঠক কবিতার চাইতে গল্পেরই বেশী ভক্ত ছিল, কিন্তু যথেষ্ট গল্পের বই না থাকায় কবিতার পাঠক এখনকার তুলনায় সেকালে বেশী ছিল।

তখন শুধু বাঙলা বই পড়ে পাঠকের বুভুক্ষা মিটত না, প্রচুর ইংরেজী গল্পও লোকে পড়ত। আশ্চর্য এই, সেকালে সদ্য এনট্রান্স পাস করা ছাত্র এবং অনেকে যারা পাস করে নি তারাও ইংরেজী নভেল পড়ত, অথচ শুনতে পাই এখনকার অধিকাংশ গ্রাজুয়েট ইংরেজী নভেল বুঝতে পারে না। নব্য বাঙালীর শক্তি বা রুচির এই পরিবর্তন উন্নতি কি অবনতির লক্ষণ তা শিক্ষা-বিশারদগণ বলতে পারেন।

আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশে কোনও শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব হলে এদেশে অবিলম্বে তার খবর আসে। সেকালে এমন হত না। অল্প কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত লোক নূতন বইএর সন্ধান রাখতেন কিন্তু আর সকলের পাঠ্য ছিল প্রাচীন লেখকের রচনা। তখন কলেজ স্ট্রীটের বইএর দোকানে ক্লাসিক ভিন্ন অন্য ইংরেজী নভেল পাওয়া যেত না, পাঠকরা হগ মার্কেট, রেলওয়ে বুকস্টল প্রভৃতি থেকে তাঁদের প্রিয় গল্পের বই যোগাড় করতেন। শিক্ষকরা মনে করতেন ছাত্রদের পক্ষে অবাধ নভেল পাঠ ভাল নয়, তাঁরা বলতেন, রবিনসন ক্রুসো, গলিভাস ট্রাভ্‌লস, রাসেলাস, ভিকার অভ ওয়েকফিল্ড পড়তে পার, স্কটের বইও দু-চারখানা পড়তে পার, কিন্তু তার বেশী নয়। তখন কোনান ডয়েল সবে লিখতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু তার খবর অল্প বাঙালীই জানত।

সেকালে নভেলখোর বাঙালীর প্রধান পাঠ্য ছিল স্কট, ডিকেন্স,

লিটন, থ্যাকারে, ভিকটর হিউগো, রাইডার হ্যাগার্ড, মারি করেলি, ডুমা ইত্যাদি। হার্ডি, গল্‌সওয়ার্দি আর টলস্টয়ের নাম সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত ছিল। রাশি রাশি অতি সস্তা মার্কিন ডিটেকটিভ আর ওআইল্ড ওয়েস্টের গল্প আমদানি হত, কিন্তু অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে তার স্ল্যাং-বহুল ভাষা একটু দুর্বোধ ছিল। লোকে সব চেয়ে বেশী পড়ত রেনল্ড্‌সের রোমাঞ্চকর গল্পাবলী, ডিক্‌স এডিশন, ছ আনায় একখানা বেশ বড় বই, বিস্তর ছবি। অতি ছোট হরপে ছাপা, কিন্তু যারা পড়ত তাদের চোখের তেজ ছিল, মিটমিটে প্রদীপ বা হারিকেনের আলোয় অনায়াসে পড়া চলত। আমার এক মাস্টার মশাই গোগ্রাসে রেনল্ড্‌স গিলতেন। আমাকে বলেছিলেন, খবরদার, ত্রিশ বছর বয়সের আগে রেনল্ড্‌স ছোঁবে না। কিন্তু আমার দাদা বললেন, শুনিস না মাস্টারের কথা, রেনল্ড্‌সের রবার্ট ম্যাকেয়ার পড়ে দেখিস, চমৎকার ডাকাতের গল্প; তার পর রাইহাউস প্লট, নেক্রোমান্সার, ব্রঞ্জ স্ট্যাচু এই সব পড়বি। আমি দাদার উপদেশই পালন করেছিলাম। অল্প বয়সেই একগাদা রেনল্ড্‌স পড়া হয়ে গেল, অরুচিও ধরল।

ডিক্‌স এডিশনের মতন সস্তা বই এখন স্বপ্নের অগোচর। শেকস্পীয়র, মিলটন, শেলী, বাইরন প্রভৃতির সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর দাম ছিল বারো আনা। ডিকেন্স স্কট লিটন ইত্যাদির উপন্যাস ছ আনা মাত্র। অতি গরিব পাঠকও অল্প খরচে অনেক বই সংগ্রহ করতে পারত।

এককালে যাঁর বইএ এ দেশের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল সেই রেনল্ড্‌সের কোনও চিহ্নই এখন পাওয়া যায় না। বিলাতেও তাঁর বই প্রথম প্রথম খুব চলত। দু-একটি বইএ তিনি ব্রিটিশ রাজবংশের কুৎসা করেছিলেন সেজন্য কালক্রমে তাঁর জনপ্রিয়তা লোপ পায়। তাঁর গ্রন্থাবলীর কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আমার মনে আছে। দেদার রহস্য আর রোমাঞ্চ, কিছু ব্যভিচার, কিছু চুরি ডাকাতি নরহত্যা, এবং লর্ড-লেডিদের বিলাসময় জীবনযাত্রা।

নায়ক-নায়িকারা রূপে গুণে অতুলনীয়, বিস্তর বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে বহু কষ্টভোগের পর তাদের মিলন হয়। অনেক বইএর শেষে থাকত—And they were happy, oh, supremely happy। অথবা—At last they were united in holy wedlock and lived happily ever after.

Yellow back নামে খ্যাত জনপ্রিয় ইংরেজী নভেলসমূহ এবং যেসব বাঙলা বইএর কাটতি সব চেয়ে বেশী তাদের রচনা-পদ্ধতি অনেকটা রেনল্ড্সের মতন। রূপকথা আর অধিকাংশ ডিটেকটিভ গল্পের পদ্ধতিও এই রকম। আমার মনে হয় সব রকম গল্পই মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর গল্প রূপকথা জাতীয়, প্লটে যতই জটিলতা আর রোমহর্ষণ থাকুক, পরিশেষে পূর্ণ শান্তি, নায়ক-নায়িকার শারীরিক মানসিক আর্থিক সর্বাঙ্গীণ কুশল। পড়া শেষ হলে পাঠক হয়তো মনে মনে কিছুক্ষণ রোমন্থন করেন, কিন্তু তার পরে নিশ্চিন্ত হন, কারণ নায়ক-নায়িকার ভবিষ্যৎ একবারে নিষ্কণ্টক, দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের নায়ক-নায়িকা অল্পাধিক আঘাত পায়, তার ক্ষত সম্পূর্ণভাবে সারে না। লেখক মিলনান্ত করে গল্প সমাপ্ত করলেও কিছু কণ্টক রেখে দেন, তার ফলে পাঠকের মনে গল্পের জের চলতে থাকে। এই শ্রেণীর সকণ্টক গল্পকেই বোধ হয় মনস্তত্ত্বমূলক বলা হয়।

মহাভারতের অন্তর্গত সাবিত্রী-সত্যবান আর নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান প্রথম শ্রেণীর নিষ্কণ্টক গল্প। কিন্তু মহাভারতের মূল আখ্যান সকণ্টক দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। যুদ্ধজয়ের পর যুধিষ্ঠির ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। গ্রন্থ সমাপ্তির পরেও আমাদের ভাবনা হয়—যুধিষ্ঠিরের মন হয়তো শেষ পর্যন্ত অশান্ত ছিল, তবে ভীম বোধ হয় বেশ ফুর্তিতেই ছিলেন। দ্রৌপদী তাঁর পিতা ভ্রাতা আর পঞ্চ পুত্রের শোক নিশ্চয় ভুলতে পারেন নি, গান্ধারী আর তাঁর বিধবা পুত্রবধূদের সঙ্গে রাজপুরীতে বাসও বোধ হয়

তাঁর পক্ষে সুখকর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারানী আর যুগলাঙ্গুরীয় নিষ্কণ্টক গল্প, কিন্তু বিষবৃক্ষ সকণ্টক। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলন হলেও তাঁদের সম্পর্ক আগের মতন হবার নয়। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবিকে নিষ্কণ্টক গল্প বলা যেতে পারে, কারণ পাত্র-পাত্রীদের সমস্ত দুঃখ শেষকালে মিটে গেছে। কিন্তু তবু সন্দেহ থেকে যায়, জীবনের অত বড় বিপর্যয়ের পর কমলা তার অজ্ঞাত স্বামীকে আবিষ্কার করে কি পূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছিল? শেষের কবিতা নিশ্চয় সকণ্টক গল্প। কেটিকে বিবাহ করে অমিত রায় কর্তব্য-পালন করেছে, সেই সঙ্গে আত্মবিসর্জনও দিয়েছে। লাবণ্যর কাছে সে যেরকম উচ্ছ্বাসময় বক্তৃতা দিত, কেটির কাছে তার কোনও কদর হবে মনে হয় না। অগত্যা সে হয়তো পলিটিক্স নিয়ে মেতে উঠে একজন দেশনেতা হয়ে যাবে। শরৎচন্দ্রের দত্তা নিষ্কণ্টক গল্প, কিন্তু বামুনের মেয়েতে কণ্টক আছে। প্রিয়নাথ ডাক্তার হয়তো সামলে উঠে আবার রোগী দেখা শুরু করবেন, কিন্তু তাঁর গর্বিতা কন্যার মনস্তাপ সহজে দূর হবে না।

এ দেশের এবং বোধ হয় সকল দেশেরই বেশীর ভাগ পাঠক প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ নিষ্কণ্টক গল্প চায় যার শেষে নায়ক-নায়িকা সুখে ঘরকন্না করে and live happily ever after। মামুলী ডিটেকটিভ কাহিনী এবং রোমাঞ্চ সিরিজের রূপসী বোম্বেটে জাতীয় গল্পও এই শ্রেণীতে পড়ে। ছোট ছেলেমেয়ের জন্য যেমন রূপকথা তেমনি অসংখ্য সাধারণ পাঠকের জন্য এমন গল্প দরকার যাতে প্রচুর আতঙ্ক আর উত্তেজনা আছে, প্রেমের লড়াইও আছে, কিন্তু যার পরিণাম নিষ্কণ্টক। যে পাঠকরা অপেক্ষাকৃত বিদগ্ধ এবং মানব-চিত্তের রহস্য সম্বন্ধে কুতূহলী, অর্থাৎ যাঁরা সমস্যাময় বাস্তব জীবনের চিত্র চান, তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সকণ্টক গল্পই বেশী উপভোগ করেন।

১৮৭৯

সাহিত্যের পরিধি

রাম আর শ্যাম ঘোড়া নিয়ে তর্ক করছে। রাম সজোরে বলছে, ঘোড়ার মাপ অন্তত তিন হাত। ততোধিক জোরে শ্যাম বলছে, ঘোড়া দেড় ইঞ্চির বেশী হতেই পারে না। এরা কেউ দু রকম অর্থ স্বীকার করে না। ঘোড়া বললে রাম বোঝে যে যে ঘোড়া ঘাস খায়, আর শ্যাম বোঝে যা টিপলে বন্দুকের আওয়াজ হয়।

এই তর্কের হেতু—পৃথক বস্তু বোঝাবার জন্য একই শব্দের প্রয়োগ। এ রকম তর্ক বড় একটা শোনা যায় না, কিন্তু অর্থের ব্যাপ্তি সমান নয়। যেমন, যদু বলছে, ছানা আর চিনি একত্র পাক করলে যা হয় তারই নাম সন্দেশ। মধু বলছে, নাগ-মশাই দে-মশাই সেন-মশাই আর গঙ্গু-মশাই যা তৈরি করেন তাই হল সন্দেশ, আর সব সন্দেশই নয়। যারা আসল আর ভুয়ো গণতন্ত্র, সচ্চা আর ঝুটা আজাদি, খাঁটী আর ভেজাল হিন্দুধর্ম, ইত্যাদি নিয়ে বিতণ্ডা করে তারাও এই দলে পড়ে।

সাহিত্য সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে তর্ক শোনা যায় তা অনেকটা যদু-মধুর তর্কের তুল্য। তর্ককারীরা নিজের নিজের পছন্দসই গণ্ডির মধ্যে সাহিত্য শব্দের অর্থ আবদ্ধ রাখতে চান। কেউ বলেন, সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। কেউ বলেন শুধু রসে চলবে না, উচ্চ আদর্শ চাই। সংস্কৃতে কাব্য আর সাহিত্য প্রায় সমার্থক। কিন্তু আধুনিক প্রয়োগে সাহিত্যের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। Concise Oxford Dictionaryতে literatureএর বিবৃতি আছে—writings whose value lies in beauty of form or emotional effect ; the books treating of a subject ;

(colloq.) printed matter। বাঙলায় সাহিত্য শব্দ আজকাল যেসব অর্থে চলে তা এই ইংরেজী বিবৃতির অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরঙ্গ জনকে অনেক চিঠি লিখেছেন। মথুর কুণ্ডুও পাটের দর জানাবার জন্য শিবু শাকে চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তাই প্রকৃত চিঠি, আর মথুর কুণ্ডু যা লিখেছেন তা কিছুই নয়—এ কথা বলা চলে না। তুচ্ছ মহৎ ভাল মন্দ যাই হক, কবি প্রেমিক উকিল বা পাওনাদার যিনিই লিখুন, সমস্ত চিঠির সামান্য লক্ষণ—একজন অপর জনকে কিছু জানাবার জন্য যা লেখে। সাহিত্যেরও সামান্য লক্ষণ বলা যেতে পারে—একজন (বা এক দল) বহু জনকে কিছু জানাবার জন্য যা লেখে। সাহিত্য অতি তুচ্ছ হতে পারে, পাগলের প্রলাপ, বিপক্ষকে গালাগালি, বিজ্ঞাপন, টেক্স্ট্‌বুক, সংবাদপত্র, কবিতা, গল্প, জ্ঞানগর্ভ রচনা বা তত্ত্বকথা হতে পারে, তার পাঠকসংখ্যা নগণ্য বা অগণ্য হতে পারে। আপনার আমার যা ভাল লাগে কিংবা নামজাদা সমালোচক যাকে রসোত্তীর্ণ বলেন তাই সাহিত্য এবং আর সবই অসাহিত্য, এমন মনে করলে অর্থবিভ্রাট হবে। সাহিত্যের আধুনিক অর্থ অতি ব্যাপক। কাব্যসাহিত্য, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, রবীন্দ্রসাহিত্য তো আছেই, তা ছাড়া দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস জীবনী সমালোচনা বিজ্ঞাপন স্কুলপাঠ্য-সাহিত্য প্রভৃতি, এমন কি অশ্লীল সাহিত্যও শোনা যায়। এই সব প্রয়োগে সাহিত্যের অর্থ, the books treating of a subject, কোনও বিষয় সংক্রান্ত পুস্তকসমূহ।

আজকাল গাড়ি বললে বড়লোকরা বোঝেন মোটরকার। সেই-রকম অনেক শিক্ষিত জন সাহিত্য শব্দে বোঝেন ললিত সাহিত্য, অর্থাৎ সর্বাগ্রে গল্প-উপন্যাস, তার পর কবিতা নাটক লঘুপ্রবন্ধ ও ভ্রমণকথা। Writings whose value lies in beauty of form or emotional effect, যার রচনাপদ্ধতি বা ভাষা মনোহর

অথবা যা ভাবের উদ্রেক করে—এই অর্থই এখন অনেকে সাহিত্যের একমাত্র অর্থ মনে করেন। সাহিত্যদর্পণকারও বলেছেন, রসাত্মক বাক্যই কাব্য (=সাহিত্য)।

আত্মব্যঞ্জনা বা self-expressionএর জন্য মানুষ নানা প্রকার চেষ্টা করে, তারই একটির ফল সাহিত্য। সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ নীচ ভাল মন্দ সবই আছে। কিন্তু সকল পাঠকের রুচি সমান নয়, একই পাঠকেরও রুচির বৈচিত্র্য থাকতে পারে। রাম সন্দেশ ভালবাসে, কিন্তু জলিপি ছোঁয় না। শ্যামও সন্দেশের ভক্ত, কিন্তু সময়ে সময়ে জিলিপিই বেশী পছন্দ করে। অধিকাংশ লোকের মতে সন্দেশই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কি রকম সন্দেশ? ভারত সরকার তেল ঘি ইত্যাদি অনেক জিনিসের standard বেঁধে দিয়েছেন; হয়তো ভবিষ্যতে এক-দুই-তিন নম্বর সন্দেশেরও উপাদানের অনুপাত নির্দেশ করে দেবেন। কিন্তু এক-দুই-তিন নম্বর সাহিত্যের মান বেঁধে দেবার শক্তি সাহিত্য-আকাডেমিরও নেই। বহু লোকের মতে বা পুলিসের দৃষ্টিতে যা অনিষ্টকর তা বর্জিত বা দমিত হবে, কিন্তু বিভিন্ন পাঠকের রুচি বা প্রয়োজন অনুসারেই অন্যান্য সাহিত্য প্রচলিত থাকবে।

অধিকাংশ জনপ্রিয় রচনার উপজীব্য মানুষের আচরণ ও চিত্তবৃত্তি, এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। কিন্তু এমন রচনাও উৎকৃষ্ট ও সমাদৃত হতে পারে যার পাত্র-পাত্রী আর ঘটনাবলী অপ্রাকৃত, যেমন Penguin Island, Animal Farm, রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ ইত্যাদি। ডিটেকটিভ এবং রহস্যমূলক রোমাঞ্চকর গল্পে emotional effect প্রচুর থাকে, তার পাঠকসংখ্যাও সকল দেশে সব চাইতে বেশী, তথাপি এই শ্রেণী রচনা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গণ্য হয় না। দৈবাৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন Conan Doyleএর Sherlock Holmesএর গল্প ক্লাসিক সাহিত্যের সম্মান পেয়েছে। Lewis Carrollএর Alice in Wonderland ছোট ছেলে-

মেয়েদের জন্য লিখিত হলেও সকল পাঠকের সমাদর পেয়ে চিরায়িত হয়েছে। সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' আরও উচ্চ শ্রেণীর রচনা মনে করি। চিত্র আর তক্ষণ কলায় যেমন impressionistic style এবং অবাস্তব সংস্থান দ্বারা রসসৃষ্টি করা হয়, সুকুমার রায় তাঁর ছড়া রচনায় সেইরূপ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পাঠক আর সমালোচকদের মধ্যে রামগরুড়ের ছানার বাহুল্য আছে তাই সুকুমার রায়ের প্রতিভা যথোচিত মর্যাদা পায় নি।

ইংরেজী অভিধানে যে beauty of form or emotional effectএর উল্লেখ আছে, কবি নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের একটি শ্লোকে তারই সমর্থন পাওয়া যায়—

যানেব শব্দান্ বয়মালপামঃ
যানেব চার্থান্ বয়মুল্লিখামঃ।
তৈরেব বিন্যাসবিশেষভব্যৈঃ
সম্মোহয়ন্তীহ কবয়ো জগন্তি॥

—আমরা যেসব শব্দ বলি, যেসব অর্থ প্রয়োগ করি, তাদেরই বিশেষপ্রকার ভব্য বিন্যাস দ্বারা কবিগণ জগৎকে সম্মোহিত করেন।

কিন্তু form বা শব্দবিন্যাসের উপর যদি অতিরিক্ত নির্ভর করা হয়, তবে emotion বা রসের চাইতে ভঙ্গীই বেশী প্রকট হয়। এরূপ রচনার বহু পাঠক হয় না। জেম্‌স জয়েসের অদ্ভুত রচনায় যাঁরা রস পান তাঁদের সংখ্যা অল্প। আমাদের দেশের কয়েকজন আধুনিক কবির রচনা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ, কিন্তু একশ্রেণীর সমানধর্মা পাঠকের সমাদর পেয়েছে। বাঙলা কবিতার যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা এখন দ্বিধা বিভক্ত। একদল প্রাচীনপন্থী কবিদের কৃপার চক্ষে দেখেন, আর একদল অত্যাধুনিক কবিদের অপ্রকৃতিস্থ মনে করেন। কোনও নূতন পদ্ধতির প্রবর্তনকালে প্রায় মতভেদ দেখা যায় কালক্রমে সেই পদ্ধতি বর্জিত বা বহুসমাদৃত হতে পারে অথবা

চিরদিনই বিতর্কের বিষয় হয়ে টিকে থাকতে পারে। শত বৎসর পূর্বে বাঙলা কবিতায় যমক অনুপ্রাস ইত্যাদি শব্দালংকারের বাহুল্য ছিল, এখন আর নেই। এককালে গদ্য কবিতা অনেকের দৃষ্টিতে উপহাসের বিষয় ছিল, এখন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আদিরসাত্মক রচনা নিয়ে বোধ হয় চিরদিনই বিতর্ক চলবে।

ব্যাপক প্রয়োগে সাহিত্যের আধুনিক অর্থ—কোনও বিষয়-সংক্রান্ত পুস্তকসমূহ এবং যা কিছু ছাপা হয় (printed matter)। বিশিষ্ট প্রয়োগে—এমন গ্রন্থ যার রচনাপদ্ধতি বা ভাষা মনোহর, অথবা ভাবের উদ্রেক করে, অর্থাৎ যাতে রস আছে।

আর্ট-এর যেমন বাঙলা প্রতিশব্দ নেই, তেমনি রস-এর ইংরেজী নেই। মোটামুটি বলা যেতে পারে, রচনায় যে গুণ থাকলে পড়তে ভাল লাগে তারই নাম রস। অলংকার-শাস্ত্রে নবরসের উল্লেখ আছে—আদি (বা শৃঙ্গার), হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত। কৌতূহলও একটা রস, বোধ হয় অদ্ভুতের অন্তর্গত। ডিটেকটিভ গল্পে এই রসই প্রধান। আমাদের আলংকারিকরা রস সম্বন্ধে বিস্তর লিখেছেন, করুণ রস পড়ে লোকে কেন সুখ পায় তাও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

একশ্রেণীর সমালোচকরা বলেন, শুধু রসে চলবে না, উচ্চ আদর্শ থাকা চাই। সমাজের যা আদর্শ সাহিত্যেরও কি তাই? হিতোপদেশ, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, Pilgrim's Progress, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্‌ভাবশতক, ইত্যাদি গ্রন্থে উচ্চ আদর্শ আছে। রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে মুকুন্দ দাস যেসব যাত্রার পালা রচনা করেছিলেন তা নীতিবাক্যে পরিপূর্ণ। ক্ষেত্রবিশেষে এই সব রচনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু সাহিত্যে যদি নীতিকথা বা সামাজিক আদর্শ প্রচারের বাহুল্য থাকে তবে তার

রস শুখিয়ে যায়। হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ঘরে বাইরে, দেনা পাওনা, পথের পাঁচালি, ইত্যাদিতে উচ্চ আদর্শ কতটুকু আছে? আমরা নিজের জীবনে রোগ শোক নিষ্ঠুরতা কৃতঘ্নতা প্রতারণা ব্যভিচার ইত্যাদি চাই না, ভয়ানক আর বীভৎস রসও পরিহার করি, কিন্তু সাহিত্যে এ সমস্তই রসসৃষ্টির সহায়। পুণ্যের জয় আর পাপের পরাজয়ও সাহিত্যে অত্যাবশ্যক নয়।

ব্যক্তিগত বা সামাজিক আকাঙ্ক্ষা আর সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষা সমান নয়। মনোবিজ্ঞানীরা এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু কোনও বহুসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি. সাহিত্যের যে রস সুধীজনের কাম্য তা বহু জটিল উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের রসতত্ত্বের জ্ঞান নিতান্ত অস্পষ্ট, art for art's sake, মানব-কল্যাণের নিমিত্তই সাহিত্য, মানুষে মানুষে মিলনের জন্যই সাহিত্য, জীবনের আলেখ্যই সাহিত্য—এই ধরনের উক্তিতে রসতত্ত্বের নিদান পাওয়া যায় না। উত্তম সাহিত্য আমাদের আনন্দ দেয়, কিন্তু কোন্ কোন্ রস কি ভাবে যোজিত হলে উত্তম সাহিত্য উৎপন্ন হয় তা আমরা জানি না। অনেক বৎসর পূর্বে এ সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম তা থেকে কিছু পুনরুক্তি করছি।—

সাহিত্যের অনেক উপাদান নীতিবিরোধী, অনেক উপাদান পরস্পরবিরোধী, কিন্তু কৃতী রচয়িতা কোনও উপাদান বাদ দেন না। নিপুণ পাচক কটু তিক্ত মিষ্ট সুগন্ধ দুর্গন্ধ নানা উপাদান মিশিয়ে সুখাদ্য প্রস্তুত করে। নিপুণ সাহিত্যিকের পদ্ধতিও অনুরূপ। খাদ্যে কতটা ঘি দিলে উপাদেয় হবে, কটা লংকা দিলে মুখ জ্বালা করবে না, কতটা পেঁয়াজ রসুন দিলে উৎকট গন্ধ হবে না,—এবং সাহিত্যে শান্তরস আদিরস বা বীভৎসরস, সুনীতি বা দুর্নীতি, একনিষ্ঠ প্রেম বা ব্যভিচার, কত মাত্রায় থাকলে সুধীজনের উপভোগ্য হবে তার নিরূপণের সূত্র অজ্ঞাত। জন কতক ভোক্তার হয়তো কোনও বিশেষ রসে আসক্তি বা বিরক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাদের বিচারই চূড়ান্ত

গণ্য হয় না। যিনি শুধু একশ্রেণীর ভোক্তার তৃপ্তিবিধান করেন অথবা জনসাধারণের অভ্যস্ত ভোজ্যই পরিবেশন করেন তিনি সামান্য পেশাদার বা hack writer মাত্র। যাঁর রুচি অভিনব এবং যিনি বহু ভোক্তার রুচিকে নিজের রুচির অনুগত করতে পারেন তিনিই উত্তম সাহিত্যস্রষ্টা। যিনি কোনও লেখকের রচনায় এই গুণ উপলব্ধি করে পাঠকগণকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন তিনিই উত্তম সমালোচক।

সকল দেশেই অল্প কয়েকজন বিচক্ষণ বোদ্ধা সাহিত্যের বিচারকরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। এঁদের কেউ নির্বাচন করে না, নিজের প্রতিভাবলেই এঁরা বিচারকের পদ অধিকার করেন এবং পাঠকের রুচির উপর প্রভাব বিস্তার করেন। এঁরা কেবল রচনার রস বা উপভোগ্যতা দেখেন না, সমাজের উপর তার সম্ভাব্য প্রভাবও বিচার করেন। পাঠকের আনন্দ আর সামাজিক স্বাস্থ্য দুইএর প্রতিই তিনি দৃষ্টি রাখেন। তাঁর যাচাইএর পদ্ধতি কি রকম তা তিনি প্রকাশ করতে পারেন না, তাঁর নিজেরও বোধ হয় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নেই। সামাজিক আদর্শ চিরকাল একরকম থাকে না সে কারণে রচনায় অল্পস্বল্প বিচ্যুতি থাকলে তিনি উপেক্ষা করেন, কিন্তু অধিক বিচ্যুতি মার্জনা করেন না। তাঁর সিদ্ধান্তে মাঝে মাঝে ভুল হতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত জন সাধারণত তাঁর অভিমতই প্রামাণিক মনে করেন।

১৮৭৯

বানানের সমতা ও সরলতা

কয়েক বৎসর পূর্বে একজন উত্তরপ্রদেশীয় লেখক আমার কাছে এসেছিলেন। একজন বাঙালী অধ্যাপকও তখন উপস্থিত ছিলেন। দুজনের পরিচয়ের পর অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন, পণ্ডিতজী, আমাদের জাতীয় সংগীত জন-গণ-মন হিন্দীতে অমন উৎকট বানানে লেখা হয় কেন—'দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গা, উচ্ছল-জলধিতরঙ্গা ?' শেষে অনর্থক আ-কার যোগ করেন কেন? পণ্ডিতজী উত্তর দিলেন, বাবুজী, হিন্দী আর বাঙলা জবান এক নয়। আপনাদের অ-কার যেন awe, কিন্তু হিন্দীতে তেমন নয়, up-এর আদ্যক্ষর তুল্য হ্রস্ব। জন-গণ-মন গাইবার সময় সেই হ্রস্ব অ-কার আমরা টেনে দীর্ঘ করি, তার ফলে অ-কারান্ত বঙ্গ আমাদের উচ্চারণে বঙ্গা হয়ে যায়। শেষে আ-কার না দিলে লোকে পড়বে—দ্রাবিড়্, উৎকল্, বঙ্গ্, জলধিতরঙ্গ্। তুলসীদাসজীও তাঁর রামায়ণে ছন্দের প্রয়োজনে অনেক জায়গায় অ স্থানে আ করেছেন, যেমন, 'সুনি প্রভু বচন হরস হনুমানা, শরণাগত বচ্ছল ভগবানা। আপনাদের বানানেও গলদ আছে। অ-কার হচ্ছে হ্রস্ব স্বর, তার আসল উচ্চারণ ভুলে গিয়ে তাকে awful করেছেন কেন? হ্রস্ব অ-কার বোঝাবার জন্য আপনারা দীর্ঘ অ-কার দেন কোন্ হিসাবে? bus, club, পঞ্জাব স্থানে বাস ক্লাব পাঞ্জাব লেখেন কেন?

বাঙলা বানান নিয়ে বহু বিতর্ক হয়ে গেছে, এখন আর সেসব পুরনো কথার আলোচনা করব না। কতকগুলি শব্দের বানানে যে বৈষম্য বা জটিলতা দেখা যায় তার সম্বন্ধে কিছু বলছি।

বাঙলা আসামী ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী গুজরাটী প্রভৃতি আর্যভাষার মধ্যে অনেক মিল আছে। এই মিল যত বজায় রাখা যায় ততই মঙ্গল। বাঙলা বইএর গুণগ্রাহী অবাঙালী পাঠক বিস্তর আছেন। আমরা যদি বাঙলা বানানে অনর্থক বৈষম্য আনি তবে অবাঙালী পাঠকের পক্ষে তা দুর্বোধ হবে, তার ফল বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে লাভজনক হবে না।

সংস্কৃতে অ কণ্ঠ্য বর্ণ, তার মূল উচ্চারণ up-এর আদ্যক্ষর তুল্য। এই হ্রস্ব অ টেনে উচ্চারণ করলেই আ হয়। ই ঈ যেমন মূলত একই ধ্বনি, শুধু প্রথমটি হ্রস্ব আর দ্বিতীয়টি দীর্ঘ, তেমনি অ আ মূলত একই, শুধু প্রথমটি হ্রস্ব, দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। ইংরেজী fur যদি টেনে দীর্ঘ করা হয় তবে far হয়ে যায়। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে কলেক্টর পায়োনিয়র সর (sir) ক্লব ইত্যাদি বানান প্রচলিত ছিল। তখন অ-কারের মৌলিক অর্থাৎ up-এর আদ্যক্ষর তুল্য উচ্চারণ আমাদের অভ্যস্ত ছিল, তার ফলে বাঙলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় বহু শব্দে একই বানান চলত। বাঙালী তখন স্থানভেদে অ-কারের চার রকম উচ্চারণ করত, যেমন কটা, কটু, একটু, টি-কপ। 'কটা' শব্দে অ-কারের উচ্চারণ সংবৃত, অর্থাৎ ইংরেজী awe শব্দের তুল্য। এই উচ্চারণ হিন্দীতে নেই। 'কটু' শব্দের অ-কার ও-কারের তুল্য। এও হিন্দীতে নেই। 'একটু' শব্দে অ-কার গ্রস্ত, অর্থাৎ ক-অক্ষর হসন্ত তুল্য। 'টি-কপ' শব্দে ক-এর উচ্চারণ বিবৃত, অর্থাৎ ইংরেজী cup-এর তুল্য, কিন্তু আধুনিক বাঙালী অ-কারের শেষোক্ত হ্রস্ব উচ্চারণ ভুলে গেছে, তার ফলে অ-কার স্থানে আ-কার চলছে, যেমন, ক্লাব, বাস, সার্কাস, কাটলেট। মাঝে মাঝে নাম্বারও দেখতে পাই, কিন্তু জজ এখনও জাজ হন নি।

হিন্দী মরাঠী গুজরাটীতে অ-কারের শুধু বিবৃত বা হ্রস্ব, এবং গ্রস্ত বা হসন্তবৎ উচ্চারণ আছে। 'কল বন বট'-এর হিন্দী উচ্চারণ cull, bun, but-এর তুল্য। গ্রস্ত অ-কার হিন্দীতে খুব বেশী, আমাদের 'জনতা বিমলা কামনা' হিন্দী উচ্চারণে 'জন্তা, বিম্লা, কাম্না।' কিন্তু হিন্দীতে সংবৃত অর্থাৎ awe-তুল্য অ-কার নেই, তা বোঝাবার জন্য আ-কার লেখা হয়, যেমন royal—রায়ল, talky—টাকি। সেকালে বাঙালীও এই রকম বানান করত, তার কয়েকটি নিদর্শন এখনও রয়ে গেছে, যেমন কালেজ, আগস্ট, লাট (lord বা lot)। ষাট-সত্তর বৎসর আগে law স্থানে 'লা' লেখা হত।

এককালে আমাদের অ-কারের যে শক্তি ছিল তা ফিরিয়ে আনা

উচিত মনে করি। হ্রস্ব অ-কার স্থানে আ-কারের প্রয়োগ খুব বেশী-দিনের নয়। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যাপত্রে আছে—'অপর সরকিউলর রোড।' রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের পুরনো মুদ্রণে 'কটলেট, থর্ড' ইত্যাদি বানান দেখা যায়। আমাদের লেখকরা একটু চেষ্টা করলেই অ-কারের অপপ্রয়োগ বন্ধ করে অ-কারের মৌলিক বিবৃত হ্রস্ব উচ্চারণ ফিরিয়ে আনতে পারেন। Bus স্থানে বাস না লিখে বস লিখলে কোনও ক্ষতি হবে না, সাধারণ লোকে এখন যতটা বিকৃত উচ্চারণ করে তার চাইতে বেশী বিকৃত করবে না। স্থানভেদে অ-কারের চার রকম উচ্চারণই বাঙলায় চলতে পারে, তাতে অবাঙালী পাঠকের উচ্চারণে ভুল হলেও অর্থবোধে বাধা হবে না। জন-গণ-মন গানে সংবৃত অ-কার বোঝাবার জন্য যদি -বঙ্গা -তরঙ্গা লেখা হয় তাতে আমাদের আপত্তির কারণ নেই। আমরাও তো হিন্দী হৈ স্থানে হ্যায় লিখি।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত বানান-সমিতির নিয়মে অসংস্কৃত শব্দে ণ বাদ দিয়ে শুধু ন লেখার বিধান আছে। হিন্দী প্রভৃতিতেও অসংস্কৃত শব্দে ণ নেই, রানী, বরন (বর্ণ), মন (চল্লিশ সের) লেখা হয়। বাঙলায় 'গিণি সোণা' মূর্ধন্য ণ দিয়ে কেন লেখা হয় জানি না, হয়তো সোনার গৌরব-বৃদ্ধির জন্য।

বানান-সমিতির আর একটি নিয়ম—কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স এবং sh স্থানে শ হবে, যেমন, ইশারা তামাশা শয়তান শেমিজ-এ তালব্য শ, কিন্তু আসমান জিনিস সাদা নোটিস পুলিস-এ দন্ত্য স। হিন্দী প্রভৃতিতে এই রীতি মানা হয়, বাঙালী মুসলমান লেখকরাও তা মানেন। সকলেই এই নিয়মে বানান করলে সামঞ্জস্য আসবে।

আর একটি বিষয় বিচারের যোগ্য। অনেক শব্দে অনর্থক apostrophe বা উর্ধ্বকমা দেখতে পাই। বার্নার্ড শ', পাঁচ শ' ইত্যাদিতে উর্ধ্বকমার সার্থকতা কি? না দিলেও লোকে শ-এর

ঠিক উচ্চারণ করবে, কেউ শ্ বলবে না। দু'দিন, ন'টাকা ইত্যাদি বানানে উর্ধ্বকমার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। দুই থেকে দু, নয় থেকে ন হয়েছে তা জানবার কি দরকার? দু ছ ন শ ইত্যাদি স্বপ্রতিষ্ঠ শব্দ, এদের ব্যুৎপত্তি না জানলে কোনও ক্ষতি হয় না। সাধু রূপ 'তাহা তাহাকে তাহাতে তাহার' থেকে চলিত রূপ 'তা তাকে তাতে তার' হয়েছে, কিন্তু উর্ধ্বকমা দেওয়া হয় না।

লখনউ-এর যারা বাসিন্দা তারা সকল বানান লেখে ল খ ন উ, কিন্তু বাঙালী অনর্থক লক্ষ্ণৌ লেখে কেন? 'দরভঙ্গ'ায় দ্বার নেই, বঙ্গের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই, তবু দ্বারবঙ্গ লেখা হয় কেন? আর একটা উৎকট বানান sir স্থানে স্যার। যেমন ক্যাট হ্যাট ব্যাট, তেমনি স্যার। শুধু সার লিখলেই চলে, সেকেলে বানান সর আরও ভাল মনে করি।

অনেকে মনে করেন বিদেশী শব্দের হসন্ত উচ্চারণ বোঝাবার জন্য শেষে হস্‌চিহ্ন দিতেই হবে। এঁরা লেখেন—কাট্‌লেট্‌, টি-পট্‌, প্লেট্‌, ডিশ্‌। হসচিহ্ন না দিয়ে যদি শুধু ডিশ লেখা হয় তবে লোকে ডিশঅ পড়বে এমন ভয় আছে কি? অনর্থক হস্‌চিহ্ন দিয়ে লেখা কণ্টকিত করায় লাভ নেই।

অনেকে 'মেইন, চেইন, টেইলার' লেখেন। এঁদের যুক্তি—ইংরেজি শব্দে i অক্ষর আছে, উচ্চারণেও তার প্রভাব পড়ে। এই যুক্তি মিথ্যা। এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করা যায় না, কাছাকাছি বানান হলেই যথেষ্ট। 'মেইন, চেইন' ইত্যাদি লিখলে লোকে ই-কারের উপর অতিরিক্ত জোর দেয়। আর একটি ভয়ংকর বানান মাঝে মাঝে দেখি—'কেইক' অর্থাৎ কেক। ই-কার না দিলে কি 'ক্যাক' পড়বার ভয় আছে?

১৮৭৯

আচার্য উপাচার্য

কালক্রমে অনেক শব্দের মানে বদলায়। সংস্কৃত অভিধানে যেসব অর্থ পাওয়া যায় আধুনিক বাঙলা প্রয়োগে বহু ক্ষেত্রে তার অল্পাধিক পরিবর্তন হয়েছে। পাঠশালা আর বিদ্যালয় এই দুইএর মূল অর্থ একই, কিন্তু আজকাল মানে বদলে গেছে। সেই রকম—বৈদ্য ও চিকিৎসক, ঘটনা ও যোজনা, অভ্যর্থনা ও প্রার্থনা, প্রণাম ও নমস্কার। অনেক শব্দের অর্থব্যাপ্তি (connotation) পূর্ববৎ নেই, যেমন, সাহিত্য-এর অর্থ প্রসারিত হয়েছে, কাব্য-এর অর্থ সংকুচিত হয়েছে। ধাতু বললে সাধারণ শিক্ষিত লোকে বোঝে metal, কিন্তু কবিরাজরা প্রাচীন অর্থ অনুসারে অধিকন্তু বোঝেন হরিতাল হিঙ্গুল প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ এবং রক্ত মাংস প্রভৃতি দৈহিক উপাদান।

একালের রাক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সেকালের মতন নয়, সেজন্য অনেক শব্দের প্রাচীন অর্থ কিছু না বদলালে আমাদের আধুনিক প্রয়োজন মেটে না। কিন্তু মূল অর্থের সঙ্গে নূতন অর্থের ভাবগত বিরোধ যাতে না হয় তা দেখা দরকার। স্নাতক-এর একটি প্রাচীন অর্থ—বিদ্যাশিক্ষান্তে যে ব্রহ্মচর্যসমাপ্তিসূচক স্নান করেছে। সমাবর্তন-এর অর্থ—ব্রহ্মচর্যের অন্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ। আজকাল এই দুই শব্দ গ্র্যাজুএট ও কনভোকেশন অর্থে চলছে। এতে আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু নাচ গানের স্কুলের বিদ্যালয় বলা গেলেও পাঠশালা বলা চলবে না, সেখানকার শিক্ষককেও গুরুমশায় বা অধ্যাপক বলা চলবে না।

কুলপতি শব্দের আভিধানিক অর্থ—যে বিপ্রর্ষি দশসহস্র মুনিকে প্রতিপালন ও শিক্ষদান করেন। যেমন অক্ষৌহিণী শব্দের বিবৃতিতে

৬৫,৬১০ অশ্ব, ২১,৮৭০ গজ ইত্যাদির উল্লেখ আছে তেমনি কুলপতির বিবৃতিতে ১০,০০০ শিক্ষার্থী মুনির উল্লেখও পৌরাণিক সংখ্যান ধরা যেতে পারে। দশ সহস্র শিষ্যের মানে অনেক শিষ্য, দু-এক হাজার বা দু-পাঁচ শও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর কুলপতি ছিলেন—একথা বললে প্রাচীন অর্থের অপলাপ হবে মনে করি না।

মনুর বচন অনুসারে আচার্য শব্দের অর্থ—যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করে বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ সমেত বেদ শিক্ষা দেন। আপ্তের অভিধানে আচার্য-এর একটি অর্থ দেওয়া আছে—(when affixed to proper names) learned, venerable (somewhat like the Eng. Dr)। এই সব অর্থের কালোচিত পরিবর্তন করলে রবীন্দ্রনাথের আচার্য উপাধিও সার্থক। গুরু আর আচার্য প্রায় সমার্থক, সেজন্য তাঁর গুরুদেব উপাধিও সার্থক।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতীর শুধু প্রতিষ্ঠাতা নন, বহুকাল স্বয়ং অধ্যাপনা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষার বিধায়ক ছিলেন। এ কারণে আচার্য উপাধি সর্বতোভাবেই তাঁর উপযুক্ত। বিশ্বভারতী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, তার চানসেলর নেহরুজী দিল্লিতে থাকেন, কালেভদ্রে বিশেষ উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে প্রশাসন বা administration সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে তাঁর সম্মতি নিতে হয়। কোন স্কুল বা কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্টকে আচার্য বা অধ্যাপক বললে যে দোষ হয়, বিশ্বভারতীর চানসেলরকে আচার্য বললেও সেই দোষ হয়। বিশ্বভারতী বা কলিকাতা বা অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের চানসেলরের পদে যিনি অধিষ্ঠান করেন তিনি রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী বা রাজ্য পাল যাই হন, তাঁকে আচার্য বলা নিতান্ত অসংগত। চানসেলর আর আচার্য এই দুই শব্দের অর্থগত বা ভাবগত সাদৃশ্য কিছুমাত্র নেই।

কলেজের প্রিনসিপাল অধ্যাপনাও করতে পারেন কিন্তু অধ্যাপনার উপর গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকে শুধু প্রাধান্যসূচক পদবী দেওয়া হয়েছে, কারণ, তিনি অধ্যাপকবর্গের প্রধান এবং পরিচালক। প্রিনিসিপাল-এর প্রতিশব্দ অধ্যক্ষও প্রাধান্য- ও কর্তৃত্ব-সূচক। Concise Oxford Dictionaryতে *university* Chancellor-এর অর্থ—titular head with vice-c. acting অর্থাৎ, চানসেলর পদবীতে প্রধান হলেও ভাইসচানসেলরই প্রকৃত কর্তা। চানসেলরের যা অধিকার তা প্রশাসন বা ব্যয়-অনুমোদন সংক্রান্ত, তাঁকে আচার্য বলার পক্ষে কিছুমাত্র যুক্তি নেই।

ভাইসচানসেলরকে উপাচার্য বলা আরও আপত্তিজনক। ইংরেজী ভাইস-এর অন্ধ অনুকরণে বাঙলায় উপ-উপসর্গের প্রয়োগ একবারে নিরর্থক। ভাইসচানসেলর ইচ্ছা করলে অধ্যাপনা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত কর্ম প্রশাসন বা পরিচালন। ইংরেজী নামে ভাইস উপসর্গ সত্ত্বেও তিনি কারও স্থানাভিষিক্ত বা সহকারী নন। উপাচার্য শুনলে মনে আসে assistant professor। এই উপাধি তাঁর শুধু অযোগ্য নয়, মর্যাদাহানিকরও বটে।

সরকারী কার্যের পরিভাষা সংকলনের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার একটি সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন। এই সমিতির সংকলিত তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কয়েকটি পরিভাষা আছে, যেমন—Senate অধিষদ্‌, Syndicate নিষদ্‌, Registrar নিবন্ধক, Vice-chancellor অধিপাল, Chancellor মহাধিপাল। (এই সংজ্ঞাগুলির রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য এম-এ কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ)। কলেজের প্রধান যেমন অধ্যক্ষ, সরকারী বিভাগের ডিরেক্টর যেমন অধিকর্তা, কোনও সংঘের প্রধান নেতা বা নিয়ন্তা, যেমন অধিনায়ক, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি প্রধান নিয়ন্তা তিনি অধিপাল।

একালের ভাইসচানসেলর (বিশেষত বিশ্বভারতীর তুল্য

আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের) সেকালের কুলপতিরই সমপর্যায়ের। অধিপাল উপাধিতে তাঁর অধিনায়কত্ব ও পদোচিত গৌরব সূচিত হয়। চানসেলরকে আচার্য আখ্যা না দিয়ে মহাধিপাল বললে তাঁরও যথোচিত মর্যাদা বজায় থাকে।

১৮৭৯

স্বাধীনতার স্বরূপ

স্বাধীন আর পরাধীন দেশের প্রভেদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলবেন, দেশের লোকেই যেখানে শাসন করে সে দেশ স্বাধীন, বিদেশী যেখানে শাসন করে তা পরাধীন। কিন্তু এত সহজে প্রশ্নটির মীমাংসা হয় না। দেশের কত জন স্বাধীন, কতটা স্বাধীন, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্বাধীন, ইত্যাদি নানা বিষয় বিচার করা দরকার।

স্বাধীনতার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—নিজের ইচ্ছায় চলবার অর্থাৎ যা ইচ্ছা তাই করবার ক্ষমতা। এ রকম নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কোনও দেশের কোনও লোকের নেই, সর্বশক্তিমান ডিকটেটারেরও নেই। সকল রাষ্ট্রেই নাবালক, পাগল, জেলখানার কয়েদী ইত্যাদির স্বাধীনতা অল্প। প্রাচীন স্বাধীন ভারতে স্ত্রী আর শূদ্রের অনেক অধিকার ছিল না, ব্রাহ্মণ গুরু পাপে লঘু দণ্ড পেত, কিন্তু অব্রাহ্মণ নিষ্কৃতি পেত না। কমিউনিস্ট দেশের প্রজার স্বাধীনতা অতি সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগুরু অশ্বেতজাতির অনেক অধিকার নেই। বিলাতে ১৯২০ সালের আগে রোমান ক্যাথলিক প্রজার পূর্ণ অধিকার ছিল না, ১৯১৮ সালের আগে মেয়েদের ভোট ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ভারতের প্রজা বিনা বাধায় প্রচুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারত, কিন্তু সমাজতন্ত্রী স্বাধীন ভারতে সেই অধিকার সংকুচিত হয়েছে। বর্তমান ব্রিটিশ এবং আরও অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের অবস্থাও এই রকম। মোট কথা, প্রজার পক্ষে স্বাধীন আর পরাধীন দুই দশাই আপেক্ষিক বা relative।

আমরা বলে থাকি, তুর্ক জাতি অর্থাৎ পাঠান-মোগল কর্তৃক ভারত বিজয়ের পর থেকে ১৯৪৭ সালের অগস্ট পর্যন্ত মোটামুটি

৭০০ বৎসর ভারত পরাধীন ছিল। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, মুসলমান বিজেতারা ভারতে স্থায়ী ভাবে বসতি করেছিল এবং এদেশের বিস্তর লোক মুসলমান হয়ে বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, এই কারণে বাদশা-নবাবদের বিদেশী বলা ঠিক নয়, তাঁদের রাজত্বকালে ভারত পরাধীন ছিল এ কথাও বলা চলে না। এঁদের যুক্তি অনুসারে কেবল ব্রিটিশ অধিকারেই ভারত পরাধীন ছিল। এ দেশের মুসলমানরাও মনে করে, বাদশাহী আর নবাবী আমলে তাদের স্বাধীনতার হানি হয় নি।

আলোচ্য বিষয়টি কি রকম জটিল তা আরও কয়েকটি দেশের ইতিহাস থেকে জানা যাবে। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নরমাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম যখন ইংলাণ্ড আক্রমণ করে জয়ী হন তখন ইংরেজ জাতি নিশ্চয় পরাধীন হয়েছিল। তার পর শতাধিক বৎসর নরমান অভিজাত বর্গের সর্বময় কর্তৃত্বের সময় দেশের অধিবাসী অ্যাংলো-স্যাকসনরা অধীনতার দুঃখ ভাল করেই ভোগ করেছিল। কিন্তু সেই পরাধীন দশা ক্রমে ক্রমে আপনিই বিলীন হয়ে গেল। বিজেতা আর বিজিতদের মধ্যে ভাষাগত ভেদ ছিল, কিন্তু বর্ণগত ধর্মগত আর আচারগত ভেদ ছিল না, সেজন্য নরমান আর অ্যাংলোস্যাকসন শীঘ্রই সম্পূর্ণভাবে মিশে গেল। সুতরাং এ কথা বলা চলে যে নরমান বিজয়ের পর ইংলাণ্ড দু-এক শ বৎসর মাত্র পরাধীন ছিল।

সপ্তম শতাব্দে ইসলামের উৎপত্তির সময় মিসর পারস্য তাতার প্রভৃতি স্বাধীন ছিল, কিন্তু কয়েক শ বৎসরের মধ্যেই মুসলমান খলিফা এবং আরব যোদ্ধারা এই সব দেশ জয় করে করে নিজের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশের লোক বিজিত হল, কিন্তু ধর্মান্তরিত হয়ে বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সাধুজ্য লাভ করল, তাদের পরাধীনতার কলঙ্ক আর রইল না।

মুসলমান বিজয়ের এইপ্রকার পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটলেও কয়েকটি দেশে ব্যতিক্রম দেখা গেছে। স্পেন, সিসিলি, বলকান

প্রদেশের কতক অংশ আর ভারতবর্ষ বিজিত হয়েও পুরোপুরি ধর্মান্তরিত হয় নি। স্পেন সিসিলি ইত্যাদি কয়েক শ বৎসরের মধ্যেই বিজেতার কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ তা পারে নি। কুবলাই খাঁ আর তাঁর উত্তরাধিকারীরা অনেক বৎসর চীন দেশে রাজত্ব করেছিলেন এবং নিজেরাই বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

এ কালে ভারতে যে দেশাত্মবোধ আর সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে সেকালে তা ছিল না। ভারতবাসী বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, আপৎকালেও তাদের ঐক্য ঘটে নি, আক্রামক জাতিদের মতন তারা যুদ্ধনিপুণ ছিল না, তাদের নীতি যদ্‌ভবিষ্য তদ্‌ভবিষ্য। এই সব কারণে ভারত পরাধীন হয়েছিল। ভারতীয় প্রজা চিরকাল ঝঞ্ঝাট পরিহার করেছে, ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে থেকে চিরাগত ধর্ম আর সমাজবিধি পালন করতে পারলেই কৃতার্থ হয়েছে, রাজা যেই হক তাতে তার বিশেষ আপত্তি ছিল না।

নরমান বিজয়ের পর ইংলাণ্ডের এবং মুসলমান বিজয়ের পর মিসর পারস্য প্রভৃতির সর্বাঙ্গীণ পরাধীনতা ঘটেছিল এবং মিশ্রণের ফলে কয়েক শ বৎসরের মধ্যে তা তিরোহিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের পরাধীনতা আংশিক, অর্থাৎ শুধু রাজনীতিক, অত্যাচারিত হয়েও দেশের অধিকাংশ লোক তাদের ধর্মগত আর সমাজগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল। বহুবর্ষব্যাপী নিশ্চেষ্টতার মধ্যেও ভারতবাসীর একটি বিষয়ে দৃঢ়তা ছিল, সে তার 'সহজং কর্ম (বা ধর্ম) সদোষমপি' ত্যাগ করে নি। সমগ্র ভারত যদি পরধর্ম গ্রহণ করত তবে আমাদের পরাধীন দশার স্থিতি সাত শ বৎসর না হয়ে দু শ বৎসর গণ্য হত, অর্থাৎ শুধু ব্রিটিশ অধিকার কাল। সে ক্ষেত্রে সমস্ত মুসলমানের সঙ্গে সাজাত্য অনুভব করে কবি ইকবালের মতন আমরাও হৃত রাজ্যের জন্য বিলাপ করতাম—চীন হমারা, স্পেন হমারা।

অন্য বিষয়ে উদ্যমহীন হয়েও ভারতবাসী তার দৃঢ় স্বধর্মনিষ্ঠা কোথা থেকে পেয়েছে? কেউ কেউ বলবেন, এর মূলে আছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। কিন্তু যথার্থ বর্ণাশ্রম আর চাতুর্বর্ণ্য বহুকাল আগেই লোপ পেয়েছে, তার স্থানে যা এসেছে তা জাতিভেদ বা casteism। এই শতমুখী ভেদবুদ্ধির এমন শক্তি থাকতে পারে না যার দ্বারা বিজেতার ধর্মকে বাধা দেওয়া যায়। ভারতবাসীর প্রকৃতিতে এক প্রকার প্রবল জাড্য বা inertia আছে, সে অজ্ঞাতসারে অনেক পরিবর্তন মেনে নেয় কিন্তু সজ্ঞানে তার নিষ্ঠা ত্যাগ করতে চায় না। হয়তো এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই বহিরাগত আঘাত প্রতিহত হয়েছিল। পেগান গ্রীস আর রোমের সংস্কৃতি প্রচুর ছিল, তথাপি সেখানকার লোকে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিল। ভারতের অসংখ্য ধর্মমত আর লোকাচারের মধ্যে এমন কিছু বলিষ্ঠ অবলম্বন আছে যার কাছে বিদেশীর প্রভাব হার মেনেছিল। ইতিহাসজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানীরা হয়তো তার সন্ধান পেয়েছেন।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। পাঁচ শ বৎসরের মুসলমান শাসনের ফলে ভারতবাসীর সংস্কৃতি অবশ্যই কিছু বদলেছে। কিন্তু তার চাইতে বহুগুণ বদলেছে দু শ বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে। মুসলমান সংস্কৃতি থেকে গ্রহণযোগ্য বেশী কিছু আমরা পাই নি, কিন্তু ব্রিটিশ বা ইওরোপীয় সংস্কৃতি থেকে প্রচুর পেয়েছি। আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম নেবার প্রয়োজন বোধ করি নি, কিন্তু ইওরোপীয় আচার কিছু কিছু আত্মসাৎ করেছি এবং সাগ্রহে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা বুদ্ধি ও ভাবধারা অজস্র পরিমাণে বরণ করে নিয়েছি।

১৮৭৯

আমিষ নিরামিষ

মথুর মুখুজ্যে সকালবেলা পার্কে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর বাল্যবন্ধু অঘোর দত্তের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হয়ে গেল। দুজনে একটা বেঞ্চিতে বসলেন। মথুরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তার পর, আছ কেমন? বয়স কত হল?

অঘোর দত্ত বললেন, ভাল মন্দ মিশিয়ে আছি, নালিশ করবার কিছু নেই। বয়স প্রায় আটাত্তর হল।

মথুর। আমার পঁচাত্তর, কিন্তু ভাল নই দাদা। বাত হাঁপানি ডিসপেপসিয়া, নানানখানা। আচ্ছা তুমি তো নিরামিষ খাও। কত দিন খাচ্ছ?

অঘোর। তা ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর, ছেলেবেলা থেকেই।

মথুর। বল কি হে! সেই জন্যই এখন পর্যন্ত বেশ আছ। আমিও ভাবছি মাছ মাংস ছেড়ে দেব। আর কেন, ঢের খেয়েছি, শেষ বয়সে সাত্ত্বিক আহারই ভাল। নিরামিষভোজীরা দীর্ঘজীবী হয়, আনি বেসান্ট, বার্নার্ড শ, গান্ধীজী—

অঘোর। ভুল করলে ভাই। আমিষ খেয়েও বিস্তর লোক আশি পেরিয়ে বেঁচে আছেন, যেমন চার্চিল, ফজল হক, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। যোগেশ বিদ্যানিধি মশাই তো ছেয়ানব্বই পার হয়ে বার্নার্ড শকেও হারিয়ে দিয়েছেন।

এমন সময় ফণী মল্লিক এসে পড়লেন। এঁর বয়স প্রায় ষাট, বহু কাল আগে একবার বিলাত গিয়েছিলেন, তার লক্ষণ সাজে আর চালচলনে এখনও কিছু দেখা যায়। মথুরবাবু বললেন, আসতে আজ্ঞে হক মল্লিক সায়েব, বসুন এইখানে। এই অঘোর দত্তকে চেনেন তো? অদ্ভুত মানুষ, পঁয়ষট্টি বৎসর নিরামিষ খেয়ে বেঁচে

আছেন। আচ্ছা মল্লিক মশাই, আপনি তো বিচক্ষণ জ্ঞানী লোক, আমিষ নিরামিষ আহার সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ফণী মল্লিক বললেন, প্রচুর আমিষ খাওয়া উচিত, আমিষের অভাবেই হিন্দু জাতির অধঃপতন হয়েছে।

মথুর। আচ্ছা অঘোর, তোমার তো কোনও কালেই ধর্মে তেমন মতি দেখি নি। তবে মাছ মাংস খাও না কি কারণে?

অঘোর। যে কারণে তুমি সাপ ব্যাঙ খাও না।

মথুর। ও একটা বাজে কথা। যদি বলতে অহিংসার জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য খাও না, কিংবা শাস্ত্রমতে প্রশস্ত নয় তাই খাও না তা হলে বুঝতাম।

অঘোর। আমরা যা করি সব কিছুরই কি কারণ বলা যায়? যা বলেছি তার সোজা অর্থ—তোমার যেমন সাপ ব্যাঙে রুচি হয় না আমার তেমনি মাছ মাংসে হয় না। যদি জেরা কর কেন রুচি হয় না, তবে ঠিক উত্তর দিতে পারব না। হয়তো পাকযন্ত্রের গড়ন এমন যে আমিষ সয় না কিংবা পুষ্টির জন্য দরকার হয় না। হয়তো ছেলেবেলায় এমন পরিবেশে ছিলাম বা এমন কিছু দেখেছিলাম শুনেছিলাম বা পড়েছিলাম যার প্রভাব স্থায়ী হয়ে আছে। যদি নিরামিষ সহ্য না হত তবে নিশ্চয় আমিষ ধরতাম, যেমন অক্ষয়-কুমার দত্ত শেষ বয়সে রোগে পড়ে ধরেছিলেন। আমি কিন্তু পুরো-পুরি ভেজিটেরিয়ান নই। দুধ খাই, যা হচ্ছে খাঁটী গোরস, আর মাঝে মাঝে চিকিৎসার জন্য জান্তব ঔষধও খেতে বা ইনজেকশন নিতে হয়েছে।

ফণী মল্লিক সহাস্যে বলিলেন, হুঁ, এইবার পথে আসুন। এক মার্কিন ভদ্রলোক এচ. জি. ওয়েল্‌সকে বলেছিলেন, আপনাদের বার্নার্ড শ একজন ক্ষণজন্মা জ্ঞানী সাধুপুরুষ, নিরামিষ খেয়েই এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মস্তিষ্ক চালনা করছেন। ওয়েল্‌স হেসে বললেন, নিরামিষ না ছাই। দুধ খাচ্ছেন, চীজ খাচ্ছেন, ডিম খাচ্ছেন, আবার

প্রতিদিন লিভার এক্সট্রাক্ট ইনজেক্‌শন নিচ্ছেন, যা হল রক্তমাংসের সারাৎসার। শুনুন মথুরবাবু, মাছ মাংস ডিম খেলে যত সহজে পুষ্টি আর শক্তিলাভ হয়, তেমন আর কিছুতে হয় না। জনকতক ভাত ডাল শাগ তরকারি খেয়ে দীর্ঘজীবী হতে পারে, কিন্তু অ্যাভারেজ লোকের পক্ষে আমিষ বর্জন অনিষ্টকর। যার প্রচুর দুধ ক্ষীর ছানা খাবার সামর্থ্য আছে তার হয়তো চলে যেতে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে আর সকল জায়গায় তা সুলভ নয়।

মথুর। কিন্তু শুনেছি মাংস খেলে হিংসাবৃত্তি প্রবল হয়। এই দেখুন না, এদেশে যারা মাংসখোর তারাই দাঙ্গাবাজ আর একটুতে ছোরা মারে।

ফণী। মারবেই তো, অন্য পক্ষ যে নিস্তেজ ভীরু। মুখুজ্যে মশাই, আমাদের যে মাইল্ড হিন্দু বলে খ্যাতি আছে তা মোটেই গৌরবের নয়। আমাদের একটু উগ্র হওয়া দরকার। ভারতীয় আর্যজাতির ইতিহাস দেখুন। রাম লক্ষ্মণ সীতা বনে গিয়ে মাংস খেয়েই জীবনধারণ করতেন। চিত্রকূট আর দণ্ড্যকারণ্যের জঙ্গলে চাল ডাল আটা পাবেন কোথা? পেলে অবশ্য ফলমূলও খেতেন, কিন্তু সেটা তাঁদের প্রধান খাদ্য ছিল না, শুধু ভাইটামিন-সি-এর জন্য খেতেন। বনবাসী পাণ্ডবরাও তাই করতেন। তাঁরা এত হরিণ মারতেন যে সেখানকার ঋষিরা তাঁদের অন্যত্র চলে যেতে বলেছিলেন। আমাদের মাংসাশী পূর্বপুরুষেরা তেজস্বী মহাবীর যুদ্ধবিশারদ ছিলেন, আবার বেদ-বেদান্তও রচনা করেছেন। তাঁদের বংশধররা বৌদ্ধ আর জৈনদের নকলে নিরামিষভোজী হয়েই অধঃপাতে গেছে।

মথুর। অঘোর, তুমি কি বল? মাংসাহার আসুরিক নয় কি? তাতে কাম ক্রোধ লোভাদি রিপু আর হিংস্রতা প্রবল হয় না কি?

অঘোর। ঠিক বলতে পারি না। নিরামিষাশী গণ্ডার মোষ আর ষাঁড়ের ক্রোধ নেহাত কম নয়। বাঁদর আর ছাগলের প্রথম রিপু বাঘ সিংগির চাইতে প্রবল। শুনেছি হিটলার নিরামিষ

খেতেন, কিন্তু অহিংস হতে পারেন নি। আমিষাশী লোকের তুলনায় নিরামিষাশীর সংযম হয়তো মোটের উপর কিছু বেশী, কিন্তু তার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমান নেই। চুরি জুয়াচুরি ভেজাল কালোবাজার লাম্পট্য ইত্যাদি নানারকম দুষ্কর্ম আমাদের দেশের নিরামিষখোরদের মধ্যে কিছুমাত্র কম নয়। এদেশের অনেক লোক গরুকে মাতৃজ্ঞান করে, বাঁদরকে ভ্রাতৃজ্ঞান করে, কিন্তু গোখাদক শিকারপ্রিয় পাশ্চাত্ত্য জাতিদের তুলনায় আমাদের জন্তুপ্রীতি মোটের উপর কম। নিরামিষ ভোজন বেশী হিতকর কি না তার পরীক্ষা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত হয় নি। যদি শ-খানিক শিশুকে একই পরিবেশে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত রাখা হয় এবং তাদের পঞ্চাশ জনকে আমিষ আর পঞ্চাশ জনকে নিরামিষ খাওয়ানো হয় তবে তাদের স্বাস্থ্য আর চরিত্রের গড়পড়তা প্রভেদ দেখে খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করা যেতে পারে। তবে এ কথা ঠিক যে আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানীরা বেশী মাংস খাওয়ার নিন্দা করেন, আমিষ-নিরামিষ মিশ্রিত খাদ্যই ভাল মনে করেন।

ফণী। আমিও মানি যে মিশ্রিত আহারই ভাল। কিন্তু খাদ্য-বিজ্ঞানীরা শুধু বেশী মাংস খাওয়ার নিন্দা করেন না, অতিরিক্ত স্টার্চ মিষ্টান্ন আর তেল ঘিও অনিষ্টকর বলেন। আমরা বাঙালীরা যা খাই তাতে মাছ মাংসের মাত্রা নিতান্তই কম। এদেশে নদী-বহুল অঞ্চলে আর সমুদ্রের উপকূলে বিস্তর মাছ পাওয়া যায়, সেই বিধিদত্ত খাদ্য না-খাওয়া ঘোরতর বোকামি। মাছ পাঁঠা মটন ডিম আমাদের নিষিদ্ধ খাদ্য নয়, মুরগিও জাতে উঠেছে, আজকাল পোর্ক আর বীফেও অনেকের আপত্তি নেই। এখন দরকার যেমন করে হক আহারে আমিষের মাত্রা বাড়ানো। আমরা যদি আহার বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের সমান না হই তবে জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে যাব। কূপমণ্ডুক হয়ে সনাতন বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ থাকার দিন চলে গেছে। আমাদের এখন নানা উপলক্ষ্যে দেশবিদেশে যেতে হয়,

এ খাব না ও খাব না বলে আবদার করলে চলবে না। সভ্য মানুষের পোশাক যেমন প্রায় এক ধরনের হয়ে পড়েছে, সভ্য মানুষের খাদ্যও তেমনি ইউনিভার্সাল হওয়া দরকার। অঘোরবাবু যে সাপ ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন তা অত্যন্ত কুযুক্তি। সাপ ব্যাঙে রুচি না হবারই কথা, কিন্তু সভ্য লোকে সর্ব দেশে যা খায় তার উপর ঘৃণা থাকা সুরুচির পরিচয় নয়।

অঘোর। সাপ ব্যাঙ শুওর গরু ছাগল ভেড়া কোনওটার উপর আমার ঘৃণা নেই, সবাই কৃষ্ণের জীব। সায়েবদের যেমন কাঁঠাল কয়েতবেল আর টোপাকুলের গন্ধ সয় না, আমারও তেমনি আমিষের গন্ধ সয় না। নিজে খাই না, কিন্তু যারা খায় তাদের রুচির নিন্দা করি না। মল্লিক মশাই, আপনি রামায়ণ মহাভারত থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। দয়া করে আর একটু পশ্চাতে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করুন। আমাদের পূর্বপুরুষ অতিপ্রাচীন মানবজাতি কি খেয়ে জীবনধারণ করত? যখন পশুপালন আর কৃষিকর্ম জানা ছিল না তখন মানুষ শুধু শিকার করা জন্তু নয়, সাপ ব্যাঙ ইঁদুর টিকটিকি শামুক গুগলি ফড়িং পোকা, মায় নরমাংস, যা জুটত তাই খেত। পাওয়া গেলে ফলমূলও খেত, কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সত্য মানতে হবে যে প্রায় সকল প্রাণীই মানুষের ভক্ষ্য হতে পারে, কিন্তু সকল উদ্ভিদ নয়। পশুপক্ষিপালন শেখার পর মানুষ পালিত জন্তুর মাংস দুধ ডিম খেতে শুরু করল। তার পর কৃষির প্রচলন হলে নানারকম শস্য উৎপন্ন হতে লাগল, খাদ্যের বৈচিত্র্য বেড়ে গেল। মানুষের রুচি কালে কালে বদলায়, এক শ বছর আগে আমরা যা খেতাম এখন ঠিক তা খাই না। মোট কথা, আমাদের অতিপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের সাপ ব্যাঙ পোকামাকড়ে বিলক্ষণ রুচি ছিল, তার পর ক্রমশ রুচি বদলেছে, আধুনিক সভ্য মানুষ নানা রকম আমিষ নিরামিষ খেতে শিখেছে, সেকালের অনেক খাদ্যের উপর বিতৃষ্ণাও জন্মেছে। কিন্তু এখনও অসভ্য

আর অর্ধসভ্য জাতি আছে যাদের সাপ ব্যাঙ ইঁদুর পোকায় আপত্তি নেই।

ফণী। আদিম মানুষ কি খেত আর একালের অসভ্য মানুষ কি খায় তা আমাদের দেখবার দরকার নেই। আমার বক্তব্য আধুনিক সভ্য সমাজে যা খুব চলে তাই আমাদের খেতে হবে।

অঘোর। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কতকগুলি প্রাণীর মাংস ডিম দুধ আর বাছা বাছা শস্য তরকারি ফল মূল। হিন্দুর লোকাচার অনুসারে মাছ ছাগল ভেড়া হরিণ হাঁস ইত্যাদি কয়েকটি প্রাণীর মাংস শুদ্ধ। শাস্ত্রে পাঁচটি পঞ্চনখ জন্তু খাবার বিধানও আছে—খরগোশ শজারু গোসাপ গণ্ডার আর কচ্ছপ। এখন নতুন ফর্দ করতে হবে, সায়েবরা যা খায় অর্থাৎ গরু শুওর ইত্যাদিও খেতে হবে। পোর্ক আর বীফ দুর্মূল্য হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য দেশে আজকাল ঘোড়া আর তিমি অর্থাৎ হোয়েলের মাংসও চলছে। সায়েবরা ব্যাঙের ঠ্যাং আর ঝিনুকের কাঁচা শাঁসও অতি সুস্বাদু মনে করে। অতএব এসবেও আপত্তি করা চলবে না। মল্লিক মশাই, এই তো আপনার মত?

ফণী। হাঁ, তবে সায়েব বললে ঠিক হবে না, বলুন আধুনিক সুসভ্য জাতিরা।

অঘোর। সুসভ্য জাতিদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞতম আর দূরদর্শী তাঁরা বুঝেছেন যে অভ্যস্ত বাছাবাছা খাদ্যের উপর একান্ত নির্ভর ভাল নয়। দরকার হলে অনভ্যস্ত খাদ্যও খেতে হবে, যাতে পুষ্টি হয় আর স্বাস্থ্যহানি হয় না। পুরাণে আছে, দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র সপরিবারে কুকুরের মাংস খেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আধুনিক যুগে যুদ্ধ বা আবিষ্কার ইত্যাদির অভিযানে অবস্থা বিশেষে অনভ্যস্ত খাদ্যও খাবার দরকার হতে পারে। সম্প্রতি বিলাতে আর ফ্রান্সে জনকতক ভলনটিয়ারকে কিছুদিনের জন্য এমন জায়গায় নির্বাসিত করা হয়েছিল যেখানে মামুলী খাদ্য মোটেই মেলে না

তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, ফল মূল পাতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মাছ ব্যাঙ শামুক গুগলি যা জোটে তাই কাঁচা খেয়ে জীবনধারণ করতে হবে। তারা ফিরে এলে দেখা গেল যে তাদের কিছুমাত্র স্বাস্থ্যহানি হয় নি। আমাদের দেশেও ওই রকম আপৎকালীন আহারের অভ্যাস হওয়া দরকার।

মথুর। দেখ অঘোর, তুমি একটি ভণ্ড। নিজে নিরামিষ খাও অথচ মল্লিক মশাইকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তুমি কি বলতে চাও, সাপ ব্যাঙ পোকা মাকড় খেতে না শিখলে আমাদের নিস্তার নেই?

ফণী। অঘোরবাবু আমার লেগ পুল করছেন।

অঘোর। আজ্ঞে না। আপনি অনেক সারগর্ভ কথা বলছেন, আমি শুধু আপনার যুক্তি আর একটু ফলাও করবার চেষ্টা করছি।

মথুর। আচ্ছা মল্লিকমশাই, আমিষ খাদ্য খুব পুষ্টিকর তা তো বুঝলাম। কিন্তু অহিংসা হচ্ছে পরম ধর্ম, অতএব কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যহানি মেনে নিয়েও নিরামিষাশী হওয়া উচিত নয় কি? প্রাচীন যুগের অবস্থা যাই হক, ঈশ্বরকৃপায় এখন যখন চাল ডাল গম তরকারি আর কিছু কিছু দুধও জুটছে, আর মাছ মাংসের বাজারও আগুন, তখন নিরামিষ খাওয়াই আমাদের উচিত, এই কি ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়?

ফণী। ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তা জানবেন কি করে? সকলেই অহিংস হবে আর নিরামিষ খাবে এই যদি সৃষ্টিকর্তার মতলব হত, তবে তিনি বাঘ সিংগ বেরাল প্রভৃতি জানোয়ার সৃষ্টি করতেন না, সব জন্তুকেই গরু ছাগলের মতন নিরামিষাশী করতেন। পৃথিবীতে বিস্তর প্রাণী আছে যারা বিধাতার বিধানেই আমিষাশী হয়েছে, হিংসার পাপ তাদের স্পর্শ করে না। মানুষকেও সেই দলে ফেলবেন না কেন?

অঘোর। কিন্তু মানুষ শুধু আমিষ খায় না, লাউ কুমড়ো আম কাঁঠালও খায়। বিধাতা আমাদের বাঘ সিংগির দলে ফেলেন নি, বরং বলতে পারেন, ভালুক শেয়াল ইঁদুর কাগ প্রভৃতি সর্বভুক জানোয়ারের দলে ফেলেছেন।

ফণী। এ কথায় আমার আপত্তি নেই।

অঘোর। আরও একটা কথা। বিধাতা আমাদের এমন বুদ্ধিও দিয়েছেন, যাতে চিরাভ্যস্ত খাদ্য বদলাতে পারি।

মথুর। তাইতো, বিষয়টা বড়ই গোলমেলে ঠেকছে। তোমরা দুই তার্কিকে মিলে আমার মাথা গুলিয়ে দিলে।

অঘোর। শোন মথুর, এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামিও না, কূল কিনারা পাবে না। শাস্ত্রে আছে, যাতে জীবের অত্যন্ত হিত হয়, তাই ধর্ম। কিন্তু মুশকিল এই, বেরালের যা হিত ইঁদুরের তা নয়, মশা মাছি ছারপোকার যা হিত মানুষের তা নয়। অহিংসা পরম ধর্ম, কিন্তু তা পুরোপুরি মেনে চলা আমাদের অসাধ্য। আমিষাহার না হয় বর্জন করা গেল, কিন্তু আরও অনেক নিষ্ঠুর কর্ম আমরা চোখ বুজে করে থাকি। ষাঁড়কে নপুংসক করে বলদ বানিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে খাটাই। কোটি কোটি পোকা মেরে পবিত্র আর শৌখিন এণ্ডি গরদ তসর তৈরি করি, তুচ্ছ শখের জন্য পাখিকে খাঁচায় পুরি, নানা জন্তুর স্বাধীনতা হরণ করে জুএ বন্দী করি, পোলিও-ভ্যাকসিন তৈরির জন্য হাজার হাজার বাঁদর চালান দিই, তাদের বধ করা হবে জেনেও। এসব কি জীবহিংসা নয়? আমাদের স্বভাব হঠাৎ বদলানো যাবে না। আমিষাহার অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, শাস্ত্রে তার নিন্দা থাকলেও বারণ নেই। মনুর সেই বচনটি জানো তো? 'ন মাংসভক্ষণে দোষো' ইত্যাদি। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং'—লোকের প্রবৃত্তিই এই রকম, নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'—তবে ছাড়তে পারলে মহা ফললাভ। আমাদের দেশের অনেক মহাপুরুষ মাংসাহার সমর্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গৌরদাস বাবাজীকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'বাপু, ভগবান কোথায় বলেছেন যে পাঁঠা খাইও না?....পদ্মপুরাণ খোল, দেখাইব যে মাংস-ভোজন আবশ্যক বলেছেন। এদেশের যেসব সম্প্রদায় বংশানুক্রমে নিরামিষাশী ছিল, তাদেরও অনেকে

আজকাল খাচ্ছে, আধুনিক ভারতে নিরামিষভোজী কমছে, আমিষভোজী বাড়ছে।

মথুর। তবে কি তোমরা বলতে চাও আমিষ না খাওয়াই দোষের?

ফণী। তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

অঘোর। আমি তা বলি না। এ যুগের ঋষি হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। খাদ্যবিজ্ঞানী যে ব্যবস্থা দেবেন, তাই মেনে নেওয়া ভাল। অবশ্য সেকালের ঋষিদের মতন আধুনিক ঋষিদেরও মতভেদ আছে। যাঁর ব্যবস্থা আমাদের মনের মতন হয়, তাই মেনে নেওয়া যেতে পারে।

ফণী। অঘোরবাবু, আপনাদের শাস্ত্রে আছে না—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ?' মহাজন অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোকে যা করে, তাই হচ্ছে ধর্মের পথ। অতএব আমিষাহারই ধর্ম। আপনি ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন।

অঘোর। মহাজনের পথ ছেড়ে অন্য পথে চললেই লোকে ধর্মভ্রষ্ট হয় না। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, আজীবন ব্রহ্মচারী, ছাতু-মাত্র-ভোজী, নির্বাক মৌন বাবা, বিবস্ত্র নেংটা বাবা—এরা খাপছাড়া, কিন্তু অধার্মিক নয়। নিরামিষভোজীকেও যদি এইসব ক্র্যাংকের দলে ফেলেন, তবে আপত্তি করব না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। কালক্রমে নিরামিষ ভোজনই সভ্যজনের প্রিয় হওয়া অসম্ভব নয়। অহিংসা প্রবৃত্তির প্রসারের ফলে আমাদের রুচি বদলাতে পারে। নিরামিষের তুলনায় আমিষ খাদ্যে টোমেইন আর নানা রকম ক্রিমি কীট (যেমন trichina, fluke ইত্যাদি) জন্মাবার সম্ভাবনা বেশী, এই কারণেও আমিষের আকর্ষণ কমতে পারে। হয়তো ভবিষ্যতে সভ্য মানবের বিচারে আমিষ খাদ্য অসুন্দর অহৃদ্য অনাবশ্যক গণ্য হবে। অনেক পাশ্চাত্ত্য শিকারী লিখেছেন, মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে বাঁদরের মাংস তাঁরা খেতে পারেন না। সর্বজীবে সমজ্ঞান বৃদ্ধি পেলে হয়তো কোনও মাংসেই রুচি হবে না।

মথুর। বাঁদর তো আমাদের পূর্বপুরুষ?

অঘোর। ঠিক পূর্বপুরুষ নয়, নিকট জ্ঞাতি বলা যেতে পারে। সম্প্রতি প্রফেসর হালডেন দিল্লীতে বক্তৃতায় বলেছেন, মাছই আমাদের অতিপ্রাচীন আদিম পূর্বপুরুষ।

মথুর। কি ভয়ানক কথা। তাহলে মাছ খাওয়া মানে পিতৃ-মাংস ভক্ষণ? আচ্ছা দেড় টাকা সেরের চুনো পুঁটিও কি আমাদের পূর্বপুরুষ?

অঘোর। চুনো পুঁটি কই মাগুর ইলিশ রুই কাতলা সবাই। তবে চিংড়ির কথা আলাদা, ওরা হল মাকড়সা আর কাঁকড়াবিছের সগোত্র।

মথুর। মহাভারত! তা হলে খাব কি?

অঘোর। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলছে, হাতি ঘোড়া থেকে পোকা মাকড় পর্যন্ত সব প্রাণীই মানুষের ভক্ষ্য। প্রবৃত্তি বলছে, বাছা বাছা গুটিকতক প্রাণীই খেতে ইচ্ছা করে। অন্তরাত্মা বলছে, নিরামিষেই যখন কাজ চলে তখন জীব-হিংসার দরকার কি।

ফণী। সব গাঁজা। আমিষ ত্যাগ করলে মানুষের অধঃপতন হবে, নিরামিষ খাদ্যে এসেনশ্যাল আমিনো-অ্যাসিডের অভাব আছে।

অঘোর। খাদ্যবিজ্ঞানী আর রসায়নী হয়তো সে অভাব পূরণ করতে পারবেন। সয়া বীন, চীনা বাদাম, তিল, ঈস্ট, খুদে পানা ইত্যাদি নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট চলছে।

মথুর। তা হলে এখন করা যায় কি?

অঘোর। দেখ মথুর, প্রবৃত্তিই বলবতী। যাতে তোমার রুচি হয়, যা তোমার পেটে সয়, তাই খাবে। ভবিষ্যতে হয়তো মাছ মাংসের অনুকল্প উপাদেয় সুষম নিরামিষ খাদ্য আবিষ্কৃত হবে, কিন্তু তা তোমার আমার ভোগে লাগবে না। মল্লিক মশায়ের বয়স কম, উনি হয়তো চেখে দেখবার সুযোগ পাবেন। এখন ওঠা যাক, অনেক বেলা হয়েছে।

১৮৭৯

গ্রহণীয় শব্দ

ভাবের বাহন ভাষা, ভাষার উপাদান শব্দ। শব্দের অর্থ যদি সর্বগ্রাহ্য হয় তবেই তা সার্থক, অর্থাৎ প্রয়োগের উপযুক্ত এবং সাহিত্যে গ্রহণীয়।

বাঙলা ভাষা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। তার এক কারণ, বাঙালীর জীবনযাত্রার পরিবর্তন, অর্থাৎ নূতন বস্তু নূতন ভাব নূতন রুচি আর নূতন আচারের প্রচলন। অন্য কারণ, অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছাপূর্বক ইংরেজী ভাষার অনুকরণ। মৃত ভাষা ব্যাকরণের বন্ধনে মমির মতন অবিকৃত থাকতে পারে, কিন্তু সজীব চলন্ত ভাষায় বিকার বা পরিবর্তন ঘটবেই। আমাদের আহার পরিচ্ছদ আবাস সমাজব্যবস্থা আর শাসনপ্রণালী যেমন বদলাচ্ছে, তেমনি শব্দ শব্দার্থ আর শব্দবিন্যাসও বদলাচ্ছে।

যাঁরা গোঁড়া প্রাচীনপন্থী তাঁরা কোনও পরিবর্তন প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারেন না। আধুনিক ছেলেমেয়ের চালচলন যেমন অনেক লোকের পক্ষে দৃষ্টিকটু, আধুনিক বাঙলা ভাষার রীতিও সেই রকম। অন্ধ গোঁড়ামি সকল ক্ষেত্রেই অন্যায়, কিন্তু শুধু হুজুগ বা ফ্যাশনের বশে কোনও নূতন বস্তু বা রীতি মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। ভাষার রীতির তুলনায় সামাজিক রীতির গুরুত্ব অবশ্য অনেক বেশী, তথাপি কোনও শিক্ষিত লোকই চান না যে মাতৃভাষায় জঞ্জাল আসুক। সহসাগত কোনও শব্দ শব্দার্থ বা প্রয়োগরীতিকে সাহিত্যে স্থান দেবার আগে একটু যাচাই করে দেখা ভাল।

ভাষার সমৃদ্ধি হয় কৃতী লেখকের প্রভাবে, কিন্তু তার ক্রমিক মন্থর পরিবর্তনে জনসাধারণের হাতই বেশী। সাধারণ মানুষ ব্যাকরণ অভিধানের বশে চলে না। কয়েকজন শব্দের উচ্চারণে

বা প্রয়োগে ভুল করে, তার পর অনেকে সেই ভুলের অনুসরণ করে, তার ফলে কালক্রমে নূতন শব্দ নূতন অর্থ আর নূতন ভাষার উৎপত্তি হয়। ভাষা মাত্রেই পূর্ববর্তী কোনও ভাষার বিকার বা অপভ্রংশ এবং একাধিক ভাষার মিশ্রণ। শব্দ অর্থ আর ভাষার এই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বা evolution বারণ করা যায় না। কিন্তু অভিব্যক্তিতেও মানুষের কিছু হাত আছে। মানুষ অন্ধভাবে সবরকম প্রাকৃতিক পরিবর্তন মেনে নেয় না, স্বচ্ছন্দাগত সব কিছুকে সাদরে বরণ করে না। অভিব্যক্তির বহু ক্ষেত্রে মানুষ সজ্ঞানে হস্তক্ষেপ করেছে, যে পরিবর্তন তার পক্ষে অনুকূল তাই ঘটাবার চেষ্টা করেছে। বন্য প্রাণী আর উদ্ভিদ থেকে গৃহপালিত পশুপক্ষী আর ভক্ষ্য শস্য ফলাদির উৎপত্তি মানুষেরই যত্নের ফল। ভাষার ক্ষেত্রেও আমাদের সতর্ক হস্তক্ষেপ শুভজনক হতে পারে।

বিষয়টি সহজ নয়। ভাষার সৌষ্ঠব রক্ষা আর প্রকাশ-শক্তি বর্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় কি সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কোন্ শব্দ গ্রহণীয় বা বর্জনীয় তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। সবিস্তার আলোচনা না করে শুধু কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। তা থেকে হয়তো সতর্কতার প্রয়োজন বোঝা যাবে।

এমন অনেক বস্তু এদেশে আছে যার সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ শিক্ষিত জন এতকাল উদাসীন ছিলেন। সম্প্রতি এই প্রকার কয়েকটি বস্তুর গুরুত্ব বেড়েছে, সংবাদপত্র এবং সাধারণের পাঠ্যগ্রন্থে তাদের উল্লেখ না করলে চলে না। কিন্তু নামকরণে অসাবধানতা দেখা যাচ্ছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে লোহা তৈরি হচ্ছে, নূতন পরিকল্পনায় উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যাবে। যে কাঁচা মাল বা খনিজ বস্তু থেকে লোহা তৈরি হয় তার বাঙলা নাম কি? রাশি রাশি এই বস্তু রেলগাড়িতে বোঝাই হয়ে লোহার কারখানায় যায়, কলকাতার বন্দর থেকে জাহাজে জাপান রাশিয়া ইত্যাদি দেশে রপ্তানি হয়। অতি

প্রয়োজনীয় এই ভারতীয় সম্পদের একটা সর্বগ্রাহ্য নাম অবশ্যই চাই। ইংরেজী নাম iron ore, বৈজ্ঞানিক নাম hematite। যে অশিক্ষিত জন এই বস্তু পাহাড় কেটে বার করে বা খনি থেকে তোলে তারা বলে লোহা-পাথর। এই অতি সরল উত্তম নামটি কিন্তু বাঙলা কাগজে স্থান পায় না, লেখা হয়—লৌহপিণ্ড বা খনিজ লৌহ বা আকরিক লৌহ। তিনটে নামই ভুল। লৌহপিণ্ড মানে লোহার তাল, lump of iron। খনিজ বা আকরিক লৌহ বললে বোঝায়, যে লৌহ খনি বা আকরে থাকে। কিন্তু খনি বা আকরে কুত্রাপি লৌহ যৌগিক অবস্থায় আছে। মাটিতে আখ হয়, আখে চিনি আছে, আখকে ভূমিজ শর্করা বলা চলে না। খনি আর আকর শব্দের মানে একই, কিন্তু পারিভাষিক প্রয়োগে mineralএর বাঙলা খনিজ, oreএর বাঙলা আকরিক। অতএব iron ore-এর শুদ্ধ প্রতিশব্দ লৌহ-আকরিক। কিন্তু লোহা-পাথর নাম আরও ভাল।

লোহার কথা আর একটু বলছি। লোহা-পাথর থেকে প্রথমে যে লোহা অশুদ্ধ অবস্থায় নিষ্কাশিত হয় তার মোটা মোটা বাটের নাম pig-iron। শূকর-দেহের সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই বস্তু ভারতের বাইরে প্রচুর চালান যায়। Iron foundry বা লোহা ঢালাইখানায় এই লোহা গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে রেলিং, রাঁধবার কড়াই, বাটখারা ইত্যাদি নানা জিনিস তৈরি হয়। এই জাতীয় লোহার নাম cast-iron বা ঢালাই লোহা। সংস্কৃতে অনেক রকম নাম আছে, কিন্তু কোন্‌টিতে cast-iron বোঝায় তা স্থির করা যায় না। pig-ironএর বাঙলা নাম চাই। শূকর লৌহ চলবে না, বাজার চলিত নাম পিগ-লোহা বাঙলা ভাষায় মেনে নেওয়া ভাল।

Atom bomb অর্থে অনেকে আণবিক বোমা লেখেন। এই অনুবাদ ভাল। Atomicএর বাঙলা পারমাণবিক। পরমাণু বোমা

লিখলে ঠিক হয়। এ সম্বন্ধে পরিমল গোস্বামী মহাশয় অনেকবার আলোচনা করেছেন।

যুদ্ধের সময় blackout অর্থে নিষ্প্রদীপ খুব শোনা যেত, এখনও বিজলীর অভাবে শহর অন্ধকার হলে বলা হয় নিষ্প্রদীপ। কিন্তু blackoutএর উদ্দিষ্ট অর্থ আলোকহীনতা। নিষ্প্রদীপ মানে আলোকহীন। ভারতচন্দ্র বহুকাল আগে শুদ্ধ নাম রচনা করে গেছেন—অপ্রদীপ, অর্থাৎ আলোকের অভাব। শব্দটি বিশেষ্য বিশেষণ দুই রূপেই চলতে পারে। Blackoutএর প্রতিশব্দ রূপে অপ্রদীপই গ্রহণীয়।

সাত-আট বৎসর আগে civil supply অর্থে লেখা হত অসামরিক সরবরাহ। civil শব্দের বাঙলা ছিল না, তাই নঞর্থক অসামরিক শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল। যেন সামরিক প্রয়োজনই মুখ্য, জনসাধারণের প্রয়োজন নিতান্তই গৌণ। এই রকম মনোভাবের ফলে এককালে non-Mahomedan নামটির সৃষ্টি হয়েছিল। আজকাল সরকারী নাম জনসংভরণ চলছে, কিন্তু প্রথম প্রথম খুব আপত্তি শোনা গিয়েছিল।

Subcontinentএর বাঙলা উপমহাদেশ। ইংরেজী কাগজে অবিভক্ত সমগ্র ভারত সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকলে লেখা হয়—in this Subcontinent। এর উদ্দেশ্য বোধ হয় পাকিস্থানকে কোনও রকমে ক্ষুণ্ণ না করা। বাঙলায় 'এই উপমহাদেশে' যেমন শ্রুতিকটু তেমনি অনর্থক। বিষ্ণুপুরাণে পরাশরের বচন আছে—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যস্য সন্ততিঃ॥

এই বর্ণনা অনুসারে ভারতবর্ষ নামেই this Subcontinent, যেমন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া নামে নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক আর আইসল্যাণ্ড। প্রাচীনকালে এই দেশে বহু স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল, ব্রিটিশ আমলেও ফ্রেঞ্চ পোর্তুগীজ অঞ্চল আর নেপাল ছিল, তথাপি

সমগ্র দেশকে বলা হত India বা ভারতবর্ষ। পাকিস্থান হয়েছে বলেই ভারতবর্ষ নামের ভৌগোলিক অর্থ বদলাতে পারে না। আমাদের খণ্ডিত দেশকে শুধু ভারত বা ভারত রাষ্ট্র বলা যেতে পারে।

Chancellor ও Vice-chancellor অর্থে আচার্য ও উপাচার্য চলছে। এই দুই প্রতিশব্দ অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে করি। উপাচার্যের মানে assistant professor। Vice-chancellorকে এই নাম দিলে তাঁর মর্যাদার হানি হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা করেছি।

কথায় কথায় thanks, please, kindly ইত্যাদি বলা ইংরেজী শিষ্টাচার। আমরা তা মেনে নিয়েছি। একবার একটি মেয়ের অটোগ্রাফ খাতায় আমি নাম সহি করলে সে বলেছিল, ধন্যবাদ। আমি প্রশ্ন করলাম, কে ধন্য, তুমি না আমি ? মেয়েটি প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, তার পর উত্তর দিল—আমি, আমি। ধন্য শব্দের এক অর্থ কৃতার্থ, আর এক অর্থ খুব বাহাদুর, যেমন ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী। মেয়েটি প্রথম অর্থে নিজেকেই ধন্যবাদ দিয়েছিল, দ্বিতীয় অর্থে আমাকে দেয় নি। Thanksএর বাঙলা চাই, ঠিক সমার্থক না হলেও ধন্যবাদ মেনে নেওয়া যেতে পারে। Please, kindly স্থানে অনুগ্রহপূর্বক, দয়া করে ইত্যাদি বলা হয়। হিন্দীতে 'কৃপয়া' এই ছোট সংস্কৃত পদটি চলছে, বাঙলাতেও মেনে নেওয়া যেতে পারে।

ইংরেজীতে অনেক লোকের নাম একত্র লিখতে হলে আগে Messrs বসানো হয়, অর্থাৎ এঁরা সকলেই Mister। হিন্দীতে তার নকল চলছে সর্বশ্রী, বাঙলাতেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই। সর্বশ্রী শুনলেই মনে আসে হাওড়াশ্রী ব্যাঁটরাশ্রী। লোকে যদি এতই শ্রীর কাঙাল হয় তবে উৎকট সর্বশ্রী না লিখে শ্রীর পর কোলন বা ড্যাশ দিয়ে সমস্ত নাম লেখা যেতে পারে।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রতি আমাদের কিছু পক্ষপাত দেখা যায়। জীবনচরিত বা চরিত স্থানে জীবনী, জন্মবার্ষিক বা জন্মদিন স্থানে জন্মবার্ষিকী, পরিক্রম বা পরিক্রমণ স্থানে পরিক্রমা, শতাব্দ স্থানে শতাব্দী, প্রকাশ স্থানে প্রকাশনা ইত্যাদি চলছে। এতে আপত্তির কারণ নেই, কিন্তু স্থানে অস্থানে কার্যকরী শব্দটির এত চলন হল কেন? শুধু খবরের কাগজে নয়, অনেক জনপ্রিয় লেখক আর অধ্যাপকের লেখাতেও দেখতে পাই—কার্যকরী উপায়, কার্যকরী সমাধান, প্রস্তাব কার্যকরী করা ইত্যাদি। কার্যকর বা কার্যকারী লিখতে বাধে কেন?

আর একটি অদ্ভুত ফ্যাশন সম্প্রতি দেখা দিয়েছে—ক্লীবলিঙ্গ প্রীতি। পত্রিকা বা পুস্তকের নাম রূপম্, সুন্দরম্, অবনীন্দ্রচরিতম্ ইত্যাদি রাখলে আপত্তি করা যায় না। বোধ হয় গৌরব বৃদ্ধির জন্যই সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত নাম দেওয়া হয়। ভরতনাট্যম্ও এই রকম হতে পারে। অনেক দ্রাবিড়ী নামের শেষে ম্ আছে, যেমন—পায়সম্ রসম্ পপড়ম্ শ্রীরঙ্গম্ চিদম্বরম্। ভরতনাট্যম্ও হয়তো সেই রকম। সেদিন রাস্তায় একটি কবিরাজী দোকানে সাইন বোর্ড দেখেছি— শ্রীআয়ুর্বেদম্। সংস্কৃত ভাল করে না শিখলে কবিরাজ হওয়া যায় না। আয়ুর্বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ। দোকানের মালিক শেষে ম্ যোগ করে আয়ুর্বেদকে নপুংসক করলেন কেন? আর একটি শোচনীয় নাম মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। একজন লেখক তাঁর রচনার শেষে নাম লেখেন—ভারতপুত্রম্। এই ভারতসন্তান ক্লীবত্ব বরণ করলেন কোন্ দুঃখে?

১৮৮০

শিক্ষার আদর্শ

আমার শোবার ঘরের পাশে একটা বকুল গাছ আছে, এক জোড়া বুলবুলি আর গোটাকতক শালিক চড়াই তাতে রাত্রিযাপন করে। চৈত্র মাসে নূতন পাতা গজাবার পর তারা প্রায় সকলেই বিতাড়িত হয়, দুটো কাগ এসে গাছে বাসা বাঁধে। নিশ্চয় একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী। কিছুদিন পরে দেখি, বাসার খড়কুটোর মধ্যে একটা কদাকার বাচ্চা প্রকাণ্ড হাঁ করছে, তার মা নিজের ঠোঁট দিয়ে সন্তানের লাল মুখের ভিতর খাবার পুরে দিচ্ছে। শিশু কাগ ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে, তার মুখের ব্যাদান আর রক্তিমা কমে আসে, সে নিজের ঠোঁট দিয়ে মায়ের মুখ থেকে খাবার তুলে নেয়। আরও কিছুদিন পরে দেখি, কিশোর কাগ বাসা ছেড়ে ডালের উপর বসেছে, তার মা তাকে ঠেলা দিচ্ছে, বাচ্চা ভয়ে কা কা করছে, পাখা নাড়ছে, আর দু পায়ের আঙুল দিয়ে ডাল আঁকড়ে আছে। তার পর তরুণ কাগ হঠাৎ শাখাচ্যুত হয়ে ঝটপট করছে, তার মা নিজের দেহ দিয়ে তাকে সামলাচ্ছে। একজন সাঁতারপটু লোক ছোট ছেলেকে যেমন করে সাঁতার শেখায়, কাগের মা তেমনি করে নিজের বাচ্চাকে উড়তে শেখাচ্ছে।

পাখির যা প্রাথমিক শিক্ষা, ওড়া আর আহার সংগ্রহ, তা সে নিজের মায়ের কাছ থেকেই পায়। বাকী যা কিছু সবই তার সহজ প্রবৃত্তি (instinct) আর অভিজ্ঞতার ফল। মাছ ব্যাঙ সাপ ইত্যাদি নিম্নতর প্রাণী পিতামাতার উপর আরও কম নির্ভর করে, তাদের জীবিকার্জনের সামর্থ্য জন্মগত।

আদিম মানুষ পিতা মাতা আর গোষ্ঠীবর্গের কাছ থেকে জীবন-

যাপনের উপযোগী সকলপ্রকার শিক্ষা পায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন বেড়েছে, শিক্ষার ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল হয়েছে। আত্মীয়স্বজনের কাছে যা শেখা যায় তা এখন পর্যাপ্ত নয়, সমাজ আর রাষ্ট্রই নানাপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ইতর প্রাণী আর আদিম মানুষ পিতামাতা ইত্যাদির কাছে যা শেখে তা যতই সামান্য হক, তাদের জীবনযাত্রার পক্ষে পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট। আধুনিক সভ্য মানুষের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাও কি পর্যাপ্ত? অন্য দেশ সম্বন্ধে আলোচনা না করে আমাদের দেশের কথাই বলছি।

প্রচলিত শিক্ষাকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। (১) সামান্য শিক্ষা, যা সকলের পক্ষেই আবশ্যক এবং পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ গণ্য হয়। (২) বিশেষ শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীর রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে নির্ধারিত হয়। (৩) বৃত্তিমুখী শিক্ষা, যার উদ্দেশ্য জীবিকার্জনের উপযোগী কোনও কর্মে জ্ঞান ও পটুতা লাভ।

(১) সামান্য শিক্ষা।—আমাদের দেশে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য যেসব বিষয় নির্দিষ্ট আছে সেগুলিকেই সামান্য শিক্ষার অঙ্গ বলা যেতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী তালিমও সামান্য শিক্ষা, যদিও তার অঙ্গগুলি কিছু অন্যরকম। নিরক্ষর লোকেও জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, কেউ কেউ কোটিপতি ধনী বা সাধু মহাত্মাও হতে পারে, তথাপি বিদ্যার প্রয়োজন চিরকালই স্বীকৃত হয়েছে। এককালে লেখাপড়া বললে বোঝাত ন্যূনতম বিদ্যা অর্থাৎ নামমাত্র লেখা আর পড়া, আর একটু অঙ্ক করা। ইংরেজীতে এরই নাম three Rs.; reading, writing and rithmetic। এই লেখাপড়া কখনই যথেষ্ট গণ্য হয় নি, শাস্ত্র (অর্থাৎ সুশৃঙ্খল

কেতাবী বিদ্যা) না পড়লে মানুষ অন্ধবৎ হয়, একথা বিষ্ণুশর্মা হিতোপদেশ গ্রন্থে বলেছেন—

অনেকসংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।
সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক সকলের লোচনস্বরূপ শাস্ত্রজ্ঞান যার নেই সে অন্ধই।

এদেশে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত যেসব বিষয় পড়ানো হয় তার বার বার পরিবর্তন হয়েছে, তথাপি এইগুলিকে প্রধান অঙ্গ বলা যেতে পারে।—মাতৃভাষা, ইংরেজী, সংস্কৃত, ভারতের ইতিহাস ও শাসনতন্ত্র, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান ইত্যাদি। এইসব বিদ্যার অল্পমাত্র জ্ঞানও যার নেই সে 'অন্ধ এব', অর্থাৎ তাকে অশিক্ষিত বলা যেতে পারে।

(২) বিশেষ শিক্ষা।—উল্লিখিত সামান্য শিক্ষায় সকলে তৃপ্ত হয় না, অনেকে কয়েকটি বিদ্যা ভাল করে আয়ত্ত করতে চায়। এই বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন নাও হতে পারে। অনেকে কেবল শখ বা জ্ঞানলাভের জন্যই বিদ্যাবিশেষের চর্চা করেন। হাইকোর্টের জজ ব্যারিষ্টার ইত্যাদির মধ্যে গণিত বিজ্ঞান আর সংস্কৃতে উচ্চ উপাধিধারী লোক বিরল নন। এরা যে বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তা বিচার সংক্রান্ত কাজের পক্ষে অনাবশ্যক।

এক শ্রেণীর বিদ্যাকে ইংরেজীতে বলা হয় humanities। এই সংজ্ঞাটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে, লাটিন গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য এর একটি প্রধান অঙ্গ। কয়েকটি আধুনিক বিদ্যাও এর অন্তর্গত, কিন্তু পরীক্ষা-ও প্রযুক্তি-মূলক বিজ্ঞান (experimental and applied science) নয়। কলেজের পাঠ্য বিষয়কে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, আর্টস্ ও সায়েন্স। সায়েন্সের প্রতিশব্দ আছে—বিজ্ঞান। খবরের কাগজে আর্টস্ স্থানে কলা দেখিতে পাই, কিন্তু এই অনুবাদ অন্ধ নকল। আর্টস্ বললে

যেসব কলেজী বিদ্যা বোঝায় তাদের কলা নাম দিলে উপহাস করা হয়। আর্টস্ আর হিউম্যানিটিজকে যুক্তভাবে সাহিত্যাদিবর্গ বলা যেতে পারে। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য এবং ইতিহাস জীবন-চরিত দর্শন সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় সাহিত্যাদির অন্তর্গত।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে কলেজের উচ্চতর শ্রেণীতে বিজ্ঞানের চাইতে সাহিত্যাদিবর্গের ছাত্র বেশী দেখা যেত। তখন বিজ্ঞ লোকেরা বলতেন, সায়েন্স তো ছেলেখেলা, আসল বিদ্যা হচ্ছে ইংরেজী সাহিত্য, তার পরে ফিলসফি। এখন রুচির পরিবর্তন হয়েছে, বিজ্ঞানের ছাত্রই আজকাল বেশী। এই পরিবর্তনের কারণ, সাহিত্যাদি শিখলে জীবিকার্জনের যত সম্ভাবনা, বিজ্ঞান শিখলে তার চাইতে বেশী। ভারত সরকার শিল্পবর্ধনের ব্যাপক পরিকল্পনা করেছেন, তার ফলে বিজ্ঞানীর চাকরি পাবার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। অর্থবিদ্যা (economics), বাণিজ্য (commerce) প্রভৃতি বিশেষ বিদ্যাও আজকাল জনপ্রিয় হয়েছে, শিখলে জীবিকার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

(৩) বৃত্তিমুখী শিক্ষা।—এই শ্রেণীর শিক্ষা হাতেকলমে না শিখলে সম্পূর্ণ হয় না। আইন আর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বৃত্তিমুখী, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। ডাক্তারি শিক্ষার পদ্ধতিকেই প্রকৃতপক্ষে বৃত্তিমুখী বলা চলে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র রোগীর সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন, চিকিৎসা কার্যেও সাহায্য করেন, সেজন্য তাঁর বৃত্তির উপযোগী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদের শিক্ষার্থীও ভবিষ্যৎ মক্কেল শ্রেণীর সম্পর্কে আসেন, সেজন্য তাঁর শিক্ষাও যথার্থ বৃত্তিমুখী। আইন শিক্ষার্থীকে যদি বাদী-প্রতিবাদীর সম্পর্কে আনা হত এবং মকদ্দমা চালাবার কিছু ভার দেওয়া হত, এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীকে দিয়ে যদি নূতন ব্রিজ বাঁধ বা কারখানার প্ল্যান এস্টিমেট আর তদারকের কাজ কিছু কিছু করানো হত, তবেই তাঁদের শিক্ষা যথার্থ বৃত্তিমুখী হত।

মানুষের শৈশবে যার আরম্ভ হয় এবং জীবিকানির্বাহের উপযোগী কর্মে নিয়োগ পর্যন্ত যা চলে, যাতে যথাসম্ভব শরীর আর মনের উৎকর্ষ এবং অর্থোপার্জনের যোগ্যতা লাভ হয়, সেই সমগ্র শিক্ষাই পর্যাপ্ত শিক্ষা। এরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য—সকল লোকেরই সামর্থ্য অনুযায়ী বিদ্যা আর জীবিকার বিধান। শুনতে পাই সোভিএট রাষ্ট্রে সমস্ত প্রজার জন্য এই ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেখানে কর্ম নির্বাচনে প্রজার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কতটা গ্রাহ্য হয় জানি না। ভারতে এবং অন্যান্য সকল দেশে অল্প-সংখ্যক প্রজাই সরকারী কাজ পায়, বাকী সকলকেই নিজের চেষ্টায় জীবিকার যোগাড় করতে হয়। আমাদের দেশে সকলে কাজ পায় না, সেজন্য বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

বন্দে মাতরম্ স্তোত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশকে ধরণীং ভরণীং বলেছেন, অর্থাৎ বঙ্গমাতা তাঁর সন্তানগণকে ধারণ করেন, ভরণও করেন। এখন নানা কারণে আমাদের মাতৃভূমির ধারণ ও ভরণের ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। সকল প্রজার উপযুক্ত পর্যাপ্ত শিক্ষা আর জীবিকার সংস্থান শীঘ্র সম্ভাব্য না হলেও কল্যাণ রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার স্টেটের লক্ষ্য তাই হওয়া উচিত।

শিক্ষা যদি পর্যাপ্ত বা বৃত্তিমুখী নাও হয় তথাপি জীবিকার্জনের উপযোগী হতে পারে। যাঁরা কেবল সাহিত্যাদি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন তাঁরাও রাষ্ট্রের অতি উচ্চ পদ পেতে পারেন, সরকারী বিভাগের অধিকর্তা, রাজনীতিক, অধ্যাপক, লেখক, সম্পাদক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হতে পারেন। যাঁরা বিজ্ঞানাদি বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করেন অথবা বৃত্তিমুখী শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের জীবিকার ক্ষেত্র অবশ্য আরও বিস্তৃত।

আমাদের শিক্ষালাভের তিনটি পর্যায় আছে—(১) পাঠশালা ও স্কুল, (২) কলেজ, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া, প্রায়োগিক (technical) ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার জন্য কতকগুলি পৃথক শিক্ষালয়

আছে, যেমন মেডিক্যাল, এঞ্জিনিয়ারিং ও ল কলেজ, চারু ও কারু শিল্প বা arts and crafts-এর শিক্ষালয়, সংগীত শিক্ষালয় ইত্যাদি। এই প্রকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত।

ইংরেজী ইউনিভার্সিটি শব্দের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দ রচিত হয়েছে। এই বৃহৎ শব্দটির বদলে একটি ছোট নাম চালাতে পারলে সকলেরই সুবিধা হয়। বিদ্যামণ্ডল, বিদ্যাচক্র, বিদ্যাকুল, এইরকম কিছু চালানো যায় না কি?

নামের আদিতে বিশ্ব থাকলেও তার মানে এ নয় যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাবতীয় বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষণীয় বিষয় আর শিক্ষার্থীর বাহুল্য হলে সকল ক্ষেত্রে ফল ভাল হয় না। প্রাচীন-কালের কুলপতি বিপ্রর্ষিরা তাঁদের আশ্রমে নাকি দশ সহস্র মুনিকে পালন করতেন আর শিক্ষা দিতেন। নালন্দা প্রভৃতি বিহারেও অসংখ্য বিদ্যার্থী থাকত। তিন-চার শ বৎসর আগেও বিদ্যার সংখ্যা কম ছিল, মেধাবী লোকে চেষ্টা করলে সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে পারত। কিন্তু এখন বিদ্যার (বিশেষত বিজ্ঞানের) শাখা প্রশাখা অত্যন্ত বেড়ে গেছে, আজকাল সর্বজ্ঞ বা বহুজ্ঞের চাইতে বিশেষজ্ঞের আদর বেশী। ইংরেজীতে একটি পরিহাস আছে—বিশেষজ্ঞ তাঁকেই বলে যিনি অল্প বিষয় সম্বন্ধে বিস্তর জানেন। অতএব গণিতের পদ্ধতি অনুসারে বলা চলে—শূন্য বিষয় সম্বন্ধে যাঁর অনন্ত জ্ঞান আছে তিনিই চরম বিশেষজ্ঞ।

সেকালের অসংখ্য বিদ্যার্থী সমন্বিত ঋষিকুল বা বিহারের অনুরূপ ব্যবস্থা এখন অচল। যেখানে কয়েকটি বিদ্যার প্রকৃষ্ট চর্চার ব্যবস্থা আছে সেই বিদ্যামণ্ডলই প্রশস্ত। অতিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা প্রধান তাঁরা যদি প্রশাসন বা পরিচালন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তবে অধ্যাপনা উপেক্ষিত হবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার খ্যাতি আছে। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা আয়ুর্বেদ চর্চার জন্য, উজ্জয়িনী

জ্যোতিষের জন্য, মিথিলা জনক রাজার কালে অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য এবং পরবর্তীকালে ন্যায়শাস্ত্র চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান কালে আমাদের দেশেও বিভিন্ন বিদ্যামণ্ডলের বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়। সকল বিশ্ববিদ্যালয় একই ছাঁচে গড়ে উঠলে ফল ভাল হবে না।

বিশ্বভারতী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। শুনতে পাই সেখানকার শিক্ষার ব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত তা নিয়ে প্রবল মতভেদ আছে। এক দল নাকি বলেন, সেকেলে আশ্রমিক ব্যবস্থা চলবে না, এখন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি মেনে নিতে হবে। আর এক দল বলেন, গুরুদেবের যে আদর্শ ছিল, তিনি যে রীতি চালিয়ে গেছেন তা থেকে কিছুমাত্র স্খলন হলে বিশ্বভারতী পণ্ড হবে।

প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ আর তাঁর প্রবর্তিত রীতির অনুসরণ করলে বিশ্বভারতীর অগ্রগতি ব্যাহত হবে—এই ধারণার কারণ দেখি না। কলিকাতা প্রভৃতি অতিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যা শেখানো হয়, উচ্চ বিজ্ঞানাদি শেখাবার যে রকম ব্যবস্থা আছে, বিশ্বভারতীতে ঠিক সে রকম না হলে ক্ষতি কি? কবিগুরুর জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আর বিশ্বভারতীতে যা শিক্ষণীয় ছিল তা প্রধানত সাহিত্যাদি বিদ্যা—হিউম্যানিটিজ ও আর্টস্, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাসাদি, তা ছাড়া চিত্র সংগীত ইত্যাদি চারু-কলা আর কয়েকটি কারুকলা। শিক্ষার সেই বৈশিষ্ট্য আর পরিধি বজায় রেখেই বিশ্বভারতীর অগ্রগতি ও বিবৃদ্ধি হতে পারে। পূর্বে যে সামান্য শিক্ষার কথা বলেছি (যা সকলের পক্ষেই অপরিহার্য) তারই অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞান শিক্ষার সীমা যদি আই এস-সি শ্রেণী পর্যন্তই রাখা হয় এবং বহুবিধ বিজ্ঞান চর্চার আয়োজন যদি নাও হয় তাতেই বা ক্ষতি কি? যেসব ছাত্র উচ্চতর বিজ্ঞান অথবা চিকিৎসা বাস্তুবিদ্যা যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি প্রায়োগিক যা বৃত্তিমুখী বিদ্যা শিখতে চায় তারা কলকাতায় বা অন্যত্র শিক্ষালাভ করতে পারে। Liberal education বা উদার শিক্ষা বা polite learning বা ভব্য শিক্ষা

বললে যা বোঝায় তাই বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য হতে পারে। কবিগুরুর যা একান্ত কাম্য ছিল—বিভিন্ন দেশের মনীষীদের চিন্তার আদান-প্রদান, বিশ্বভারতী যদি সেই মিলনের ক্ষেত্র হয় তা হলেও তার প্রতিষ্ঠা সার্থক হবে।

গাছতলায় বা ফাঁকা জায়গায় বিনা চেয়ার টেবিলে পঠন-পাঠনের পদ্ধতি যথাসম্ভব বজায় রাখলে বিশ্বভারতীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। প্রাসাদের বদলে আটচালাতেও উচ্চ শিক্ষা চলতে পারে। বাহ্য আড়ম্বরের চাইতে বিদ্বান কুশলী ও সন্তুষ্ট অধ্যাপকবর্গের প্রয়োজন অনেক বেশী। পণ্ডিত নেহরু সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সকল বিদ্যাস্থান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

১৮৮০

বাংলা সাইক্লোপিডিয়া

অষ্টাদশ শতাব্দের মাঝামাঝি কয়েকজন ফরাসী পণ্ডিত (Diderot, D' Alembert, Voltaire, Euler ইত্যাদি) Encyclopedie নাম দিয়ে একটি গ্রন্থমালা রচনা করেন। নামটি গ্রীক থেকে উদ্ভূত, মৌলিক অর্থ—বিদ্যাপরিবৃতি, অর্থাৎ সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার। প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী মত প্রকাশের জন্য সম্পাদকগণ তখনকার রোমান ক্যাথলিক ধর্মনেতাদের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন, রাজদণ্ডও ভোগ করেছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছু পরে ইংরেজী Encyclopedia Britannica সংকলিত হয় এবং এ পর্যন্ত তার অনেক সংস্করণ হয়েছে। এই প্রকাণ্ড বহুখণ্ড বহুবার সংশোধিত গ্রন্থে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের লেখা যে সকল বিবৃতি আছে তা প্রামাণিক বলে গণ্য হয়।

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' এবং অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক আরব্ধ 'মহাকোষ' গ্রন্থের উদ্দেশ্য উক্ত দুই গ্রন্থের অনুরূপ। নানা বিদ্যার ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবৃতিসংবলিত কোষগ্রন্থের সম্পাদন একজনের সাধ্য নয়, বহু বিশেষজ্ঞের সাহায্য ভিন্ন প্রামাণিক সংকলন অসম্ভব। নগেন্দ্রনাথ যা সমাপ্ত করেছেন এবং অমূল্যচরণ যার কয়েক খণ্ড প্রকাশ করে গেছেন তা অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফল। এন সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা যেমন মুখ্যত ব্রিটিশ জাতি, আর ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনে রচিত, নগেন্দ্রনাথ আর অমূল্যচরণের গ্রন্থ তেমনি বাঙালী আর বাংলা ভাষার প্রয়োজনে রচিত।

কয়েকটি বৃহৎ বাংলা শব্দকোষে ভূগোল, ইতিহাস ও সাহিত্য-বিষয়ক তথ্য এবং জীবনচরিত আছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বিদ্যানিধি বহু বৎসর পূর্বে যে 'বাঙ্গালাশব্দ-কোষ' রচনা করেছিলেন তাতে এদেশের খনিজ, বনজ, কৃষিজ দ্রব্য, প্রাণী, নৌকাদি যান, শিল্পসাধিত্র যথা তাঁত ঢেঁকি ঘানি, মাছ-ধরা জাল, গৃহোপকরণ এবং তাস পাশা দাবা প্রভৃতি খেলার বিবরণও আছে। অন্য কোনও বাংলা শব্দকোষে এসব পাওয়া যায় না। যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থ সংস্কৃতেতর বাংলা শব্দের অভিধান, সেজন্য তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ প্রায় বর্জিত হয়েছে, তথাপি কয়েকটি সংস্কৃত নামযুক্ত বিষয়ের বিবৃতি আছে, যেমন সংগীতের তাল ও রাগ-রাগিণী। তাঁর শব্দকোষ এখন পাওয়া যায় না। নব সংস্করণের জন্য তিনি গ্রন্থের আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন, শুনেছি তৎসম শব্দ যোগ করে অভিধানও পূর্ণাঙ্গ করেছেন। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যে এই বহু তথ্যপূর্ণ অদ্বিতীয় গ্রন্থের পুনর্মুদ্রনের আয়োজন হচ্ছে।

বহুমূল্য কোষগ্রন্থ কেনা সকলের সাধ্য নয়, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন প্রকাণ্ড গ্রন্থ নাড়াচাড়া-করাও অসুবিধাজনক। ইংরেজীতে বড় মাঝারি ছোট অনেক রকম সাইক্লোপিডিয়া আছে। ছোট-গুলির দাম বেশী নয়। তাতে যে বিবৃতি থাকে তা খুব সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি কাজ চলে। বাংলায় এই রকম ছোট কোষ রচনার চেষ্টা কয়েকজন করেছেন, কিন্তু ইংরাজী গ্রন্থের সঙ্গে কোনওটিরও তুলনা হয় না।

একটি ছোট সুসংকলিত প্রামাণিক বাংলা সাইক্লোপিডিয়ার প্রয়োজন আছে। হাজার বার শ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ যদি পনের-কুড়ি টাকার মধ্যে পাওয়া যায় তবে বোধ হয় ক্রেতার অভাব হবে না। ইংরেজীর নকলে এই ছোট গ্রন্থের নাম 'বিশ্বকোষ' বা ওই রকম কিছু দিলে অতিরঞ্জন হবে। 'বিষয়কোষ' নাম চলতে পারে শব্দকোষ বা অভিধানের প্রধান উদ্দেশ্য—শব্দের রূপ অর্থ ও প্রয়োগবিধির নির্দেশ। বিষয়কোষের উদ্দেশ্য—বিষয় (subject)

অর্থাৎ পদার্থ, জাতি (class), ব্যক্তি (individual), স্থান, ঘটনা প্রভৃতির বিবৃতি। শব্দকোষ যেমন ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার সহায়, বিষয়কোষ সেইরূপ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন ও জ্ঞান লাভের সহায়।

যে কোষগ্রন্থের প্রস্তাব করছি তাঁর উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার গৌরব বর্ধন নয়, শুধুই উপস্থিত প্রয়োজন সাধন। সাধ্যের অতিরিক্ত সঙ্কল্প করলে কাজ অগ্রসর হবে না, হয়তো পণ্ড হবে। এমন একটি গ্রন্থ চাই যা থেকে ছাত্র শিক্ষক লেখক পাঠক সাংবাদিক রাজনীতিক ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই দেশীয় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার সংক্ষিপ্ত উত্তর পান। যা ইংরেজী গ্রন্থে পাওয়া যায় তা দেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না, তাতে সম্পাদনের শ্রম আর প্রকাশের খরচ অনর্থক বাড়ানো হবে। আমরা এখনও ইংরেজী ভাষার চর্চা করি। যখন ইংরেজী বর্জন করব, তখন বিষয়কোষের পরিধি বাড়ালেই চলবে, যাতে বিদেশী গ্রন্থের দরকার না হয়। আপাতত পাশ্চাত্ত্য কোনও বিষয় জানতে হলে ইংরেজী সাইক্লোপিডিয়াই দেখব। যা তাতে নেই, যা নিতান্ত এদেশের শুধু তার জন্যই বাংলা বিষয়কোষের প্রয়োজন।

শব্দকোষের মতন বিষয়কোষ বর্ণানুক্রমেই সংকলিত হওয়া আবশ্যক। বিষয়ের শ্রেণী অনুসারে ভাগ করলে (অর্থাৎ বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প জীবন-চরিত ইত্যাদি পৃথক পৃথক দিলে) সুবিধা হবে না। প্রস্তাবিত গ্রন্থে আল্পস্, লণ্ডন, পিরামিড, তড়িৎতত্ত্ব, সাইক্লোট্রন, ব্যাকটিরিয়া, বাওবার-বৃক্ষ অনাবশ্যক, কিন্তু অবিভক্ত ভারতের নগর পর্বত নদী মন্দিরাদি, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, শাল, সেগুন, ধান, যব, গম, আম, কাঁটাল, কলা থাকবে। এদেশের চটকল, কাপড় কল, কাগজ, সিমেণ্ট, রাসায়নিক সার, লোহা, তামা, এঞ্জিন, টেলিফোন, বন্দুক কামান বারুদ প্রভৃতির কারখানা, দামোদর পরিকল্পনা ইত্যাদির কথাও থাকবে। সীজার, শেক্সপীয়র, মার্কস,

স্তালিন, চার্চিল, ফরাসী-বিপ্লব, ইউরোপীয় দর্শন সাহিত্য ও কলা বাদ যাবে ; চন্দ্রগুপ্ত, কালিদাস, তুলসীদাস, রবীন্দ্রনাথ, বরাহমিহির, গান্ধী, সিপাহী-বিদ্রোহ, ভারতীয় দর্শন সাহিত্যকলা দিতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাদ যাবেন, আলেকজাণ্ডার, হিউএন্ত্সাং, মহম্মদ ঘোরি, অলবেরুনি, ভিক্টোরিয়া থাকবেন, কারণ তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘটেছিল। কৃষ্ণ বুদ্ধ চৈতন্য রামমোহন রামকৃষ্ণ থাকবেন, বিদেশী হলেও জরথুস্ত্র খ্রীষ্ট মহম্মদ সেণ্ট টমাস থাকবেন, কারণ এঁদের সঙ্গে বহু ভারতবাসীর ধর্মীয় সম্বন্ধ আছে ; কিন্তু আখেনাটেন সেণ্ট পল মার্টিন লুথার বাদ যাবেন। কংগ্রেস মোসলেম লীগ হিন্দু মহাসভা কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি ভারতীয় রাজনীতিক দল থাকবে, কিন্তু নাৎসী বলশেভিক কুমেনটাং প্রভৃতি বাদ যাবে।

কিউবা কোথায়? প্লেটোর প্রধান রচনাবলী কি কি? ক্যাসানোভা কে? আইফেল টাওয়ার কি? ইভোলিউশন থিওরি কি? জেস্যুইট কোয়েকার মরমন কারা? এই সব প্রশ্নের জন্য আমরা ইংরেজী সাইক্লোপিডিয়া দেখব। বাংলা বিষয়কোষে—দেখব মাণ্ডি রাজ্য কোথায়? ভাস কবির প্রধান রচনা কি কি? পরাগল খাঁ কে? যন্ত্রমন্ত্র কি? নব্য ন্যায় কি রকম? মিতাক্ষরা আর দায়ভাগের প্রভেদ কি? নাথপন্থী কর্তাভজা ওআহাবী কারা?

এই রকম একটি বিষয়কোষ রচনা করতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের সমবেত চেষ্টা চাই। তাঁরা এক বা একাধিক সম্পাদকের নির্দেশ অনুসারে লিখবেন অথবা তথ্য যোগান দেবেন। বাংলা দেশে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের তুল্য অশেষজ্ঞ পণ্ডিত দ্বিতীয় নেই। বয়স ছিয়ানব্বই হলেও তাঁর নানা বিষয়ে আগ্রহ আছে, এখনও তিনি লেখেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থের সম্পাদনের ভার তাঁকে দিতে বলছি না, লেখার জন্য কিছুমাত্র পীড়ন করতেও বলছি না। বিষয়কোষ যাঁরা রচনা করবেন তাঁদের কর্তব্য হবে

যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে যোগ রাখা, তাঁর উপদেশ নেওয়া, এবং তাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। নানা বিদ্যায় তাঁর অধিকার আছে, ভারতীয় জ্যোতিষ উদ্ভিদ প্রাণী এবং চিরাগত শিল্প সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান, এবং অনেক তথ্য তাঁর জানা আছে যা আমাদের আধুনিক শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা জানেন না। এদেশের লোকাচার এবং ব্রত-পূজাদি সম্বন্ধেও তিনি অনেক জানেন। তিনি বর্তমান থাকতে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যদি তথ্য আহরণ না করি, তবে আমরা বঞ্চিত হব।*

এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের উদ্যোগ কে করবেন? বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ জড়ত্ব লাভ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিত্য কর্ম আর শিক্ষার সংস্কার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, নূতন কিছুতে হাত দেবেন মনে হয় না। উত্তর ও মধ্য প্রদেশের সরকার নিজ ভাষার উন্নতির জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেছেন, শুনেছি একটি ছোট হিন্দী সাইক্লোপিডিয়া রচনারও আয়োজন হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র-পুরস্কার ছাড়া বাংলা ভাষার জন্য কিছু খরচ করেন কি না জানি না। নানা পরিকল্পনা আর বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জন্য তাঁরা অজস্র টাকা যোগাতে পারেন। যাতে এদেশের শিক্ষার সাহায্য হয়, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানলাভ হয়, এমন একটি উদ্দেশ্যের জন্য তাঁরা কি কয়েক হাজার টাকা খরচ করতে পারেন না? রাধাকান্ত দেব, মহাতাব চাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের তুল্য কোনও বিদ্যোৎসাহী বদান্য ব্যক্তি বা ধনী বাঙালী ব্যবসায়ী যদি সাহস করে গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করেন, তবে তাঁদের ক্ষতি না হয়ে লাভেরই সম্ভাবনা।

গ্রন্থ রচনার জন্য এমন একদল লোকের প্রয়োজন হবে যাঁরা

* এই প্রবন্ধ লেখবার সময়ে যোগেশচন্দ্র জীবিত ছিলেন।

ভূগোল ইতিহাস পুরাণ দর্শন বিবিধ বিজ্ঞান, কৃষি গোপালন খনিকর্ম শিল্প চিকিৎসা স্বাস্থ্যতত্ত্ব আইন রাজনীতি অর্থনীতি পরিসংখ্যান প্রত্নতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব লোকাচার সাহিত্য চারুকলা স্থাপত্য, বিবিধ ধর্মসম্প্রদায়, খ্যাত লোকের জীবনচরিত, ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ। যাঁরা শুধু পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাই শিখেছেন তাঁরা বেশি কিছু করতে পারবেন না। এদেশের ঐতিহ্য প্রকৃতি আর আধুনিক শিল্পোদ্‌যোগ সম্বন্ধে যাঁরা খবর রাখেন তাঁরাই এই কাজের যোগ্য। খ্যাতিমান সাক্ষিগোপাল বা অতি বৃদ্ধ অক্ষম লোককে সম্পাদনের ভার দেওয়া বৃথা। যিনি (বা যাঁরা) কর্মঠ ও বহুজ্ঞ, এমন লোককেই সম্পাদকপদে বরণ করতে হবে। সম্পাদক ও সহকর্মী সকলকে পরিমিত পারিশ্রমিক দিতে হবে, বেগারে কাজ চলবে না।

যদি জনকতক উৎসাহী সুশিক্ষিত লোক অগ্রণী হন তবে এই গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হতে পারবে। দু শ বৎসর আগে ফ্রান্সে কয়েকজন পণ্ডিত যার উদ্যোগ করেছিলেন এবং চার্চের বশংবদ রাজশক্তির প্রবল বাধা সত্ত্বেও যা সমাপ্ত করেছিলেন, তার চাইতে অনেক ছোট একটি গ্রন্থ রচনা কি এই যুগের বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব ?

১৮৭৭

অশ্লীল ও অনিষ্টকর

আমরা সিনেমার কবলে পড়েছি। শহরের দেওয়াল অভিনেত্রীদের ছবিতে ছেয়ে গেছে, সমস্ত খবরের কাগজে সিনেমার বড় বড় বিজ্ঞাপন আর বিবরণ ছাপা হচ্ছে। মোটা মোটা মাসিক পত্রিকায় বিখ্যাত লেখকদের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সিনেমা-সুন্দরীদের ছবি গিজগিজ করছে। পূজার মণ্ডপে হিন্দী ফিল্ম-সংগীত নিনাদিত হচ্ছে। তারকাদের লীলাভূমি বোম্বাই এখন সিনেমাক্রান্ত ছেলে-মেয়ের মক্কা-বারাণসী।

সম্প্রতি আমাদের হুঁশ হয়েছে—সিনেমা শুধু চিত্ত-বিনোদন করে না, অনেক ক্ষেত্রে চিত্তবিক্ষোভও করে। আপত্তিজনক ছবি আর বিজ্ঞাপন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। পুলিসের কর্তারা নাকি বলছেন তাঁদের হাত-পা বাঁধা, সেনসর বোর্ড যা পাস করেন তার উপর কথা চলে না। শুধু এদেশে নয়, বিলাতেও অশ্লীল ছবির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে। গত নভেম্বরের World Digest পত্রিকায় Sidney Moseleyর একটি প্রবন্ধ থেকে এই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—

By film, by television, by picture in the Press, we stir sexual emotions which are already astir in the normal human being. Do you wonder then, that some men, unable to resist the effect of the glamorous presentations of sex which are continually thrust before them, go berserk and that all sorts of tragedies result? When you tempt men with drink or doxies the result inevitable.

এর চাইতে কড়া সমালোচনা বোধ হয় এদেশে কেউ করেন নি। পাশ্চাত্ত্য দেশে কি রকম ছবি দেখানো হয় বা বিজ্ঞাপিত হয় তা ঠিক জানি না, তবে তার যেসব পোস্টার এখানে দেখা যায়, তা থেকে অনুমান করতে পারি যে ভারতীয় ছবির তুলনায় তা ঢের বেশী 'প্রগতিশীল'। এদেশের লোকমত এখনও পাশ্চাত্ত্যের মতন উদার আর নির্লজ্জ হয় নি। আমাদের আদর্শ কি হওয়া উচিত তাও স্থির করা সহজ নয়, কারণ অশ্লীলতার কোনও বহুসম্মত মানদণ্ড নেই। লোকমত কালে কালে বদলায়, দেশে দেশেও বিভিন্ন। স্ত্রী পুরুষ অল্পবয়স্ক আর পূর্ণবয়স্কের পক্ষে কি অবদ্য বা অনবদ্য তারও বিচার এক পদ্ধতিতে করা যায় না।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু অশ্লীলতা আছে। তার দোষ ক্ষালনের জন্য Horace Heyman Wilson বহুকাল পূর্ব্বে লিখেছেন—

These men wrote for men only; they never think of a woman as a reader. What is natural, cannot be vicious; what everyone knows, surely everyone may express; and that mind which is only safe in ignorance or which is only defended by decorum, possesses but a very feeble and impotent security.

অর্থাৎ যে বিষয়ের আলোচনা নারীর পক্ষে অশোভন, তা পুরুষের পক্ষে বিহিত হতে পারে। যা স্বাভাবিক, তা মন্দ হতে পারে না। যা সকলেই জানে, তা সকলেই প্রকাশ করতে পারে। যে মনকে অজ্ঞতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়, সে মন অত্যন্ত দুর্ব্বল, তার আত্মরক্ষার শক্তি নেই।

ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দ উপাদেয় গ্রন্থ, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি অনেক মনীষী তার বিলাস বর্ণনায় কুরুচি পেয়েছেন। ভারতচন্দ্রের রচনায় এবং প্রাচীন বাঙলা কাব্যে যে আদিরস আছে,

তা আধুনিক শিক্ষিত পাঠকের দৃষ্টিতে অশ্লীল, কিন্তু সেকালে কেউ তার দোষ ধরত না। পাঁচালি তরজা কবির লড়াই প্রভৃতির অশ্লীলতা ইতর ভদ্র সকলে উপভোগ করত। প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য লেখকদের অনেকে নিরঙ্কুশ ছিলেন। শেক্সপীয়রের Venas and Adonis এর তুলনায় কালিদাস জয়দেব ভারতচন্দ্র প্রভৃতির আদিরসাত্মক রচনা যেন শিশুপাঠ্য। Don Quixote গ্রন্থে একটি সরাইএর বর্ণনায় যে কুৎসিৎ বীভৎসতা আছে তা প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বিলাতে ভিক্টোরীয় যুগের ভদ্র শ্রেণী কিছু prude বা শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন, সাহিত্যে আর প্রকাশ্য সামাজিক আচরণে তার প্রভাব পড়েছিল। ইংরেজের শিষ্য বাঙালী লেখকরা সেই ভিক্টোরীয় শুচিতা আদর্শরূপে মেনে নিয়েছিলেন। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য থেকে লজ্জা প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে, বাঙলা সাহিত্যও কিছু অসংবৃত হয়েছে, কিন্তু ইংরেজীর তুলনায় পিছিয়ে আছে। খ্যাতনামা জনপ্রিয় ইংরেজ লেখকদের রচিত লোকসাহিত্যে এমন বর্ণনা দেখা যায়, যা আধুনিক বাঙলা গ্রন্থে থাকলে লেখক আর প্রকাশককে আদালতে দণ্ড পেতে হবে।

উপরে উইলসনের যে অভিমত দিয়েছি তা যুক্তিসম্মত হলেও সকল সমাজে গ্রহণীয় হবার সম্ভাবনা নেই। অশ্লীলতার মোটামুটি লক্ষণ—যা কামের উদ্দীপক অথবা উদ্দীপক না হলেও যা প্রচলিত রুচিতে কুৎসিত বা অশালীন গণ্য হয়। সামাজিক প্রথার সঙ্গে শালীনতার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। ভিক্টোরীয় যুগে ভদ্র নারীর decollete সজ্জা (অর্ধমুক্ত বক্ষ) ফ্যাশনসম্মত ছিল (এখনও আছে) কিন্তু অনাবৃত ankle বা পায়ের গোছ অশ্লীল গণ্য হত এবং পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এখন ankle প্রদর্শন রুচিসম্মত হয়েছে, পুরুষের লোভও প্রায় লোপ পেয়েছে। আমাদের দেশে নারীচরণের নিম্নভাগ কোনও

কালেই কামোদ্দীপক গণ্য হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় কবিরা পুরুষের দেহসৌষ্ঠব বর্ণনায় যেমন ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ লিখেছেন তেমনি সুন্দরীর রূপ বর্ণনায় পীনপয়োধরা ক্ষীণমধ্যা নিবিড়নিতম্বা করভোরু প্রভৃতি বিশেষণ দিয়েছেন। দেবীস্তোত্রেও এই সব লক্ষণ বর্জিত হয় নি। What is natural cannot be vicious—Wilsonএর এই সিদ্ধান্ত আমাদের প্রাচীন কবিরা বিলক্ষণ মানতেন। কিন্তু কালক্রমে এদেশে রুচির পরিবর্তন হয়েছে, নারীর রূপবর্ণনা এখন প্রাচীন রীতিতে করলে চলে না, একটু রেখে ঢেকে সংবৃতভাবে করতে হয়।

অনাত্মীয় পুরুষকে ভদ্র নারীর মুখ দেখানো নিরাপদ নয়, অর্থাৎ তা অশ্লীল—এই ধারণা থেকে ঘোমটা বোরখা অবরোধ অসূর্যম্পশ্যতা ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু তাতে অভীষ্ট ফল লাভ হয় নি। লোকে বহুকাল থেকে যা অনাবৃত দেখে তার সম্বন্ধে দুষ্ট বা morbid কৌতূহল হয় না, যা আবৃত তার প্রতিই আকৃষ্ট হয়। ৬০।৭০ বৎসর আগে অতি অল্প বাঙালী মেয়ে স্কুল-কলেজে যেত। তাদের সম্বন্ধে অল্পবয়স্ক পুরুষদের দুষ্ট কৌতূহল ছিল। কিশোরী আর যুবতী নূতন ধরনে শাড়ি পরে জুতো পায়ে দিয়ে হাতে বই নিয়ে খুটখুট করে চলেছে—এই অভিনব দৃশ্যে অনেকের চিত্তবিকার হত, সেজন্য মেয়েদের পায়ে হেঁটে যাওয়া নিরাপদ গণ্য হত না। এখনকার পুরুষেরা পথচারিণীদের সহজভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ সর্বকালে সর্বদেশেই আছে, তাই মাঝে মাঝে মেয়েদের অপমান সইতে হয়। শিস, অশ্লীল গান বা ঠাট্টা, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি ধর্ষণেরই অনুকল্প।

অনিষ্টকর না হলেও অনেক বিষয় শিষ্ট রুচির বিরোধী বা কুৎসিত গণ্য হতে পারে। ভাতার শব্দ ভর্তার অপভ্রংশ মাত্র, অর্থে গৌরব আছে, কামগন্ধ নেই। তথাপি শিষ্টজনের রুচিতে অশ্লীল। এই রকম অনেক শব্দ আছে, যার সংস্কৃত রূপ বা ডাক্তারী নাম শিষ্ট

কিন্তু বাঙলা গ্রাম্য রূপ অশ্লীল গণ্য হয়। অনেক সময় অল্পবয়স্করা (এবং অনেক বৃদ্ধও) নিজেদের মধ্যে অশ্লীল আলাপ করে। বোধ হয় তাতে তারা নিষেধ লঙ্ঘনের আনন্দ পায়। যারা এরকম করে, তাদের দুশ্চরিত্র মনে করার কারণ নেই। মাতা ভগিনী কন্যা সম্পর্কিত কুৎসিত গালি যাদের মধ্যে চলিত আছে তারা অসভ্য হলেও দুর্বৃত্ত না হতে পারে। অশ্লীল বিষয়ের প্রভাবও সকলের উপর সমান নয়। এমন লোক আছে যারা স্থন্দরী নারীর চিত্র বা প্রতিমূর্তি দেখলেই বিকারগ্রস্ত হয়। আবার এমন লোকও আছে যারা অত্যন্ত অশ্লীল দৃশ্য দেখে বা বর্ণনা শুনেও নির্বিকার থাকে।

সামাজিক সংস্কার অনুসারে অতি সামান্য ইতরবিশেষে শ্লীল বিষয়ও অশ্লীল হয়ে পড়ে। কোথায় পড়েছি মনে নেই—এক পাশ্চাত্ত্য চিত্রকর একটি নগ্ন স্ত্রীমূর্তির sketch এঁকে তাঁর বন্ধুকে দেখান। বন্ধু বললেন, অতি অশ্লীল। চিত্রকর বললেন, তুমি কিছুই বোঝ না, অশ্লীল কাকে বলে এই দেখ। এই বলে চিত্রকর মূর্তির পায়ে জুতো এঁকে দিলেন। বন্ধু তখন স্বীকার করলেন, চিত্রটি আগে নির্দোষ ছিল, এখন বাস্তবিকই অশ্লীল হয়েছে।

অনিষ্টকর না হলেও অনেক বিষয় কেন কুৎসিত গণ্য হয় তার ব্যাখ্যান নৃবিজ্ঞানী anthropologist আর মনোবিজ্ঞানীরা করবেন। আমাদের শুধু মেনে নিতে হবে যে নানারকম taboo সব সমাজেই আছে এবং তা লঙ্ঘন করা কঠিন, যদিও কালক্রমে তার রূপান্তর হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে মেয়েদের অভিনয় আর নাচের প্রবর্তন করেন তখন তাঁকে বিস্তর গঞ্জনা সইতে হয়েছিল। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে রুচি আর শালীনতার ধারণাও বদলায়। ২৫।৩০ বৎসর আগে কেউ ভাবতেও পারত না যে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী কুলললনা বক্ষ আর পৃষ্ঠ অর্ধমুক্ত আর কক্ষ প্রকটিত করে পরপুরুষের বাহুলগ্না হয়ে বল নাচে মেতেছে। ভদ্র পুরুষের নটবৃত্তিতে আমরা বহু-কাল থেকে অভ্যস্ত। কিন্তু ভদ্র নারী সিনেমায় নেমে বহুজনপ্রিয়া রূপ-

বিলাসিনী হবে এবং প্রচুর প্রতিপত্তি পাবে—এও ২৫।৩০ বৎসর আগে কল্পনাতীত ছিল। অচির ভবিষ্যতে বাঙালীর 'হোটেলে' বা রেস্তোরাঁতে হয়তো cabaretএর ব্যবস্থা হবে এবং তাতে মেয়েরা নাচবে।

প্রায় দু শ বৎসরের ব্রিটিশ রাজত্বে আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের পরে যেন পরিবর্তনের প্লাবন এসেছে, দেশের লোক অত্যন্ত আগ্রহে বিলাতী আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করছে। ভবিষ্যৎ বাঙালী তথা ভারতীয় সমাজ পাশ্চাত্ত্য সমাজের নকলেই গড়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের প্রগতিতে অর্থাৎ সাহেবীভবনে যে বিলম্ব হচ্ছে, তার প্রধান কারণ দারিদ্র্য, প্রাচীন সংস্কার নয়। যাঁরা ধনী তাঁদের অনেকে বহুদিন পূর্বেই ইঙ্গবঙ্গ সমাজ স্থাপন করেছেন। জাপানে যা হয়েছে ভারতেও তা না হবে কেন? পাশ্চাত্ত্য বীর্য উদ্যম কর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ না পেলেও ক্ষতি নেই, পাশ্চাত্ত্য রীতি নীতি ফ্যাশন ব্যসন যথাসাধ্য আত্মসাৎ করতেই হবে, তাই আমাদের পরম পুরুষার্থ।

মহা বাধা আমাদের দারিদ্র্য। টাকার জোরে এবং শখের প্রাবল্যে অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান শীঘ্রই পূর্ণমাত্রায় সাহেব হয়ে যেতে পারবে, কিন্তু মধ্যবিত্ত আর অল্পবিত্ত সকলকেই লোভের মাত্রা কমিয়ে নিজের সামর্থ্যের উপযোগী আধা বা সিকি-সাহেবী সমাজে তুষ্ট হতে হবে। আমাদের রুচি আর শালীনতাও এই মধ্যাল্পবিত্ত সমাজের বশে নিরূপিত হবে।

এদেশের যাঁরা নিয়ন্তা, অর্থাৎ বিধানসভা ইত্যাদির সদস্য, তাঁদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্ত। অশ্লীলতা দমন এঁদেরই হাতে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণমাত্রায় পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন নয়, ইওরোপ আমেরিকার রুচি এঁরা অন্ধভাবে মেনে নিতে পারবেন না। অতএব আশা করা যেতে পারে, অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীর রুচি অনুসারেই এঁরা শ্লীলতা বা অশ্লীলতা, নিরাপত্তা বা অনিষ্টকারিতা বিচার করবেন এবং তদনুসারে সিনেমার ছবি আর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রিত করবেন।

কোনও সাহিত্যিক রচনা ভাল কি মন্দ তার বিচার সমালোচকরা ধীরে সুস্থে করেন। তাঁদের মানদণ্ড অনির্দেশ্য, সকলে তা প্রয়োগ করতে পারে না। যদি বিদগ্ধতার খ্যাতি থাকে তবে পাঠক-সাধারণ তাঁদের অভিমতই মেনে নেয়। মত প্রকাশে দেরি হলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু সিনেমা-ছবির নির্বাচন অবিলম্বে করতে হয়, সেনসর-বোর্ড বেশী সময় নিতে পারেন না। তাঁরা কিরকম মানদণ্ড অনুসারে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচার করবেন?

সেনসর-বোর্ডের সদস্যদের রুচি যদি মোটামুটি একরকম হয় তবে বিচার কঠিন হবে মনে করি না। তাঁদের অতিমাত্রায় উদার না হওয়াই উচিত। যদি তাঁরা মনে করেন, কোনও ছবি দেখে এক শ দর্শকের মধ্যে দশজনের চিত্তবিকার হতে পারে তবে সে ছবি মঞ্জুর করবেন না। মনোবিজ্ঞানীরা যাকে psycho-somatic effect বলেন, অর্থাৎ মানসিক উত্তেজনার ফলে দৈহিক বিকার (পূর্বে উদ্ধৃত Sydney Moseleyর উক্তিতে তারই ইঙ্গিত আছে)—তার সম্ভাবনা থাকলে সে ছবি অবশ্যই বর্জন করবেন। বিদেশে সে ছবি দেখানো হয় কিনা, ভারতের অন্য প্রদেশের সেনসর-বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে কিনা—তা ভাববার দরকার নেই। যা তাঁদের নিজের বিচারে অবাঞ্ছিত, এখানকার সেনসর-বোর্ড তা অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন, পরিবারের সকলে যে ছবি একসঙ্গে দেখতে পারে শুধু সেই ছবিই মঞ্জুর করা উচিত, প্রাপ্তবয়স্ক আর অল্পবয়স্কর জন্যে ভেদ রাখা অন্যায়। এই প্রস্তাব অতি সমীচীন। কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য—এই কথা বিজ্ঞাপনে লিখলেই অল্পবয়স্কদের লোভ বাড়ানো হয়।

আর্টের অসংখ্য উপাদানের মধ্যে কিঞ্চিৎ কামকলার প্রয়োজন থাকতে পারে। সিনেমা আর সাহিত্যে তার প্রয়োগ যদি সংযত করা হয় তবে আর্ট আর সংস্কৃতি চর্চার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।

১৮৮০

পরিপূর্ণ সাহিত্য

রোজগার বললে অধিকাংশ বাঙালী বোঝে চাকরি। ওকালতি ডাক্তারি ঠিকাদারি দালালি ব্যবসা ইত্যাদি রোজগার হলেও অগ্রগণ্য নয়, সাধারণ ভদ্রসন্তানের দৃষ্টিতে চাকরিই সর্বোত্তম জীবিকা। সেই রকম, সাহিত্য বললে অধিকাংশ বাঙালী বোঝে প্রধানত গল্প-উপন্যাস, তার পর কবিতা, তার পর লঘু প্রবন্ধ বা রম্যরচনা। ইংরেজীতে literature অর্থে অনেক রকম রচনা বোঝায়, কিন্তু বাঙলায় সাহিত্য শব্দ অতি সংকীর্ণ অর্থে চলে। অমুক একজন সাহিত্যিক এ কথার মানে, লোকটি গল্প উপন্যাস বা কবিতা লেখেন অথবা তার সমালোচনা করেন।

অনেকে বলেন, বাঙলা কথাসাহিত্য এখন ইংরেজীর সমকক্ষ এবং বাঙলা ভাষা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চাইতে অনেক এগিয়ে আছে। কথাটা হয়তো সত্য, কিন্তু সেজন্যে আমাদের বেশী আত্মপ্রসাদের কারণ নেই। শুধু গল্প-উপন্যাস নয়, সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অবস্থা কি রকম তা ভাবা দরকার।

স্কুল-কলেজের টেক্স্‌ট-বুক, শিশুপাঠ্য গল্প-কবিতা, ওকালতি ডাক্তারি ইত্যাদি কর্ম সংক্রান্ত পুস্তক, রাজ্যশাসন সংক্রান্ত নানা-রকম বিধিগ্রন্থ—এই সব ছাড়া যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাই বয়স্থ জনসাধারণ অবসরকালে পড়ে। তা থেকেই আধুনিক বাঙালী লেখক আর পাঠকের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত রচনা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে—উদ্‌ভাবী (বা কাল্পনিক) আর ভাবাত্মক অর্থাৎ creative আর emotional রচনা। গল্প উপন্যাস কবিতা

ভক্তিগ্রন্থ ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবং এই সবেরই পাঠক বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে—জ্ঞানাত্মক আর বাস্তব-বিষয়ক অর্থাৎ informative আর factual রচনা। এই শ্রেণীর উদাহরণ—বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব', রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর, বিশ্বপরিচয়', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা, বিচিত্র জগৎ', চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বিশ্বের উপাদান', বিনয় ঘোষের 'পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতি', সমরেন্দ্রনাথ সেনের 'বিজ্ঞানের ইতিহাস।' প্রথম শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থসংখ্যা অনেক কম, পাঠকও কম। এসব বইএর বারো মাসে তেরো সংস্করণ হবার কোন আশা নেই।

ইংরেজী প্রভৃতি সমৃদ্ধ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পত্রিকা আছে, যেমন, গল্প-উপন্যাস, কবিতা, দেশ-ভ্রমণ, সার-সংকলন বা digest, খেলা, বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদি, বাঙলা পত্রিকার বৈচিত্র্য বেশী নেই, সাধারণ মাসিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকায় সব রকম জনপ্রিয় রচনা ছাপা হয়। এইসব পত্রিকায় নানারকম বইএর যে বিজ্ঞাপন থাকে তা থেকেই বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থার আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। আমার অনুরোধ statisticsএর একটি ছাত্র অনেকগুলি বিজ্ঞাপন থেকে একটি মোটামুটি পরিসংখ্যান খাড়া করেছেন। তাঁর হিসাব অনুসারে বিজ্ঞাপিত বিভিন্ন শ্রেণীর বইএর শতকরা হার এই রকম :—

গল্প, উপন্যাস এবং তার আলোচনা	৭৫
কবিতা, নাটক এবং তার আলোচনা	৫
ভক্তিগ্রন্থ	৬
চরিতকথা, স্মৃতিকথা	৪
ভ্রমণকথা, স্থান-বিবরণ	২
ইতিহাস	২
রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব	২
অর্থনীতি, কৃষি, বাণিজ্য শিল্প	১এর কম

দার্শনিক বিষয়	১
বৈজ্ঞানিক বিষয়	১এর কম
ফলিত জ্যোতিষ, আলৌকিক বিষয়	১
অন্যান্য বিবিধ বিষয়—	১

এই ফর্দ থেকে বোঝা যায় যে বাঙলা সাহিত্যের শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ উদ্‌ভাবী বা কাল্পনিক এবং ভাবাত্মক রচনা। ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যেও গল্প-উপন্যাসাদির সংখ্যা বেশী, কিন্তু জ্ঞানাত্মক গ্রন্থের অনুপাত এদেশের মতন অত অল্প নয়

সংস্কৃত শাস্ত্রে চৌষট্টি কলার উল্লেখ আছে, তার কতকগুলি ইংরেজী art সংজ্ঞার অন্তর্গত। যেমন গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য আলেখ্য তক্ষণ। ইংরেজীতে গল্প আর কাব্য-রচয়িতাও আর্টিস্টরূপে গণ্য হন, বাঙলাতেও তাঁদের কলাবিৎ বলা চলে। যাঁরা ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন, গীত-বাদ্য নৃত্য বা অভিনয় করেন তাঁরা যেমন আর্টিস্ট, গল্প-উপন্যাস আর কবিতার লেখকও তেমনি আর্টিস্ট, বা কলাবিৎ। এঁদের সকলেরই রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন। যাতে বিনোদনের সঙ্গে মনের উৎকর্ষ আর অনুভূতির প্রসার হয় সেই রচনাই অবশ্য প্রকৃষ্ট। সকল দেশেই সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ আর্ট বা কলাচর্চা।

সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে কথাসাহিত্য কাব্য সংগীত নাট্য চিত্রকলা প্রভৃতি অপরিহার্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কলাচর্চাই সংস্কৃতির সবটা নয়। উদ্‌ভাবী বা কাল্পনিক, এবং ভাবাত্মক, creative আর emotional সাহিত্যে সব প্রয়োজন মেটে না, জ্ঞানাত্মক আর বাস্তব বিষয়ক সাহিত্যও অপরিহার্য। এই জাতীয় সাহিত্য বাঙলায় যথেষ্ট নেই।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, জ্ঞানাত্মক বাস্তব বিষয়ের চর্চা তো স্কুল-কলেজেই চুকে গেছে, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ বয়সেও যদি তার জের টানতে হয় তবে জীবন দুর্বহ হবে। এ রকম মনোভাব ঠিক নয়।

শিক্ষার শেষ নেই, আজীবন তা চলে। ঠেকে শেখা শুনে শেখা আর দেখে শেখার সুযোগ সকল ক্ষেত্রে মেলে না, তাই যত কাল সামর্থ্য তত কালই পড়ে শিখতে হয়। মানুষের যে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা পুরাকাল থেকে সংগৃহীত হয়ে আসছে তা শুধু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সংরক্ষিত গুহ্য বিদ্যা নয়, জনসাধারণের সাহিত্যেও যথাসম্ভব মনোজ্ঞ ভাষায় তাকে স্থান দিতে হবে।

টেক্স্‌ট-বুক প্রায় নীরস রচনা, পরীক্ষা পাসের জন্যেই ছেলে-মেয়েরা তা পড়ে। সে রকম লেখা বয়স্থ লোকের উপযুক্ত নয়। শুধু তথ্য থাকলেই চলবে না, রচনা চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই, তবেই সাধারণ পাঠকের পড়বার আগ্রহ হবে। ইংরেজীতে এই জাতীয় গ্রন্থ বিস্তর আছে, পাঠকও অসংখ্য। উদাহরণ আর আদর্শস্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম করছি।—

H. G. Walesএর Short History of the World, সদ্য প্রকাশিত Julian Huxleyর Story of Evolution, M. Davidsonএর Easy Outline of Astronomy, Gilbert Murryর Myths and Ethics, A. N. Whiteheadএর Science and the Modern World, নির্মলকুমার বসুর Cultural Anthropology.

বাঙলায় এই জাতীয় গ্রন্থ নেই এমন নয়, কিন্তু যথেষ্ট নেই। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ নামে বিশ্বভারতী অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ ছোট বই প্রকাশ করেছেন। শুনেছি এই গ্রন্থমালার ক্রেতা অনেক কিন্তু পাঠকও অনেক কিনা জানি না।

বাঙলা গল্প কাব্য আর ভক্তিগ্রন্থ সংখ্যায় এবং উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য রচনায় হিন্দী এগিয়ে যাচ্ছে। কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশের অনেক বৎসর আগেই হিন্দী অনুবাদ ছাপা হয়েছে। ভারতের প্রাকৃতিক আর শিল্পজাত দ্রব্যের বিবরণেও হিন্দী অগ্রণী। বাঙলার তুলনায় হিন্দীভাষীর সংখ্যা

অনেক বেশী, হিন্দী বই-এর পাঠকও বেশী। বিহার উত্তরপ্রদেশ পঞ্জাব রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ—এই সকল রাজ্যে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্যে প্রচুর সরকারী সাহায্য আর উৎসাহ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পোষকতা তো আছেই। এ সবের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারী সাহায্য অতি অল্প। আমাদের অপূর্ণ সাহিত্যকে পূর্ণতা দেবার জন্যে লেখক প্রকাশক পাঠক আর সরকার সকলকেই অবহিত হতে হবে। বাঙলা সাহিত্য চিরকালই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয়ে থাকুক এমন স্পর্ধা করতে বলি না, কিন্তু বাঙলা সাহিত্য সকল বিভাগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক এই কামনা বাঙালি মাত্রেরই করা উচিত।

১৮৮১

রচনা ও রচয়িতা

আমরা যেসব বস্তু নিত্য ব্যবহার করি তার অধিকাংশের উদ্দেশ্য জীবনযাত্রার স্থূল প্রয়োজন মেটানো। এইসব বস্তুর কতকগুলি অতি প্রাচীন, তাদের উদ্‌ভাবক বা প্রবর্তকের নাম আমাদের জানা নেই। যেমন তীর-ধনুক, পোড়ামাটির বাসন, গাড়ির চাকা, কাপড় বোনার তাঁত ইত্যাদি। কতকগুলি বস্তুর প্রবর্তকের নাম আমরা জানি এবং সসম্মানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কিন্তু তাঁদের প্রবর্তিত বস্তুর পরিবর্তন করতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাতে তাঁদের মর্যাদাহানি হবে তাও মনে করি না। আমরা চাই, যা কাজের জিনিস তা আরও কাজের উপযুক্ত হক, আরও ভাল হক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত প্রথম ব্যাকরণের জন্যে পাণিনির নাম জগদ্‌বিখ্যাত, কিন্তু পরবর্তী ব্যাকরণকারগণ পাণিনির অন্ধ অনুকরণ করেন নি। প্রথম বিজলী বাতির উদ্‌ভাবক এডিসন এবং প্রথম সার্থক এয়ারোপ্লেনের নির্মাতা রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, কিন্তু তাঁদের নির্মিত বস্তুর সঙ্গে আধুনিক বস্তুর সাদৃশ্য খুব কম।

নিত্যব্যবহার্য জিনিসের উপযোগিতা বা utilityই অগ্রগণ্য, তার উদ্‌ভাবকের কীর্তি অতি গৌণ। কে প্রথমে তৈরি করেছিলেন তা অনেকেই জানে না, যারা জানে তারাও ব্যবহারকালে স্মরণ করে না। কিন্তু যেসব বস্তুর মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দদান অথবা ভাব বা রসের উৎপাদন, তার সঙ্গে রচয়িতার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। রচয়িতা যদি অজ্ঞাত হন তথাপি তাঁর কৃতির উপর অন্যের হস্তক্ষেপ স্যাক্রিলেজ তুল্য অপরাধ গণ্য হয়। কেউ যদি অ্যাপোলো বেলভিডিয়ার বিগ্রহ ও অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি আরও ভাল করে গড়তে চায়, কিংবা কালিদাস শেক্সপীয়ার রবীন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কার করতে চায়, তবে সে উন্মাদ গণ্য হবে।

বেদের এক নাম শ্রুতি, কারণ গুরুশিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখে আর শুনে শুনে বেদাধ্যয়ন হত। প্রাচীন ভারতের লিপির প্রচলনের পরেও বেদাভ্যাসের এই পদ্ধতি বজায় ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সহজে প্রশংসা করেন না, কিন্তু তারাও মেনেছেন যে অন্তত তিন হাজার বৎসর যাবৎ বেদবিদ্যা মুখে মুখেই চলে আসছে এবং অপরিবর্তিত আছে। শুধু তার বাক্য নয়, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ভেদে তার উচ্চারণ বা পঠনরীতিও প্রায় যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। এই আশ্চর্য ঘটনার কারণ, বেদের প্রতি ভারতবাসীর অসীম শ্রদ্ধা। বাঙলা দেশে বেদচর্চা প্রায় লোপ পেয়েছিল, সেজন্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতকে শুদ্ধ পাঠ শেখবার জন্যে কাশী পাঠিয়েছিলেন। এখনও ব্রাহ্ম উপাসনায় প্রাচীন রীতিতে উপনিষদাদির শ্লোক উচ্চারিত হয়।

শুধু বেদ নয়, সংস্কৃত কাব্য পাঠের রীতিও অতি প্রাচীন এবং সর্বত্র প্রায় একরকম। কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণে বিকার এসেছে। শুনেছি কোনও এক পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, সংস্কৃত বাক্য রচনার যেমন গৌড়ী আর বৈদর্ভী রীতি আছে তেমনি বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণকে গৌরী রীনি রূপে মেনে নিতে দোষ কি? এই উক্তির জন্য তিনি ধমক খেয়েছিলেন। আমরা সংস্কৃত কবিতা সুর করে পড়তে জানি না, নীরস গদ্যের মতন পড়ি; কিন্তু ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে সুর করে পড়াই রীতি। বিহারী উত্তরপ্রদেশী মরাঠী গুজরাটী এবং দ্রাবিড় পণ্ডিতরা প্রায় একই সুরে সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করেন। এই চিরাগত রীতির কারণও সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ।

আমাদের দেশের অনেক ওস্তাদ মনে করেন, গান-বাজনা গুণিজনের স্বচ্ছন্দ বিহার বা কসরতের ক্ষেত্র, যদি নির্দিষ্ট সুর আর তাল মোটামুটি বজায় রাখা হয় তবে কর্তব বা সুর ভাঁজায় গায়কের চিরন্তন অধিকার আছে। গান যদি বেওয়ারিস হয় কিংবা গানের

বাক্য যদি তুচ্ছ আর সুরের বাহন মাত্র হয় তবে কর্তবে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু রচয়িতা যদি কবিতার সঙ্গে তাল মান লয় যোগ করে গান রচনা করেন তবে তার অলংকরণের অধিকার গায়কের থাকে না। কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বরকে বাগর্থ তুল্য সম্পৃক্ত বলেছেন। কবি যখন গান রচনা করেন তখন বাক্ আর অর্থের সঙ্গে সুরও সম্পৃক্ত করেন, অর্থাৎ কবিরচিত গানে কবিতার সঙ্গে সুরের অচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয় বন্ধন ঘটে।

রবীন্দ্রকাব্যের বাক্যের পরিবর্তন যেমন গর্হিত, রবীন্দ্রসংগীতের সুরের পরিবর্তন বা অলংকরণও তেমনি গর্হিত। মনা লিসার বাঁকা হাসি যদি ভাল না লাগে তবে অতি বড় চিত্র-বিশারদেরও তা সোজা করার অধিকার নেই। যিনি মনে করেন, নির্দিষ্ট রীতিতে না গেয়ে রবীন্দ্রসংগীত আরও শ্রুতিমধুর করে গাওয়া যেতে পারে, তাঁর উচিত অন্য গান রচনা করে তাতে নিজের সুর দেওয়া।

১৮৮১

স্নেহদ্রব্য

বাঙালীর রান্নায় সরষের তেল আর ঘি বহুকাল থেকে চলে আসছে। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে পঞ্জাবী আর উত্তরপ্রদেশীকে বলতে শুনেছি, সরষের তেল খেলে পেট জ্বলে যায়, কিন্তু এখন তারাও খেতে আরম্ভ করেছে। গান্ধীজী বলতেন, লংকা আর সরষের তেল বিষবৎ ত্যাজ্য। কিন্তু লংকাখোর দক্ষিণভারতবাসীর জঠর এপর্যন্ত দগ্ধ হয় নি, বাঙালীর জঠরও সরষের তেলে স্নিগ্ধ আছে, যদিও কেউ কেউ বিষাক্ত ভেজাল তেল খেয়ে রোগে পড়েছেন।

'বনস্পতি' নাম কোন্ মহাপণ্ডিত চালিয়েছেন জানি না। সরকার এই উৎকট নাম মেনে নিয়েছেন। এর আভিধানিক অর্থ— পুষ্পব্যতিরেকে ফলজনক বৃক্ষ, অশ্বত্থাদি ; বৃক্ষ মাত্র। (শব্দসার)। হিন্দীতে বনস্পতি মানে উদ্‌ভিদ। যদি সেই অর্থই ধরা হয় তা হলেও উদ্‌ভিজ্জ তৈলজাত দ্রব্যবিশেষের নাম বনস্পতি হবে কেন? গরু থেকে দুধ হয়, দুধ থেকে ঘি। সে কারণে ঘিকে গরু বলা চলে কি? এই প্রবন্ধে হাইড্রোজেনেটেড অয়েলকে সংক্ষেপে হাইড্রোতেল বলব। বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত এই দ্রব্য 'ডালডা, রসোই, কুসুম, পকাও' ইত্যাদি নানা নামে বিক্রি হয়।

গত যুদ্ধের আগে ঘি আর সরষের তেলের যে দাম ছিল এখন তার পাঁচ-ছ গুণ হয়েছে। হাইড্রোতেল প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিদেশ থেকে আসতে আরম্ভ করে প্রথম প্রথম হোটেলের রান্নায়, ময়রার ভিয়ানে, আর ঘিয়ের ভেজালে চলত, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ তা পছন্দ করত না, যদিও দাম ছিল দশ আনা সেরের কাছাকাছি, অর্থাৎ ঘিএর অর্ধেক। অনেকে মনে করত, বস্তুটি অপকারী, অন্তত তার 'ফুড-ভ্যালু' কিছু নেই। হাইড্রোতেল সম্বন্ধে সাধারণের ভয়

ক্রমশ দূর হল, গৃহস্বামীর আপত্তি থাকলেও গৃহিণীরা লুকিয়ে আনাতে লাগলেন। কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের কর্ত্রী আমাকে বলেছিলেন, কি করা যায় বলুন, ছেলেগুলো রাক্ষসের মতন লুচি খাচ্ছে, কাহাঁতক ঘি যোগাব? (ঘি তখন পাঁচ সিকে সের)।

এখন এদেশে প্রচুর হাইড্রোতেল তৈরি হচ্ছে, জনকতকের আপত্তি থাকলেও জনসাধারণ বিনা দ্বিধায় খাচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি এই বস্তুটির বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগ উঠেছে, এবং সবিশেষ জানবার জন্যে অনেকে আগ্রহী হয়েছেন। এই প্রবন্ধে তেল ঘি হাইড্রোতেল প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

স্নেহ (fat)

ইংরেজী ফ্যাট শব্দের অর্থ প্রাণিদেহের চর্বি, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় মাখন ঘি আর উদ্‌ভিজ্জ তেলও ফ্যাট-এর অন্তর্গত। এই ব্যাপক অর্থে ফ্যাট-সংজ্ঞার প্রতিশব্দ রূপে অনেকে লেখেন, চর্বি বা চর্বি-জাতীয় দ্রব্য। ইংরেজী প্রয়োগের অন্ধ অনুকরণে সরষে তিল ইত্যাদির তেলকে চর্বি বললে আমাদের সংস্কারের উপর পীড়ন হয়। বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে ফ্যাট-এর প্রতিশব্দ স্নেহ বা স্নেহদ্রব্য লেখাই ভাল, তাতে ভুল বোঝাবার সম্ভাবনা থাকবে না।

স্নেহাম্ল (fatty acid)

স্নেহ শব্দের এক অর্থ, স্নিগ্ধতা, চিক্কণতা, বা তেলা ভাব। ভ্যাসেলিন, লুব্রিকেটিং অয়েল প্রভৃতিও চিক্কণ, কিন্তু তাদের রাসায়নিক গঠন স্নেহ বা ফ্যাটের তুল্য নয়। স্নেহ মাত্রেরই প্রধান উপাদান গ্লিসারিন এবং কয়েক প্রকার স্নেহাম্ল বা ফ্যাটি অ্যাসিড। রসায়ন শাস্ত্রে যাকে অম্ল বা অ্যাসিড বলা হয় তার স্বাদ টক নাও হতে পারে। টক নয়।

অপূরিত (unsaturated) ও প্রপূরিত (saturated)

প্রত্যেক স্নেহাম্লের অণুতে কতকগুলি কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু থাকে। এই সব পরমাণুর বিন্যাস ও সংখ্যা এক-এক স্নেহাম্লে এক-এক প্রকার। এক শ্রেণীর স্নেহাম্লে আরও হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়ে দিতে পারা যায়, অপর শ্রেণীতে তা পারা যায় না। প্রথম শ্রেণীকে বলা হয় অপূরিত (অনসাটুরেটেড), অর্থাৎ যতটা হাইড্রোজেন থাকতে পারে ততটা নেই, হাইড্রোজেনের কিছু আসন খালি আছে। অপর শ্রেণীর স্নেহাম্লকে বলা হয় প্রপূরিত (স্যাটুরেটেড), অর্থাৎ এগুলিতে পূর্ণমাত্রায় হাইড্রোজেন আছে, আসন খালি নেই।

বিভিন্ন তেলে আর ঘিএ যে স্নেহাম্ল থাকে তার মধ্যে অপূরিত আর প্রপূরিতের শতকরা হার মোটামুটি এই রকম—

	অপূরিত	প্রপূরিত
সরষের তেল	৫০	৫০
তিল তেল	৮৫	১৫
চীনাবাদাম তেল	৭৫-৮৭	২৫-১৩
নারকেল তেল	২	৯৮
ঘি (গাওয়া ভঁয়ষার কিছু তারতম্য আছে)	২৯	৭১

সরষে তিল আর চীনাবাদাম তেলে অপূরিত স্নেহাম্ল প্রচুর আছে, এই সব তেল শীতকালেও তরল থাকে। নারকেল তেল আর ঘিএ প্রপূরিত বেশী, ঠাণ্ডায় জমে যায়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সংযোগ করলে অপূরিত স্নেহাম্ল প্রপূরিত হয়ে যায়, তার ফলে তরল তেল গাঢ় হয়। যোজিত হাইড্রোজেনের মাত্রা অনুসারে তেলের রূপ ঘিএর মতন নরম, ছাগল ভেড়ার চর্বির মতন জমাট বা মোমের মতন শক্ত করা যায়। এদেশে ৯ ভাগ চীনাবাদাম তেল ১ ভাগ তিল তেল মিশিয়ে তাই থেকে

হাইড্রোতেল তৈরি হয়, কিন্তু সবগুলির গাঢ়তা সমান নয়। হাইড্রোতেলের কথা পরে হবে, এখন সাধারণ তেলের কথা বলছি।

কোন্ তেল ভাল?

ভারতের অনেক প্রদেশে তিল আর চীনাবাদাম তেলে রান্না হয়, দক্ষিণ ভারতে নারকেল তেলও চলে। বাঙালী সহজে অভ্যাস বদলাতে পারে না। বারো-তেরো বৎসর আগে যখন সরষের তেল খুব দুষ্প্রাপ্য হয়েছিল তখন অনেকে জেনে শুনে ভেজাল তেল কিনত, কিন্তু তিল বা চীনাবাদাম তেল ছুঁত না। প্রচলিত তেলের মধ্যে কোন্‌টি বেশী হজম হয় বা বেশী পুষ্টিকর তার পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত হয় নি, অতএব নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। আয়ুর্বেদে তিল তৈলের বহু প্রশংসা আছে, তৈল শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থই তিলজাত (যেমন oil-এর মৌলিক অর্থ olive-জাত)। সরষে তিল আর চীনাবাদাম তিন রকম তেলই অনেক কাল থেকে ভারতবাসীর রান্নায় চলছে, তাতে স্বাস্থ্যহানি হয়েছে এমন শোনা যায় নি। অতএব ধরা যেতে পারে যে তিনটি তেলই সুপাচ্য। অবশ্য এমন লোক আছে যার পেটে এক রকম তেল সয় কিন্তু অন্য রকম তেল সয় না, কিংবা ঘি সয় কিন্তু কোনও তেল সয় না। সব রকম তেলের চাইতে ঘি বেশী পাচ্য আর পুষ্টিকর, এ বিষয়ে মতভেদ নেই।

খাদ্যের রাসায়নিক গঠনের সঙ্গে তার পাচ্যতা আর পুষ্টিকরতার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ সকল ক্ষেত্রে সুনির্ণীত হয় নি। মোটামুটি দেখা যায়, স্নেহদ্রব্যের মধ্যে যেগুলি তরল এবং যাতে অপূরিত স্নেহাম্ল বেশী, সেইগুলিই সহজে জীর্ণ হয়। ঘিএ প্রপূরিত স্নেহাম্ল বেশী থাকলেও তার লঘু গঠনের জন্য সুপাচ্য। তা ছাড়া ঘিএ ভাইটামিন এ আর ডি আছে, তেলে নেই। নারকেল তেলে প্রপূরিত স্নেহাম্ল খুব বেশী, কিন্তু তার কতকটা ঘিএর তুল্য।

পূর্বোক্ত তালিকায় বিভিন্ন তেলের যে স্নেহাম্ল দেখানো হয়েছে তাতে তিল তেলে অপূরিত স্নেহাম্ল সব চাইতে বেশী আর প্রপূরিত কম। এই কারণে অন্য তেলের তুলনায় সম্ভবত তিল তেল পাচ্যতায় শ্রেষ্ঠ, তার পরেই চীনাবাদাম তেল।

খাদ্যদ্রব্য ভাজবার সময় তেল বা ঘি তপ্ত করতে হয়। বেশী তাপে সব স্নেহদ্রব্যই বিকৃত হয় বা পুড়ে যায়, কিন্তু তেল যত আঁচ সইতে পারে, ঘি তত পারে না। সেজন্য প্রবাদ—তেল পুড়লে ঘি, ঘি পুড়লে ছাই। ঘি বেশী পুষ্টিকর হলেও ভাজবার পক্ষে তেলই ভাল, যদিও 'ঘিএ ভাজা তপ্ত লুচি'র খ্যাতি বেশী। চর্বি আর হাইড্রোতেলও বেশী আঁচ সইতে পারে।

ভাজবার সময় তেল-ঘিএর কিছু অংশ বাষ্পাকারে উবে যায়। ঘিএ সব চাইতে বেশী যায়, তিল তেলে আর নারকেল তেলে একটু কম, সরষে আর চীনাবাদাম তেলে আরও কম। এই কারণে ভাজবার পক্ষে সরষে আর চীনাবাদাম তেল শ্রেষ্ঠ। সরষের তেলের দুর্লভতার সময় আমি তিন-চার মাস তিল তেল চালিয়েছিলাম, তার ফলে রান্নাঘরের দেওয়াল তৈলাক্ত হয়ে যায়।

খাদ্য সম্বন্ধে অকারণ পক্ষপাত বা বিদ্বেষ ভাল নয়। পশ্চিম বাঙলার খাদ্যসংকটের একটি কারণ—রুটিতে আপত্তি আর ভাতে অত্যাসক্তি। যে সব খাদ্য অন্য প্রদেশে খুব চলে তা বাঙালীরও অভ্যাস করা উচিত। প্রত্যেক তেলেরই বিশিষ্ট গন্ধ আছে। সরষের তেল না হলে চলবে না, অন্য তেলের গন্ধ খারাপ, এমন মনোভাব ক্ষতিকর। অভ্যাস করলে তিল আর চীনাবাদাম তেলেও রুচি হবে।

হাইড্রোজেন

ঘিএর উপর ভারতবাসীর যে আসক্তি আছে তা অন্যায় নয়, কারণ অন্য স্নেহদ্রব্যের চাইতে ঘিএর পুষ্টিকরতা বেশী। জল আর বাতাসের সংস্পর্শে, পুরনো হলে, এবং বার বার তপ্ত করলে ঘি আর

তেল বিকৃত হয়। ঘিএর উপর সাধারণের পক্ষপাত আছে, তাই খারাপ ঘি দিয়ে তৈরী খাবারে একটু দুর্গন্ধ থাকলে লোকে গ্রাহ্য করে না, বরং সেই গন্ধকেই ঘৃতপক্কতার প্রমাণ মনে করে। ঘি আভিজাত্যের লক্ষণ, মান্য কুটুম্ব বা অতিথিকে তেলে ভাজা খাবার দেওয়া যায় না। খাঁটী ঘি দুর্মূল্য হলে লোকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে সস্তা ভেজাল দেওয়া ঘি কেনে। ঘিএর কৃত্রিম এসেন্স বাজারে পাওয়া যায়, হাইড্রোতেলে অল্প একটু দিলে পচা ঘিএর মতন গন্ধ হয়। অনেক দোকানের 'বিশুদ্ধ ঘৃতের খাবার' এই নকল ঘিএ তৈরী হয়। গৃহস্থের যে চক্ষুলজ্জা আগে ছিল এখন তা দূর হয়েছে, নকল ঘি কিনে আত্মবঞ্চনা বা অতিথি-বঞ্চনার দরকার হয় না, খোলাখুলি হাইড্রোতেলে রান্না হয়। তেলে ভাজা খাবারে যে গন্ধ হয় তা হাইড্রোতেলের খাবারে থাকে না, সেজন্য ঘৃতপক্কের বিকল্পরূপে হাইড্রোতেলপক্ক খাবার অবাধে চলে।

হাইড্রোতেলে ঘি-ব্যবসায়ীর ক্ষতি

অনেকে বলেন, হাইড্রোতেলে ঘিএর সর্বনাশ হচ্ছে, এর উৎপাদন একবারে বন্ধ না করলে ঘি লোপ পাবে। এই অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত নয়। চল্লিশ বৎসর আগে হাইড্রোতেল ছিল না, তখন ঘিএ চর্বি চীনা-বাদাম তেলের ভেজাল দেওয়া হত। ভাল চর্বির গন্ধ অনেকটা ভঁয়সা ঘিএর মতন, তাই ভেজাল ধরা সাধারণের অসাধ্য ছিল। হাইড্রোতেল তুলে দিলে আবার চর্বি চলবে। ঘি-ব্যবসায়ীর যে অসুবিধা হয়েছে তার প্রকৃত কারণ হিন্দু জনসাধারণ চোখ বুজে চর্বি-মিশ্রিত ভেজাল ঘি খেলেও শুধু চর্বি খেতে রাজী নয়, কিন্তু শুধু হাইড্রোতেল খেতে তার আপত্তি নেই। সেকালে খাঁটী আর ভেজাল ঘিএর একাধিপত্য ছিল, তাই ঘিএর ব্যবসা ভাল চলত। কিন্তু এখন হাইড্রোতেল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। হাইড্রোতেল তুলে দিলে চর্বি-মিশ্রিত ভেজাল ঘিএর বিক্রি খুব বেড়ে যাবে, খাঁটী ঘিএর দাম চড়বে।

ভারতবর্ষ ভেজালের জন্য কুখ্যাত। আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসংখ্য অসাধু আছে, জনসাধারণও নিশ্চেষ্ট। বাজারের ঘি আর তেলে প্রচুর ভেজাল চলে, বিদেশ থেকে ঘি আর সরষের তেলের কৃত্রিম এসেন্স অবাধে আমদানি হয়। আমাদের সরকার ছোটখাটো ভেজালদারদের সাজা দেন কিন্তু বড়দের পরিহার করেন। যেমন, বেরাল নেংটি ইঁদুর ধরে কিন্তু ড্রেনবাসী বড় ইঁদুর দেখলে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়।

সরকারী নিয়ম অনুসারে হাইড্রোতেলে কিছু তিল তেল দেওয়া হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় তিল তেল সহজেই ধরা যায়, সেজন্য ঘিএ হাইড্রোতেল থাকলে তিল তেলের জন্যই ভেজাল ধরা পড়ে। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষা সাধারণের সাধ্য নয়, সেজন্য প্রস্তাব হয়েছে, হাইড্রোতেলে এমন রঙ দেওয়া হক যাতে ঘিএ মেশালে রঙ দেখেই লোকে ভেজাল বুঝতে পারে। এই প্রস্তাব একবারে নিরর্থক। হাইড্রোতেলে যদি প্রচুর রঙ থাকে তবেই ঘিএ ভেজাল ধরা পড়বে। কিন্তু লাল নীল সবুজ ব্রাউন ইত্যাদি রঙের হাইড্রোতেল তৈরি করা বৃথা, কেউ তা কিনবে না।

হাইড্রোতেলের দোষ

হাইড্রোতেলের প্রপূরিত গাঢ় স্নেহাম্ল বেশী, সেজন্য তার কতকটা হজম হয় না, মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এই কারণে খাদ্য হিসাবে তেলের চাইতে হাইড্রোতেল নিকৃষ্ট।

শারীরবিজ্ঞানী আর স্বাস্থ্যবিশারদগণ মাঝে মাঝে এমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যাতে লোকে উদ্‌বিগ্ন হয়। কয়েক বৎসর থেকে তাঁরা প্রচার করছেন, সিগারেট-খোরদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসার বেশী দেখা যায়। সিগারেট-ব্যবসায়ীরা এই মত খণ্ডনের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, নামজাদা ডাক্তারদের দিয়ে প্রতিবাদও প্রচার করাচ্ছেন, তথাপি সিগারেটের অনিষ্টকরতা এখন প্রায় সর্বস্বীকৃত

হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে সাধারণ লোকেও খুব জল্পনা করছে, কিন্তু সিগারেটের কাটতি এখন পর্যন্ত কিছুমাত্র কমে নি। লোকের মনোভাব বোধ হয় এই,—হুজুগে পড়ে নেশা ছাড়তে পারব না, ক্যানসার যখন হবে তখন দেখা যাবে। সম্প্রতি শারীরবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, স্নেহদ্রব্যে যদি প্রপূরিত স্নেহাম্ল থাকে তবে তা বেশী খেলে রক্তে কোলেস্টেরল নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তার ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে। হাইড্রোতেলে প্রপূরিত স্নেহাম্ল বেশী, সেজন্য এসব জিনিস খেলে থ্রম্বোসিসের সম্ভাবনা বাড়ে। মাখন আর ঘিও নিরাপদ নয়, কারণ তাতেও প্রপূরিত স্নেহাম্ল আছে। অতএব তরল তেল খাওয়াই সব চেয়ে ভাল।

ঘিএর অনুকল্প

এদেশে যেমন ঘিএর, পাশ্চাত্ত্য দেশে তেমনি মাখনের আদর। মাখন দুর্মূল্য, সেজন্য দরিদ্রের জন্য মাখনের অনুকল্প মার্গারিন-এর প্রচলন হয়েছে। ঘিএরও একটা অনুকল্প দরকার। মার্গারিন দেখতে মাখনের মত হলেও উপাদান মাখনের সমান হয়, কিন্তু সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দেশে ঘিএর যে অনুকল্প হবে তারও উপাদান আর লক্ষণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। হাইড্রো-তেলে প্রপূরিত স্নেহাম্ল যদি খুব কমানো হয়, অর্থাৎ চীনাবাদাম তেলে যদি বেশী হাইড্রোজেন সংযোগ নিষিদ্ধ হয় তবে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা কমবে। এ রকম হাইড্রোতেল হয়তো খুব নরম হবে, গ্রীষ্মকালে তেলের মতন তরল থাকবে, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য তাই চালাতে হবে। সরকার স্বয়ং উদ্‌যোগী হয়ে কিছু করবেন মনে হয় না, কিন্তু জনমত যদি প্রবল হয়, তবে আইন করতে বাধ্য হবেন।

এক বিষয়ে চর্বি আর গাঢ় হাইড্রোতেল ঘি আর তরল তেলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিস্কুটে ঘি বা তেলের ময়ান দিলে চলে না। পূর্বে দেশী বিলাতী সব বিস্কুটেই চর্বির ময়ান চলত, এখন হাইড্রো-

তেল দেওয়া হয়। রান্নার হাইড্রোতেল যদি পাতলা করা হয় বিস্কুট-ওয়ালাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

বাজারে প্রায় গন্ধহীন ও বর্ণহীন চীনাবাদাম তেল পাওয়া যায়, তার দাম সাধারণ তেলের চাইতে বেশী, কিন্তু হাইড্রোতেলের চাইতে কম। অনেক গুজরাটী আর মারোয়াড়ী খাবারওয়ালা তা ঘিএর বদলে ব্যবহার করে। এই deodorized decolorized তেলে হাইড্রোজেন যোগ করা হয় না, তেলের স্বাভাবিক স্নেহাম্লই বজায় থাকে। বাঙালী গৃহস্থ এই তেল ঘিএর অনুকল্পরূপে ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

১৮৮১

রাশি রাশি

শ্রীপ্রমথ বিশীর কোনও বইএ পড়েছি, অক্ষয়কুমার দত্ত অহরহ ভাবতেন, ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড। শেষ বয়সে তাঁর মাথার অসুখ হয়েছিল, নিরামিষ ছেড়ে আমিষ খেতে শুরু করেছিলেন। প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তাই বোধ হয় তাঁর অসুখের কারণ।

বিপুল, বিশাল, বিরাট, ভূমা, অসীম ইত্যাদি শব্দের একটা মোহিনী শক্তি আছে। অত্যন্ত বৃহতের চিন্তা আমাদের একটু অভিভূত করে, তার উপলব্ধিতে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হই, আনন্দিত হই, কিঞ্চিৎ ভয়ও পাই। অদৃষ্টপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন 'হর্ষিত' অর্থাৎ রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁর মনে 'ভয়ে প্রব্যথিত' হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বিপুলতা থেকে আশ্বাসও পান। ভবভূতি তাঁর জীবদ্দশায় অবজ্ঞাত ছিলেন। মালতীমাধব নাটকের প্রস্তাবনায় এই বলে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন—কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা ; কোনও কালে কোনও দেশে এমন লোক থাকতে পারেন যিনি আমার সমানধর্মা এবং এই রচনার গুণগ্রহণে সমর্থ।

আকাশ সমুদ্র হিমালয় ইত্যাদির বিশালতা কবিকে ভাবাবিষ্ট করে। দেশ আর কাল নিয়ে দার্শনিকরা চিরকাল মাথা ঘামিয়েছেন, এই দুই বিরাট পদার্থের কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, না শুধুই আমাদের অধ্যাস বা illusion ? এখনও তাঁরা এ রহস্যের সমাধান খুঁজে পান নি। বিজ্ঞানীরা সমস্তই মাপতে চান, তাঁদের মানদণ্ড একদিকে বেড়ে চলেছে, আর একদিকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হচ্ছে, আগে যে সংখ্যা পর্যাপ্ত মনে হত এখন তাতে কুলয় না। সেকালেও লোকের ধারণা ছিল যে আকাশে অসংখ্য তারা আছে, কিন্তু শুধু চোখে যা দেখা যায় তার সংখ্যা তিন হাজারের বেশী নয়, লোকে

তাই অসংখ্য মনে করত। এখন যন্ত্রের যত উৎকর্ষ হচ্ছে ততই বেশী তারা দেখা যাচ্ছে, লক্ষ থেকে কোটি, তার পর বহু কোটি।

এক শ বৎসর আগে পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বাইবেলের উক্তি অনুসারে বিশ্বাস করতেন যে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভূবিজ্ঞানী লায়েল বললেন, পৃথিবীর বয়স কয়েক হাজার নয়, কয়েক কোটি বৎসর। তার পর ডারউইন আর ওআলেস প্রচার করলেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপী ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে পুরাতন জীব থেকে নব নব জীবের উদ্ভব হয়েছে। তখনকার গোঁড়া খ্রীষ্টানরা (মায় প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন) এই মতের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন, কিন্তু তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হলেন। আধুনিক গবেষণায় স্থির হয়েছে, পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি নয়, বহু কোটি বৎসর।

আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের কালপরিমাণ আরও বিপুল। চতুর্যুগ = ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। এক মন্বন্তর = ৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। ব্রহ্মার এক অহোরাত্র = ২৮,৮০০ কোটি বৎসর। ব্রহ্মার আয়ু = ১০,৩৬৮এর পর ১২ শূন্য দিলে যত হয় তত বৎসর।

প্রচলিত ধারাপাতে সংখ্যার এই তালিকা দেখা যায়।—এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত (million), কোটি, অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ (billion), পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য, পরার্ধ। বৃন্দ-এর অন্য নাম অব্জ। Prof. N. W. pirie, F. R. S. ১৯৫৪ সালে লিখিত Origin of Life প্রবন্ধে অব্জ শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

পরার্ধ মানে ১এর পিঠে ১৭ শূন্য। ছেলেবেলায় আমরা যে ধারাপাত পড়তুম তাতে পরার্ধের পরেও অনেক সংখ্যা ছিল। তাদের নাম ভুলে গেছি, শুধু শেষের দুটি মনে আছে—পার, অপার। আমাদের যিনি অঙ্ক শেখাতেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, অপারের পরে কোন্ সংখ্যা? তাঁর বিদ্যা বেশী ছিল না, উত্তর দিলেন; অপার

সব চাইতে বড়, তার পরে আর সংখ্যা নেই। আমি বললুম, কেন, অপারের পিঠে তো আরও শূন্য জুড়ে দেওয়া যায়। তিনি বললেন, তাতে তোর লাভটা কি? অপারের বেশী টাকাও তোর হবে না, কাঁইবিচিও হবে না। মাস্টারমশাই রিয়ালিস্ট ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত পিঁপড়ের মতন। চিনির এক কণায় যদি পেট ভরে তবে বস্তার সন্ধান করা বোকামি।

বিজ্ঞানীরা টাকা গোনবার জন্যে সংখ্যা চান না, যেসব বৃহৎ বা সূক্ষ্ম বা রাশি রাশি বস্তু নিয়ে তাঁদের কারবার, তার পরিমাপের জন্যেই সংখ্যা দরকার। লক্ষ, কোটি, মিলিয়ন, বিলিয়ন ইত্যাদিতে এখন কাজ চলে না। তারায় তারায় দূরত্ব মাপা হয় আলোকবর্ষ দিয়ে (প্রায় ৬এর পর ১২ শূন্য মাইল), অথবা parsec দিয়ে (প্রায় ১৯এর পর ১২ শূন্য মাইল), অতি সূক্ষ্ম বস্তু মাপা হয় Angstrom unit দিয়ে (১ সেন্টিমিটারের ১০ কোটি ভাগের ১ ভাগ)।

খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ দার্শনিক A. N. Whitehead লিখেছেন—
Let us grant that the pursuit of mathematics is a divine madness of the human spirit, a refuge from the goading emergency of contingent happenings. অর্থাৎ ধরা যেতে পারে, গণিতের চর্চা একরকম দিব্যোন্মাদ, ঝঞ্ঝাট থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায়। হোআইটহেডের যদি ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র পড়া থাকত তা হলে হয়তো লিখতেন—গণিতচর্চায় যে আনন্দ লাভ হয় তা ব্রহ্মস্বাদসহোদর।

যাঁরা খাঁটী গাণিতিক তাঁরা সংখ্যা নির্ধারণ করেই খুশী, তা দিয়ে কি মাপা হবে সে চিন্তা তাঁদের নেই। Edward Kasner একজন বিখ্যাত মার্কিন গণিতজ্ঞ। খেয়ালের বশে একদিন তিনি একটা সংখ্যা স্থির করলেন—১এর পিঠে ১০০ শূন্য। তাঁর ন বছরের ভাইপোকে বললেন, ওরে, একটা নাম বলতে পারিস? ভাইপো

বলল, googol। নামটি গ্রীক ল্যাটিন বা ইংরেজী নয়, ছোট ছেলের স্বচ্ছন্দ বালভাষিত, যেমন হিট্‌টিমাটিম। কিন্তু এই গুগল নাম এখন সর্বস্বীকৃত হয়েছে। কাসনার তাঁর ভাইপোকে আবার বললেন, গুগলের চাইতে ঢের বড় একটা সংখ্যা বলতে পারিস? ভাইপো বলল, পারি, একের পিঠে দেদার শূন্য বসিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না হাতে ব্যথা হয়। কাসনার বললেন, তা হলে তো একটা মূর্খ পালোয়ানের কাছে আইনস্টাইনকে হেরে যেতে হবে, সংখ্যার নির্ধারণ গায়ের জোরে হতে পারে না। তখন ভাইপো চিন্তা করে বলল, একের পিঠে এক গুগল শূন্য, এর নাম হক googolplex। কাসনার বললেন, তথাস্তু, গাণিতিক সমাজও তাই মেনে নিলেন।

আপনি অঙ্কপাত করে অনায়াসে এক গুগল অর্থাৎ ১এর পর ১০০ শূন্য লিখতে পারেন, লাইনটি লম্বায় চার-পাঁচ ইঞ্চের বেশী হবে না। কিন্তু গুগলপ্লেক্স লেখবার চেষ্টা করবেন না, পাগল হয়ে যাবেন। কাগজে কুলোবে না, ঘরেতেও নয়, পৃথিবীতেও নয়, আকাশের অতিদূরস্থ নক্ষত্র পর্যন্ত শূন্যের পর শূন্য বসিয়ে যেতে হবে।

গন্ধর্ব পুষ্পদন্ত যে মহিম্নস্তব রচনা করেছেন তার একটি শ্লোকে আছে— সমুদ্র যদি মসীপাত্র হয়, তাতে যদি অসিতগিরিসম স্তূপীকৃত কজ্জল গোলা হয়, সুরতরুর শাখা যদি লেখনী হয়, ধরণী যদি পত্র হয় এবং শারদা যদি সর্বকাল লিখতে থাকেন, তথাপি হে মহেশ তোমার গুণাবলীর পারে পৌঁছতে পারবেন না। পুষ্পদন্ত যদি আধুনিক গণিতের সংখ্যা জানতেন তা হলে সংক্ষেপে বলতে পারতেন, হে মহেশ তোমার গুণরাশি গুগলপ্লেক্সের চাইতেও বেশী।

সংখ্যাবিশারদরা অনেক রকম অদ্ভুত হিসাব করেছেন। মানবজাতি যখন প্রথম কথা বলতে শিখল তখন থেকে এখন পর্যন্ত মোট কত কথা বলেছে? শিশুর আধ-আধ কথা প্রেমালাপ গালাগালি রাজনীতিক বক্তৃতা ইত্যাদি সব নিয়ে ১এর পিঠে মোটে ১৬টা শূন্য, গুগলের চাইতে ঢের কম।

নোবেল-পুরস্কৃত এডিংটন হিসাব করেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত প্রোটন আছে তার সংখ্যা ১৩৬·২ × ১এর পর ২৫৬শূন্য। ইলেকট্রনের সংখ্যাও তাই। অর্থাৎ গুগলের চাইতে বেশী কিন্তু গুগলপ্লেক্সের চাইতে কম।

আমাদের গ্যালাক্সি বা ছায়াপথে কত তারা আছে? জ্যোতিষীরা অনুমান করেন, ৩,০০০ কোটি থেকে ১০,০০০ কোটির মধ্যে, অর্থাৎ ৩এর পর ১০ শূন্য এবং ১এর পর ১১শূন্যর মধ্যে। গুগলের চাইতে ঢের কম।

দাবা খেলায় যত চাল হতে পারে তার সংখ্যা কত? আগে ১এর পর ৫০ শূন্য বসান। যে সংখ্যা পাবেন তত শূন্য ১এর পর বসান। গুগলের চাইতে বেশী কিন্তু গুগলপ্লেক্সের চাইতে কম।

এইবার অতি ক্ষুদ্র রাশি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। আমাদের শাস্ত্রোক্ত অণু-পরমাণু কি বস্তু তা বোঝা যায় না। সংস্কৃত অভিধানে ত্রসরেণুর অর্থ—ছয় পরমাণুর সমষ্টি, অথবা গবাক্ষচ্ছিদ্রাগত রৌদ্রে দৃশ্যমান চঞ্চল সূক্ষ্ম পদার্থ। জীববিজ্ঞানে কীটের চাইতে কীটাণু ছোট, তার চাইতে জীবাণু বা মাইক্রোব ছোট, তার চাইতে ভাইরস ছোট (অণুবীক্ষণে অদৃশ্য)। রসায়নের অণু আরও ছোট, পরমাণু তার চাইতে ছোট, ইলেকট্রন সব চাইতে ছোট।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের উত্তম উদাহরণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। মাদার টিংচারে যে মূল বস্তু থাকে তার ১০ ভাগের ১ ভাগ থাকে প্রথম ডাইলিউশনে। তৃতীয় ডাইলিউশনে ১,০০০ ভাগের ১ ভাগ। দ্বাদশ ডাইলিউশনে লক্ষ কোটি ভাগের ১ ভাগ। শততম ডাইলিউশনে থাকে ১ গুগলের ১ ভাগ। হোমিওপ্যাথরা বলেন, ডাইলিউশন বৃদ্ধিতে ঔষধের পোটেন্সি বৃদ্ধি হয়। অবিশ্বাসীরা বলেন, ১০০ ডাইলিউশনে পৌঁছুবার আগেই এমন অবস্থা হয় যে এক শিশিতে অণু-প্রমাণ ঔষধও থাকে না। বিশ্বাসী বলেন, তোমার অস্ত্রশাস্ত্র

যাই বলুক, অণুপ্রমাণ ঔষধ থাকুক বা না থাকুক, স্পষ্ট দেখছি উপকার হয়, অতএব তর্ক না করে খেয়ে যাও, বিশ্বাসেই কৃষ্ণলাভ হয়।

অতি সূক্ষ্মের আর একটি উদাহরণ—ব্যাঙের আধুলির গল্প। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতীতে তার ভাল বর্ণনা আছে। ব্যাঙ তার বন্ধুকে একটি আধুলি ধার দিয়েছিল। শর্ত এই ছিল যে প্রতি কিস্তিতে অর্ধেক শোধ করতে হবে। প্রথম কিস্তিতে চার আনা, দ্বিতীয়তে দু আনা, তার পর যথাক্রমে এক আনা, দু পয়সা এক পয়সা আধ পয়সা ইত্যাদি। ব্যাঙ হিসাব করে দেখল, তার পাওনা কোনও দিন শোধ হবে না, একটু বাকী থাকবেই। সে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। ব্যাঙ যদি বুদ্ধিমান হত তবে বুঝত যে কয়েক কিস্তি পরেই বাকীর পরিমান নগণ্য হয়ে যাবে, অনন্তকাল তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

অন্তরকলন বা differential calculus এর আবিষ্কর্তা লিবনিৎস সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন তিনি প্রশিয়ার রানীকে বললেন, যদি অনুমতি দেন তবে আজ আপনাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র infinitesimal রাশির রহস্য বুঝিয়ে দেব। রানী বললেন, আপনাকে বোঝাতে হবে না, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাকে বলে তা এখানকার এই সভাসদ্‌দের আচরণ থেকেই আমি টের পাই।

১৮৮১

ধর্মশিক্ষা

আমাদের দেশে সব রকম দুষ্কর্ম আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। চুরি ডাকাতি প্রতারণা ঘুষ ভেজাল ইত্যাদি দেশব্যাপী হয়েছে, অনেক রাজপুরুষ আর ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর কর্মে অসাধুতা প্রকট হয়েছে, জননেতাদের আচরণেও অসংযম আর গুণ্ডামি দেখা দিয়েছে, ছেলেরা উচ্ছৃঙ্খল দুর্বিনীত হয়েছে। অনেক সরকারী অফিসে কাজ আদায়ের জন্যে চিরকালই আমলাদের ঘুষ দিতে হত। এখন তাদের জুলুম বেড়ে গেছে, উপরওয়ালাদের বললেও কিছু হয় না, তাঁরা নিম্নতনদের শাসন করতে ভয় পান।

প্রাচীন ভারতে চোরের হাত কেটে ফেলা হত। বিলাতে দেড় শ বৎসর আগে সামান্য চুরির জন্যেও ফাঁসি হত। রাজা রতন রাও কুলনারীহরণের জন্যে নিজের পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এই রকম কঠোর শাস্তির ভয়ে দুর্বৃত্তরা কতকটা সংযত থাকত, কিন্তু একেবারে নিরস্ত হত না।

সমাজরক্ষার জন্যে যথোচিত দণ্ডবিধি অবশ্যই চাই, কিন্তু তার চাইতেও চাই এমন শিক্ষা আর পরিবেশ যাতে দুষ্কর্মে প্রবৃত্তি না হয়। অনেকে বলেন, বাল্যকাল থেকে ধর্মশিক্ষাই দুষ্প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। রিলিজস এডুকেশনের জন্যে বিলাতে আইন আছে, সকল খ্রীষ্টান ছাত্রকেই বাইবেল পড়তে হয় এবং তৎসম্মত ধর্মোপদেশ শুনতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান মাত্রেই এই শিক্ষা অত্যাবশ্যক মনে করেন। কিন্তু যুক্তিবাদী র‍্যাশনালিস্টরা (যাঁদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা মনীষী আছেন) বলেন খ্রীষ্টীয় বা অন্য কোনও ধর্মের ভিত্তিতে মরালিটি বা সামাজিক কর্তব্য শেখানো শুধু অনাবশ্যক নয়, ক্ষতিকরও বটে, তাতে বুদ্ধি সংকীর্ণ হয়।

বাল্যকাল থেকে সুনীতি আর সদাচার শিক্ষা অবশ্য কর্তব্য, এ সম্বন্ধে মতভেদ নেই। কিন্তু সেকিউলার বা লোকায়ত ভারত-রাষ্ট্রের প্রজার জন্যে এই শিক্ষার ভিত্তি কি হবে? শিক্ষার্থীর সম্প্রদায় অনুসারে হিন্দু জৈন শিখ মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র, অথবা শাস্ত্রনিরপেক্ষ শুধু নীতিবাক্য?

রিলিজন শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। ক্রীড বা নির্দিষ্ট বিষয়ে আস্থা না থাকলে রিলিজন হয় না। হিন্দুধর্ম ঠিক রিলিজন নয়, কারণ তার বাঁধা ধরা ক্রীড নেই। কিন্তু যেমন মুসলমান আর খ্রীষ্টীয় ধর্ম, তেমনি জৈন শিখ বৈষ্ণব আর ব্রাহ্ম ধর্মও রিলিজন। ভারতীয় ছাত্র যদি মুসলমান খ্রীষ্টান জৈন শিখ বৈষ্ণব ব্রাহ্ম ইত্যাদি হয় তবে তার সাম্প্রদায়িক ক্রীড অনুসারে তাকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু ছাত্রকে কিংবা মিশ্র সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়ে কি শেখানো হবে? শুধু অল্পবয়স্কদের জন্যে ব্যবস্থা করলে চলবে না, প্রাপ্তবয়স্করাও যাতে কুকর্মপ্রবণ না হয় তার উপায় ভাবতে হবে।

ধর্ম শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ অতি ব্যাপক—যা প্রজাগণকে ধারণ করে। অর্থাৎ সমাজহিতকর বিধিসমূহই ধর্ম, যাতে জন-সাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয় তাই ধর্ম। ইংরেজীতে gentle manএর একটি বিশিষ্ট অর্থ—chivalrous wellbred man। জেণ্টলম্যান বা সজ্জনের যে লক্ষণাবলী, তা যদি বহুগুণ প্রসারিত করা হয় তবে তাকে ধর্ম বলা যেতে পারে। শুধু ভদ্র বেশ, ভদ্র আচরণ, মার্জিত আলাপ, সত্যপালন, দুর্বলকে রক্ষা করা ইত্যাদি ধর্ম নয়, শুধু ভক্তি বা পরমার্থতত্ত্বের চর্চাও ধর্ম নয়। স্বাস্থ্য বল বিদ্যা উপার্জন সদাচার সুনীতি বিনয় (discipline) ইন্দ্রিয়সংযম আত্মরক্ষা দেশরক্ষা পরোপকার প্রভৃতিও ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যে গুণাবলীর অনুশীলন ও সামঞ্জস্য বিবৃত করেছেন তাই ধর্ম। মানুষের সাধনীয় ধর্মের এমন সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আর কেউ বোধ হয় করেন নি।

ভারতীয় বিদ্যার্থী সেকালে গুরুগৃহে যে শিক্ষা পেত তাকে তখনকার হিসাবে সর্বাঙ্গীণ বলা যেতে পারে। বিবিধ বিদ্যা আর শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান বা ritualএর সঙ্গে সদাচার আর সামাজিক কর্তব্যও শিক্ষণীয় ছিল। এখন গুরুগৃহের স্থানে স্কুল-কলেজ হয়েছে, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তায় আস্থা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এখনকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা অত্যল্প, ধর্ম বা সামাজিক কর্তব্য শেখাবার তাঁদের সময় নেই, যোগ্যতাও নেই।

ধর্মশিক্ষার জন্যে কেউ কেউ মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করে থাকেন। ছেলেরা নিয়মিত গায়ত্রী জপ, সন্ধ্যা-আহ্নিক, স্তোত্র-পাঠ, গীতা-অধ্যয়ন ইত্যাদি করুক। মেয়েরা মহাকালী পাঠশালার অনুকরণে নানা রকম ব্রতপালন আর শিরপূজা করুক। ছাত্র-ছাত্রীদের রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি শোনাবার ব্যবস্থা হক। সর্বশক্তিমান পরমকারুণিক ঈশ্বরে বিশ্বাস আর ভক্তি যাতে হয় তার চেষ্টা করা হক।

পাশ্চাত্ত্য দেশেও দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। অনেকে বলেন, স্বর্গ-নরকে সাধারণের আস্থা কমে যাওয়াই নৈতিক অবনতির কারণ। Pie in the sky আর hell fire, অর্থাৎ পরলোকে গিয়ে পুণ্যবান স্বর্গীয় পিষ্টক খাবে আর পাপী নরকাগ্নিতে দগ্ধ হবে, এই বিশ্বাস লোপ পাচ্ছে। কলকাতার রাস্তায় খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞাপন দেখা যায়—Jesus Christ can save to the uttermost ! ফ্রেমে বাঁধানো আশ্বাসবাক্য দেশী ছবির দোকানে পাওয়া যায়—'একমাত্র হরিনামে যত পাপ তরে, পাপিষ্ঠের সাধ্য নাই তত পাপ করে।' কিন্তু এই সব বাণীতে কোনও ফল হয় না, কারণ জনসাধারণ ইহসর্বস্ব হয়ে পড়েছে।

দুষ্ক্রিয়া বৃদ্ধির নানা কারণ থাকতে পারে। বোধ হয় একটি প্রধান কারণ, জুয়াড়ী প্রবৃত্তি বা gambling spiritএর প্রসার।

অনুসারে ভক্তি কর্ম বা জ্ঞানের চর্চা করে। শুনেছি বিদ্যাসাগর প্রায় নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর মতন কর্মবীর পরোপকারী সমাজহিতৈষী অল্পই জন্মেছেন। গান্ধীজী ভক্ত বিশ্বাসী, নেহেরুজী অভক্ত যুক্তিবাদী কিন্তু দুজনেই অক্লান্তকর্মা লোকহিতৈষী সাধুপুরুষ।

মনুর বচন বলে খ্যাত একটি প্রাচীন শ্লোক আছে—

পরস্পরভয়াৎ কেচিৎ পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে।
রাজদণ্ডভয়াৎ কেচিৎ যমদণ্ডভয়াৎ পরে॥
সর্বেষামপি চৈতেষামাত্মা যময়তাং যমঃ।
আত্মা সংযমিতো যেন যমস্তস্য করোতি কিম্॥

—কোনও কোনও পাপমতি পরস্পরের ভয়ে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, কেউ রাজদণ্ডের ভয়ে; কেউ বা যমদণ্ডের ভয়ে। কিন্তু সকল শাসকের উপরে শাসন করে আত্মা বা অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ যে সংযমিত করেছে যম তার কি করবে?

মোট কথা, ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য অন্তকরণের সংযমন বা বিনয়ন, disciplining the mind। এই বিনয়নের উপায় অন্বেষণ করতে হবে।

শোনা যায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা অবিনীত লোককে বিনীত করা হয়। প্রথমে হয় brain washing বা মস্তিষ্ক ধোলাই, অর্থাৎ লোকটির মনে যেসব কমিউনিস্ট-নীতিবিরুদ্ধ পূর্ব সংস্কার আছে তার উচ্ছেদ করা হয়, তার পর মন্ত্রণা দিয়ে এবং দরকার মতন পীড়ন করে নূতন সংস্কার বদ্ধমূল করা হয়। এই indoctrinationএর ফলে বহু নবাগত বিদেশী পূর্বের ধারণা ত্যাগ করে কমিউনিস্ট শাসনের আজ্ঞাবহ ভক্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের প্রজাদের শিশুকাল থেকেই শেখানো হয়—পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলের স্বার্থের চাইতে

রাষ্ট্রের স্বার্থ বড়, রাষ্ট্রশাসকের বিধান শিরোধার্য করাই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অন্য দেশে যে ডিমোক্রেসি আছে তা দুর্নীতিপূর্ণ ধাপ্পাবাজি মাত্র, প্রকৃত গণতন্ত্র কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই আছে, সেখানকার প্রজাই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে। অবশ্য এমন লোক আছে যারা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রজা না হয়েও স্বেচ্ছাক্রমে সেখানকার শাসনতন্ত্রের বংশবদ ভক্ত এবং তার কোনও দোষই মানতে চায় না।

এই রাষ্ট্রবিহিত একদেশদর্শী শিক্ষার ফলে কমিউনিস্ট প্রজার মানসিক পরিণতি কি হয়েছে তার আলোচনা অনাবশ্যক, অনেকে সে সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু যেসব পর্যটক অপক্ষপাতে দেখেছেন তাঁরা কমিউনিস্ট শাসনের শুধু দোষ আবিষ্কার করেন নি, অনেক সুফলও লক্ষ্য করেছেন। সম্প্রতি (২৪-১০-৫৯) স্টেট্সম্যান পত্রে প্রকাশিত একজন নিরপেক্ষ দর্শকের বিবরণ থেকে কিছু তুলে দিচ্ছি—

China today is free of all signs of jobbery and corruption, and this is no mean achievement. ... One does feel that we, in our country, could do with a little more honesty. There is an air of efficiency everywhere in the new China. ...One does not have to worry about things like the purity of food, ...or short measure or incorrect prices. These things are the result of strict controls. I miss these on my return to India. ....The people have been made conscious of the need to keep their homes and the streets clean....Is it fear that drives him or is it patriotism ? The truth probably is, a bit of both. ....The Communist party has...used two methods : coercion and "education".

ডিক্‌টেটর-শাসিত রাষ্ট্রে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদিত হয়, সেখানকার প্রজা ভয়ে বা ভক্তিতে নিয়মনিষ্ঠ হয়ে চলে। গণতন্ত্রে ততটা আশা করা যায় না, কারণ, দুষ্ট দমনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সেখানকার শাসকদের নেই। যারা দুষ্ট আর দুষ্টের পোষক, তাদেরও ভোট আছে, সুতরাং তাহারা অসহায় নয়। গণতন্ত্রের আদর্শ— প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বেশী হস্তক্ষেপ না করে এমন শিক্ষা, পরিবেশ আর দণ্ডবিধির প্রবর্তন যাতে লোকে সুবিনীত কর্তব্যনিষ্ঠ হয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অনুকরণ না করেও সেখান থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি।

Indoctrinationএর একটি ভাল প্রতিশব্দ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে পেয়েছি—কর্ণেজপন, চলিত কথায় যার নাম জপানো বা ভজানো। শব্দটি মন্দ অর্থেই চলে, কিন্তু ভাল মন্দ মাঝারি সকল উদ্দেশ্যেই এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হতে পারে। শিশুকে যখন শেখানো হয়—সত্য কথা বলবে, চুরি করবে না, ঝগড়া মারামারি করবে না, গুরুজনের কথা শুনবে ইত্যাদি, তখন শিশুর মঙ্গলের জন্যেই তার কর্ণেজপন হয়। ভোটের দালালরা যখন নিরন্তর গর্জন করে—অমুককে ভোট দিন ভোট দিন, তখন পাড়ার লোকের কর্ণেজপন হয়। ধর্মঘটী আর রাজনীতিক শোভাযাত্রীর দল অবিরাম যে স্লোগান আওড়ায় তা সর্বসাধারণের কর্ণেজপন। কিন্তু এই ধরনের স্থূল ঘোষণায় বিশেষ কিছু ফল হয় না, কর্ণেজপন হলেও তা প্রায় অরণ্যে রোদনের তুল্য।

ব্যবসায়ী যে বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাও কর্ণেজপন। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনে সত্য মিথ্যা আর অত্যুক্তির এমন নিপুণ মিশ্রণ থাকে যে বহু লোক মোহগ্রস্ত হয়। 'তেল ঘি খেয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করবেন না, অমুক বনস্পতি খান, পুষ্টির জন্যে তা অপরিহার্য, আধুনিক সভ্য আর শিক্ষিত জনের রান্নাঘরে তা ছাড়া অন্য কিছু ঢুকতে পায় না।' সম্প্রতি লোকসভায় একজন মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে

এরকম বিজ্ঞাপন আপত্তিজনক, কিন্তু এমন আইন নেই যাতে এই অপপ্রচার বন্ধ করা যায়।

বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ, অকারণে শিকল টেনে গাড়ি থামানো, রেলকর্মচারীকে নির্যাতন, গাড়ির আসবাব চুরি ইত্যাদি নিবারণের জন্যে সরকার বিস্তর বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশবাসীকে আবেদন জানাচ্ছেন, কিন্তু কোনও ফল হচ্ছে না, কারণ, কুকর্ম নিবারণে শুধু কর্ণেজপন যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে শাস্তির অবশ্যম্ভাবিতা আর লোকমতের প্রবল সমর্থন আবশ্যক। ভেজাল ধরা পড়লে যে শাস্তি হয় তা অতি তুচ্ছ। অপরাধী ধনী হলে তার নাম প্রায় প্রকাশিত হয় না। একই লোক তেল-ঘিএ ভেজালের জন্যে বহুবার জরিমানা দিয়েছে এবং স্বচ্ছন্দে সসম্মানে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে এমন উদাহরণ বিরল নয়।

বিষ্ণুশর্মা বলেছেন, নব মৃৎপাত্রে যে সংস্কার লগ্ন হয় তার অন্যথা হয় না। বাল্যশিক্ষার অর্থ, লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ হিতকর সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ করা। এর প্রকৃষ্ট উপায় নির্ধারণের জন্যে বিচক্ষণ মনোবিজ্ঞানীদের মত নেওয়া আবশ্যক। শিক্ষার সবটাই বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, চরিত্র-গঠনে অভিভাবন বা suggestionএরও স্থান আছে। যে শিক্ষক ধর্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা দেবেন তাঁকে শিক্ষণের পদ্ধতি শিখতে হবে। কিন্তু বাল্যশিক্ষাই যথেষ্ট নয়, বয়স্থ জনসাধারণ যাতে সংযমিত থাকে তার জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা দরকার। শুধু উপদেশ বা সরকারী বিজ্ঞাপনে কাজ হবে না, বর্তমান দণ্ডনীতি কঠোরতর করতে হবে এবং সেইসঙ্গে প্রবল জনমত গঠন করতে হবে।

সৎকর্ম আর সচ্চরিত্রতার শ্রেষ্ঠ উদ্দীপক জনসাধারণের প্রশংসা, দুষ্কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক জনসাধারণের ধিক্কার। ট্রামকর্মী, মোটর-বস ও ট্যাক্সির চালক, মুটে ইত্যাদির সাধুতা, বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের সাহসিকতা ইত্যাদি বিবরণ মাঝে মাঝে কাগজে দেখা যায়। এইসব কর্মের প্রশংসা আরও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত।

সাধারণের কাছে সিনেমাতারকা, ফুটবল-ক্রিকেট-খেলোয়াড়, সাঁতারু ইত্যাদির যে মর্যাদা, সৎকর্মা আর সাহসী স্ত্রীপুরুষেরও যাতে অন্তত সেই রকম মর্যাদা হয় তার চেষ্টা করা উচিত। দুষ্কর্মের নিন্দা তীক্ষ্ণ ভাষায় নিরন্তর প্রচার করতে হবে, যাতে জনসাধারণের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। শুধু মামুলী দুষ্কর্ম নয়, রাস্তায় ময়লা ফেলা, যেখানে সেখানে প্রস্রাব করা, পানের পিক ফেলা, রাস্তার কল খুলে রেখে জল নষ্ট করা, নিষিদ্ধ আতসবাজি পোড়ানো ইত্যাদি নানা রকম কদাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দরকার। সংবাদপত্রের কর্তারা যদি বিবিধ রাজনীতিক সভার বিবরণ, সিনেমা চিত্রের বিস্তারিত পরিচয়, রাশিফলের আলোচনা ইত্যাদি কমিয়ে দিয়ে সৎকর্মের প্রশংসা আর কুকর্মের নিন্দা বহুপ্রচারিত করেন তবে তা সার্থক কর্ণেজপন হবে, লোকমতও প্রভাবিত হবে। যেমন দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, তেমনি দেশব্যাপী দুর্নীতি, কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের রাজনীতিক আর সাংস্কৃতিক নেতাদেরও এই জনমত গঠনে উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য।

সাধারণের পক্ষে ফ্যাশনের বিধান প্রায় অলঙ্ঘনীয়। যে নিষ্ঠার সঙ্গে স্ত্রীপুরুষ ফ্যাশনের বিধি-নিষেধ মেনে চলে, সেই রকম নিষ্ঠা বিহিত-অবিহিত কর্ম সম্বন্ধেও যাতে লোকের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয় তার জন্যে সুকল্পিত ব্যাপক আর অবিরাম প্রচার আবশ্যক।

পঞ্চশীল ভঙ্গ করে চীন দুঃশীল হয়েছে, ক্রূর কর্ম করে ভারতবাসীকে ক্ষুব্ধ বিদ্বিষ্ট করেছে। চীনের শাসনতন্ত্রে যতই স্বেচ্ছাচার নির্দয়তা আর কুটিলতা থাকুক, প্রজার স্বাধীন চিন্তা যতই দমিত হক, সে দেশের জনসাধারণের যে নৈতিক উন্নতি হয়েছে তা অগ্রাহ্য করা যায় না। কিছুকাল আগেও দুর্নীতির জন্যে চীন কুখ্যাত ছিল, কিন্তু দশ বছরে ভাল-মন্দ যে উপায়েই হক, চীনের প্রজা সংযমিত কর্তব্যনিষ্ঠ হয়েছে, আর আমাদের দেশে তার বিপরীত অবস্থা দেখা দিয়েছে। কোনও অবতার বা মহাপুরুষ অলৌকিক শক্তির

দ্বারা আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন না। কমিউনিস্ট পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ না করেও আমরা সমবেত চেষ্টায় দেশের কলঙ্ক মোচন করতে পারি। যদি হাল ছেড়ে দিয়ে যদ্‌ভবিষ্য নীতি আশ্রয় করি তবে আমাদের রক্ষা নেই।

১৮৮২

রবীন্দ্র-জন্মদিন

কোনও মহাপুরুষের উদ্দেশে লোকে যখন সমবেতভাবে শ্রদ্ধার অর্ঘ দেয় তখন এক বা ত্রকাধিক প্রতীক উপলক্ষ্য করেই তা দিয়ে থাকে। এই প্রতীক প্রতিমূর্তি হতে পারে, কৃতির নিদর্শন হতে পারে, জন্মস্থান সাধনাস্থান বা জন্মদিনও হতে পারে। যদি অসংখ্য অনুরাগী জন একই কালে বা একই স্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তবে সেই শ্রদ্ধা বিপুলতা পায়।

পঁচিশে বৈশাখে অনেক লোক জন্মেছে, কিন্তু একাধিক রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় নি। অতএব এই তারিখের কোনও নিজস্ব নিরপেক্ষ মহত্ত্ব নেই। ফলিত জ্যোতিষে যাঁদের আস্থা আছে তাঁরা হয়তো বলবেন, শুধু দিন ক্ষণ তিথি নক্ষত্র নয়, আরও অনেক রকম জটিল যোগাযোগ চাই, তবেই রবীন্দ্রনাথের তুল্য পুরুষের উদ্ভব হতে পারে। যাঁরা কার্যকারণের অনন্ত শৃঙ্খলা মানেন তাঁরা বলবেন, শুধু জ্যোতিষিক সমাবেশ নয়, অসংখ্য কারণপরম্পরার ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু তার নির্ণয় আমাদের অসাধ্য।

তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য দেবতার অধিষ্ঠানের জন্যে নয়, বহু কাল যাবৎ অগণিত ভক্তের সমাগমের ফলে সামান্য স্থানও পুণ্যভূমি হয়ে ওঠে। চৈত্র-শুক্ল-নবমী, ভাদ্র-কৃষ্ণ-অষ্টমী, ক্রিসমাস ডে প্রভৃতির পুণ্যতা রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বা যিশুখ্রীষ্টের জন্মের জন্যে নয়, অসংখ্য ভক্ত একই দিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, সেই কারণেই তা পুণ্যদিন। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম একটি আকস্মিক ঘটনা। তিনি যদি সামান্য লোক হতেন তবে এই দিন কেউ গ্রাহ্য করত না। তিনি অসামান্য, তাই এই দিনকে উপলক্ষ্য করে গুণগ্রাহী ভক্তজন সমবেতভাবে

শ্রদ্ধা নিবেদন করে, এবং তার ফলেই এই দিনটি পুণ্যময় পর্বদিনে পরিণত হয়েছে।

বুদ্ধ খ্রীষ্ট চৈতন্যদেব প্রভৃতির যে বিবরণ সমকালীন লোকেরা রেখে গেছেন তার কতটা ইতিবৃত্ত আর কতটা পৌরাণিক বা mythical তার নির্ণয় সহজ নয়। ধর্মনেতা বা অবতারদের চরিতকথায় কালক্রমে অতিরঞ্জন এসে পড়ে। ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ ধর্মনেতা ছিলেন না এবং তিনি স্বয়ং স্মৃতিকথা লিখে গেছেন। যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদেরও অনেকে কবির কথা লিখেছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা এখনও লিখেছেন। পঞ্চাশ ষাট সত্তর বৎসর পরে এই সাক্ষাৎদর্শীদের কেউ জীবিত থাকবেন না, তখন তাঁদের লিখিত বিবরণ আর কবির স্বরচিত আত্মকথাই আমাদের ঐতিহাসিক সম্বল হবে।

স্মরণ কীর্তন আর আলোচনাই শ্রদ্ধাপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। তার ভিত্তি বিশ্বস্ত সত্যাশ্রিত বিবরণ। যাঁরা কবির কথা লিখছেন, ভবিষ্যদ্-বংশীয়দের কাছে তাঁদের গুরুতর দায়িত্ব আছে। লেখক আর সমালোচকদের সতর্ক থাকতে হবে যেন রবীন্দ্রচরিতকথায় কল্পনা আর জল্পনা না আসে, যেন তা কিংবদন্তী বা অবদানকল্পলতায় পরিণত না হয়।

১৮৮১

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মোৎসবে পঠিত।

সাহিত্য-সংস্কার

সব দিকে শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটিয়াছে, মিস মেয়ো অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন, স্টেট্‌স্‌ম্যান বর্জন ও ইংলিশম্যানের অর্জন জোরে চলিতেছে, রিফর্ম কমিশনও নিশ্চয় বয়কট হইবে। কিন্তু আসল কাজই বাকী রহিয়াছে,—খুড়ার গঙ্গাযাত্রা।

সজ্ঞানে তীরস্থ করার উপযোগী খুড়া পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু বিস্তর লেখক আছেন, ছোট বড় মাঝারি,—তাঁদের দুরস্ত করাই এখন মস্ত কাজ। লেখকগণের নিজের চরিত্র সংশোধনের কথা বলিতেছি না। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার চরিত্র, তারা কি বলে কি করে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়।

গীতায় ভগবান একটি খাঁটী কথা বলিয়া গেছেন—কিং কর্ম কিং অকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ—অর্থাৎ কি কর্ম আর কি অকর্ম সে বিষয়ে কবিদের কাণ্ডজ্ঞান নাই। এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে যে সব অনর্থ ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে তার প্রতিকার আবশ্যক। আমাদের প্রথম কর্তব্য—বড় বড় লেখকগণ যা লিখিয়া ফেলিয়াছেন তার একটা গতি করা। দ্বিতীয় কর্তব্য—ভবিষ্যতে যাঁরা লিখবেন তাঁদের জন্য একটা আদর্শ-নির্দেশ।

ছোট-খাটো লেখকগণ ধর্তব্য নন, কারণ তাঁদের লেখা কালক্রমে আপনিই মুছিয়া যাইবে। কিন্তু যাঁরা সম্রাট. তাঁদের লেখা আবশ্যক মত সংস্কার করা অবশ্যক কর্তব্য। শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা দূরে থাক তাঁর গানের সুরেও কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিতে চান না। যদি সত্য হয় তবে দুঃখের বিষয় স্টিফেনশন প্রথমে যে রেল-গাড়ির এঞ্জিন সৃষ্টি করেন তার চিম্‌নি ছিল চার হাত, হেলিয়া

তুলিয়া কোনও গতিকে গজেন্দ্রগমনে ঘণ্টায় পাঁচ-দশ মাইল চলিত। আর এখানকার পঞ্জাব বম্বে মেলের এঞ্জিন দেখ, কি পরিবর্তন। কিন্তু স্টিফেনশনের মর্যাদা কিছুই কমে নাই। যদি রবীন্দ্রনাথের বাউলের সুর ওস্তাদ-পরম্পরায় সংস্কৃত হইয়া বাগেশ্রী-চৌতালে পরিণত হয়, তবে তাঁর ক্ষুণ্ণ হওয়া অনুচিত, কারণ ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম। যদি কোন দক্ষ ব্যক্তি গোরার উন্নত সংস্করণে পরেশ বাবুর বড় মেয়ে লাবণ্যর সঙ্গে পানুবাবুর বিবাহ দেয়, তবে দেখিতে শুনিতে ভালই হয়। অধিকন্তু, যদি রেললাইনের উপরেই শানাই বাজাইয়া মোটর চালানো যায়, অর্থাৎ নরেশচন্দ্রের কিরণময়ীর শুভ-বিবাহ সংঘটিত হয় এবং তদুপলক্ষে যতীন্দ্র সিংহ মহাশয়ের চকার-ভর্তি সাহেব সঙ্গীত রচনা করেন, তবে মস্ত একটা সামাজিক সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। এই উপায়ে প্রবীন নবীন সমস্ত বড় লেখকদের রচনা অদল বদল করিয়া ছাঁটিয়া তালি দিয়া নির্দোষ অস্থায়ী সাহিত্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য-ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ নির্দেশ। এই আদর্শ এমন হওয়া চাই যাতে আর্ট ও সমাজ দু-ই বজায় থাকে।

আর্ট কি? এক কথায় বলা যাইতে পারে—যা ভাল লাগে তাই আর্টের অঙ্গ বা রস-বস্তু, এবং তা ভদ্র-জনের মুখরোচক করিয়া পরিবেশন করাই আর্ট। অবশ্য একই বস্তু সকলের ভাল না লাগিতে পারে, অতএব আর্টের সৃষ্টি ও উপভোগ কতকটা ব্যক্তিগত। কিন্তু এমন জিনিস অনেক আছে যা অনেকেরই ভাল লাগে কেবল মাত্রার তারতম্য লইয়াই বিবাদ। সকলেই বলে—দুধ অতি উপাদেয় বস্তু, কিন্তু কেউ ঢক্‌ঢক্ কি য়া খায়, কেউ একটু-আধটু খায়। পেঁয়াজের দুর্গন্ধ প্রসিদ্ধ, মাত্রা-ভেদে ভদ্র-অভদ্র অনেকেরই রুচিকর। অতএব দুধ ও পেঁয়াজ দু-ই অপরিহার্য রসবস্তু! তথাপি, সমাজ মনে করে—দুধ যত খাওয়া যায় ততই বলবৃদ্ধি হয়, কিন্তু পেঁয়াজ বেশী মাত্রায় বিকট। তাই আমরা গতানুগতিক ভাবে দুধ-খোরকে বলি সাত্ত্বিক,

পেঁয়াজ-খোরকে বলি নেড়ে। ইহা অন্ধ সমাজের কথা, আমাদের অন্তরের কথা নয়। দয়া দাক্ষিণ্য ভক্তি প্রীতির কথা শুনিতে আমাদের বেশ ভাল লাগে তা অবশ্য মানি ; কিন্তু কেচ্ছা কেলেঙ্কারি, খুনোখুনি ব্যভিচার, নরমাংস নারীমাংস—এ সকলও উপযুক্ত অনুপানের সহিত কম উপভোগ্য নয়।

সর্বভুক্ পাঠক হাঁ করিয়া আছে, ওস্তাদ রসস্রষ্টা কাহাকেও বঞ্চিত করিতে, কিছুব বাদ দিতে পারেন না। তিনি শান্ত করুণ রসের স্রোত বহাইবেন, আবার ষড়্‌রিপুর বিচিত্র খেলা দেখাইয়াও তাক্ লাগাইয়া দিবেন। কিন্তু নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিবেন কোন্ উপায়ে? পূর্বাচার্যগণ তাহা দেখাইয়া গেছেন। ভারতচন্দ্র পায়সান্ন পরিবেশনের সঙ্গে কালীনামের গরম মশলা দিয়া শুঁটকী মাছ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এ যুগে তাহা চলিবে না, কারণ উক্ত মাছের নূতনত্ব নাই, কালীনামেরও আর তেমন হজম করাইবার ক্ষমতা নাই। মনীষী রেনল্ড্‌স্ ও তাঁর ভারতীয় শিষ্যগণ উৎকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন,—তাঁরা যথাসাধ্য আর্টের কেরামতি করিয়া অবশেষে দেখাইয়াছেন ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়। ইহাই নিন্দুকের প্রকৃষ্ট প্রত্যুত্তর। এখন আর্টের সীমা আরো বর্ধিত হইয়াছে, প্রাচীন লেখকগণ যা স্বপ্নেও ভাবেন নাই এমন নব নব রসবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে,—আলকাতরা হইতে স্যাকারিন, বানরের অঙ্গে নব যৌবনের গ্রন্থি, ছাগলের মনের গোপন কোণে উদ্দাম প্রেমের আদিধারা। কিছুই বাদ দিবার দরকার নাই, যা কিছু ব্যাপার হইয়া থাকে বা ঘটিতে পারে তা-ই আর্টের গণ্ডিতে পড়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা চাই। যত ইচ্ছা নরক মন্থন করিয়া রত্ন উদ্ধার কর, কিন্তু উপসংহারে সমস্ত পাপাত্মার নাক কাটিয়া দাও।

একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিব, কিন্তু প্লট মনে আসিতেছে না। অপরের প্লট যে আত্মসাৎ করিব তার জো নাই,—আজকালকার ছোকরারা অতি চালাক, রুশিয়া হইতে চুরি করিলেও ধরিয়া

ফেলিবে। অতএব ঋণ স্বীকার করিয়াই চন্দ্রশেখর হইতে দু-একটি চরিত্র লইব। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে মন্দ আঁকেন নাই, তবে প্রায়শ্চিত্তটা বেশী হইয়াছে,—আজকাল অত না হইলেও চলে। কিন্তু আধুনিক আর্টের ব্যাপ্তি না জানায় প্রতাপকে তিনি একবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রতাপের চরিত্র আমূল সংশোধিত করিয়া কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইতেছি।—

প্রতাপ রায় মরে নাই। ঘা সারিবামাত্র সে চন্দ্রশেখরের বাড়ি আসিয়া হাঁকিল—ভটচায, ও ভটচায।

চন্দ্রশেখর নামাবলী গায়ে খড়ম পায়ে আসিয়া বলিলেন—কে ও, প্রতাপ যে। বেশ সেরেচ বাবা?

প্রতাপ একটি তাড়ি-রঙের ধুতির উপর তাড়ির ভাঁড়ের রঙের মেরজাই পরিয়া আসিয়াছে। তার চোখ লাল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। টলিতে টলিতে বলিল—শৈবলিনীকে ডেকে দিন।

চন্দ্রশেখর মাথা নীচু করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন—নাই বা দেখা করলে।

—দেখা করতে আমি আসি নি, একবারে নিয়ে যেতে এসেচি। ডাকুন শীগ্‌গির।

—সে কি প্রতাপ? তিনি যে কুল-বধূ।

—হলেনই বা, এক কুল ছেড়ে অন্য কুলে যাবেন, আমি তো আর লরেন্স ফস্টর নই। সব ঠিক করেচি, তোকি খাঁ প্রস্তুত, আজই শৈবলিনীকে মোছলমান বানিয়ে দেবে,—তার পর আপনাকে তাল্লাক, আমার সঙ্গে নিকে। আমার নাম এখন আফ্‌তাব খাঁ। ভয় নেই ঠাকুর, জাত যাবে না, কালই আবার রামানন্দ স্বামীকে ধরে দুজনে শুদ্ধি নিয়ে নেব।

চন্দ্রশেখর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—তুমি কি জাল-প্রতাপ?

প্রতাপ বজ্র-নিনাদে বলিল—আমি জাল। মূর্খ ব্রাহ্মণ,, কাহার সম্পত্তি তুমি ভোগ করিতে চাও? এক বৃন্তে দুটি ফুল, কে ছিঁড়িয়া-

ছিল ? (মূল গ্রন্থ দেখ) ভণ্ড জ্যোতিষী, শৈবলিনীর অন্তরের কথা বিবাহের পূর্বে গণিয়া দেখ নাই ?

চন্দ্রশেখর কাতর কণ্ঠে কহিলেন—খুবই অন্যায় হয়ে গেছে বাবা। স্ত্রী-চরিত্র তো জ্যোতিষে গণা যায় না। এই কলিকালে যে বিবাহের পূর্বে প্রেম হতে পারে তা জানতুমই না। যেতে দাও বাবা, যেতে দাও—যা হবার হয়ে গেছে। বেচারী এখন শান্তিতে আছে, সংসারধর্ম করচে, পুরানো কথা সব ভুলেচে। আহা, আর তাকে উদ্‌ব্যস্ত করো না।

প্রতাপ উন্মত্তের ন্যায় হাসিয়া বলিল—এই বিদ্যে নিয়ে তুমি পণ্ডিতি কর ? যে অন্তরে অন্তরে আমারই, তাকে তুমি কোন্ অধিকারে আটকে রাখবে ? বল ব্রাহ্মণ, বল বল। যে আমার শৈশব-সঙ্গিনী, সে আজু কাঁহা মেরী হৃদয়কী-ঈ-ঈ— (স্টার থিয়েটার দেখ)

চন্দ্রশেখর ভীত হইয়া বলিলেন—একটু ঠাণ্ডা হও বাবা। আমি বুঝিয়ে দিচ্চি।—পাপের স্পর্শ হতে কেউ রক্ষা পায় না, শৈবলিনীও ছেলেবেলায় পাপে পড়েছিলেন—

—অ্যাঁ! পূর্বরাগ পাপ ?

—সর্বত্র পাপ নয় বাবা। কিন্তু যেখানে স্বাধীন বিবাহ চলিত নেই, সেখানে পূর্বরাগের ফলে পরে শান্তিভঙ্গ হতে পারে; সেজন্যই পাপ।

—তবে পাপীয়সীকে ছেড়ে দাও না ঠাকুর।

——খাপ্‌পা হয়ো না বাবা। পাপ হলই বা—ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি,—অমন একটু-আধটু পাপ আমরা সবাই করে থাকি। কিন্তু সেটা নির্মূল করাও যায়। শৈবলিনী মন্ত্রলাভ করেচেন, যে মন্ত্রবলে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাতে চালানো যায়। (মূল গ্রন্থ দেখ)

—বুঝেচি বুঝেচি, বুজরুকি করে তাকে আটকে রাখতে চান!

ও চলবে না ঠাকুর, তুমি তাকে আটকাবার কে? আমার শৈবলিনীকে চাই, এক্ষুনি এক্ষুনি। উচাটন মন যারে ধরিবারে ধায়, তারে কেন-ক্যানও-কেন নাহি পায়! (স্টার থিয়েটার দেখ)

চন্দ্রশেখর খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন—ক্যানও নাহি পায় তা আমি বুঝিয়ে দিচ্চি। রামচরণ অ রামচরণ—

রামচরণ এখন ভটচায-বাড়িতেই কাজ করে। সাড়া দিল—আজ্ঞে।

—ওরে নিয়ে আয় তো আমার ছড়িটা, সেই বেতের লিক্‌লিকে ছড়ি। বাঁশের লাঠিটা নয়, বুঝেচিস্?

প্রতাপ বলিল—ছড়ি কি হবে, ভটচায?

—তোমায় লাগাব। দু-এক ঘা খেলেই বুদ্ধি সাফ হয়ে যাবে। রামচরণ, জল্‌দি—

প্রতাপ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—অ্যাঁ, মারবে? প্রতাপ রায়ের গায়ে হাত? তবে রে পাজী, শুয়ার—

—অ রামচরণ, বেতের ছড়িতে হবে না রে, বাঁশের লাঠিটাই আন্—

প্রতাপ সদর্পে পলায়ন করিল। আর্ট ও সমাজধর্ম দু-ই বজায় রহিল, অথচ লাঠি ভাঙিল না।

১৮৪৯

তামাক ও বড় তামাক

মানুষ ও জন্তুর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, মানুষ নেশা করিতে শিখিয়াছে, জন্তু শেখে নাই। বিড়াল দুধ মাছ খায়, অভাবে পড়িলে হাঁড়ি খায়, ঔষধার্থে ঘাস খায়, কিন্তু তাকে তামাকের পাতা বা গাঁজার জটা চিবাইতে কেউ দেখে নাই। মানুষ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে, ঘর সংসার পাতে, জীবন-ধারণের জন্য যা-কিছু আবশ্যক সমস্তই সাধ্যমত সংগ্রহ করে, কিন্তু এতেই তার তৃপ্তি হয় না—সে একটু নেশাও চায়। অবশ্য, গম্ভীর-প্রকৃতি হিসাবী লোকের কথা আলাদা। তাঁদের কাছে নেশা মাত্রই অনাবশ্যক; কারণ তাতে দেহের পুষ্টি হয় না, জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হয় না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে অপকারই হয়। তথাপি বহু লোক কোনও অজ্ঞাত অভাব মিটাইবার জন্য নেশার শরণাপন্ন হয়।

নেশা বহু প্রকার, যথা তামাক গাঁজা মদ সঙ্গীত কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি। সকলগুলির চর্চার স্থান এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় নাই, সুতরাং তামাক ও গাঁজা সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

তামাক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিন্দুক জুটিয়াছে। তামাক খাইলে ক্ষুধা নষ্ট হয়, বুদ্ধি জড় হয়, হৃৎপিণ্ড দূষিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে? জগতের আবাল-বৃদ্ধ তামাকের সেবক, বনিতারাও হইয়া উঠিতেছেন। তামাকের বিরুদ্ধে যে-সব ভীষণ অভিযোগ শোনা যায়, তামাক-খোর তার খণ্ডনের কোন প্রয়াসই করে না, শুধু একটু হাসে ও নির্বিকারচিত্তে টানে। কিন্তু তাদের অন্তরে যে জবাব অস্ফুট হইয়া আছে, আমরা তার কতকটা আন্দাজ করিতে পারি।—মশায়; তামাক জিনিসটা স্বাস্থ্যের অনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যই কি সব চেয়ে বড়? একটু না হয়

ক্ষুধা কমিল, চেহারায় পাক ধরিল, হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করিল,—কিন্তু আনন্দটা কি কিছুই নয়? মোটের উপর লাভটাই আমাদের বেশী। লোকসানের মাত্রা যদি বেশী হইত, তবে আপনিই আমরা ছাড়িয়া দিতাম, উপদেশের অপেক্ষা রাখিতাম না। আমাদের শরীর মন বেশ ভালই আছে, ভদ্র-সমাজে কেউ আমাদের অবজ্ঞা করে না। হাঁ, কোন কোন অর্বাচীনের তামাক খাইলে মাথা ঘোরে তা মানি; কিন্তু দু-এক জনের দুর্বলতার জন্য আমরা এত লোক কেন এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইব?

এই সময় গঞ্জিকাসেবীর বাজখাঁই গলার আওয়াজ শোনা গেল—ভায়া, আমরাও আছি। আমাদের তরফেও কিছু বল।

তামাক-খোর ধমক দিয়া বলেন—দূর হ লক্ষ্মীছাড়া গেঁজেল! তোদের সঙ্গে আমাদের তুলনা?

গাঁজা-খোর ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—সে কি দাদা? তোমাতে আমাতে তো কেবল মাত্রার তফাত। তুমি খাও তামাক, আমি খাই বড়-তামাক। তোমরা শৌখিন বড়লোক, তাই বিস্তর আড়ম্বর,—রুপার ফরসি, জরিদার সটকা, সোনার সিগারেট-কেস, কলের চকমকি। আমরা গরীব, তাই সরঞ্জামের বড়-বড় নাম রাখিয়াই শখ মিটাই। গাঁজা কাটিবার ছুরিকে বলি রতন-কাটারি কাঠের পিঁড়িকে বলি প্রেম-তক্তি, ধোয়া ছাঁকিবার ভিজা ন্যাতাকে বলি জামিয়ার, গাঁজা ডলিবার সময় মন্ত্র বলি—বোম্ শঙ্কর কঙ্কড় কি ভোলা! আমাদের নেশার আয়োজনেই কত কাব্য-রস—তোমরা তো পরের প্রস্তুত জিনিস টানিয়াই খালাস। আর, আনন্দের কথা যদি ধর, তবে তোমরা বহু পশ্চাতে। ত্বরিতানন্দ জান? আমরা তাই উপভোগ করি। স্বাস্থ্য? তার জবাব তো তোমরা নিজেরাই দিয়াছ। আমরা স্বাস্থ্যের উপর একটু বেশী অত্যাচার করি বটে, কিন্তু আনন্দটি কেমন? না হয় গলাটা একটু কর্কশ হইল, চোখ একটু লাল হইল, চেহারাটা একটু চোয়াড়ে হইল, কিন্তু মোটের উপর শরীর মন ঠিকই আছে।

হিসাবী সমাজহিতৈষী দুই তরফের কথা শুনিয়া বলিলেন—তোমা-

দের বচসা মিটানো বড়ই শক্ত কাজ। আমি বলি কি—তোমরা দু দলই বদ অভ্যাস ত্যাগ কর। শরবত খাও, ভাল ভাল জিনিস খাও—যাতে গায়ে গত্তি লাগে, যথা লুচি-মণ্ডা। প্রকৃত আনন্দ তাতেই আছে।

তামাক-খোর বলিলেন—শরবত খুব স্নিগ্ধ, লুচি-মণ্ডাও খুব পুষ্টিকর, সুবিধা পাইলেই আমরা তা খাই। কিন্তু এ সব জিনিসে আত্মা তৃপ্ত হয় না, আড্ডা জমে না। কিঞ্চিৎ নেশার চর্চা না করিলে মানুষে মানুষে ভাবের বিনিময় অসম্ভব। তামাক অবশ্য চাই, এইটিই নিরীহ প্রকাশ্য নেশা, আর সব নেশা অপ্রকাশ্য।

গাঁজা-খোর বলিলেন—ঠিক কথা। নেশা চাই বই কি, কিন্তু গাঁজাই পরাকাষ্ঠা। তোমাদের পাঁচ জনের উৎসাহ পাইলেই আমরা ভদ্র-সমাজে চালাইয়া দিতে পারি।

সমাজহিতৈষী চিন্তিত হইয়া বলিলেন—তাই তো, বড় মুস্কিলের কথা। দেখিতেছি তোমরা কেউ-ই ধোঁয়া না টানিলে বাঁচিবে না। আচ্ছা, অক্সিজেন শুঁকিলে চলে না?

তামাক-খোর গাঁজা-খোর অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সমস্বরে কহিলেন—আজ্ঞে, ওটা অন্তিম কালে, হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছু সাকার সুগন্ধি সুস্বাদ মনোহারী ধোঁয়ার ফরমাশ করুন।

হিতৈষী নাচার হইয়া বলিলেন—তবে ঐ তামাক অবধি বরাদ্দ রহিল। তার উপর আর উঠিও না, ঐখানেই গণ্ডি টানিলাম।

গাঁজা-খোর অট্টহাস্যে বলিলেন—খুব বুদ্ধি আপনার! নেশার তত্ত্ব আপনি কিছুই বোঝেন না। ঐ তামাকই তো একটু একটু করিয়া বেমালুম ভাবে গাঁজায় পরিণত হইয়াছে—তামাক-তামা-তাজা-গাঁজা। 'মৌচাক' এর শিশু পাঠকরাও এই তত্ত্ব জানে। কোথায় গণ্ডি টানিবেন?

সমাজহিতৈষী মহাশয় হতাশ হইয়া বলিলেন—তবে মর তোমরা পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা। দিন কতক যাক, তারপর বুঝিব কার পরমায়ু কত কাল।

১৮৪৯

রবীন্দ্রকাব্যবিচার

রবীন্দ্রকাব্যবিচার

যাঁরা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় —লেখক, পাঠক আর সমালোচক। লেখক সাহিত্য রচনা করেন, পাঠক তা উপভোগ করেন, সমালোচক তার উপভোগ্যতা বিচার করেন। এই তিন শ্রেণীর চেষ্টা বিভিন্ন, পটুতাও বিভিন্ন, কিন্তু এঁদের সংস্কার বা মানসিক পরিবেশ যদি মোটামুটি এক না হয় তবে লেখক পাঠক আর সমালোচকের সংযোগ হতে পারে না। বন্দেমাতরম্ গান সকল জাতির এবং সকল সম্প্রদায়ের উপভোগ্য হতে পারে নি, কারণ তার রূপক অনেকের সংস্কারের অনুকূল নয়। রুল ব্রিটানিয়া, ইয়াংকি ডুড্‌ল প্রভৃতি গান সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে হিন্দু বলতেন, যদিও তিনি সনাতনী ছিলেন না। ভারতীয় পুরাণ তত্ত্বে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল, বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতির তিনি অনুরক্ত পাঠক ছিলেন, উপনিষৎ থেকে আরম্ভ করে রূপকথা আর গ্রাম্য ছড়া পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস আর ঐতিহ্যের কোনও অঙ্গই তিনি উপেক্ষা করেন নি। পূর্ববর্তী লেখক ভারতচন্দ্র মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় রবীন্দ্রনাথও ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত হয়েছিলেন। তারই ফলস্বরূপ কর্ণ-কুন্তী, কচ-দেবযানী, ব্রাহ্মণ অভিসার, মেঘদূত প্রভৃতি অনবদ্য রচনা তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। এই বিশিষ্ট ভারতীয় সংস্কারের চিহ্ন তাঁর রচনাতেই অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যেমন গ্রীস-রোমের পুরাণ, বাইবেল আর ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে সংস্কার পেয়েছে, আমাদের সাহিত্যও তেমনি ভারতীয় দর্শন পুরাণ ইতিহাসাদি থেকে পেয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সংস্কার মোটামুটি আয়ত্ত না করলে যেমন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের

রসগ্রহণ করা যায় না, তেমনি ভারতীয় সংস্কারে ভাবিত না হলে এদেশের সাহিত্য উপভোগ করা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের মধ্যে যাঁদের প্রাচীনপন্থী বা রবীন্দ্রানুসারী বলা হয় তাঁদের রচনাও ভারতীয় সংস্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু যাঁরা আধুনিক বলে খ্যাত তাঁরা এই সংস্কার প্রায় বর্জন করে চলেন, তাঁদের রচনায় আধুনিক পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাবই প্রকট, গ্রীস-রোমের পুরাণকথার উল্লেখও কিছু কিছু দেখা যায়। এই নব্য রীতি প্রবর্তনের কারণ—গতানুগতিকতায় বিতৃষ্ণা এবং আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্য-রীতির প্রতি অনুরাগ। আর একটি কারণ—এদেশের ঐতিহ্যকে এঁরা প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ মনে করেন, সেজন্য তার যথোচিত চর্চা করেননি।

পূর্ববর্তী কবিরা যে সংস্কার অর্জন করেছিলেন, তা থেকে এঁরা প্রায় বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ, মেঘদূত' তুল্য রচনা এঁদের আদর্শের অনুরূপ নয়, সাধ্যও নয়। 'এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম রঞ্জিত ফেনহিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে'—এইরকম অনুপ্রাসময় ছন্দ তাঁরা অতি সেকেলে মনে করেন। 'তাঁর লটপট করে বাঘছাল তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে, তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল, যত ভুজঙ্গদল তরজে'—এই রকম পৌরাণিক কল্পনাতেও তাঁদের অরুচি ধরে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব তাঁরা অস্বীকার করেন না, কিন্তু আদর্শও মনে করেন না।

বাঙালী সমাজের একটি শাখা ইঙ্গবঙ্গ নামে খ্যাত। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে নূতন শাখা উদ্‌গত হয়েছে, তাকে ইওরোবঙ্গ নাম দিলে ভুল হবে না। এই নূতন শাখার প্রসারের ফলে আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন শাখার ক্ষতি হবে মনে করি না। সাহিত্যের মার্গ বহু ও বিচিত্র, কালধর্মে নূতন নূতন মার্গ আবিষ্কৃত হবেই। একদল কবি যদি পূর্বধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বনির্বাচিত পথেই চলেন এবং তাঁদের গুণগ্রাহী পাঠক আর সমালোচকের সমর্থন পান তাতে সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়বে ছাড়া কমবে না।

প্রাচীন আর নবীন দুই শাখায়ই নিষ্ঠাবান লেখক পাঠক আর সমালোচক আছেন। এক শাখার সমালোচক যদি অন্য শাখার রচনা বিচার করেন, তবে পক্ষপাতিত্ব অসম্ভব নয়। তথাপি বাঙ্গালী সমালোচকের পক্ষে সমগ্র বাঙলা কাব্য বিচারের চেষ্টা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় বা বিদেশী যে কোনও পণ্ডিতের পক্ষে ভারতীয় আর পাশ্চাত্ত্য রচনার তুলনাত্মক সমালোচনা সহজ নয়।

এককালে রবীন্দ্র-কাব্যের যেসব দোষদর্শী সমালোচক ছিলেন তাঁরা সকলেই প্রাচীনপন্থী। নব্যতন্ত্রের পক্ষ থেকে প্রতিকূল সমালোচনা বিশেষ কিছু হয়নি। রবীন্দ্রকাব্য আর পাশ্চাত্ত্যকাব্যের তুলনাত্মক নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন এমন বিদগ্ধ প্রতিভাবান সাহিত্যিক কেউ আছেন কিনা জানি না। মধুসূদন দত্ত যদি একালের লোক হতেন, তবে হয়তো পারতেন, প্রমথ চৌধুরীও হয়তো পারতেন। কোনও বিদেশী পণ্ডিতের এইরূপ সমালোচনার যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ। ভারতীয় আর পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ সাহিত্যে যাঁর গভীর জ্ঞান নেই, উভয়বিধ সংস্কারে যিনি ভাবিত নন, তাঁর পক্ষে তুলনাত্মক বিচারের চেষ্টা না করাই উচিত।

